প্রকাশক : শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৭

মুদ্রক : শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়
টেম্পল প্রেস
২, ন্যায়রত্ন লেন
কলিকাতা-৪

নিবেদন

'প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার' গ্রন্থখানি যাঁহাকে উৎসর্গীকৃত, সেই ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত আর ইহজগতে নাই। বাংলার সাহিত্য-শিক্ষাগগনে একটি জ্যোতিষ্ক পতন ঘটিল। আমার আক্ষেপ, আমি এই গ্রন্থখানি তাঁহার হাতে তুলিয়া দিতে পারি নাই। এই তর্পণাঞ্জলি দ্বারা আজ শুধু সর্বান্তঃকরণে তাঁহার পরলোকগত সত্তার শান্তি ও সুগতি কামনা করি।

আলোচ্য গ্রন্থের এই দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয় সংস্কৃত রসসাহিত্য, পালি, বৌদ্ধ-সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্যের পরিচিতিসহ বাঙালীর উত্তরাধিকারের পর্যালোচনা।

ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়, যে সংস্কৃতসাহিত্যের সহিত বাঙালীর এত নিবিড় যোগ, একমাত্র দেবায়ত প্রেমকবিতার ধারাটি ব্যতীত, সংস্কৃতের বহুবিচিত্র অন্য কোন সাহিত্যশাখা প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে রক্ষিত হয় নাই। তবে সংস্কৃত প্রকাশভঙ্গি, অলংকরণ-রীতি ও বাক্-প্রৌঢ়ির প্রভাব কোনদিনই অল্প ছিল না। নব্যযুগে বাঙালীর মনোজগতে সংস্কৃত সাহিত্য এক বিচিত্র আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। নব্য-বাংলার নাটক, যাত্রা, মহাকাব্য. কথাসাহিত্য ও নবীন কবিতায় সংস্কৃতসাহিত্যের অপরিমেয় প্রভাব। কবি কালিদাস বাঙালীর মানসলোকে অমর আসনে অধিষ্ঠিত।

প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের প্রধান ভিত্তি লৌকিক ধর্ম-কর্ম ও সাহিত্য। এই সূত্রে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব গণনীয়। অবশ্য হীনযান পালিসাহিত্যের সাক্ষাৎ উত্তরাধিকার প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে নাই। হীনযান বৌদ্ধসাহিত্যের সহিত বাঙালীর নবপরিচয় নব্যযুগে। ইহাদ্বারা প্রাচীন বৌদ্ধ-নীতির আদর্শ, বুদ্ধদেবের সংস্কারমুক্ত বৈপ্লবিক মনোভাব এবং সর্বোপরি সার্বিক মানবধর্ম শিক্ষিত বাঙালী-মানসে অশেষ প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে। প্রাচীন যুগে এদেশে বিদ্যমান ছিল মহাযান বৌদ্ধ ধর্মাদর্শ। বাংলাসাহিত্যের সূচনাকাল হইতে তান্ত্রিক ও সহজিয়া বৌদ্ধদের মধ্যস্থতায় এই মহাযান মত বাঙালীর লৌকিক ধর্ম-কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। নব্যযুগে নেপাল-তিব্বতের মহাযান সাহিত্যের আবিষ্কার এদেশে নূতন গবেষণার দ্বার উন্মোচন করিয়া দিয়াছে এবং বাঙালীর সংস্কৃতি-সাহিত্যে বৌদ্ধধর্মের নিগূঢ় প্রভাব ক্রমে ক্রমে বহু অনুদ্ঘাটিত তথ্যের উপর আলোক সম্পাত করিতেছে।

বাংলার লৌকিক সাহিত্যে ও ধর্মে-কর্মে জৈনশাস্ত্র সাহিত্যের প্রভাবও অন্তঃশীলা। ধর্মবিষয়ে কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনায় ও ধর্মের নামে 'হত্যা' দেওয়ার ব্যাপারে জৈনপ্রভাব রহিয়াছে। বাংলার ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যে জৈন 'ধম্মকহা'র প্রভাব অপরিসীম। বাংলার নাথসাহিত্য ও কথাসাহিত্যের বিবিধ উপাদান জৈনসাহিত্য হইতে সমাহৃত। প্রাকৃত রসসাহিত্যের সহিত বাংলাসাহিত্যের যোগ তেমন প্রত্যক্ষ না হইলেও এদেশের লৌকিক প্রেমকবিতার সহিত প্রাকৃত প্রেমকবিতার নাড়ীর যোগ লক্ষিত হয়। বাংলা মঙ্গলকাব্যের গঠনপ্রকৃতির সহিত সাদৃশ্য আছে প্রাকৃত গৌড়বহো কাব্যের।

অপভ্রংশ ভাষা ও সাহিত্যের সহিত বাংলার যোগ প্রত্যক্ষ। চর্যার ভাষা ও ব্রজবুলি অপ্রাচীন অপভ্রংশেরই অপভ্রংশ। অপভ্রংশের শিথিল উচ্চারণ-রীতি ও অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত ছন্দের প্রভাবও বাংলাছন্দে অনুকৃত হইয়াছে। শুধু তাই নয়, লৌকিক জগতের যাবতীয় ভাব এই লৌকিক ভাষার মাধ্যমেই বাংলার লোকজগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। বাংলার ব্যবহারিক ছড়ায়, গোঁয়ার-গোবিন্দ কৃষ্ণের কল্পনায়, দরিদ্র গৃহী শিবের চিত্রাঙ্কনে অপভ্রংশের ছায়া সুস্পষ্ট।

বস্তুতঃ লোকজগতের সংস্কার লইয়াই বাংলাসাহিত্যের উন্মেষ। ক্রমে ক্রমে ইহার বুকে হিন্দুব্রাহ্মণ্যের ভৃগুপদচিহ্ন মুদ্রিত হইয়াছে এবং বাংলাসাহিত্যে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের উত্তরাধিকার সার্থক হইয়াছে স্বী-কৃত সংস্কৃতসাহিত্য লইয়া। এই গ্রন্থে এই সকল বিষয়ের প্রতিই অঙ্গুলিসংকেত করা হইয়াছে।

এই দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে মহাবাণী প্রেসে। মহাবাণী প্রেসের সুদক্ষ কর্মিবৃন্দের কথা আমি কোনদিনই ভুলিতে পারিব না। গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের শ্রম অসাধারণ। আমার এই সামান্য সেবা দ্বারা যদি বাংলাসাহিত্য ও বাঙালী পাঠক-সমাজ বিন্দুমাত্রও উপকৃত হন, তবেই এই শ্রমের সাফল্য। আমি সর্বান্তঃকরণে সকলের শুভেচ্ছা কামনা করি।

শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী
রামমোহন কলেজ (সিটি কলেজ মহিলা বিভাগ)
কলিকাতা

পোঃ গড়িয়া, ২৪ পরগণা

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা

বছর দুয়েক পূর্বে এই খণ্ড নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। ডি. এম. লাইব্রেরীর স্বত্তাধিকারী শ্রদ্ধেয় গোপালদা'র আগ্রহাতিশয্যে ইহা পুনরায় প্রকাশিত হইল। তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ। প্রয়োজনবোধে এই খণ্ডের কোন-কোন অংশ পরিমার্জিত ও পুনর্লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি যে অধ্যাপক, ছাত্র ও সাধারণ পাঠক মহলে জনপ্রিয় হইয়াছে, ইহাতে আমি গৌরবান্বিত। এই গ্রন্থের মুদ্রণ কার্য অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে করিয়াছেন টেম্পল প্রেসের কর্মিবৃন্দ। তাঁহাদের আমি ধন্যবাদ জানাই।

গড়িয়া (২৪ পরগণা)

গ্রন্থকার

সূচী

॥ সংস্কৃত রসসাহিত্য ॥ পৃষ্ঠা ১-২২২

॥ পালি সাহিত্য ॥ পৃষ্ঠা ২২৩-২৫৩

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য
ও
বাঙালীর উত্তরাধিকার

॥ সংস্কৃত রসসাহিত্য ॥

১. ভূমিকা

ঠিক কোন্ সময় হইতে সংস্কৃত ভাষা নিজস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই ভাষায় রসসমৃদ্ধ সাহিত্য রচিত হইয়া আসিতেছে তাহা নিঃসংশয়ে নিরূপণ করা অসম্ভব। বেদ-ব্রাহ্মণ-উপনিষদের ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য থাকিলেও বৈদিক যুগের পুরোহিত-তন্ত্রের ভাষার প্রকৃতি লৌকিক সংস্কৃত হইতে পৃথক।

পাণিনিব ব্যাকরণে 'ভাষা' নামে একটি স্বতন্ত্র ভাষার উল্লেখ দেখা যায়। পণ্ডিতগণ মনে করেন, এই 'ভাষা'ই শিষ্টজন-ব্যবহৃত লৌকিক সংস্কৃত। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণও বলেন, বৈদিক যুগে জনসাধারণেব মুখে ভাষার একটি কথ্য রূপ ছিল, আর শিক্ষিত শিষ্টজনের মধ্যে আব একটি ভাষার ব্যবহার ছিল। শেষোক্ত ভাষাটি বৈদিক ভাষারই একটি সুসংস্কৃত রূপ—অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল। ইহাই সংস্কৃত।

এই সংস্কৃত ভাষায় একটি সুবিশাল বস-সমৃদ্ধ সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। বিষয়বৈচিত্র্যে, চিন্তাশক্তির দার্ঢ্যে ও প্রকাশ-নৈপুণ্যে এই সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যেরও গৌরব।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এমন একটি সুসমৃদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাসও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। ইহার আদি পর্বের ইতিহাস প্রায় বিস্মৃত। বিকাশ-পর্বে ইহার যে প্রদীপ্ত ছটা, তাহারও কালনির্ণয়ের অভ্রান্ত নিরিখ নাই।

স্থূলভাবে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক হইতে খ্রীষ্টাব্দ দ্বাদশ শতক পর্যন্ত এই সাহিত্যের কালসীমা ধরিয়া ইহাকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়ঃ আদিপর্ব, সমৃদ্ধি পর্ব ও অবক্ষয় পর্ব।

খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হইতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত, অর্থাৎ কালিদাসের পূর্ব পর্যন্ত আদি পর্ব। নাম আদি পর্ব, কিন্তু উহার পটভূমিকায় বেদ-পুরাণ-ইতিহাসের সুসমৃদ্ধ উপকরণ থাকায় সংস্কৃত সাহিত্য শৈশব হইতেই প্রৌঢ়। আচার্য Maxmuller তাঁহার বহুখ্যাত Renaissance Theory দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, শক-সিথিয়ানদের আক্রমণে এদেশে এমন একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল যে,

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যের কোন উল্লেখযোগ্য চর্চা এদেশে হয় নাই। গুপ্তরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালে সংস্কৃত ভাষা-সাহি... পুনর্জাগরণ ঘটে এবং সংস্কৃত সাহিত্যের শুরুও সেই সময় হইতে।

আচার্য Maxmuller-এর এই তত্ত্ব খণ্ডিত হইয়াছে। কবি কালিদাসের খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষভাগ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে এবং খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হই... যে সংস্কৃত কাব্য-নাটক রচিত হইয়া আসিতেছে, তাহারও প্রমাণ মিলিতেছে।

তবে একথা সত্য যে, গুপ্তরাজত্বের অভ্যুত্থানের পূর্বে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃ সাহিত্য জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রবল বাধার সম্মুখীন হইয়াছিল। এই সময় প্রাকৃ ভাষা, বিশেষতঃ পালিভাষার অভ্যুন্নতি। তথাপি উহা সংস্কৃতের চর্চাকে রুদ্ধ করিতে পারে নাই। ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম অমেয় প্রাণশক্তির অধিকারী। বররুচির মত কবি, চাণক্যের মত কঠোর রাজনীতিবিদ্ ও পতঞ্জলির মত ভাষ্যকার ব্রাহ্মণের অসদ্ভাব কোনকালেই হয় নাই। উপরন্তু মহাযান বৌদ্ধগণ পালির পরিবর্তে সংস্কৃতকে (মিশ্র সংস্কৃত) ভাবপ্রকাশের বাহনরূপে গ্রহণ করায় সংস্কৃতের চর্চায় ছেদও পড়ে নাই। সংস্কৃত সাহিত্যের আদিপর্বেই ভরতের নাট্যশাস্ত্র, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, কাত্যায়নের বার্তিক (পাণিনির টীকা), কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও নীতিশ্লোক, বাৎস্যায়নের কাম সূত্র (কেহ কেহ মনে করেন, চাণক্যের অপর নাম বাৎস্যায়ন) এবং পতঞ্জলি মহাভাষ্য রচিত হইয়াছে। কাব্য, নাটক, খণ্ডকবিতা ও গল্পসাহিত্যও প্রচ ছিল। কথিত আছে, স্বয়ং পাণিনি 'জাম্ববতী জয়' নামক কাব্য রচনা করি ছিলেন। কবি অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' কাব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। নাট্যসাহিত্যে অভাব ছিল না। পাণিনির ব্যাকরণের 'নটসূত্র' প্রমাণ করে, তাঁহার সময়ে নাটক প্রচলিত ছিল। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি এই 'নটসূত্রে'র ভাষ্যে এমন কতক গুলি কথা বলিয়াছেন, যাহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, তৎকালে নাট্যকলা সুসমৃদ্ধ ছিল অশ্বঘোষের নাটক ও ভাসের নাট্যচক্র আবিষ্কৃতও হইয়াছে। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে বিবিধ উপাখ্যান-বর্ণনায় দক্ষ যাবক্রীতিক, যাযাতিক, বাসবদাত্তিক প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। বৌদ্ধ দীর্ঘনিকায়ের 'ব্রহ্মজাল সুত্তে'ও—রাজ-কথা, চোর-কথা, যুদ্ধ-কথা, গ্রাম কথা, নারী-কথা, বীর-কথা প্রভৃতি কথার উল্লেখ রহিয়াছে। উহাদ্বারা কালিদাসোক্ত উদয়ন-কথা-কোবিদ্‌গণের আলাপ্য কথাসাহিত্যও যে সে যুগে প্রচলিত ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা সম্ভব। এগুলি ছাড়া, মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের অনু শাসন (গীর্ণার অনুশাসন) এবং কবি হরিষেণ রচিত সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তি (এলাহাবাদ প্রাপ্ত, আনুমানিক ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে সংস্কৃত রচনাশৈলীর যে নিদর্শন পা যায়, তাহাতে কালিদাসের আবির্ভাব যে আকস্মিক নয়, তাহা অনুমান করা সম্ভ

এই আদি পর্বের সংস্কৃত সাহিত্য যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা সহজ অনাড়ম্বর শিল্প-নৈপুণ্যের স্বাক্ষর বহন করে। অলংকার শাস্ত্রের কঠিন নিয়ম সাহিত্যের স্কন্ধে চাপিয়া বসে নাই ; তাই এই পর্বের সাহিত্যে একটি অকৃ ও প্রাণ-শক্তির প্রকাশ লক্ষিত হয়।

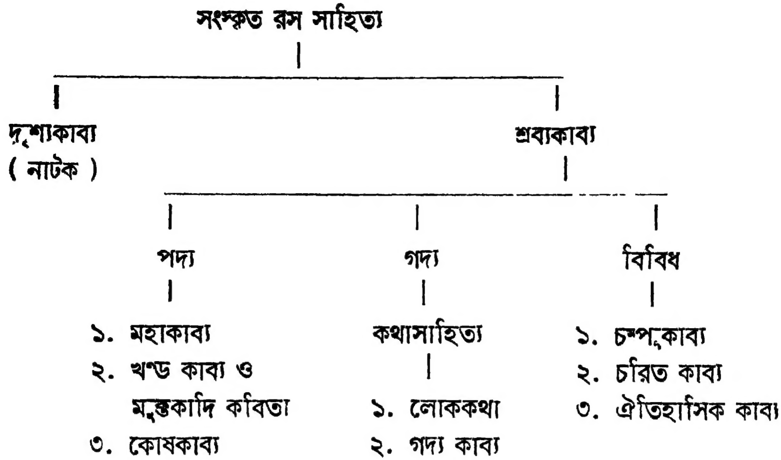
খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতক সংস্কৃত সাহিত্যের সমৃদ্ধির যুগ। এই সময় কবি-নাট্যকার কালিদাসকে কেন্দ্র করিয়া সংস্কৃত রস-সাহিত্য চর্চা উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। তখন গুপ্তসম্রাটগণ রাজচক্রবর্তীর আসনে সমাসীন। নবরত্ন সমন্বিত হইয়া তাঁহারা রাজসিংহাসনে উপবেশন করিতেন। কাব্যকথা ও রসকথায় রাজসভা পূর্ণ হইয়া উঠিত। ভারতবর্ষের সমাজ ও রাষ্ট্র তখন ঐশ্বর্যে ও প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। সামাজ ও রাষ্ট্রের অবস্থানির্ভর সাহিত্যও তাই এই যুগে জয়-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত। এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার কালিদাস।

সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সুদীর্ঘ ছয়শত বৎসর সংস্কৃত সাহিত্যের কৃত্রিম কাব্যকলা ও অবক্ষয়ের যুগ। তন্মধ্যে সপ্তম হইতে দশম শতাব্দীকে বলা চলে কৃত্রিম কাব্যরীতির যুগ। এই সময়ের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের গগনচুম্বী ঊর্মি অধোগামী হইয়াছে। কৃত্রিমতায় ও অলংকরণের বাহুল্যে সাহিত্য তাহার প্রাণশক্তি হারাইয়া ফেলিতেছে। তথাপি ইহারই ভিতর কিছু সাহিত্য রচিত হইয়াছে, যাহা কালের বুকে অমরতার দাবি করিতে পারে। ভারবি, ভট্টি, বাণ, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি সাহিত্যিক এই যুগের প্রথিতযশা কবি।

একাদশ-দ্বাদশ শতকে ভাবের দীনতা ও ভাষার কৃত্রিমতা চরমে উঠিয়াছে। ইহাই প্রকৃত অবক্ষয় যুগ। যে রস-সাহিত্য ছিল বিশুদ্ধ প্রেম ও সৌন্দর্যের বাহন, তাহা দেহগত শৃঙ্গারের পোষকতায় কামায়নপ্রচুর সাহিত্যে পরিণত হইয়াছে। শ্লীলতা ও অশ্লীলতার সীমারেখা চূর্ণ-বিচূর্ণ। সামাজিক ও রাষ্টীয় ব্যবস্থার ভিত্তিও শিথিল। রাজসভায় ষড়যন্ত্র ও বিশৃংখলা, সমাজেও নীতিহীনতা। একদিকে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা ও ব্যভিচারের প্লাবন, অপরদিকে গজনী ও ঘুরবংশীয় মুসলমানদের আক্রমণ। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের রাজগণের মধ্যে নিত্য বিরোধে, চালুক্য-রাষ্ট্রকূট-যাদবগণের বিদ্রোহে ও একতার অভাবে হিন্দু রাজ্য তখন শতধা বিভক্ত। এই পরিবেশে মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি হইতে পারে নাই। কোথাও ব্যর্থ অনুকরণ, কোথাও অতি কৃত্রিম অলংকরণ। তথাপি পূর্ব পূর্ব যুগের রচনার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর হইলেও, এই যুগের সোমদেবের কথাসরিৎসাগর, শ্রীহর্ষের নৈষধ চরিত, কহ্লণের রাজতরঙ্গিণী, জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও কয়েকখানি কোষকাব্যের সংকলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের এই প্রকার যুগবিভাগে ত্রুটি-বিচ্যুতির আশংকা, কারণ প্রমাণ স্বল্প এবং কাব্যের রচনাকালও সংশয়িত। বরং ইহাতে যে বহু বিচিত্র সাহিত্য-শাখা প্রচলিত আছে, সেই শাখা ধরিয়া আলোচনা করাই যুক্তি সঙ্গত। বৈচিত্র্যে ও প্রকাশনৈপুণ্যে সংস্কৃত সাহিত্য সুসমৃদ্ধ। পদ্যে ও গদ্যে যত প্রকার রচিত হইতে পারে, উন্মেষ পর্ব হইতেই সংস্কৃতে তাহার প্রকাশ দেখা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে এই বিবিধ শাখার পরিচয় বিধিবদ্ধ হইয়াছে। শের সূক্ষ্ম তারতম্যে তাহাদের উপবিভাগও অসংখ্য। অবান্তর সূক্ষ্ম য়া সংস্কৃত রসসাহিত্য-শাখার এই তালিকাটি গ্রহণ করা যাইতে পারে।

পূর্ব ইতিহ। Maxmul. শক-সিথিয়া



২. সংস্কৃত সাহিত্যের বিশিষ্টতা

(i) সংস্কৃত রসসাহিত্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বাহন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যে অষ্টাদশ বিদ্যা বহুকাল হইতে হিন্দুজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে সংস্কৃত সাহিত্য সেই নীতি শাসিত।

(ii) জন্মলগ্ন হইতেই এই সাহিত্য রসাত্মক বাক্যকেই কাব্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। রসসৃষ্টিই ইহার মুখ্য লক্ষ্য। এই রসশাস্ত্রের আদি সূত্রধার আচার্য ভরত। নাট্যশাস্ত্রকে যত অর্বাচীনই বলা হউক (খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক), উহা অপ্রাচীন নয়। স্মরণাতীত কাল হইতে সংস্কৃত কবিগণ ভরত-প্রদত্ত রসসংজ্ঞা দ্বারা পরিচালিত।

(iii) এই রসের আদি 'শৃঙ্গার'। সংস্কৃতসাহিত্য প্রধানতঃ শৃঙ্গাররসের প্রতি-মূর্তি। অগ্নিপুরাণকার বলিয়াছেন, কবি নিজে শৃঙ্গারী হইলে সমস্ত জগতটিই রসময় হইয়া উঠে। সংস্কৃত কবিগণ এই বাক্যকে সার্থক করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্য প্রেমের অপূর্ব আলেখ্য।

এই প্রেমচর্চার বেদ গান্ধর্ববেদের অন্তর্গত কামশাস্ত্র। বাৎস্যায়ন-প্রণীত কাম-শাস্ত্রকে পণ্ডিতগণ পরবর্তীকালের রচনা বলিয়া মনে করিয়াছেন. কিন্তু দেখা যায়, সংস্কৃত সাহিত্য আগাগোড়া কামন্দকী নীতিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কামের বিচিত্র গতি, বিশেষতঃ সৌন্দর্য ও সম্ভোগ বর্ণনায় ইহা বাৎস্যায়ন-গোনর্দ নীতির অধীন।

কিন্তু এই কাম 'ধর্মাবিরুদ্ধ কাম'। উহাতে সম্ভোগের স্থান নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সে সম্ভোগ কঠোর সংযম-শাসিত। নিছক ভোগে পরিসমাপ্ত শৃঙ্গারকে আর্যগণ কখনই শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করেন নাই। শুদ্ধ, সংযমিত, সমাজবিধিবিহিত প্রেমেরই

এখানে গৌরব। এ প্রেম সংজ্ঞাস্পত্যে পর্যবসিত। সংস্কৃতসাহিত্য যে সনাতন জীবনাদর্শের পরিপোষক, সে জীবন উপরকার কতকগুলি বিক্ষোভ-বাসনার উৎক্ষেপ মাত্র নয়, অন্তর্নিহিত শিবময় সৌন্দর্যের রূপমূর্তি।

(iv) এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এ সাহিত্য জীবন-পলাতক। অর্থাৎ এ সাহিত্যে সাধারণ জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয় নাই। রুদ্র বাস্তবের অভিঘাতে শ্রমক্লান্ত জীবন, অতি সাধারণ সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনায় উদ্বেল জীবন এখানে স্থান পায় নাই। যেটুকু পাইয়াছে, তাহাও সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তর্গত প্রাকৃত অংশে। ইহার এক কারণ—অধিকাংশ সংস্কৃত কাব্য-নাটক রচিত হইয়াছে রাজসভার ছত্রছায়ায় ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায়। যাঁহারা এই সাহিত্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও সমাজের উচ্চমঞ্চে অধিষ্ঠিত সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ। কিন্তু তাই বলিয়া সাধারণ জীবনকে যে তাঁহারা দেখেন নাই বা তাহাদের প্রতি কবিদের সহানুভূতি ছিল না, এ অভিযোগ অসত্য।

সংস্কৃত কবিদের জীবন-বোধ বীণাতন্ত্রের অতি উচ্চ গ্রামে বাঁধা এবং তাহা চিন্তার গভীরে সম্প্রসারিত। জীবনের কেন্দ্রীয় সুউচ্চ লক্ষ্যকেই তাঁহারা খুঁজিয়াছেন। এই জন্য 'বাস্তব' বলিতে যে দৃঢ়বদ্ধ ধারণাটি আধুনিক কালে গড়িয়া উঠিয়াছে, সংস্কৃত সাহিত্যের বাস্তব তাহা হইতে স্বতন্ত্র। ইহাদ্বারা কোন জীবনের প্রতি কবিদের অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধার ভাব বুঝায় না, বরং ঐশ্বর্যে ও প্রাচুর্যে পরিবর্ধিত, সুখে-সমৃদ্ধিতে লালিত মানস প্রবণতাকেই বুঝায়।

(v) সংস্কৃত সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গির মধ্যেও এই মানস-প্রবণতা প্রতিফলিত। কি উক্তি বৈচিত্র্যে, কি বর্ণনার প্রাচুর্যে একটি শ্লথমন্থর ভাব পরিলক্ষিত হয়। গল্প বলিতে গিয়াও কবিগণ দ্রুতত্বকে নয়, মন্থরতাকেই প্রশ্রয় দিয়াছেন। চলার বেগ বলার আনন্দে মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে। শ্রোতাও কাব্যের এই সিন্ধরীতির বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ উত্থাপন করেন নাই। বক্তব্যের বিষয় অপেক্ষা বক্তব্যের ভঙ্গিই সংস্কৃত সাহিত্যের বিশিষ্ট গৌরব।

(vi) এই প্রসঙ্গে আচার্য কুন্তকের একটি কথা মনে পড়ে। তিনি বলেন, একজন লেখকের উক্তি-বৈচিত্র্য বা ভঙ্গি-ভণিতি তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রাক্তন সংস্কারের ফল। শিক্ষা-দীক্ষা, পরিবেশ, অভিজ্ঞতা, সংস্কার যে কবির যত সমৃদ্ধ, অর্থাৎ কবি-ব্যক্তিত্ব যাঁহার যত পরিপুষ্ট, তাঁহার কাব্য তত উৎকৃষ্ট। সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করিলে এই সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধ হয়। এখানে যিনি কবি তিনি শিক্ষা-সম্বলহীন নন, তাঁহার সঞ্চয় আছে, পুঁজি আছে, তাই অধিকার আছে। সাহিত্য সস্তা অনুভূতির সহজ বহিঃপ্রকাশ মাত্র নয়—উহা অন্তর্নিহিত অনুভবের জ্ঞান-গভীর বৈদগ্ধ্যপূর্ণ প্রকাশ। সাহিত্যরচনার পশ্চাতে সংস্কৃত কবিবর্গের এই প্রস্তুতি যে কোন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহাদের শিক্ষার সমৃদ্ধি, জ্ঞানের বিস্তৃতি ও গভীরতা, অনুভবের তীব্রতা, অভিজ্ঞতায় বৈচিত্র্য ও প্রকাশের নৈপুণ্য এক অপার বিস্ময়। কোন সংস্কৃত কবি দৈব প্রেরণাবশে কাব্য

রচনা করেন নাই, করিয়াছেন স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও অর্জিত জ্ঞান-পৌরুষের প্রেরণাবলে। সংস্কৃত সাহিত্য কবি-ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল, ইহা পৌরুষেয়।

৩. কাব্যশাখার পরিচয়

দৃশ্যকাব্য (নাটক)

সংস্কৃতে দৃশ্যকাব্য বা নাট্য-সাহিত্য সুসমৃদ্ধ। কিন্তু, কোন্ সময় হইতে নাটকের সূত্রপাত, কে প্রথম নাট্যকার—তাহা জানা অসম্ভব। নাট্যশাস্ত্রের প্রণেতা ও প্রথম প্রয়োগকর্তা হিসাবে গান্ধর্ববেদের আদি ঋষি ভরতের নাম সুবিদিত। কিন্তু পণ্ডিতগণের মতে ভরতের নাট্যশাস্ত্রের কাল খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক [Keith]। অথচ নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখিত বিধি অনুসারে নাটক পাওয়া যাইতেছে তাহারও পূর্বে। Weber প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনে করেন, গ্রীক সংস্পর্শের প্রভাবেই এদেশে নাট্যকলা গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের যুক্তি প্রধানতঃ এই সকল তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—(১) Ionian শব্দের অনুকরণে এদেশের নাটকে 'যবনী' ও 'যবনিকা' শব্দের প্রয়োগ, (২) পরিচয় উদ্ঘাটনের জন্য কোন স্মারকচিহ্নের ব্যবহার, (৩) কোন অপরিচিতা যুবতীর প্রতি রাজার আসক্তি ও বাধা জয় করিয়া তাহার সহিত মিলন। কিন্তু ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের উপর গ্রীক নাট্যকলার প্রভাব এই সকল অবান্তর কারণ দ্বারা সমর্থন করা যায় না। ভারতীয় নাটকে 'যবনিকা' আবরণ-পট রূপেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু গ্রীক নাটকে Curtain-এর কোন প্রয়োগ ছিল না।[১] দ্বিতীয়তঃ পরিচয় উদ্ঘাটনের জন্য স্মারকচিহ্নের প্রয়োগ এদেশে নূতন নয়ঃ রামায়ণে হনুমান রামের অঙ্গুরিয়ক দ্বারা সীতার নিকট নিজের পরিচয় দিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ যেদেশে রাজাদের বহুবিবাহ অনুমোদিত, সেদেশে এক মহিষী বর্তমান থাকিতে অন্য যুবতীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় বৈদেশিক ঋণের প্রশ্ন উঠে না। সর্বাপেক্ষা বড় কথা, ভারতীয় নাটক যদি গ্রীক প্রভাবেই গড়িয়া উঠিবে, তাহা হইলে এদেশের নাটকে প্রথম হইতেই Tragedy সৃষ্টি হইল না কেন ? তাহা ছাড়া, প্রাচীন গ্রীক নাটক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপেই অভিনীত হইত।[২] কিন্তু এদেশে নাটকের উৎপত্তি লোকরঞ্জনার্থে ['বিনোদকরণং লোকে নাট্যমেতদ্ ভবিষ্যতি'—নাট্যশাস্ত্র ১.৮৬]। উহা পর্বকালে, বিজয়োৎসবে ও রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে অভিনীত হইত।

ভারতবর্ষে নাট্যশিল্প স্বতন্ত্রভাবেই বিকশিত হইয়াছিল। গ্রীক আবির্ভাবের পূর্বেও যে এদেশে নাটক প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। পাণিনি-ব্যাকরণে [খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক] নটসূত্রের উল্লেখ আছে। রামায়ণে [400-200 B. C]

---

১. 'There continued to be no curtain'—Outlines of classical Lit. H. J. Rose.
২. 'It is highly likely that its origin was religious'—Ibid,

'কুশীলবে'র উল্লেখ দেখা যায়। নাটকের বীজ বেদেও আছে। বেদের সংলাপ-প্রধান আখ্যানসূক্ত [যেমন, পুরূরবা-উর্বশী সংবাদ ঋ. ১০.৯৫], ভারতীয় নাটকের আদিরূপ। বৈদিক যুগে 'নৃতুঃ' ('Dancers or actors') ছিল।[১] নাট্যশাস্ত্রে বলা হইয়াছে ঋগ্বেদ হইতে পাঠ্য, সাম হইতে গীত, যজুঃ হইতে অভিনয় ও অথর্ববেদ হইতে রস আহরণ করিয়া নাটকের উৎপত্তি।[২] মনে হয়, বৈদিক সাহিত্যে যাহা ছিল বীজ, তাহারই পরবর্তী রূপ পূর্ণাঙ্গ নাটক।

(i) নাটকের সংজ্ঞার্থ ও লক্ষণ

ভারতবর্ষে নিজস্ব ধারায় যে নাট্যকলা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার সংজ্ঞার্থ ও লক্ষণ অলঙ্কারশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রই এবিষয়ে পথিকৃৎ। নাটক হইতেছে 'লোকবৃত্তানুকরণ' ['লোকবৃত্তানুকরণনং নাট্যম্'—নাট্যশা. ১.৭৮] মানুষের সুখদুঃখ সমন্বিত যে স্বভাব, অঙ্গাদি অভিনয় দ্বারা তাহার প্রকাশই নাটক,

যোঽয়ং স্বভাবো লোকস্য সুখদুঃখ সমন্বিতঃ।
সোঽঙ্গাদ্যভিনয়োপেতো নাট্যমিত্যভিধীয়তে॥ [নাট্যশাস্ত্র ১.৮৫]

আচার্য ভরতের নাট্যসংজ্ঞায় নাটকের প্রাণবস্তুকেই তুলিয়া ধরা হইয়াছে। জীবনের অনুকরণই নাটক। ইউরোপেও নাটকের এই সংজ্ঞার্থই গৃহীত। পার্থক্য এই যে, ভারতবর্ষ যেখানে জীবনের যে কোন ভাবের অভিনীত রূপটিকেই নাটক বলিয়াছে ['ত্রৈলোক্যস্যাস্য সর্বস্য নাট্যং ভাবানুকীর্তনম্'—নাট্যশাস্ত্র ১.৭৬], ইউরোপ সেখানে দ্বন্দ্ব-সংঘাত পূর্ণ ভাবের অভিনয়কেই নাটক বলিয়াছে। ফলে ইউরোপীয় নাটক হইয়াছে সংঘাত-প্রধান, আর ভারতীয় নাটক ভাব বা রসপ্রধান। ইউরোপীয় নাটকে আছে দ্রুত গতি ও সংহতি—ভারতীয় নাটকে আছে মন্থরতা ও বিস্তৃতি। রুচি ও জীবন-চর্যার বিভিন্নতাতেও দুই দেশের নাটক স্বতন্ত্র।

আচার্য ভরত নাটকের অন্তরঙ্গ স্বরূপ বিচার করিয়া নাটকের আকার ও প্রকার সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। পরবর্তীকালের আচার্যগণও নাটকের বহিরঙ্গ লক্ষণগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া নাটকের সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করিয়াছেন। আলঙ্কারিক বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে নাটকের এই সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে ঃ

নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধিসমন্বিতম্।
বিলাসর্ধ্যাদি গুণবদ্ যুক্তং নানাবিভূতিভিঃ॥
সুখদুঃখ সমুদ্ভূতি নানারস নিরন্তরম্।
পঞ্চাদিকা দশপরাস্তত্রাঙ্কাঃ পরিকীর্তিতাঃ॥

---

১. Original Sans Texts Vol V.—Muir.
২. জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বণাদপি॥ [নাট্য. শা. ১. ১৭]।

প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষি ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্ ।
দিব্যোঽথ দিব্যাদিব্যো বা গুণবান্ নায়কো মতঃ ॥
এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা ।
অঙ্গমন্যে রসাঃ সর্বে কার্যং নির্বহণেঽদ্ভুতম্ ॥
চত্বারঃ পঞ্চ বা মুখ্যাঃ কার্যব্যাপৃত পুরুষাঃ ।
গোপুচ্ছাগ্রসমাগ্রন্তু বন্ধনং তস্য কীর্তিতম ॥ [সাহিত্যদর্পণ. ষষ্ঠ পঃ]

—১. নাটকের 'বৃত্ত' হইবে একটি পুরাণ-ইতিহাস প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত, ২. ইহাতে পঞ্চসন্ধি (মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ ও উপসংহার) থাকিবে, ৩. ইহা বিলাস, ঋদ্ধি প্রভৃতি গুণসংযুক্ত হইবে, ৪. ইহাতে থাকিবে সুখ-দুঃখ হইতে সমুদ্ভুত নানারস এবং ৫. ইহা পাঁচ হইতে দশ অঙ্কে বিভক্ত হইবে ; ৬. নাটকের নায়ক হইবেন প্রখ্যাত বংশোদ্ভূত দিব্য বা অদিব্য কোন ধীরোদাত্ত প্রতাপশালী ব্যক্তি, ৮. ইহাতে শৃঙ্গার বা বীররস অঙ্গী হইবে, অন্যান্য রস অঙ্গরূপে থাকিবে এবং নির্বহণ সন্ধিতে থাকিবে কোন বিস্ময়জনক ব্যাপার ; ৯. ইহাতে মুখ্যতঃ চারিজন বা পাঁচজন পুরুষ পাত্র থাকিবেন এবং ১০. ইহার রচনা হইবে গোপুচ্ছাগ্রের মত (অর্থাৎ ঘটনা বিস্তৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম আকার ধারণ করিবে। কোন বিষয় মুখসন্ধিতে সমাপ্ত হইবে, কোনটি বা প্রতিমুখ সন্ধিতে বা গর্ভে)।

'গোপুচ্ছাগ্রসমাগ্রন্তু বন্ধনং তস্য কীর্তিতম্'—এই বাক্যটি দ্বারা আচার্য বিশ্বনাথ নাটক রচনার গূঢ় কৌশলটি সংকেতিত করিয়াছেন। নাটক রচয়িতা প্রথমে বর্ণনীয় বস্তু নির্দেশ করিয়া, উল্লিখিত বীজকে বিস্তৃত করিয়া থাকেন ; তাহার পর বুদ্ধিপূর্বক বিচার করিয়া সেই বিস্তৃত ঘটনাগুলিকে আবার সংশ্লিষ্ট করেন। বীজ অংকুরিত হইয়া পুষ্পিত হয়, আবার পুষ্প বীজেই প্রত্যাহৃত হয়। নাটকও ঠিক সেইরূপ। মুদ্রারাক্ষস নাটকেও নাটকের বীজ বিস্তার সম্পর্কে মন্ত্রী রাক্ষসের মুখে এই সত্য প্রকাশিত হইয়াছে।[১]

উপরের নাট্যসংজ্ঞা হইতে দেখা যায়, নাটকের প্রধান অবয়ব তিনটি ঃ বস্তু, নেতা ও রস ['বস্তুনেতারসশ্চৈব নাটকেঽবয়বা মতাঃ']। নাটকে প্রথমতঃ থাকিবে একটি বস্তু-বৃত্ত বা কাহিনী ; দ্বিতীয়তঃ একজন নায়ক ; এবং তৃতীয়তঃ ইহাতে আভাসিত হইবে একটি রস। একটি বস্তুকে রসে রূপায়িত করিতে প্রয়োজন কুশীলব বা নাটকের পাত্রপাত্রী। তাহাদের পরিচালক 'সূত্রধার'। সূত্রধারই নাট্যসূত্র ধারণ করিয়া থাকেন এবং নাটকের সূচনা করেন। এই সূচনাকে বলা হয় 'পূর্বরঙ্গ' (Prelude)। ইহার

---

১. কার্যোপক্ষেমাদৌ তনুমপি রচয়ংস্তস্য বিস্তারমিচ্ছন্
বীজানাং গর্ভিতানাং ফলমতি গহনং গূঢ়মুদ্ভেদয়ঞ্চ ।
কুর্বন্ বুদ্ধ্যা বিমর্শং প্রসৃতমপি পুনঃ সংহরন্ কার্যজাতং
কর্তা বা নাটকানামিমমনুভবতি ক্লেশমস্মদ্বিধো বা ॥ [মুদ্রা ৪র্থ অংক]

অন্তর্গত নান্দী ও প্রস্তাবনা। প্রথমে 'নান্দী' পাঠ করা হয়। 'নান্দী' হইতেছে মঙ্গলাচরণ ; দেব-দ্বিজ-নৃপাদির আশীর্বচন সংযুক্ত শ্লোক। নান্দী পাঠের পর সভা-পূজা ও কবি-পরিচয় প্রদানেরও নিয়ম আছে। প্রস্তাবনা হইতেছে নাটকের মুখ্য বস্তুর স্থাপনা। সূত্রধার নট, বিদূষক বা পারিপার্শ্বিকের সহিত আলাপ করিতে করিতে প্রস্তুত বিষয়ের সূচনা করিযা থাকেন। ইহাব পরেই মূল নাটকের আরম্ভ। নাটকের মূল কথাবস্তু পাঁচ হইতে দশ অংকে বিভক্ত। অংক হইতেছে নাটকেব অধ্যায বিশেষ। ইহাতে নায়কের চরিত্র প্রত্যক্ষ হয়, রস ও ভাব ব্যক্ত হইতে থাকে। নাটকীয় তাৎপর্য ক্রমে ক্রমে অগূঢ় (সুস্পষ্ট) হয়। ইহার মাঝে মাঝে গদ্য, মাঝে মাঝে শ্লোক বা পদ্য থাকে। অংক মধ্যে নাটকের বীজ সংহৃত হয় না, বরং হাস্য-উদ্বেগ-জনক বহুবিধ ব্যাপার দ্বারা বীজাংকুর বিস্তৃত হইতে থাকে। অংকের বর্ণনীয় বিষয় বহুদিনের ঘটনা নয় ['নানেকদিননির্বর্ত্ত্য কথযা সম্প্রযোজিতঃ'—সাহিত্যদর্পণ] ; ইহাতে বধ, যুদ্ধ, রাজ্যবিপ্লব, মৃত্যু, দন্তচ্ছেদ্য বা নখচ্ছেদ্য কোন ব্রীড়াকর বিষয়, অধরপানাদি বা নগরাদি অবরোধের দৃশ্য প্রদর্শিত হয না। অংকশেষে সকল পাত্র-পাত্রীরই নিষ্ক্রান্ত (প্রস্থান) দেখানো হয়।

কিন্তু অংক বিভাগ হইতেও নাটকের সন্ধি-বিভাগেব গুরুত্ব সমধিক। এই সন্ধি অংকের মত প্রত্যক্ষ কোন ভাগ দ্বারা প্রদর্শিত হয না, কিন্তু নাটকীয বস্তুব স্থাপনা, উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণাম সন্ধির দ্বারাই সূচিত হয়। সন্ধি হইতেছে নাটকীয় বস্তুর ক্রমবিকাশ ও পরিণতির অদৃশ্য বিভাগ। নাটক 'পঞ্চ সন্ধি সমন্বিতঃ'—এই সন্ধিগুলির নাম মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ ও নির্বহণ।[১] মুখসন্ধিতে বস্তুর স্থাপনা, প্রতিমুখে বিচিত্র চরিত্র ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে কথাবস্তুর অগ্রগতি ও বিস্তার, গর্ভসন্ধিতে ইহার ঘনীভূত অবস্থা, বিমর্ষ সন্ধিতে বস্তুজালের সংকুচন ও নির্বহণ সন্ধিতে কার্য ফলোৎপত্তি অর্থাৎ উপসংহার। সংস্কৃত নাটকেব উপসংহার বিয়োগান্ত হয় না ['বিয়োগান্তং ন রূপকম্'] ; কৃতি, প্রসাদ ও আনন্দে ইহার পরিসমাপ্তি। সর্বশেষে থাকে একটি 'প্রশস্তি' বা 'ভরতবাক্য'।

অভিনয় দ্বারাই রূপক প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। অভিনয় চারি প্রকার ঃ আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক। অঙ্গ দ্বারা নিষ্পন্ন অভিনযকে আঙ্গিক বা অঙ্গাভিনয় এবং বচন দ্বারা নিষ্পন্ন অভিনয়কে বাচিক অভিনয় বলা হয়। নাটকের সংলাপগুলি হয় সংস্কৃত, না হয় প্রাকৃত ঃ শিক্ষিত বা উচ্চস্তরের মানুষের ভাষা সংস্কৃত এবং অশিক্ষিত ও নারীদের ভাষা প্রাকৃত। গানগুলিও প্রাকৃতে নিবন্ধ। আহার্য অভিনয় বলিতে বুঝায়, নেপথ্য বিধান বা সাজ-সজ্জা। অভিনয় দ্বারা অশ্রু, কম্প, স্বেদাদি সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশকে সাত্ত্বিক অভিনয় বলে।

অভিনীত রূপটিই 'রূপক' বা 'নাটক'।

---

১. মুখং প্রতিমুখং গর্ভো বিমর্ষ উপসংহৃতি।
ইতি পঞ্চাস্য ভেদাঃ স্যুঃ......।। [সাহিত্য-দর্পণ. ৬ষ্ঠ পরিঃ]

(ii) নাট্যকার ও নাটক-প্রসঙ্গ

॥ অশ্বঘোষ ॥

প্রথম নাট্যকাররূপে আমরা পাই অশ্বঘোষকে। অশ্বঘোষ কণিষ্কের সমসাময়িক। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Dr. H. Luders তুরফান অঞ্চল হইতে কয়েকটি ছিন্ন তালপত্রে অশ্বঘোষের নামাঙ্কিত একখানি খণ্ডিত নাটক আবিষ্কার করিয়াছেন। নাটকটির নাম 'সারিপুত্র প্রকরণ' বা 'সারদ্বতী প্রকরণ'। এই প্রকরণটি বিখ্যাত বৌদ্ধ আচার্য সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। নাটকটি নয় অঙ্কে বিভক্ত। ব্রাহ্মণগণও যে বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন, ইহাই নাটকের বর্ণনীয় বিষয়। এই নাটক হইতে কয়েকটি মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা যায়ঃ (১) অশ্বঘোষের সময়েও প্রকারভেদে নাটককে 'প্রকরণ' বলা হইত, (২) নাটকের সংলাপে সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষাই ব্যবহৃত হইত; অভিজাত ব্যক্তিগণ সংস্কৃত এবং প্রাকৃত জন প্রাকৃত ব্যবহার করিতেন। ভারতীয় নাটকের প্রাচীন নিদর্শন হিসাবে 'সারিপুত্র প্রকরণ' অতিশয় মূল্যবান।

॥ ভাস ॥

কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে প্রথিতযশা নাট্যকার রূপে তিনজনের নাম করা হইয়াছে—ভাস, সৌমিল্ল ও কবিপুত্র।[১] সৌমিল্ল ও কবিপুত্র সম্পর্কে ইতিহাস নীরব; কিন্তু পরবর্তীকালের অনেকেই ভাসের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। বাণভট্ট তাঁহার বিখ্যাত হর্ষচরিতের 'প্রস্তাবনা' শ্লোকে বলিয়াছেনঃ

> সূত্রধার কৃতারম্ভৈ র্নাটকৈ র্বহুভূমিকৈঃ।
> সপতাকৈ র্যশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরিব ॥

—'কেহ যেমন সূত্রধারের [শিল্পীর] কৌশল-নির্মিত, বহুভূমিক [বহুতল বিশিষ্ট] পতাকা [বৈজয়ন্তী] সুশোভিত দেব ভবন প্রতিষ্ঠিত করিয়া যশোলাভ করেন, সেইরূপ মহাকবি ভাসও সূত্রধার [নট] মুখে আরব্ধ, বহুভূমিকা [পাত্র] সমন্বিত, পতাকা [প্রাসঙ্গিক কথা] যুক্ত নাটক সমূহের রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।'[২]

কবি রাজশেখরও 'সূক্তি মুক্তাবলীতে' ভাসের নাটক-চক্রের কথা উল্লেখ করিয়া 'স্বপ্নবাসবদত্তা' যে তাহারই রচনা, তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু মহাকবি ভাসের নাম ইতস্ততঃ উল্লেখিত হইলেও ভাসের নাটকাবলীর পরিচয় অজ্ঞাত ছিল। ১৯০৯

---

১. প্রথিতযশাং ভাস-সৌমিল্ল-কবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্তমান কবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ কথং বহুমানঃ—মালবিকাগ্নিমিত্র, ১ম অংক।

২. অনুবাদ শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক, 'প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণম্' প্রবন্ধ—সাহিত্য পৌষ. ১৩২০।

খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী পদ্মনাভপুরের মণ-লিক্কর মঠ হইতে তালপাতায় লিখিত একখানি মহামূল্য গ্রন্থ আবিষ্কার করেন। গ্রন্থখানি কেরলের ভাষায় লিখিত, ইহাতে মোট এগারোটি নাটক ছিল। নাটকগুলির নাম—স্বপ্ননাটকম্, প্রতিজ্ঞা নাটিকা, পঞ্চরাত্রম্, অবিমারকম্, বালচরিতম্, চারুদত্তম্, মধ্যমব্যায়োগঃ, দূতবাক্যম্, দূত-ঘটোৎকচম্, কর্ণভারম্, ও ঊরুভঙ্গম্। ইহার পরে অনুরূপ আরও দুইখানি নাটক আবিষ্কৃত হয়—প্রতিমা নাটকম্ ও অভিষেক নাটকম্।

এই তেরোখানি নাটকেরই রচনা প্রণালী প্রায় একরূপ। প্রত্যেকটি গ্রন্থের আরম্ভে 'নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ' বলিয়া সূত্রধারের মুখে নান্দী শ্লোকটি দেওয়া হইয়াছে। এগুলিতে 'প্রস্তাবনা'র পরিবর্তে 'স্থাপনা' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্যান্য নাটকে যেমন প্রস্তাবনা অংশে কবির ও নাটকের নাম ঘোষিত হয়, এই নাটকগুলিতে তাহা নাই। কবির নাম নাই-ই,* তবে গ্রন্থশেষে অর্থাৎ ভরতবাক্যে নাটকের নাম উল্লেখিত হইয়াছে। ভরতবাক্যগুলি প্রায় এক ধরনের, যথা, 'মহীমেকাতপত্রাঙ্কং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ' [স্বপ্নবাসবদত্তা, বালচরিত, দূতবাক্য] অথবা 'তথা লক্ষ্ম্যা সমাযুক্তো রাজা ভূমিং প্রশাস্তু নঃ' [প্রতিমা নাটকম্]। এই সকল লক্ষণ হইতে অনুমিত হয়, নাটকগুলি একই ব্যক্তির রচনা।

এই ব্যক্তিটি কে ? পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী মনে করেন, ইনিই মহাকবি ভাস। ভাস 'স্বপ্নবাসবদত্তা' নাটকের রচয়িতা, এই নাটক-চক্রের প্রথম নাটকখানির নাম 'স্বপ্ন নাটকম্' বা 'স্বপ্ন বাসবদত্তম্'। তাহা ছাড়া ভাস 'সূত্রধার কৃতারম্ভৈঃ' নাটক রচনা করিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বাণভট্ট যে উক্তি করিয়াছেন, তাহার সহিত এই নাটকগুলির মিল লক্ষিত হয়।

ভাসের পরিচয়-প্রসঙ্গ কিছুই জানা যায় না। নাটকে তিনি নিজের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার রচনাবলী হইতে এইটুকু মাত্র তথ্য সংগ্রহ করা যায়, তিনি বর্ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন, আর তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী।

ভাসের আবির্ভাবের কালও তিমিরাচ্ছন্ন। গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় ভাসকে খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের, এমন কি পাণিনিরও পূর্ববর্তী বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু, Winter-nitz প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনে করেন, ভাস অশ্বঘোষের পূর্ববর্তী নহেন, আবার কালিদাসের পরবর্তীও নহেন।

ভাসের রচনা বিষয়-বৈচিত্র্যে পূর্ণ। তিনি মহাভারত, রামায়ণ এবং প্রচলিত প্রাচীন কাহিনী অবলম্বনে নাট্যবস্তু রচনা করিয়াছেন। মধ্যমব্যায়োগ, দূতঘটোৎকচ, পঞ্চরাত্র, দূতবাক্য, ঊরুভঙ্গ, কর্ণভার প্রভৃতি নাটকের বিষয় মহাভারত-কাহিনী। বালচরিতে কৃষ্ণের বাল্যলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া কংসবধ ও উগ্রসেনের অভিষেক পর্যন্ত ঘটনা দেখানো হইয়াছে—ইহার মূল 'হরিবংশ'; ইহাতে 'রাসলীলা'র পরিবর্তে 'হল্লিস' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। হল্লিস একপ্রকার মণ্ডলনৃত্য। কৃষ্ণ গোপীগণকে লইয়া এই 'হল্লিস' ক্রীড়া করিয়াছিলেন। ভাসের নাটকেও হল্লিসের বিবরণ পাওয়া যায়। প্রতিমা ও অভিষেক নাটকের কাহিনী রামায়ণ হইতে সমাহৃত। প্রতিমা

নাটকের সাতটি অংক। ইহার বিষয়—রামের বনবাস (১ম অংক), দশরথের মৃত্যু (২য় অংক), ভরতের মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় আগমন ও প্রতিমা-গৃহ (Portrait-house) হইতে পিতা দশরথের মৃত্যু অনুমান ও কৈকেয়ীর সহিত সাক্ষাৎ (৩য় অঙ্ক), সুমন্ত্রসহ রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ভরতের চিত্রকূটে গমন ও পাদুকাসহ প্রত্যাবর্তন (৪র্থ অংক), সীতাহরণ ও জটায়ুবধ (৫ম অংক), রামের বিপদ আশংকা করিয়া ভরতের লংকাগমনের সংকল্প (৬ষ্ঠ অংক), রাবণবধ ও সীতাসহ বনাশ্রমে প্রত্যাবর্তন, ভরতের পঞ্চবটীগমন, রামের অযোধ্যায় আগমন ও অভিষেকানন্তর রাজ্যভার গ্রহণ (৭ম অংক)। 'অভিষেক' নাটকের বিষয় বালীবধ ও সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক। প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ, স্বপ্নবাসবদত্তা, চারুদত্ত ও অবিমারক প্রচলিত কথা অবলম্বনে রচিত।

উদয়ন-বাসবদত্তার কথা লইয়া রচিত দুইখানি নাটক—'প্রতিজ্ঞা' ও 'স্বপ্নবাসবদত্তা' ভাসের বিখ্যাত নাটক। 'স্বপ্নবাসবদত্তা' 'প্রতিজ্ঞা' নাটকের পরিপূরক।

চারিটি অংকযুক্ত 'প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ' নাটকের বিষয়—মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের কৌশলে বৎসরাজ উদয়ন কর্তৃক অবন্তী রাজকন্যা বাসবদত্তার অপহরণ। অবন্তীর রাজা ছিলেন প্রদ্যোত, তাঁহার কন্যা রূপলাবণ্যবতী বাসবদত্তা। বাসবদত্তার পাণি প্রার্থনা করিয়া মগধ, কাশী, বঙ্গ, সুরাষ্ট্র, মিথিলা, শূরসেন প্রভৃতি অঞ্চলের রাজগণ প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছিলেন—কিন্তু বৎসরাজ উদয়ন কাহাকেও প্রেরণ করেন নাই। অথচ রূপে-গুণে উদয়নই যোগ্য পাত্র। প্রদ্যোত কৌশলে উদয়নকে বন্দী করার মন্ত্রণা করিলেন। উদয়ন বংশ পরম্পরায় 'ঘোষবতী' নামক বীণার অধিকারী ছিলেন, এই বীণার ঝংকারে তিনি হস্তী বশীভূত করিতে পারিতেন। প্রদ্যোত নাগবনে নীলহস্তী ন্যাস করিবার ছলে উদয়নকে বন্দী করিলেন। উদয়নের বিচক্ষণ সচিব যৌগন্ধরায়ণ এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন ঃ

যদি শত্রুবলগ্রস্তো রাহুণা চন্দ্রমা ইব।
মোচয়ামি ন রাজানং নাস্মি যৌগন্ধরায়ণঃ ॥

—রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় শত্রুবলগ্রস্ত রাজাকে যদি মুক্ত করিতে না পারি, তবে আমার নাম যৌগন্ধরায়ণ নয়।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া যৌগন্ধরায়ণ অন্যান্য অমাত্যগণের সঙ্গে ছদ্মবেশে উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইলেন। নিজে উন্মত্তকের বেশ ধারণ করিলেন। স্থির হইল, প্রদ্যোতের নলাগিরি নামক হস্তীকে শঙ্খ-দুন্দুভির ভীষণ শব্দে মত্ত করিয়া উদয়নকে উদ্ধার করিবেন। এমন সময় সংবাদ আসিল উদয়ন কারাগৃহ হইতে রাজকন্যা বাসবদত্তাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, বাসবদত্তাও উদয়নের প্রতি অনুরাগবতী। তখন যৌগন্ধরায়ণ আর একটি প্রতিজ্ঞা করিলেন,—ঘোষবতীবীণা, নলাগিরি হস্তী, সেই আয়তলোচনা বাসবদত্তা এবং রাজা উদয়নকে যদি আমি হরণ করিতে না পারি, তবে আমি যৌগন্ধরায়ণ নহি।

যৌগন্ধরায়ণের এই প্রতিজ্ঞাগুলির জন্যই নাটকটির নাম, 'প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধ-

রায়ণম্ ।যৌগন্ধরায়ণ প্রতিজ্ঞা সফল করিয়াছিলেন। তাঁহারই কৌশলে উদয়ন ঘোষবতী-বীণা, নলাগিরি হস্তী এবং রাজকন্যা বাসবদত্তাসহ বৎসরাজ্যে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছিলেন। যৌগন্ধরায়ণ অবশ্য বন্দী হইলেন। কিন্তু অচিরেই রাজা প্রদ্যোত এই বিচক্ষণ সচিবের সহিত সন্ধি করিয়া একটি চিত্রপটে বাসবদত্তা ও উদয়নের চিত্র অঙ্কিত করাইয়া উজ্জয়িনীতে বর-কন্যার বিবাহ সম্পন্ন করাইলেন।

'স্বপ্নবাসবদত্তা'র বিষয় ইহার পরবর্তী ঘটনা। এই নাটক ছয় অঙ্কে বিভক্ত। উদয়ন সম্পর্কে এইরূপ একটি সিদ্ধবাক্য প্রচলিত ছিল, মগধরাজ দর্শকের ভগ্নী পদ্মাবতীকে বিবাহ করিতে পারিলে উদয়ন হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন। যৌগন্ধরায়ণ স্থির করিলেন, বাসবদত্তাকে গোপন করিয়া তিনি সিদ্ধবাক্যকে সফল করাইবেন। একদিন উদয়ন মৃগয়ায় বহির্গত হইলে, যৌগন্ধরায়ণ পরিব্রাজকের বেশ ধারণ করিয়া বাসবদত্তাকে লইয়া পথে বাহির হইলেন। সংবাদ প্রচারিত হইল, অগ্নিদাহে রাজপুরী ভস্মীভূত হইয়াছে, বাসবদত্তা অগ্নিদগ্ধ হইয়াছেন এবং যৌগন্ধরায়ণও বাসবদত্তাকে উদ্ধার করিতে গিয়া অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন। এদিকে যৌগন্ধরায়ণ বাসবদত্তাকে মগধরাজকন্যা পদ্মাবতীর নিকট 'ন্যাস'রূপে গচ্ছিত রাখিয়া আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। বাসবদত্তা আবন্তিকা বেশে পদ্মাবতীর সহচরী হইয়া রহিলেন। উদয়নের রাজ্যে অগ্নিদাহের সংবাদ মগধেও পৌঁছিল। সন্তপ্ত উদয়ন কোন প্রকারে বাসবদত্তার বিচ্ছেদে জীবন ধারণ করিয়া আছেন শুনিয়া বাসবদত্তা অন্তরে হৃষ্টা হইলেন। কিন্তু একদিন শুনিয়া মর্মাহতা হইলেন যে, পদ্মাবতী বৎসরাজ উদয়নের প্রতি অনুরাগবতী। উদয়নও প্রয়োজন বশতঃ মগধে উপস্থিত হইয়াছেন, সেইদিনই উদয়নের সহিত পদ্মাবতীর বিবাহ সম্পন্ন হইবে। বিবাহ সম্পন্ন হইল এবং বাসবদত্তাকেই বিবাহের বরণ-মালা গাঁথিয়া দিতে হইল। বাসবদত্তা অশ্রুজলে মালা গাঁথিতে গাঁথিতে ভাবিলেন ঃ এদং বি মএ কত্তব্বং আসী। অহো অকরুণা খু ইস্সরা [হায়, দেবগণ কি অকরুণ ! ইহাও আমাকে করিতে হইল]।

বিবাহান্তে বাসবদত্তা সংবাদ পাইলেন, সখী পদ্মাবতী শিরঃপীড়ায় অসুস্থ হইয়া 'সমুদ্রগৃহে' অবস্থান করিতেছেন ; বাসবদত্তা স্থির করিলেন, তিনি সখীকে দেখিতে যাইবেন। উদয়নও খবর পাইলেন, পদ্মাবতী অসুস্থা। যদিও উদয়ন বাসবদত্তার বিরহে কাতর, তথাপি পদ্মাবতীর অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া তিনি রাত্রিকালে 'সমুদ্রগৃহে' উপস্থিত হইলেন। পদ্মাবতী তখনও সমুদ্রগৃহে আসেন নাই। ক্লান্ত উদয়ন শয্যায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে বাসবদত্তা গৃহে আসিয়া স্তিমিত প্রদীপে উদয়নকে পদ্মাবতী মনে করিয়া তাহার পার্শ্বে শয়ন করিলেন। সহসা স্বপ্নে উদয়ন 'হা বাসবদত্তে' বলিয়া খেদোক্তি করিয়া উঠিতেই বাসবদত্তা চকিতে উঠিয়া পড়িলেন এবং মুহূর্তে সব বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। এমন সময় উদয়নের নিদ্রাভঙ্গ হইল। স্বল্পালোকে বাসবদত্তাকে দেখিয়া তিনি দ্রুত শয্যা হইতে উঠিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ইহা স্বপ্ন, না বাস্তব ! উদয়ন ভাবিলেন ঃ

যদি তাবদয়ং স্বপ্নো ধন্যমপ্রতিবোধনম্ ।
অথায়ং বিভ্রমো বা স্যাদ্ বিভ্রমো হ্যস্তু মে চিরম্ ॥

—যদি ইহা স্বপ্ন, তাহা হইলে ঘুমই ভাল ছিল। যদি ইহা বিভ্রম, তাহা হইলে এই বিভ্রম চিরস্থায়ী হউক।

স্বপ্নে বাসবদত্তা-দর্শন হইয়াছিল বলিয়া নাটকটির নাম 'স্বপ্নবাসবদত্তা'। মগধরাজের সহায়তায় উদয়ন বৎসরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং স-সহচরী পদ্মাবতী বৎসরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। এমন সময় অবন্তীরাজ্য হইতে প্রদ্যোত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত উদয়নকে অভিনন্দন জানাইয়া কঞ্চুকী ও ধাত্রীকে বৎসরাজ্যে প্রেরণ করিলেন। প্রদ্যোত বাসবদত্তার দগ্ধ হওয়ার সংবাদ পাইয়াছিলেন। তথাপি জামাতার চিত্তবিনোদের জন্য, যে অঙ্কিত চিত্রে উদয়ন-বাসবদত্তার পরিণয় সুসম্পন্ন করাইয়াছিলেন, তাহা উদয়নকে পাঠাইয়া দিলেন। উদয়ন প্রতিকৃতি দেখিয়া চঞ্চল হইলেন। পদ্মাবতী যুগপৎ প্রহৃষ্টা ও উদ্বিগ্না হইলেন এবং উদয়নকে জানাইলেন, এই প্রতিকৃতির সদৃশ এক রমণী তাঁহারই অন্তঃপুরে এক ব্রাহ্মণের 'ন্যাস'রূপে রক্ষিতা হইতেছেন। উদয়ন এই কথা শুনিয়া উৎফুল্ল হইলেন, কিন্তু পরমুহূর্তেই ভাবিলেন, 'পরস্পরগতা লোকে দৃশ্যতে রূপতুল্যতা'।

ঠিক এই সময়েই যৌগন্ধরায়ণ প্রবেশ করিলেন। তিনি পদ্মাবতীকে গচ্ছিত ন্যাস আনয়ন করিতে বলিলেন। 'ন্যাস' আনীত হইলে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, ন্যস্তা রমণী স্বয়ং বাসবদত্তা। রাজা উদয়ন ও বাসবদত্তার আবার মিলন হইল।

ভাসের নাটক পাঠ করিতে করিতে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে অতীত ভারতে এই ধরনের নাটক রচিত হইয়াছিল, ইহা কম গৌরবের কথা নয়। শ্রদ্ধেয় রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় বলিয়াছেন, 'এই প্রদীপ্ত প্রতিভাসম্পন্ন মহাকবির কল্পনার বিশালতা, উৎপ্রেক্ষাশক্তির আতিশয্য, মানব-চিত্তবৃত্তির সম্যগ্‌জ্ঞান ও তদ্বর্ণনে সামর্থ্য প্রভৃতি গুণাবলী অল্প ছিল না।' উক্তিটি বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নয়। ভাসের সর্বাপেক্ষা বড় গুণ সহজসরল ভাষা ও বাস্তব চিত্রাঙ্কন দক্ষতা। তাঁহার রচনায় অলৌকিকতার স্থান কম, অযথা প্রকৃতি বর্ণনাও নাই,—আছে জীবনধর্মিতা ও ঘটনার অনুকূল পরিবেশ রচনার ক্ষমতা। ইংরাজি Irony—Verbal Irony এবং Irony of Action—দুইই ভাসের নাটকে অদ্ভুত কৃতিত্বের সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাই ভাসের নাটকের 'পতাকা' ['সপতা কৈর্যশোলেভে']ঃ একটি বিষয়ের প্রসঙ্গে অনুরূপ আর একটি বিষয়ের অবতারণার নাম 'পতাকা'। ভাসের নাটকে এই পতাকার প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। 'প্রতিজ্ঞা' নাটকে ঃ—রাজা প্রদ্যোত মহিষীর সহিত বাসবদত্তার বর-নির্বাচন বিষয়ে আলাপ করিতেছিলেন। মগধ, কাশী, বঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, মিথিলা, শূরসেন অঞ্চল হইতে লোভনীয় বিবাহের প্রস্তাব আসিয়াছে, কিন্তু রাজা স্থির করিতে পারিতেছেন না, কাহাকে পাত্ররূপে নির্বাচন করিবেন। রাণীকে তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'কস্তে-বৈতেষাং পাত্রতাং যাতি রাজা।' এমন সময় কঞ্চুকী আসিয়া নিবেদন করিল,

'বৎসরাজঃ।'—যেন পাত্র-পাত্রীর অজ্ঞাতসারেই বাসবদত্তার বর নির্বাচিত হইয়া গেল। এই বর বৎসরাজ উদয়ন। ইহা verbel irony-র একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। Irony of Action-এর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে 'প্রতিমা' নাটকে (১ম অঙ্ক)। দশরথ রামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। রাজ্যে উৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এই উৎসবে নাটক অভিনীত হইবে। অবদাতিকা নেপথ্য-বিধানের গৃহ হইতে একটি 'বল্কল' চুরি করিয়া আনিয়াছে। এমন সময় চেটী সহ সীতা প্রবেশ করিলেন। অবদাতিকার হাতের বল্কল দেখিয়া সীতার বল্কল পরিতে সাধ হইল ঃ হলা, কিং ণু হু মম বি দাব সোহদি—দেখি এই বল্কলে আমাকে কেমন মানায়। এই বলিয়া সীতা নিজের অঙ্গে বল্কল ধারণ করিলেন। ঠিক এই সময়েই অভিষেকের বিঘ্ন ['উদ্ঘাদো অহিসেঅস্স'] সূচিত হইল এবং ঘটনাক্রমে প্রকাশিত হইল, রামচন্দ্রকে চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনবাসে যাইতে হইবে ['বর্ষাণি কিল বস্তব্যং চতুর্দশং বনে ত্বয়া,]। সীতাও বনবাসের সঙ্গিনী হইলেন। যে বল্কল পরিধান করিয়া সীতাকে রামের বনানুগমন করিতে হইবে, নাট্যকার নিপুণ কৌশলে তাহা পূর্বেই সীতার অজ্ঞাতসারে তাঁহার অঙ্গে পরাইয়া দিয়াছেন ঃ শুধু তাই নয়, সুকৌশলে সীতাকে আভরণহীনাও করিয়াছেন। এ নাট্যকৌশল অপূর্ব নাট্যকীয়তা ও আশ্চর্য নাট্যপ্রতিভার স্বাক্ষর।

॥ কালিদাস ॥

সুদূর অতীতের অন্ধকার লোক হইতে যে জ্যোতিষ্ক-দীপ্তি সমগ্র ভারতের কবিমানসকে আলোকিত করিয়াছে, তিনি 'কবিপতি' কালিদাস। এদেশের কাব্য-নিকুঞ্জে তিনি 'পিককুলপতি' ; শুধু তাই নয়, তিনি 'চিরকবি'। বাল্মীকি-ব্যাসের মত তাঁহার কাব্যধারা অতি সাধারণ লোকের ঘাটে ঘাটে প্রবাহিত হয় নাই বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের অগণিত কবি কালিদাসের কাব্য-পীযূষ পান করিয়া ধন্য হইয়াছেন এবং তাঁহার কাব্য-রসে সঞ্জীবিত হইয়া নব কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন। লৌকিক কাব্য-নাটকের রাজ্যে কালিদাস সার্বভৌম সম্রাট। বিদেশেও কালিদাসের অসাধারণ প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, অন্যান্য প্রাচীন কবিদের মতই, কালিদাসের কাল ও জীবনী সম্পর্কে অতি অল্প তথ্যই আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুন্দরের সাধক কবি কালিদাস আজ কিংবদন্তী ও জনশ্রুতির কবি। এই কিংবদন্তী হইতে এইটুকু মাত্র তথ্য সংগ্রহ করা যায়, কালিদাস ছিলেন আকাট মূর্খ। এমন মূর্খ যে, যে বৃক্ষের শাখায় তিনি বসিয়াছিলেন, তাহাই কর্তন করিতেছিলেন। পণ্ডিতগণ প্রগল্ভা এক রাজকন্যার সহিত তর্কে পরাজিত হইয়া এই আকাট মূর্খের সহিত কৌশলে তাঁহার বিবাহ সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। বিবাহের রাত্রেই কালিদাসের এই মূর্খতা ধরা পড়ে। স্ত্রী নাকি দুঃখ করিয়া বলেন, 'উষ্ট্রং লিম্পতি যং বা রংবা। তস্মৈ দত্তা নিবিড়নিতম্বা॥' স্ত্রীর নিকট গঞ্জিত হইয়া কালিদাস মনের দুঃখে আত্মবিসর্জন দিতে প্রবৃত্ত হন। তখন স্বয়ং সরস্বতী আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করেন। সহসা কালিদাসের

মূর্খ হইতে 'জয় জয় দেবি' শ্লোকটি নির্গত হয়। মূর্খ পণ্ডিতে পরিণত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন এবং স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরে বলেন 'অস্তি কশ্চিদ্ বাগ বিশেষঃ'—একটি বিশেষ কথা আছে। কথিত আছে, কালিদাসের তিনখানি শ্রেষ্ঠ কাব্যের আরম্ভ এই বাক্যটির প্রথম তিনটি শব্দ লইয়া।[১] জীবৎকালের কিংবদন্তী এই যে, কালিদাস ছিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাকবি ঃ রাজসভায় যে 'নবরত্ন' ছিলেন, কালিদাস তাঁহাদের অন্যতম রত্ন।[২] আর একটি জনশ্রুতি, কালিদাসের শোচনীয় মৃত্যু ঘটে সিংহলে। সিংহলরাজ কুমারদাসের এক গণিকা ছিল। কুমারদাস ছিলেন কবি। তিনি একটি কবিতার প্রথম চরণ 'কমলে কমলোৎপত্তিঃ শ্রূয়তে ন চ দৃশ্যতে' লিখিয়া পাদ-পূরণের জন্য গণিকাকে প্রদান করেন এবং পাদপূরণ করিতে পারিলে তাহাকে প্রচুর পুরস্কার দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। কুমারদাসের অনুরোধে কালিদাস সিংহলে গিয়া এই গণিকার গৃহে বাস করেন এবং অসমাপ্ত চরণ পূরণ করিয়া লিখেন, 'বালে তব মুখাম্ভোজে দৃষ্টমিন্দীবরদ্বয়ম্ ॥' পুরস্কারলোভে গণিকা কালিদাসকে হত্যা করে। কুমারদাস ইহা বুঝিতে পারিয়া গণিকাকে কালিদাসের চিতাতে দগ্ধ করান। কালিদাসের জন্মস্থান সম্পর্কে কিংবদন্তী নীরব। কালিদাসের কাব্যাদিতে উজ্জয়িনীর বর্ণনাবাহুল্য দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, কালিদাস উজ্জয়িনীর অধিবাসী ছিলেন। ধর্মমতের দিক হইতে কালিদাস ছিলেন শৈব।

কালিদাসের আবির্ভাবকাল সম্পর্কেও নানা মত প্রচলিত আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলিয়াছেন, 'হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল, পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল।' কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভাকবি ছিলেন, এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ কালিদাসকে শকারি বিক্রমাদিত্যের (খ্রীঃ পূঃ ৫৮) সমসাময়িক মনে করেন। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতবর্গের মতে কালিদাস ছিলেন গুপ্তরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের [৩৮০—৪১৩ খ্রীষ্টাব্দ] সভাকবি।[৩] সম্ভবতঃ চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্তের জন্ম উপলক্ষ্যে তিনি 'কুমারসম্ভব' রচনা করেন।

কালিদাস একাধারে কবি ও নাট্যকার। তিনি (১) ঋতুসংহার (২) কুমার-সম্ভব (৩) রঘুবংশ (৪) মেঘদূত—এই চারি খানি কাব্য এবং (১) মালবিকাগ্নিমিত্র

---

১. কুমার সম্ভবের প্রথম শ্লোকের আদিতে আছে 'অস্তি' ('অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ') ; মেঘদূত কাব্যের প্রারম্ভে আছে, 'কশ্চিৎ' ('কশ্চিৎকান্তাবিরহ গুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ') ইত্যাদি এবং রঘুবংশম্-এর আরম্ভে আছে 'বাগ' (বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ-প্রতিপত্তয়ে জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ ॥')

২. ধন্বন্তরি ক্ষপণকামরসিংহ-শঙ্কু-বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য ॥

৩. 'It is not unnatural to associate him with chandra gupta II (C, 380-413 A-D), who had the style of Vikramaditya' :—Dasgupta & De,

(২) বিক্রমোর্বশী ও (৩) শকুন্তলা—এই তিনখানি বিখ্যাত নাটক রচনা করেন। এগুলি ছাড়াও শৃঙ্গারাষ্টক এবং শ্রুতবোধ নামে ছন্দ গ্রন্থও কালিদাসের রচনা বলিয়া মনে করা হয়।

প্রাচ্যদেশীয় নাট্যকারদের মধ্যমণি কালিদাস। তাঁহার প্রভাব যুগাতিশায়ী। সংস্কৃত নাট্যকারগণের তো কথাই নাই, প্রাকৃত ভাষায় যাঁহারা নাটক রচনা করিয়াছেন, নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় যাঁহারা নাটক লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, সকলেই অল্প-বিস্তর কালিদাসের নিকট ঋণী।

কালিদাস যে যুগে নাটক রচনা করেন, তখন নাট্যশাস্ত্রের নিয়মগুলি বিধিবন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভরতমুনি যে অষ্টরসানুকূল নাট্যশাস্ত্রের প্রণেতা, কালিদাস 'বিক্রমোর্বশী' নাটকে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন।[১] কালিদাসের নাটকে অলংকারশাস্ত্রের নির্দেশ কেবল প্রতিপালিত হয় নাই, তাহার সুষ্ঠু প্রয়োগের দিকেও সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। সামাজিকগণের তন্ময়তা সম্পাদনে ইহাদের আবেদন অসাধারণ।

কেহ কেহ মনে করেন পঞ্চাঙ্কে বিভক্ত 'মালবিকাগ্নিমিত্র' কালিদাসের প্রথম নাটক। প্রস্তাবনায় এই নাটককে নূতনতর রচনা ['কাব্যং নবম্'] বলা হইয়াছে। প্রথিতযশা প্রাচীন কবি ভাস, সৌমিল্ল, কবিপুত্রদের তুলনায় এই নাটক নূতন, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা 'অবদ্যম্' (নিন্দার্হ) নয়। কালিদাস নিজেও সূত্রধারের মুখে এই কথা বলাইয়াছেন। এই নাটকেও কালিদাসের প্রতিভার যোগ্য স্বাক্ষর বর্তমান।

নাটকের নায়ক অগ্নিমিত্র ঐতিহাসিক চরিত্র। এই অগ্নিমিত্র 'সুঙ্গবংশে'র প্রতিষ্ঠাতা। বিদর্ভরাজ্যের অন্যতম সামন্ত মাধব সেনের ভগ্নী মালবিকাকে অগ্নিমিত্র পত্নীরূপে লাভ করিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্তটুকুই ইতিহাসাশ্রিত, তাহা ছাড়া নাটকে ইতিহাসের অনুবৃত্তি বিশেষ নাই। প্রেমের কবি কালিদাস এই নাটকে প্রেমের বিচিত্র গতি ও বিলাসকেই রূপায়িত করিয়াছেন।

ঘটনাচক্রে অপরূপ রূপলাবণ্যবতী বিদর্ভকন্যা মালবিকা পাটমহিষী ধারিণী দেবীর পরিচারিকা রূপে অগ্নিমিত্রের অন্তঃপুরে স্থান লাভ করেন। যাহাতে মালবিকা রাজার চোখে না পড়ে, প্রধানা মহিষী ধারিণী সেই উদ্দেশ্যে মালবিকাকে অভিনয় শিক্ষার্থ নাট্যাচার্য গণদাসের নিকট অর্পণ করেন। কিন্তু রাজা একটি চিত্রপটে মালবিকার চিত্র দেখিয়া রূপমুগ্ধ হন এবং একটি 'ছলিক' অভিনয় প্রসঙ্গে মালবিকাকে সাক্ষাৎ দেখিয়া প্রণয়াসক্ত হন। বিদূষকের চেষ্টায় ও কৌশলে অগ্নিমিত্র ও মালবিকার মিলন ঘটে। ইহাতে পাটমহিষী ধারিণী ক্রুদ্ধ হইয়া মালবিকাকে অবরুদ্ধ করেন। শেষপর্যন্ত মালবিকা যে সত্যই পরিচারিকা নহেন, তিনি 'দেবীশব্দক্ষমা সতী',

---

১. 'মুনিনা ভরতেন যঃ প্রয়োগো ভবতীষ্বষ্টরসাশ্রয়ো নিবন্ধঃ'—বিক্রম, (২য় অংক)

২. 'পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্' (মালবিকাগ্নিমিত্র, প্রস্তাবনা)

'অহিজণবদী' (অভিজনবতী) রাজনন্দিনী, ইহা প্রকাশিত হয় এবং ধারিণীর ক্রোধ শান্ত হয়। তিনিই উদ্যোগী হইয়া অবশেষে মালবিকাকে অগ্নিমিত্রের করে অর্পণ করেন।

মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক হইতে কালিদাসের চরিত্র-চিত্রণ দক্ষতা, রাজ অন্তঃপুরের তৎকালীন বিলাস বৈভব এবং অভিনয় ও অভিনয় প্রয়োগ নৈপুণ্যের বহু বিষয় জানিতে পারা যায়। কেন্দ্রীয় চরিত্র মালবিকা ও অগ্নিমিত্র। নায়িকা হিসাবে মালবিকা ধীরা, মুগ্ধা। রাজকন্যা হইয়াও তাঁহাকে পরিচারিকার মত থাকিতে হইয়াছিল, কিন্তু মালবিকা ধৈর্যহারা হন নাই। মালবিকা শত বাধাবিপত্তিকে উপেক্ষা করিয়া স্ফুটনোন্মুখ কুসুমের মত ধীরে ধীরে মুকুলিতা ও পুষ্পিতা হইয়া উঠিয়াছেন এবং স্বীয় গৌরবে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন। অগ্নিমিত্রের নায়কোচিত ধৈর্য ও অধৈর্য দুইই সুন্দর ফুটিযাছে। অগ্নিমিত্র প্রেমিক, অগ্নিমিত্র রাজা। দুইটি ভূমিকাতেই অগ্নিমিত্র সমুজ্জ্বল। ধারিণী দেবীর মধ্যে নারীজনোচিত ঈর্ষ্যা ও উদারতা, কঠোরতা ও কোমলতা, অপত্য স্নেহ ও পতি-প্রীতি সুন্দর ফুটিয়াছে। এই নাটকের অন্যতম চরিত্র রাজবয়স্য বিদূষক। মালবিকা ও অগ্নিমিত্রের মিলনসংঘটনে বিদূষকের দান অসামান্য। কালিদাসের অন্য কোন নাটকে বিদূষকের এতটা কার্যকারিতা, এমন চাতুর্য, এমন বুদ্ধির খেলা প্রদর্শিত হয় নাই। রাজঅন্তঃপুরের চিত্র উদ্ঘাটনেও কালিদাসের নৈপুণ্য লক্ষণীয়। তখনকার রাজপুরী ছিল ভোগপুরী : প্রেমগত ঈর্ষ্যা, কলহ এখানকার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এই প্রসঙ্গে এই নাটকের অন্যতমা প্রতি-নায়িকা 'যুক্তমদা' ইরাবতীর চরিত্রটি লক্ষণীয়। একদিন এই ইরাবতী ছিলেন রাজার প্রিয়-পাত্রী। আজ তিনি উপেক্ষিতা। মদবিহ্বলা উপেক্ষিতা এই নারীর চণ্ডমূর্ত্তি ও দুরন্ত রোষ হৃদয়কে সচকিত করে ; আর সঙ্গে সঙ্গে উপেক্ষিতা নারীর জন্য সহানুভূতিও জাগে। ইরাবতীর এই উক্তিটি বড় করুণ : হায়, পুরুষ অবিশ্বাসী। নারী তাঁহার নিকট ব্যাধের গীতি-গৃহীতচিত্তা হরিণীর ন্যায় বঞ্চিতা হয় [৩য় অঙ্ক]। তখনকার অন্তঃপুরে এইরূপ বঞ্চিতা কত নায়িকা যে বাস করিতেন, তাহার সংখ্যা করা কঠিন। অন্তঃপুরের নিয়ন্ত্রী ছিলেন পাট-মহিষী। পরিচারিকা ও অন্যান্য সপত্নীদের এমনকি রাজাকেও তাঁহার যোগ্য মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে হইত। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক হইতে কালিদাসের কালে অভিনয়-শিক্ষা, নাটক-প্রযোজনা ও নাট্যরসাভিব্যক্তির নিগূঢ় রহস্য সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যায়। 'প্রয়োগপ্রধানং হি নাট্যশাস্ত্রম্'—নাটকের রসসিদ্ধি বর্ণনায় নয়, প্রয়োগে। অঙ্গমুদ্রা দ্বারা অন্তরের ভাব ব্যক্ত করিয়া রস-বিষয়ে সামাজিকের তন্ময়তা সম্পাদন করিতে পারিলেই অভিনয় সার্থক বিবেচিত হইত। নাট্যাচার্যগণ এই অভিনয় শিক্ষা দিতেন। বিভিন্ন নাট্যাচার্যের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইত : প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফল নির্ভর করিত অভিনয়-নৈপুণ্যের উপর। নাটক-সম্পর্কে নাট্যাচার্য গণদাসের মুখ হইতে জানা যায়,

দেবানামিদমামনন্তি মুনয়ঃ কান্তং ক্রতুং চাক্ষুষম্।
রুদ্রেণেদমুমাকৃত ব্যতিকরে স্বাঙ্গে বিভক্তং দ্বিধা ॥

ত্রৈগুণ্যোদ্ভবমত্র লোকচরিতং নানারসং দৃশ্যতে।
নাট্যং ভিন্নরুচের্জনস্য বহুধাপ্যেকং সমারাধকম্ ॥ [মাল. ১ম অংক]

—(নাট্যশাস্ত্রের) মুনিগণ (ভরত-মতঙ্গাদি) বলেন, নাটক দেবতাদিগের সুখকর চাক্ষুষ যজ্ঞ। স্বয়ং রুদ্র (নটরাজ শিব) উমার সহিত একাত্ম হইয়া স্বীয় অঙ্গে এই নাট্যের দুই প্রকার ভাগ ধারণ করিয়া আছেন। নাটকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণোদ্ভূত নানা চরিত্র ও নানাপ্রকার রস দৃষ্ট হয়। নাটক ভিন্ন রুচি বিশিষ্ট সকল লোকেরই তুষ্টি-বিধায়ক।[1]

'বিক্রমোর্বশী' নাটক পাঁচ অংকে বিভক্ত। ইহাতে বহুবিখ্যাত পুরূরবা ও উর্বশীর প্রেমকাহিনী বিবৃত হইয়াছে। যজুর্বেদে পুরূরবা ও উর্বশী অগ্নিজনন কাষ্ঠমাত্র [যজুঃ. ৫.২]; কিন্তু ঋগ্বেদে পুরূরবা ও উর্বশী প্রেমিক-প্রেমিকা [ঋ ১০. ৯৫]। পুরূরবা ও উর্বশীর প্রেমকাহিনী পুরাণের নানাস্থলে বর্ণিত হইয়াছে [বিষ্ণু. ৪. ৬-৭, ভাগ. ৯. ১৫, হরি-হরি ২৬]। কালিদাস এই সকল উৎস হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া 'বিক্রমোর্বশী' রচনা করিয়াছেন। ঘটনা-বিন্যাস কালিদাসের নিজস্ব। চরিত্র-গুলিও কালিদাসের প্রতিভাস্পর্শে বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। পাট-মহিষী কাশীরাজ-পুত্রী দেবী ঔশীনরীর চরিত্র কালিদাসের মৌলিক সৃষ্টি। নাট্যকার বেদ-পুরাণ বর্ণিত বহুখ্যাত উর্বশী-বিদায় দিয়া নাটক সমাপ্ত করেন নাই। বিক্রমোর্বশী মিলনান্ত নাটক।

সুরবিদ্বেষী কেশী দানব স্বরপ্সরী উর্বশীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। আকাশপথে আর্তনাদ শুনিয়া চন্দ্রবংশের রাজা পুরূরবা দৈত্যের হাত হইতে তাঁহাকে মুক্ত করেন। প্রথম দর্শনেই পুরূরবা ও উর্বশী পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হন। এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র উর্বশী-উদ্ধারের সংবাদ পাইয়া রাজাকে স্বর্গে আহ্বান করেন। কিন্তু কার্য ব্যপদেশে পুরূরবা রাজধানীতে ফিরিতে বাধ্য হন। উর্বশীও সখী চিত্রলেখা সহ স্বর্গে গমন করেন, কিন্তু মন পড়িয়া থাকে রাজার কাছে [প্রথম অংক]। রাজ্যে ফিরিয়া রাজাও উর্বশীর চিন্তায় বিভোর। রাজার উন্মনা ভাব মহাদেবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে সংবাদ সংগ্রহের জন্য তিনি নিপুণিকাকে প্রেরণ করেন। এদিকে উর্বশী অনুরাগবশে সখী চিত্রলেখাকে লইয়া প্রতিষ্ঠান-নগরে উপস্থিত হইয়া তিরস্করণী বিদ্যাপ্রভাবে অলক্ষ্যচারী হইয়া থাকেন এবং রাজার প্রণয়াশক্তি দেখিয়া ভূর্জপত্রে একটি প্রণয়লিপি রাজার সম্মুখে ফেলিয়া দেন। ইহাতে রাজার বিরহ-বেদনা আরও প্রচণ্ড হইয়া উঠে এবং উর্বশী রাজার নিকট আত্মপ্রকাশ করেন। মিলনের এই মুহূর্তে স্বর্গ হইতে সংবাদ আসে, ভরতমুনি কর্তৃক প্রযুক্ত অষ্টরসা-শ্রয়ী নাটক অভিনয়ার্থ উর্বশীকে স্বর্গে যাইতে হইবে। বাধ্য হইয়া উর্বশী স্বর্গে চলিয়া যান। [দ্বিতীয় অংক]। ওদিকে স্বর্গে 'লক্ষ্মীস্বয়ংবর' নাটক অভিনয়-কালে উর্বশী লক্ষ্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া ভুলক্রমে 'পুরুষোত্তম' স্থলে 'পুরূরবা'

১. উক্তিটির ভিতর ভরতের নাট্যশাস্ত্রের প্রতিধ্বনি আছে।

নাম উচ্চারণ করিয়া ফেলেন। ইহাতে কুপিত হইয়া উপাধ্যায় ভরত অভিশাপ দেন, উর্বশীকে স্বর্গভ্রষ্ট হইতে হইবে। ইন্দ্র তখন অনুগ্রহ করিয়া এই কথা বলেন, উর্বশী মর্ত্যে যাইয়া পুরূরবাতেই উপরত হইবে এবং রাজা যখন উর্বশী-জাত পুত্রের মুখ দর্শন করিবেন, তখন আবার সে স্বর্গে ফিরিয়া আসিবে।

এদিকে উর্বশী-পুরূরবার প্রণয়-ব্যাপার অগ্রমহিষীর নিকট প্রকাশিত হয় এবং তিনি পতি-প্রসাদন ব্রত উপলক্ষ্যে ঘোষণা করেন যে, রাজা যে রমণীকে কামনা করেন, বা যে রমণী রাজার মিলনপ্রার্থী, তিনি তাঁহার সহিত নির্বিবাদে সখীভাবে বাস করিবেন। ঠিক এই সময়েই উর্বশীও স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া রাজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা ও উর্বশীর মিলন হইল [তৃতীয় অংক]। এইবার রাজার প্রমোদ-বিহার ও বিরহ-প্রমাদ। মন্ত্রীগণের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তিনি কৈলাসের গন্ধমাদন পর্বতে বিহারে আসিলেন। সহসা রাজার অন্যমনস্কতায় ভাবস্খলনে উর্বশী ক্রুদ্ধা হইলেন এবং দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্যা হইয়া 'কুমারবনে' প্রবেশ করিলেন। কুমারবনে স্ত্রীজাতীর প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, দেখিতে দেখিতে উর্বশী একটি লতায় পরিণতহইলেন —'লদাভাবেণ পরিণদং সে রূবম্।' তখন বিরহে রাজার উন্মত্ত দশা। তিনি উর্বশীকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন ঃ 'ক নু গতা স্যাৎ, ইতো গতা, কথং ময়া খলু তত্র ভবতী সূচয়িতব্যা' ঃ পরক্ষণেই আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, 'হন্ত হন্ত উপলব্ধমুপল-ক্ষণং'—এই যে পথের নিশানা পাইয়াছি, কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার বিষাদ। রাজা বিহ্বল হইয়া অচেতন পদার্থকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন, ক্রন্দন করিতেছেন। সহসা পাথরের ফাটলে তিনি একটি 'রক্তমণি' দেখিতে পইলেন ঃ ইহা 'গৌরীচরণো-দ্ভবা সঙ্গমমণি' ঃ ইহা ধারণ করিলে অচিরে প্রিয়জনের সহিত মিলন হয়। পুরূরবা অচিরেই একটি লতা দেখিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে লতা উর্বশীর পূর্বরূপ ফিরিয়া পাইল। রাজা দীর্ঘ বিরহান্তে প্রিয়তমাকে পাইয়া রাজধানী প্রতিষ্ঠানপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন [চতুর্থ অংক]। সুখে দিন কাটিতেছিল। সহসা একদিন এক শকুনি রাজার চূড়া হইতে সঙ্গমমণি হরণ করিল এবং দেখিতে দেখিতে দিগ্দেশ সমুজ্জ্বল করিয়া বাণপথের অতীত হইয়া গেল। কিন্তু অনতিবিলম্বেই পক্ষী শর-বিদ্ধ অবস্থায় পতিত হইল, এবং দেখা গেল শরে লেখা আছে, ইহা উর্বশীর পুত্র-আয়ুর শর। ঠিক এই সময়ে চ্যবন মুনির আশ্রম হইতে একটি বালককে লইয়া একজন তাপসী রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হইল, আগন্তুক কুমার উর্বশীর গর্ভজাত পুরূরবার পুত্র। রাজা পুত্রকে সানন্দে বরণ করিলেন, কিন্তু উর্বশী দুঃখিতা। পুরূরবা পুত্রমুখ দর্শন করিয়াছেন, আজ উর্বশীর শাপ-মুক্তির দিন, রাজাকে ছাড়িয়া তাহাকে আবার স্বর্গে ফিরিয়া যাইতে হইবে। শুনিয়া রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং সংজ্ঞা লাভ করিয়া বনগমনে কৃতসংকল্প হইলেন এমন সময় দেবর্ষি নারদ স্বর্গ হইতে সংবাদ লইয়া আসিলেন। দেবরাজ বলিয়াছেন, উর্বশী যাবজ্জীবন পুরূরবার সহধর্মিণীরূপে মর্ত্যেই থাকিবেন। মিলনের আনন্দ লইয়া নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটিল। [পঞ্চম অংক]

রামায়ণের প্রভাব থাকিলেও 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের চতুর্থ অঙ্ক কবি কালিদাসের অপূর্ব সৃষ্টি। বিরহোন্মত্ত অবস্থায় চন্দ্রবংশাবতংস রাজা পুরূরবার অধীর ক্রন্দন যে-কোন হৃদয়কে স্পর্শ করে। উর্বশী কুমারবনে প্রবেশ করিয়া লতায় পরিণত হইয়াছেন ঃ নেপথ্য হইতে অপভ্রংশ ভাষার ললিত ছন্দে চর্চরী সঙ্গীত বাজিয়া উঠিতেছে ঃ সেই সঙ্গীতের ভাবের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া রাজার হৃদয়ার্তি। বনভূমি সচকিত, স্পন্দিত, করুণায় মূর্ছিত—অচেতন প্রকৃতি চেতনায় অধীর। এ সৃষ্টি সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের গৌরব। সঙ্গীতগুলিও অতি মধুর ও সময়োপযোগী। পাটমহিষীর চরিত্রে পতিপ্রসাদন ব্রতে সতীর অদ্ভুত আত্মত্যাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে কালিদাস উর্বশীর মধ্যে মাতৃত্বের গৌরব দেখান নাই ঃ হয়তো ইচ্ছা করিয়াই দেখান নাই। উর্বশী স্বর্গের প্রগল্ভা অপ্সরী—তাঁহার প্রেম প্রগল্ভ, প্রেমের প্রকাশও প্রগল্ভ। সম্ভোগেই তাঁহার আদর। বিপ্রলম্ভের সকরুণ সৌন্দর্য, প্রেমের ত্যাগদীপ্তি, মাতৃত্বের বাৎসল্যশ্রী লাস্যময়ী অপ্সরায় না থাকাই স্বাভাবিক।

কালিদাসের অমর সৃষ্টি 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' ; 'কালিদাসস্য সর্বস্বম্ অভিজ্ঞান শকুন্তলম্।' ঘরে ও পরে ইহার বহু সমাদর। বিদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম পরিচিতি কালিদাসের 'শকুন্তলা' লইয়াই। কেহ কেহ মনে করেন, বিদেশে কালিদাসের নাটকের সমাদর সমুচ্চ শিল্পিত রূপের জন্য।[১] কিন্তু মহাকবি Goethe কেবল বহিরঙ্গ শিল্পিত রূপের জন্য শকুন্তলার সমাদর করেন নাই, একটি সংহত উক্তিদ্বারা রঞ্জন রশ্মির মত এই নাটকের অদৃশ্য প্রাণকেন্দ্রে আলোকপাত করিয়াছেন। তিনি 'শকুন্তলা' নাটককে স্বর্গ ও মর্ত্যের মিলনকেন্দ্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন ঃ ইহা আত্মার আনন্দ, উল্লাস, মহাভোজ ঃ

> Wouldst thou the young year's blossoms
> and the fruits of its decline.
> And all by which the soul is charmed,
> enruptured, feasted, fed,
> Wouldst thou the earth and heaven itself
> in one sole name combine ?
> I name thee, O Sakuntala, and all at once is said.

Goethe-এর এই উক্তিতে শকুন্তলা নাটকের মর্মার্থ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। শকুন্তলায় আমরা মানবজীবনের ক্রমবিকাশের একটি সুন্দর ধারা দেখিতে পাই—সৌন্দর্যে ও প্রাচুর্যে জীবনের যৌবন-সমারোহ, আর মাধুর্যে ও ত্যাগে জীবনের শান্তোজ্জ্বল পরিণতি।

---

১ 'While Kalidasa is universally accepted as the shakespeare of the Indian drama, it must be remembered that this is merely meant to indicate that his plays represent the purest and according to Eastern ideals highest artistic form of the classic drama.'—R. W. Frazer. A Literary Hist. of India. Chap XII

শকুন্তলা সাত অংকে বিভক্ত নাটক। পৌরব কুলতিলক রাজা দুষ্মন্তের সহিত গন্ধর্ব-কন্যা শকুন্তলার প্রণয় ও প্রণয়-পরিণাম এই নাটকের বর্ণনীয় বিষয়। নাট্যকার সুকৌশলে ধীরে ধীরে সৌন্দর্যের যবনিকা উত্তোলন করিয়া মৃগয়ায় বহির্গত মহিমান্বিত রাজা দুষ্যন্তকে মালিনী নদীর তীরবর্তী কণ্বমুনির তপোভূমিতে আনিয়া উপস্থিত করাইয়াছেন। রাজা মৃগের প্রতি শরনিক্ষেপে উদ্যত, এমন সময় বৈখানস কণ্ঠে নিষেধবাণী উচ্চারিত হইল, 'রাজন্ আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ।' রাজা প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, আশ্রম-শিষ্যদের নিকট হইতে জানিলেন, ইহা কুলপতি কণ্বের আশ্রম। দুহিতা শকুন্তলার উপর আশ্রমের আতিথ্যভার ন্যস্ত করিয়া কুলপতি সোমতীর্থে গিয়াছেন। রাজা আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তখন তাপসী বেশধারিণী অনিন্দ্য সুন্দরী শকুন্তলা প্রিয়সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সহ আশ্রমতরুর আলবালে জল নিষেক করিতেছিলেন। 'ইদো ইদো সহীও' এই বাক্যে আকৃষ্ট হইয়া রাজা বৃক্ষান্তরাল হইতে শকুন্তলার শুদ্ধান্ত-দুর্লভ সৌন্দর্য দেখিলেন ঃ

অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমল বিটপানুকারিণৌ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্ ।।

বিকশিত যৌবনের অপূর্ব এ রূপমাধুরী। বনবালা আভরণহীনা, তবু বল্কলবাসেও আশ্চর্য মনোরমা।

মুগ্ধ রাজা কিরূপে আশ্রম-কন্যাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবেন, ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময় একটি ভ্রমরের আক্রমণে আকুল শকুন্তলা সখীদের ডাকিয়া বলিলেন, 'হলা পরিত্তাঅহ মং ইমিণা দুব্বিণীদেণ মহুঅরেণ অহিহূঅমাণং'। সখীরা পরিহাস করিয়া বলিয়া উঠিলেন, আমরা কি করিব, দুষ্যন্তকে স্মরণ কর। এই সুযোগে রাজা আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'ন ভেতব্যং ন ভেতব্যম্।' রাজাকে দেখিয়া শকুন্তলাও আত্মহারা হইলেন। উভয়ের হৃদয়ে পূর্বরাগ জন্মিল। এমন সময় রাজরথ দর্শনে এক বন্য হস্তী উম্মত্ত হওয়ায় সকলকে আশ্রম কুটীরে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হইল। শকুন্তলা কুটীরে যাইতে যাইতেও ছল করিয়া সখীদের বলিতে লাগিলেন, অনসূয়ে, নব কুশাংকুরে আমার পা ক্ষতবিক্ষত হইতেছে। কুরুবক-শাখায় আমার বল্কল আটকাইয়া গিয়াছে। ['অণসূএ অহিণঅ কুসসূঈএ পরিক্খদং মে চলণং। কুরবঅসাহাপরিলগ্গং অ বক্কলং']। এই বলিয়া সলজ্জে রাজাকে দেখিতে দেখিতে মন্দগমনে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাজার হৃদয়টিও যেন শকুন্তলার দিকেই ধাবিত হইল [প্রথম অংক]। রাজা বিদূষকের নিকট শকুন্তলার সংবাদ প্রকাশ করিলেন। শকুন্তলাকে কেন্দ্র করিয়া দুই বয়স্যে রহস্য জাগিয়া উঠিল। ঠিক সেই সময়ে আশ্রম হইতে যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসদের অত্যাচার হইতে আশ্রমবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ আসিল, ওদিকে রাজধানী হইতে পাটমহিষীর ব্রতপারণা উপলক্ষ্যে রাজার রাজ্যে ফিরিবার আহবান আসিল। রাজা প্রিয় বয়স্যকে রাজ্যে পাঠাইয়া নিজে আশ্রমের আতিথ্যে আশ্রমেই রহিয়া গেলেন। শকুন্তলাঘটিত ব্যাপার সম্পর্কে বয়স্যকে বলিলেন, 'পরিহাস বিজল্পিতং সখে পরমার্থেণ ন গৃহ্যতাং

বচঃ'—পরিহাস করিয়া যে কথা বলিয়াছি, তাহা সত্য বলিয়া মনে করিও না। [দ্বিতীয় অংক]। রাজার ঔৎসুক্য শকুন্তলাকে দেখেন, তাহার মনের অবস্থা জানেন। সুযোগ মিলিল। তিনি লতাকুঞ্জে বিরহসন্তপ্তা শকুন্তলার দেখা পাইলেন, 'শোচ্যা চ প্রিয়দর্শনা মদনাক্লিষ্টেয়ম্।' শকুন্তলা ধীরে ধীরে সখীদের নিকট নিজের হৃদয় উদ্ঘাটন করিতেছেন, সখি, যেদিন হইতে তপোবনের রক্ষাকারী সেই রাজর্ষি আমার দৃষ্টিপথে আসিয়াছেন, সেইদিন হইতেই তাঁহার প্রতি অভিলাষ বশতঃ আমার এই দশা ঘটিয়াছে। শুনিয়া রাজা সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, 'শ্রুতং শ্রোতব্যম্' এবং শকুন্তলার রচিত একটি গীতের প্রত্যুত্তরস্বরূপ তিনি বৃক্ষান্তরাল হইতে লতাকুঞ্জে আত্মপ্রকাশ করিলেন। সখীরাও রাজাকে স্বাগত জানাইয়া লতাকুঞ্জ ত্যাগ করিলেন। রাজাও শকুন্তলার সহিত গান্ধর্বমতে মিলিত হইবার প্রস্তাব করিলেন। অপরিতৃপ্ত মিলন-মুহূর্তে গৌতমী আসিতেই রাজা আত্মগোপন করিলেন। শকুন্তলা লতামণ্ডপকে উদ্দেশ্য করিয়া রাজাকে পুনর্বার আসিবার আমন্ত্রণ জানাইয়া গৌতমীর সহিত আশ্রমে প্রস্থান করিলেন [তৃতীয় অংক]।

চতুর্থ অংকের সূচনায় একটি বিষ্কম্ভক।[১] বিষ্কম্ভক হইতে জানা যায়, গান্ধর্বমতে শকুন্তলার সহিত মিলিত হইয়া রাজা রাজধানীতে চলিয়া গিয়াছেন। রাজার বিরহে পতিচিন্তায় তন্ময় শকুন্তলা। এমন সময় উচ্চারিত হইল সমাগত এক অতিথির কণ্ঠস্বর—'অয়মহং ভোঃ'। 'হিঅএণ অসণ্ণিহিআ' (আত্মহারা) শকুন্তলা সে স্বর শুনিতে পাইলেন না। অবমানিত অতিথি গর্জন করিয়া উঠিলেন, 'আঃ অতিথি পরিভাবিনি,'—ওরে অতিথির অবমাননাকারিণি! অনন্যমনে যাহার কথা ভাবিতে ভাবিতে তুই অতিথিকে অবজ্ঞা করিলি, পাগল যেমন পূর্বের কথা স্মরণ করিতে পারে না, সে-ও তোকে তেমনই বিস্মৃত হইবে।' অভিশাপদাতা স্বয়ং সুলভকোপ দুর্বাসা। শকুন্তলা তন্ময়তা বশে সে অভিশাপ শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু শুনিলেন সখীদ্বয়। প্রিয়ংবদা ঋষিকে অনুনয় করিয়া 'পিয়সহী' শকুন্তলার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন। ঋষি শুধু এইটুকু বলিলেন, অভিজ্ঞান আভরণ দর্শনে শাপ অপনীত হইবে ['অহিণ্ণাণাভরণদংসণেণ সাবো ণিবত্তিস্সদি']। সখীরা এই ভাবিয়া সান্ত্বনা লাভ করিলেন, রাজা রাজধানীতে ফিরিবার সময় শকুন্তলাকে নিজের নামাঙ্কিত একটি অঙ্গুরী দিয়া গিয়াছেন, প্রয়োজন হইলে সেই অভিজ্ঞান কাজে লাগিবে। এতবড় ঘটনা যে ঘটিয়া গিয়াছে শকুন্তলা তাহা জানেন না; তিনি তখনও চিত্রলিখিতার মত বামহস্তে বদন ন্যস্ত করিয়া ভর্তৃ-চিন্তায় আত্মহারা ['ভত্তুগদাএ চিন্তাএ অত্তাণং বি ণ এসা বিভাবেই']।

ইহার পর মূল অংকের ঘটনা—আশ্রম-তপোবন হইতে আরণ্যক শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার দৃশ্য। শকুন্তলা অন্তর্বত্নী। কণ্বমুনি দৈববাণীতে শকুন্তলার বিবাহ-

---

১. বিষ্কম্ভক—দুই অংকের মধ্যবর্তী ঘটনাসমূহের যোজক একটি দৃশ্য।

বিষয় জানিতে পারিয়া তাঁহাকে পতিগৃহে পাঠাইবার আয়োজন করিয়াছেন। ঋষির হৃদয় ব্যাকুল ঃ তিনি উৎকণ্ঠিত, তাঁহার কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ, নয়ন সজল। তিনি বলিতেছেন,

বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমহো স্নেহাদরণ্যৌকসঃ।
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষ দুঃখৈর্নবৈঃ ।। [৪র্থ অঙ্ক]

—আমি বনবাসী, স্নেহবশতঃ আমারও চিত্তের ঈদৃশ অবসাদ উপস্থিত হইতেছে; না জানি সংসারীরা এমন অবস্থায় কি দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। বুঝিলাম, স্নেহ অতি বিষম বস্তু। [অনুবাদ—বিদ্যাসাগর]

সখীদ্বয় ও গৌতমী সহ শকুন্তলা আসিয়া পিতাকে প্রাণাম করিলেন। পিতা আশীর্বাদ করিয়া পবিত্র হোমাগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে বলিলেন। দুইজন শিষ্য শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত প্রস্তুত হইয়া আসিলেন। যাত্রা শুরু হইল। শকুন্তলা দুই এক পদ অগ্রসর হইয়াই বলিয়া উঠিলেন, দুঃখে আশ্রম হইতে চরণ চলিতেছে না। প্রিয়ংবদা বলিলেন, সখি, বিরহদুঃখে তুমি শুধু কাতর নও, আশ্রমও তোমার বিরহ-বেদনায় মুহ্যমান। শকুন্তলা আশ্রমপ্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। লতা বনজ্যোৎস্নার প্রতি তাঁহার 'সোদর্য স্নেহম্', মৃগ তাঁহার কৃতপুত্র ['পুত্র কৃতকঃ মৃগঃ']। এই বনকে ছাড়িয়া যাইতে শকুন্তলা স্খলিতচরণা হইতে লাগিলেন, অশ্রুতে তাঁহার নয়ন ভরিয়া উঠিতে লাগিল। শার্ঙ্গরব অন্যান্য সকলকে ফিরিতে বলিলেন। যাত্রীদল ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইলেন। ঋষিবৃদ্ধ কণ্ব এইখানে দাঁড়াইয়া রাজা দুষ্যন্তকে যে কথা বলিতে হইবে, সেই সন্দেশ উচ্চারণ করিলেন। তাহার পর শকুন্তলাকে দিলেন গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপায়-উপদেশ এবং সর্বশেষে উচ্চারণ করিলেন যাত্রামাঙ্গল্যের বাণী, 'গচ্ছ শিবাস্তে পন্থানঃ সন্তু।' গৌতমী ও শিষ্যদ্বয় সহ শকুন্তলা দৃষ্টিপথের অন্তরাল-বর্তী হইলেন। শকুন্তলাবিরহিত শূন্য তপোবনে প্রবেশ করিলেন সখীদ্বয় ও পিতা কণ্ব।

পঞ্চম অংক শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান দৃশ্য। রাজকর্ম অবসানে দুষ্যন্ত বিশ্রাম লইতে আসিয়াছেন, সঙ্গে প্রিয়বয়স্য মাধব্য। সঙ্গীতশালা হইতে একটি সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছে,

অহিণঅ মহুলোলুবো তুমং
তহ পরিচুম্বিঅ চূঅমঞ্জরিং।
কমল বসই মেত্তণিব্বুদো
মহুঅর বিস্মুরিঅোসিণং কহং ।।

'নবমধুলোভি ওগো মধুকর, চূতমঞ্জরি চুমি
কমল-বিলাসে যে প্রীতি বাসিলে কেমনে ভুলিলে তুমি ?' [অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ]
গান গাহিতেছেন রাণী হংসপদিকা। ইনি একদিন রাজা দুষ্যন্তের প্রণয়িনী ছিলেন ['সকৃৎ-কৃত-প্রণয়োঽয়ং জনঃ']। কিন্তু পাটরাণী দেবী বসুমতীর প্রেমবশে রাজা তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়াছেন। তাই উপেক্ষিতা নায়িকার এই গান। রাজা

বিদূষককে হংসপদিকার নিকট পাঠাইয়া দিলেন, বলিলেন 'নিপুণমুপালব্ধোঽস্মি... গচ্ছ নাগরবৃত্ত্যা সংজ্ঞাপয় এনাম্ ।' বিদূষক প্রস্থান করিলেন, কিন্তু রাজা এই গীত শ্রবণে উৎকণ্ঠিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তর সৌহৃদানি ॥

—রম্য দৃশ্য দেখিয়া এবং মধুর শব্দ শুনিয়া সুখী মানুষও যে পর্যাকুল হয়, তাহার কারণ, উহাদ্বারা হৃদয়ে বদ্ধমূল জন্মান্তরীণ কোন সৌহার্দ্যের স্মৃতি জাগিযা উঠে ।

এই কথা ভাবিবার সময়েই কঞ্চুকী আসিযা কণ্বাশ্রম হইতে সস্ত্রীক তপস্বীদের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। বাজা তৎক্ষণাৎ অগ্নিগৃহে গমন করিলেন। সেখানে আসিলেন গোতমী, শকুন্তলা, মুনিদ্বয়, কঞ্চুকী ও পুরোহিত। শাঙ্গ'রবের মনে হইল, তিনি যেন 'হুতবহপরীত' কোন গৃহে প্রবেশ করিলেন, রাজপুরীর 'সুখ-সঙ্গী' লোকাদিগকে দেখিয়া শুচিশুদ্ধ, জাগ্রত ও মুক্ত শারদ্বতের মনে হইল— উহারা অস্নাত, সুপ্ত ও বদ্ধ। রাজা শকুন্তলাকে দেখিয়া ভাবিলেন, 'কা স্বিদবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুট শরীরলাবণ্যা'—কে এই অবগুণ্ঠনবতী নাবী, দেহলাবণ্য যাহার নাতিপরিস্ফুট ? কুশল প্রশ্নোত্তবের পর শাঙ্গ'রব ঋষি কণ্বের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন —গোপনে রাজা যাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই 'আপন্নসত্ত্বা' শকুন্তলাকে তিনি গ্রহণ করুন। স্মৃতিভ্রষ্ট রাজা কহিলেন, 'কিমিদমুপন্যাস্তম্'—একি উপন্যাসের মত কথা, ইনি আমার পরিণীতা ? একি 'অসৎকল্পনা প্রশ্নঃ ?' উত্তর শুনিয়া শাঙ্গ'রব ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, গোতমী শকুন্তলার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলেন। রাজার তখন দোদুল্যমান অবস্থা 'ন চ খলু পরিভোক্তুং নৈব শক্নোমি হাতুম্'—এই অক্লিষ্টকান্তি রূপকে তিনি সম্ভোগ করিতেও পারিতেছেন না, ত্যাগ করিতেও পারিতেছেন না। স্মৃতি মন্থন করিয়াও রাজা স্মরণ করিতে পারিলেন না, তিনি ইহাকে বিবাহ কবিযাছিলেন কিনা। শকুন্তলা নৈরাশ্যে বলিয়া উঠিলেন, আর্যপুত্রের বিবাহেও সন্দেহ ! কুদো দাণিং মে দূরারোহিণী আসা।' নিজ লজ্জা ক্ষালণের জন্য শকুন্তলাকে সর্ব-সমক্ষে কথা বলিতে হইল, তিনি স্মৃতিচিহ্নদ্বারা সংশয় অপনোদন করিতে চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু মুদ্রাস্থান স্পর্শ করিয়াই আতঙ্কিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, হায় একি আমার অঙ্গুলি যে অঙ্গুরীয়ক শূন্য। রাজা হাসিয়া উঠিলেন। শকুন্তলা বৃথাই রাজাকে পূর্বের কথা শুনাইতে লাগিলেন। রাজা কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, 'স্ত্রীণাম-শিক্ষিত পটুত্বমমানুষীষু সংদৃশ্যতে'—মেয়ে পশুদের মধ্যেও অশিক্ষিত পটুত্ব দেখা যায়। শকুন্তলা, সরোষে বলিলেন, 'অণজ্জ অত্তণো হিঅআণুমাণেন পেক্খসি'— অনার্য, তুমি নিজের মত জগতকে দেখিতে শিখিয়াছ। বুঝিলাম, পুরুষের মুখে মধু হৃদয়ে বিষ। শাপ-ব্যবহিত চিত্ত রাজা সন্দিগ্ধবুদ্ধি ; তিনি কিছুই স্থির করিতে

পারিলেন না। অবশেষে স্থির হইল, প্রসবকাল পর্যন্ত শকুন্তলা পুরোহিতগৃহে অবস্থান করিবেন। শকুন্তলা কাঁদিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ভঅবই বসুহে দেহি মে বিঅরং' (ভগবতি বসুধে, আমাকে বিবর দান করুন)। এমন সময় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। পুরোহিত শকুন্তলাকে লইয়া গৃহে যাইতেছিলেন, সহসা একটি স্ত্রী-মূর্তিবিশিষ্ট জ্যোতি ['স্ত্রীসংস্থানং জ্যোতিঃ] শকুন্তলাকে অপ্সরাতীর্থের দিকে উঠাইয়া লইয়া গেল। পর্যাকুল রাজা বিমূঢ়ের মত সব শুনিলেন। তিনি কিছুই স্মরণ করিতে পারিলেন না, কিন্তু মন যেন বলিতে লাগিল, শকুন্তলা তাঁহারই পাণিগৃহীতা।

ষষ্ঠ অঙ্কের সূচনায় একটি 'প্রবেশক'। ইহার বিষয় ধীবর-অঙ্গুরীয়ক বৃত্তান্ত। ধীবর একটি রোহিতমৎস্য কাটিবার সময় একটি অঙ্গুরি পাইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে আসে। অঙ্গুরি রাজার নামাঙ্কিত দেখিয়া রক্ষীরা তাহাকে বেত মারিতে মারিতে রাজশ্যালকের কাছে লইয়া যায়। শ্যালক আংটিটি লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইতেই উহা দেখিয়া রাজার পূর্বস্মৃতি জাগিয়া উঠে। তিনি ধীবরকে পুরস্কৃত করিতে নির্দেশ দিয়া উন্মনা হইয়া যান।

অঙ্কারম্ভে দেখা যায়, অন্তঃপুরে বসন্ত-উৎসব নিষিদ্ধ হইয়াছে। অঙ্গুরীয়ক দর্শন করিয়া রাজার মনে হইয়াছে, তিনি শকুন্তলাকে গোপনে বিবাহ করিয়াছিলেন। চিন্তায়-জাগরণে তাঁহার দেহ ক্ষীণ, হাতের মণিময় বলয় মণিবন্ধে শিথিল, দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাসে অধর রক্তবর্ণ। বিরহে তিনি শকুন্তলার চিন্তায় মগ্ন, মিলনের স্মৃতি তাঁহার নিকট 'স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু' বলিয়া মনে হইতেছে। মাধবী লতাকুঞ্জে বসিয়া বিরহী রাজা স্বহস্তাঙ্কিত শকুন্তলার আলেখ্য দেখিয়া উন্মাদের মত প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। রাজার সর্বাপেক্ষা বেশি দুঃখ, তিনি অন্তঃসত্ত্বা ধর্মপত্নী শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এমন সময় স্বর্গ হইতে মাতলি আসিলেন ইন্দ্রের অনুজ্ঞা লইয়া—দৈত্যবধের জন্য রাজাকে যাত্রা করিতে হইবে।

সপ্তম অঙ্কে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার পুনর্মিলন। দেবকার্য সম্পন্ন করিয়া রাজা দুষ্যন্ত মাতলি-চালিত রথে মর্ত্যে অবতরণ করিতেছেন। উপর হইতে দেখা যাইতেছে অপূর্ব রমণীয় পৃথিবীর দৃশ্য ['অহো উদাররমণীয়া পৃথিবী']। পথে হেমকূটে প্রজাপতি কশ্যপের আশ্রম। রাজা সেই আশ্রমে অবতরণ করিলেন। অশোকতরুর মূলে দাঁড়াইতেই শুনিতে পাইলেন, কে যেন একটি শিশুকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে-ছেন, 'মা কৃখু চাপলং করেহু'। শব্দ অনুসরণ করিয়া দেখিলেন, একটি শিশু ক্রীড়ার্থ একটি সিংহশিশুর কেশর আকর্ষণ করিতেছে। কয়েকজন তাপসী তাঁহাকে নিষেধ করিতেছেন। দেখিবামাত্র রাজা দুষ্যন্তের ভিতর বাৎসল্যভাব জাগিয়া উঠিল। তিনি নিষেধ করিতেই বালক নিরস্ত হইল। তাপসীরা সবিস্ময়ে দেখিলেন বালকের রূপ আগন্তুকের মতই। রাজা জানিতে পারিলেন, শিশুর নাম সর্বদমন। সে মুনি-কুমার নয়, পুরুবংশের সন্তান! আরও জানিলেন, উহার মাতার নাম শকুন্তলা।

রাখী-প্রসঙ্গে রাজার ধারণা আরও দৃঢ়বদ্ধ হইল যে, এ শিশু তাঁহারই পুত্র। এমন সময় আসিলেন বিরহব্রতচারিণী একবেণীধরা শকুন্তলা—'বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ'। রাজা শকুন্তলার পদতলে পতিত হইলেন, শকুন্তলা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে 'জয়' শব্দ উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, 'উঠউ অজ্জউত্তো।' স্বামী-স্ত্রীর মিলন হইল। সকলেই বুঝিলেন, রাজার মোহের কারণ, দুর্বাসার শাপ। পার্থিব সৃষ্টির আদি জনক-জননী মারীচ (কশ্যপ)-দাক্ষায়ণী (অদিতি) এই মিলনকে অভিনন্দিত করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। মিলনের আনন্দে নাটকের পরিসমাপ্তি।

অভিজ্ঞান শকুন্তলা নিঃসন্দেহে কালিদাসের শ্রেষ্ঠ নাট্যকৃতির স্বাক্ষর। ইহার বিষয়বস্তু মহাভারতের আদি পর্ব [৮৪-৮৮ অধ্যায়] হইতে গৃহীত। শকুন্তলা মহাতপা ঋষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে অপ্সরা মেনকার কন্যা, তিনি ঋষি কণ্ব কর্তৃক প্রতিপালিতা। রাজা দুষ্যন্ত তাঁহাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করেন এবং প্রত্যাখ্যান করিয়া পুনরায় গ্রহণ করেন; এই গান্ধর্ব বিবাহের সন্তান 'সর্বদমন' ভরত—এই কাহিনীটুকুই মাত্র মহাভারত হইতে গৃহীত। অন্যান্য ঘটনার অবতারণায়, কাহিনী-বিন্যাসে ও নূতন নূতন চরিত্র সৃষ্টিতে কালিদাস স্বতন্ত্র। মহাভারতে শকুন্তলা নিজেই দুষ্যন্তের নিকট আত্মপরিচয় দিয়াছেন, কণ্বমুনির আশ্রমেই তাঁহার সন্তান প্রসূত হইয়াছে, তিনি স-সন্তান দুষ্যন্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং দুষ্যন্ত সমস্ত কথা স্মরণ করিয়াও স্মরণ করিতে পারিতেছি না[১] বলিয়া শকুন্তলাকে প্রত্যা-খ্যান করিয়াছেন এবং পরে আকাশবাণী দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হইয়া সপুত্র শকুন্তলাকে গ্রহণ করিয়াছেন।[২] কালিদাসে এসকল ঘটনা নাই; কালিদাসে শকুন্তলা-দুষ্যন্তের প্রণয়ের দূতী অনসূয়া-প্রিয়ংবদা সখীদ্বয়—তাঁহারাই রাজার নিকট শকুন্তলার জন্ম-বৃত্তান্ত ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন; শকুন্তলার পুত্র প্রসূত হইয়াছে প্রত্যাখ্যানের পর ভগবান মারীচের আশ্রমে, দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার শেষ মিলনও ঘটিয়াছে সেইখানে। সর্বোপরি কালিদাসের মৌলিক সৃষ্টি দুর্বাসার অভিশাপ। শকুন্তলা নাটকের যাবতীয় ঘটনা ও চরিত্রের বিকাশ নিয়মিত করিয়াছে এই অভিশাপ। এই অভিশাপের ফলে রাজার মোহ বিভ্রান্তি ঘটিয়াছে, তিনি পূর্বপ্রণয়ের কোন কথাই স্মরণ করিতে পারেন নাই; এই অভিশাপ শকুন্তলাকেও বিষয়াভিজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছে। মহাভারতে শকুন্তলা বহুভাষিণী ও বিষয়বুদ্ধিসম্পন্না। প্রথম মিলনের পূর্বে তিনি সর্ত করাইয়া লইয়াছেন, তাঁহার পুত্রকে রাজ্য দিতে হইবে। কিন্তু কালিদাসের শকুন্তলা চির আরণ্যক ও সরলা। সকল দুঃখকে তিনি নিজেরই ভাগ্যফল বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। মহাভারতের শকুন্তলা শাস্ত্রজ্ঞা ও নীতিকুশলা; তিনি রাজাকে

---

১. সোঽথ শ্রুত্বৈব তদ্বাক্যং তস্যা রাজা স্মরন্নপি।
অব্রবীন্ন স্মরামীতি কস্য ত্বং দুষ্ট তাপসি ॥ [মহা আদি. ৮৮. ১৯.]

২. অথান্তরীক্ষে দুষ্মন্তং বাগুবাচাশরীরিণী...
ভরস্ব পুত্রং দুষ্মন্ত মাবসংস্থাঃ শকুন্তলাম্। [আদি. ৮৮, ১০৯/১১১]

ভার্যা ও পুত্র সম্পর্কে সুদীর্ঘ নীতিকথা শুনাইয়াছেন। সেখানে কালিদাসের শকুন্তলা বাকসংযতা, ধীরা, ব্রীড়াবনম্রা ; অতি দুঃখের আঘাতে দুই একবার মাত্র তাঁহার কথায় রোষ অভিব্যক্ত হইয়াছে।

সর্বোপরি কালিদাস হইতেছেন প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি। তিনি শিল্পী। কালিদাসের নাটক এই শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয়। মহাভারতের বিবৃতি-প্রধান কাহিনী-দেহে তিনি প্রাণময় জীবনের সৌন্দর্য বিস্তার করিয়াছেন। একদিকে যেমন তিনি নূতন ঘটনা, নূতন চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি আবার নৈর্ব্যক্তিক শিল্পে ব্যক্তি-গত অনুভূতির নিবিড়তাকে সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। বহুবল্লভ নায়কের জীবনে প্রেমকে তিনি সম্ভোগের বস্তু মাত্র করিয়া রাখেন নাই, বিরহের অগ্নিস্পর্শে তাহাকে পরিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন এবং প্রেমের বিশুদ্ধতা, গভীরতা ও সহন-শীলতাকে পরিস্ফুট করিয়া সুষম সৌন্দর্যবোধ ও রুচিজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে কালিদাসের প্রকৃতি-দৃষ্টির বিচিত্রতাও লক্ষণীয়। মহাভারতেও কণ্ব-তপোবনের সুন্দর বর্ণনা আছে ঃ

বিরেজুঃ পাদপাস্তত্র বিচিত্র কুসুমাম্বরাঃ।
তেষাং তত্র প্রবালেষু পুষ্পভারাবনামিষু ॥
রুবন্তি রাবান্ মধুরান্ ষট্পদা মধুলিপ্সবঃ।
তত্র প্রদেশাংশ্চ বহূন্ কুসুমোৎকরমণ্ডিতান্ ॥
লতাগৃহ পরিক্ষিপ্তান্ মনসঃ প্রীতিবর্ধনান্।
সম্পশ্যান্ সুমহাতেজা বভূব মুদিতস্তদা ॥ [আদি. ৮৪, ১১-১৩]

—সেখানে ফুলের বিচিত্র বসনপরা অনেক বৃক্ষ, তাহাদের পুষ্পাকীর্ণ পল্লবে মধু-লোভী ভ্রমরের গুঞ্জন। সেখানে কোন স্থলে কুসুম-মণ্ডিত লতাগৃহ। মনের প্রীতি-বর্ধক লতামণ্ডপগুলি দেখিয়া মহাতেজা (রাজা) আনন্দিত হইলেন।

শকুন্তলা নাটকেও (১ম, ৩য়, ও ৬ষ্ঠ অঙ্কে) কণ্ব-তপোবনের স্নিগ্ধ-মনোরম বর্ণনা আছে। মালিনী নদী, বল্কল শোভিত বৃক্ষ, ইঙ্গুদীফলভিদ্ উপলখণ্ড, দক্ষিণ বৃক্ষবাটিকা, বনতোষিণীর শোভা, মধুকর গুঞ্জন, বেতসপরিক্ষিপ্ত লতামণ্ডপ, সৈকতে হংসলীলা, আশ্রমে নির্ভয় বনহরিণের সঞ্চরণ—সব মিলিয়া শান্তরসাস্পদ আশ্রমের পবিত্রতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা মাটি হইতে দেখা মাটির সৌন্দর্য। শকুন্তলা নাটকে অন্তরিক্ষলোক হইতে দেখা উদার রমণীয়া পৃথিবীর শোভা আরও অপূর্ব। সপ্তম অঙ্কে কালিদাস অন্তরিক্ষলোকের সৌন্দর্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। 'পরিবহ' বায়ুমার্গে মেঘলোকের সে দৃশ্য অনুপম। কণ্ব-তপোবনের দৃশ্য বহিরিন্দ্রিয়কেই মাত্র পরিতৃপ্ত করে, কিন্তু এখানকার দৃশ্য 'সবাহ্যান্তঃ করণো···অন্তরাত্মা প্রসীদতি'। এই লোকেই কিম্পুরুষবর্ষের সীমাপর্বত হেমকূটে ভগবান মারীচের আশ্রম—'স্বর্গা-দধিকতরং নিবৃতি-স্থানম্।'

মহাভারতে প্রকৃতি-বর্ণনা বস্তুগত বর্ণনা মাত্র, ইহা মানবহৃদয় প্রতিঘাতী নয় ;

কালিদাসের প্রকৃতি মানবহৃদয় প্রতিঘাতী, মানবহৃদয়ের সহিত উহার যোগ অতি নিবিড়। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'লতার সহিত ফুলের যেরূপ সম্বন্ধ তপোবনের সহিত শকুন্তলারও সেইরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ। অভিজ্ঞান নাটকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্যন্ত যেমন, তপোবন-প্রকৃতিও একজন বিশেষ পাত্র' [প্রাচীন সাহিত্য-শকুন্তলা]। উক্তিটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এখানে বনপ্রকৃতি বনদুহিতার জন্য অলংকার সংগ্রহ করেন। চতুর্থ অংকে দেখি, ঋষিকুমারদ্বয় বলিতেছেন, 'ইদমলংকরণম্ অলঙ্ক্রিয়তামত্র ভবতী।' সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ['সর্বাঃ বিলোক্য বিস্মিতাঃ]। ঋষিকুমারগণ সেই বিস্ময় অপনোদন করিয়া বলিলেন, বনপ্রকৃতিই শকুন্তলার জন্য এই অলংকার প্রদান করিয়াছেন ঃ কেহ দিয়াছেন ক্ষৌমবসন, কেহ চরণরাগ লাক্ষারস, কেহ বা আভরণ। এ এক অদ্ভুত বিস্ময়! বনের সহিত মানুষের অপূর্ব সখ্য।

কালিদাসের প্রকৃতি-বর্ণনায় অর্থান্তরন্যাস, অপ্রস্তুত প্রশংসা বা ধ্বনির সঞ্চরণও লক্ষণীয়, প্রত্যেকটি বর্ণনা ব্যঞ্জনাময়। চতুর্থ অংকের সূচনায় সুপ্তোত্থিত শিষ্য প্রভাত-বর্ণনা করিতেছেন ঃ

যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্।
আবিষ্কৃতোঽরুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ॥

—একদিকে ওষধিপতি চন্দ্র অস্তশিখরে যাত্রা করিতেছেন, অপরদিকে অরুণ আভাকে পুরোভাগে রাখিয়া সূর্য উদিত হইতেছেন।

দুইটি জ্যোতিষ্কের এই উদয়-বিলয়ের বর্ণনা মানব-ভাগ্যের উত্থান-পতনের গূঢ় ইঙ্গিত। শকুন্তলার আজ দুঃখ-জীবনের অবসান, ভাগ্যে নব প্রভাতের অভ্যুদয়। কালিদাসের প্রকৃতি-বর্ণনা প্রায় সর্বত্রই এইরূপ তাৎপর্যবোধক।

॥ ভবভূতি ॥

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে কবি কালিদাসের পরেই 'শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছন' ভবভূতির স্থান। ভবভূতির তিনটি নাটক ঃ মালতী-মাধব, মহাবীরচরিত ও উত্তররামচরিত। এই তিনটি নাটকেই ভবভূতি কবিপরিচয় প্রসঙ্গে কিছুটা নিজের পরিচয় দিয়াছেন। মহাবীরচরিতে আছে ঃ দক্ষিণাপথে পদ্মপুর নামে একটি নগর। সেখানে তৈত্তিরীয় শাখায় কাশ্যপ গোত্রীয় পংক্তিপাবন, পঞ্চাগ্নিব্রতপরায়ণ, সোমপায়ী ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ বাস করেন। সেই বংশের বাজপেয়যাজী সুগৃহীতনামা মহাকবি ভট্ট গোপালের পঞ্চম পৌত্র, পবিত্রকীর্তি নীলকণ্ঠের আত্মসম্ভব শ্রীকণ্ঠ উপাধিধারী ভবভূতি নামক কবি। ইনি জাতুকর্ণী দেবীর পুত্র। এই কথাগুলিরই সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত পুনরুক্তি রহিয়াছে যথাক্রমে উত্তররাম চরিত ও মালতী-মাধব নাটকে। এই পরিচয় প্রসঙ্গ হইতে জানা যায়, ভবভূতি ছিলেন সুপণ্ডিত, বেদজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। যেমন তাঁহার বংশগৌরব, তেমনই খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। মনে হয়, ভবভূতি সপ্তম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

ভবভূতির প্রথম নাটক 'মালতী-মাধব'। বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা কামন্দকীর নীতি-কৌশলে মন্ত্রী ভূরিবসুর দুহিতা মালতীর সহিত অমাত্য দেবরাতের পুত্র মাধবের মিলন—এই নাটকের প্রধান ঘটনা। ভূরিবসু ও দেবরাত সহাধ্যায়ী বন্ধু ছিলেন, এবং উভয়েই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে তাঁহারা সন্তানদের সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন। দেবরাত সেই উদ্দেশ্যে গুণবান পুত্র মাধবকে পদ্মাবতী-নগরে প্রেরণ করেন এবং বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা দেবী কামন্দকীকে অনুরোধ করিয়া পাঠান। পরিব্রাজিকা চীরধারিণী তাপসী হইলেও এই প্রণয় ব্যাপারে সহায়তা করিতে প্রস্তুত হন। শিষ্যাদের সাহায্যে মাধব ও মালতীর অনুরাগ সঞ্চার হয়। এদিকে রাজা স্বয়ং স্বীয় 'নর্মসখা' নন্দনের সহিত মালতীর বিবাহে উদ্যোগী হন। মাধব হতাশ হইয়া নগরের উপকণ্ঠে মহাশ্মশানে করালা মন্দিরের নিকট 'মহামাংস বিক্রয়' করিতে আসে। এই দুঃসাহসিক কার্যদ্বারা অভীষ্ট লাভ করা সম্ভব—ইহাই বিশ্বাস। এদিকে সেই রাত্রিতে সেই মহাশ্মশানে অঘোরঘণ্ট ও তাহার উত্তরসাধিকা কপালকুণ্ডলাও উপস্থিত হয়। দেবীর নিকট বলিপ্রদানের জন্য সমাহৃত হয় স্ত্রীরত্ন মালতী। মাধব এই সংকটকালে অঘোরঘণ্টকে নিহত করিয়া মালতীকে উদ্ধার করে; ইহাতে উভয়ের প্রণয় আরও দৃঢ়বদ্ধ হয়। কিন্তু এদিকে নন্দনের সহিত মালতীর বিবাহের দিন সুস্থির হয়। পরিব্রাজিকা কামন্দকীর কৌশলে মালতীর সহিত নন্দনের বিবাহের রাত্রিতে মাধব মালতীর সহিত মিলিত হয় এবং মালতীর বেশধারী মাধব-সখা মকরন্দ নন্দনের নিকট প্রেরিত হয়। ইতিমধ্যে ঘটনা প্রকাশিত হওয়ায় রাজসৈন্য মালতীকে উদ্ধার করিবার জন্য অগ্রসর হয় এবং মাধব ও মকরন্দ সৈন্যদের পরাভূত করে। সেই রাত্রিতে অঘোরঘণ্টের উত্তরসাধিকা কপালকুণ্ডলা মালতীকে একাকী পাইয়া গুরু-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত হইয়া যোগসিদ্ধিবলে মালতীকে অপহরণ করিয়া শ্রীপর্বতে লইয়া যায়। মালতীকে হারাইয়া মাধব উদ্‌ভ্রান্তের মত প্রলাপ বকিতে থাকে এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। বন্ধু মকরন্দ তাহাকে মৃত মনে করিয়া প্রাণবিসর্জনে উদ্যত হয়। এমন সময় শ্রীপর্বত হইতে আশ্চর্য সিদ্ধিসম্পন্না বৌদ্ধ তাপসী সৌদামিনী সেখানে উপস্থিত হইয়া জানান যে, তিনি মালতীকে কপাল-কুণ্ডলার কবল হইতে মুক্ত করিয়া আশ্রয় দিয়াছেন। এই সংবাদে হতাশায় আশা, গভীর দুঃখে আনন্দ জাগিয়া উঠে এবং হর্ষান্ত পরিণতির মধ্যে মাধব ও মালতী এবং মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার মিলন সাধিত হয়। রাজাও এই মিলন অনুমোদন করেন।

'মালতী-মাধব' নাটক দশ অঙ্কে বিভক্ত এবং অত্যন্ত ঘটনাবহুল। ইহাতে নায়ক নায়িকার হৃদয়গত প্রণয়চেষ্টার বর্ণনা এবং মদন ব্যাপারে উদ্ধত বীরত্ব ['ঔদ্ধত্য-মাযোজিতং কামসূত্রম্'—প্রস্তাবনা] প্রধান স্থান অধিকার করিলেও, নাট্যকার যে অদ্ভুত, বীভৎস ও রৌদ্র রসাদির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা অভিনব। তৃতীয় অঙ্কের 'শার্দুল-বিদ্রাবন' অর্থাৎ শার্দুলের আক্রমণ হইতে মকরন্দের মদয়ন্তিকাকে উদ্ধার ও পঞ্চম অঙ্কে মহাশ্মশানে দুঃসাহসী মাধবের মহামাংস বিক্রয়ার্থ অভিযান এবং করালামন্দিরে কাপালিক অঘোরঘণ্ট ও কপালকুণ্ডলার মালতীবধোদ্যোগের দৃশ্য

যুগপৎ হৃদয়কে ভয়ে, বিস্ময়ে, ঘৃণায় ও উৎসাহে পরিপূর্ণ করিয়া তুলে। মহা-শ্মশানের বর্ণনা বীভৎস ও ভয়াবহ ['মহতী শ্মশান-বাটস্য রৌদ্রতা']—মাংসাহুতি-দ্বারা প্রজ্বলিত চিতাবহ্নি, চিতাধূমের উৎকট গন্ধ, শবাহারী শিবা, ভূত-প্রেত, বেতাল-ভৈরবের সমাগম ও চিৎকার অতি ভীষণ। প্রেত-পিশাচের ভোজন-উল্লাস বীভৎসতার চরম। ইহারই ভিতর দুঃসাহসী বীর মাধব শ্মশানে মহামাংস আহরণ করিয়া প্রেত-পিশাচকে আহ্বান করিয়া বলিতেছে:

অশস্ত্রপূতমব্যাজং পুরুষাঙ্গোপকল্পিতম্।
বিক্রীয়তে মহামাংসং গৃহ্যতাং গৃহ্যতামিদম্ ।। [৫ম অঙ্ক]

মালতীমাধব নাটক হইতে বামাচারী তন্ত্রসাধনা সম্পর্কেও বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করা যায়। দুঃসাহসিক কাপালিক নৃমুণ্ডমালিনী, করালা চামুণ্ডার উপাসক। এই দেবী বলিপ্রিয়া। সাধক অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ইহার তুষ্টি বিধানার্থ নরবলি আহরণ করেন। কাপালিক নির্মম। দেবতুষ্টির জন্য তিনি যে-কোন নিষ্ঠুর কার্য করিতে পারেন। উত্তরসাধিকা কপালকুণ্ডলা মালতীকে বধার্থ আহরণ করিয়াছিল। সাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি হইলে ইঁহারা ভয়ংকর প্রতিশোধ গ্রহণেও দ্বিধা করেন না। কপালকুণ্ডলা গুরু-বধের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গীর মত মালতীকে অপহরণ করিয়াছিল। এই বীর-সাধনার সিদ্ধিও অলৌকিক। সিদ্ধিবলে সাধক বা সাধিকা অণিমাদি ঐশ্বর্য লাভ করিতে পারেন। কপালকুণ্ডলা মন্ত্রসিদ্ধা। যোগবলে সে অক্লেশে ব্যোমপথে বিচরণ করিতে পারিত। এই নাটকে তান্ত্রিক বীর-সাধনার ভয়ংকর বিভীষিকার দিকটি উদ্ঘাটিত হইয়াছে এবং এই সাধনা যে যুগপৎ রৌদ্র, ভয়ংকর ও বীভৎস রসের পরিপোষক, তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হইয়াছে। ভবভূতি এই নাটকে প্রভূত কামশাস্ত্রাভিজ্ঞতা ও প্রেম-মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ নৈপুণ্যেরও পরিচয় দিয়াছেন। নবম অংকে মালতী-বিরহে মাধবের মেঘকে দৌত্যে বরণে মেঘদূতের ছায়া লক্ষণীয়।

এই নাটকের আর একটি দিক, বৌদ্ধ পরিব্রাজিকাদের চিত্র ও আদর্শ। বৌদ্ধ পরিব্রাজিকগণ তখন সমাজের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। সংসার-ত্যাগী, ভিক্ষোপজীবিনী, চীবরধারিণী হইলেও তাঁহারা লোক-কল্যাণব্রতে নিযুক্ত। সাংসারিক মায়া-মমতা-বাৎসল্যও তাঁহাদের আছে। ইঁহাদের কেহ কেহ আবার কাপালিক-ব্রতধারিণী ও মন্ত্রসিদ্ধা। বৌদ্ধ তাপসী সৌদামিনী আশ্চর্য মন্ত্রবলের অধিকারিণী; তিনি সিদ্ধা যোগিনী। ইহাতে মহাযান বৌদ্ধধর্মের অন্তর্গত মন্ত্রযানীদের ক্রিয়া-কলাপ ও আচরণের ছবি সুস্পষ্ট হইয়াছে। কিন্তু প্রণয়-ব্যাপারে সংসার-বিরক্ত বৌদ্ধ পরিব্রাজিকাদের সহযোগিতা বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়।

এই নাটক হইতে নাট্য-শিল্প সম্পর্কে ভবভূতির নিজস্ব কয়েকটি মতের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মনে করেন, নাটকে থাকা উচিত,

ভূম্না রসানাং গহনাঃ প্রয়োগাঃ
সৌহার্দ-হৃদ্যানি বিচেষ্টিতানি।

ঔদ্ধত্যমায়োজিতকামসূত্রং
চিত্রা কথা বাচি বিদগ্ধতা চ ॥ [প্রস্তাবনা]

—রসাদির প্রচুর ও নিগূঢ় প্রয়োগ, মনোরঞ্জক অভিনয়-ক্রিয়া, বীরত্বযুক্ত প্রণয়, চিত্রা কথা ও বৈদগ্ধ্যপূর্ণ সংলাপ।

বৈদগ্ধ্যপূর্ণ সংলাপের উপর ভবভূতির বিশেষ অনুরক্তি। তাঁহার মতে, নাটকে বেদাদি জ্ঞানের সমৃদ্ধির কোন প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন বাক্-প্রৌঢ়ি ও অর্থগৌরব ['যৎ প্রৌঢ়ত্বমুদারতা চ বচসাং যচ্চার্থতো গৌরবং']। ভবভূতির নাট্য-সংলাপেও এই বাক্-প্রৌঢ়ি ও বৈদগ্ধ্য। সম্ভবতঃ এইজন্য সেকালে অনেকেই ভবভূতির নাটকের নিন্দা করিতেন। নিন্দকদের সম্পর্কে ভবভূতির এই বিখ্যাত উক্তি ঃ

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী ॥ [মা. মা. প্রস্তাবনা]

—আমাদের যাঁহারা নিন্দা করেন, তাঁহারা অনেক কিছুই জানেন (অর্থাৎ কিছুই জানেন না) ; তাঁহাদের জন্য ইহা নয়। আমার সমানধর্মা কেহ জন্মিবেন বা আছেন (তাঁহাদের জন্যই আমার প্রযত্ন) ; কারণ কাল নিরবধি, আর পৃথিবীও বিপুলা।

'মহাবীর-চরিত' বা সংক্ষেপে 'বীরচরিত' বীর রামচন্দ্রের পূর্বচরিত। ইহাতে রামের 'সিদ্ধাশ্রমে' প্রবেশ হইতে রাবণ বধের পর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনানন্তর পর্যন্ত ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে। কবি নাটকের সূচনায় প্রচেতানন্দন আদিকবি বাল্মীকির কথা স্মরণ করিয়াছেন। কিন্তু মহাবীরচরিতে কাহিনীটুকু মাত্র বাল্মীকির. ঘটনার বিন্যাস ভবভূতির নিজস্ব ; কল্পনার যোজনাও অল্প নয়। ইহা যেন এক নব রামায়ণ।

নাটকটি 'কৌমার', 'পরশুরাম সংবাদ', 'সংসৃষ্ট', 'চরিত্র', 'আরণ্যক' প্রভৃতি সাতটি অঙ্কে বিভক্ত। ইহাতে বাল্মীকি-রামায়ণ বহির্ভূত কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ—সীতাকে রাবণহস্তে অর্পণ করিবার জন্য রাবণ দূত প্রেরণ করেন কিন্তু সে দৌত্য উপেক্ষা করিয়া কুশধ্বজ সীতা ও ঊর্মিলাকে যথাক্রমে রাম ও লক্ষ্মণের হস্তে সমর্পণ করেন ; বিবাহের পূর্বে রাম-সীতার দর্শন ও পূর্বরাগ ; মাল্যবান রাবণের সচিব—তাহারই নির্দেশে পরশুরামকে হরধনুভঙ্গের সংবাদ জানাইয়া প্ররোচিত করা হয় ; তাহারই নির্দেশে শূর্পনখা মন্থরার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া রামচন্দ্রকে কৈকেয়ীর প্রার্থনা নিবেদন করে ; শেষ অঙ্কে কৈকেয়ীর অনুশোচনাত্মক ক্ষুদ্র উক্তিটিও করুণ। বিভীষণ এখানে রাজ্যলোভে সুগ্রীবের সহিত মৈত্রী করিয়াছেন এবং রামপক্ষে যোগ দিয়াছেন ; বালীকে রাবণের মিত্ররূপে চিত্রিত করা হইয়াছে ; যুদ্ধকাণ্ড বর্ণিত হইয়াছে ইন্দ্র-চিত্ররথ সংবাদে ; সপ্তম অঙ্কের বিষ্কম্ভকাংশে শোকাকুলা 'লঙ্কা' সান্ত্বনা প্রদানকারিণী 'অলকা'র চরিত্র দুইটিও অভিনব। এই নাটকে কামী মদোদ্ধত রাবণের আবির্ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে একটি মাত্র দৃশ্যে [ষষ্ঠ অঙ্ক]।

ভবভূতির প্রধান কৃতিত্ব বীর, অদ্ভুত, রৌদ্র ও ভয়ানক রসের পরিস্ফুটনে। জামদগ্ন্য পরশুরামের ক্রোধান্ধ মূর্তি অতি ভীষণ। হরধনুভঙ্গের সংবাদে তিনি উত্তেজিত ও রাম-শাসনে কৃতসংকল্প। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র তাঁহাকে নিষেধ করিতেছেন, কিন্তু অটল পরশুরাম। তিনি গুরুজনবাক্যনিষেধলঙ্ঘনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, তথাপি শস্ত্রগ্রহব্রত ত্যাগ করিবেন না ঃ

প্রায়শ্চিত্তং চরিষ্যামি পূজ্যানাং বো ব্যতিক্রমাৎ।
ন ত্বেষং দূষয়িষ্যামি শস্ত্রগ্রহ মহাব্রতম্ ।। [৩য় অংক]

ক্ষমাশূন্য দর্পের এই অমর্ষ নিঃসন্দেহে রসোজ্জ্বল।

'উত্তর রামচরিত' মহাবীরচরিতের পরিপূরক। ইহা রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনে রচিত। কিন্তু কি পরিবেশ সৃষ্টিতে, কি রস পরিণামে ইহা রামায়ণ হইতে স্বতন্ত্র। এই নাটক 'চিত্রদর্শন', 'পঞ্চবটী প্রবেশ', 'ছায়া', 'কৌশল্যা-জনকযোগ', 'কুমারবিক্রম', 'কুমার প্রত্যভিজ্ঞান' ও 'সম্মেলন' নামক সাতটি অংকে বিভক্ত। প্রথম অংকের আরম্ভ রাজা রামের নিকট ঋষি অষ্টাবক্রের আগমন লইয়া। প্রজানুরঞ্জন রঘুবংশের ধর্ম, রামচন্দ্র যেন সে ধর্ম পালন করেন। রাম কহিলেন,

স্নেহং দয়াঞ্চ সৌখ্যঞ্চ যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকানাং মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা ।।

—স্নেহ, দয়া ও সৌখ্য এমন কি প্রজানুরঞ্জন অনুরোধে যদি জানকীকেও ত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও ক্লেশ নাই।

এইখানেই যেন অজ্ঞাতসারে সীতা-নির্বাসনের ইঙ্গিত ধ্বনিত হইল। অন্তঃসত্ত্বা জানকীর অবসর বিনোদনের জন্য যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, লক্ষ্মণ তাহা দেখাইতে লাগিলেন। ইহাই বহুখ্যাত 'আলেখ্যদর্শন'। লেখক এখানে সুকৌশলে রামের উত্তরচরিত্র অংকন করিতে গিয়া পূর্বচরিত্র উদ্ঘাটন করিয়াছেন—সেই কৌমার জীবন, বিবাহ-চিত্র, নববধূদের লইয়া জননীগণের আনন্দ-চিত্র, সেই দণ্ডকারণ্য বৃত্তান্ত। বনচিত্র দর্শনে সীতার পুনর্বার বনদর্শনে সাধ হইল ঃ 'পুণো বি পসন্ন গম্ভীরাসু বণরাইসু বিহরিস্সং'। রাম লক্ষ্মণকে সীতার এই দোহদ সাধ পূর্ণ করিতে নির্দেশ দিলেন। আলস্য বশতঃ সীতা রামচন্দ্রের ক্রোড়ে নিদ্রিতা হইলেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই চর দুর্মুখ প্রবেশ করিয়া সীতাসম্পর্কে নিষ্ঠুর লোকাপবাদ জ্ঞাপন করিল। রাম হাহাকার করিয়া উঠিলেন, 'হা দেবি! দেবযজনসম্ভবে'! কিন্তু লোকারাধন রামের জীবন ব্রত। তিনি দুর্মুখের কর্ণে সীতানির্বাসনের আজ্ঞা জানাইয়া দিলেন। কর্তব্যে অপরাঙ্মুখ হইলেও রামের হৃদয় তখন দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ—মুখে শুধু হাহাকার। এদিকে লক্ষ্মণ রথ সজ্জিত করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, সীতাও জাগিয়া উঠিয়াছেন। সীতা বনদর্শনে চলিলেন। তিনি জানিতে পারিলেন না, ইহা তাঁহার নির্বাসন।

দ্বিতীয় অংকের বিষ্কম্ভকে বনদেবতা বাসন্তী ও ব্রহ্মবাদিনী আত্রেয়ীর কথোপকথন। ভগবান বাল্মীকি 'কুশ-লব' নামক দুইটি যমক বালকের সংস্কার ও শিক্ষা দীক্ষা লইয়া ব্যস্ত—উপরন্তু ক্রৌঞ্চমিথুনের দুঃখদর্শনে তাঁহার কণ্ঠে 'মা নিষাদ' শ্লোকে যে নূতন

লৌকিক ছন্দাবতার হইয়াছে, তাহাদ্বারা তিনি ব্রহ্মাকর্তৃক রামচরিত রচনা করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। তাই আত্রেয়ী বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত অগস্ত্যাশ্রমে গমন করিতেছেন। তাঁহাদের কথোপকথনে আরও জানা গেল, সীতাকে বনবাসে দিয়া রামভদ্র সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি নির্মাণ করাইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। লক্ষ্মণাত্মজ চন্দ্রকেতু যজ্ঞাশ্বের রক্ষক নিযুক্ত হইয়াছে এবং রামভদ্র এক ব্রাহ্মণপুত্রের অকালমৃত্যুর প্রতিবিধানার্থ শম্বুক নামা এক তপস্বী শূদ্রের অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছেন। শূদ্রক জনস্থানেই তপস্যায় নিযুক্ত, অতএব রামভদ্র হয়তো জনস্থানে আসিতে পারেন।

অংকারম্ভে 'সদয়োদ্যতখড়্গ' রামভদ্র প্রবেশ করিলেন ঃ শম্বুক রামকর্তৃক নিহত হইয়া দিব্যদেহ লাভ করিয়াছে। ঘটনাস্থান দণ্ডকারণ্য। দণ্ডকার দৃশ্য দর্শনে রামের হৃদয়ে সীতার স্মৃতি জাগিয়া উঠিল এবং রুদ্ধ শোকাবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। এমন সময়, অগস্ত্যাশ্রম হইতে সংবাদ আসিল, অগস্ত্য-পত্নী লোপামুদ্রা রামচন্দ্রের দর্শন প্রতীক্ষা করিতেছেন। রাম অগস্ত্যাশ্রমের দিকে অগ্রসর হইলেন, পথে অতি পরিচিত বন-পাহাড়-নদীর শ্যাম-সুন্দর শোভা। তৃতীয় অংকের নাম 'ছায়া'—ইহা ভবভূতির এক অপূর্ব সৃষ্টি। রাম পঞ্চবটীতে প্রবেশ করিবেন, তাঁহার হৃদ্‌গত প্রিয়াশোক পুটপাকের অন্তর্গূঢ় ঘন ব্যথার ন্যায় মর্ম ভিন্ন করিবে—তাই বৎসলা লোপা মুরলাকে গোদাবরীর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, যাহাতে তিনি 'মোহে মোহে রামভদ্রস্য' তরঙ্গবায়ুদ্বারা 'স্বৈরং স্বৈরং' তর্পণ করেন। মুরলার সহিত তমসার সাক্ষাৎ হইল। তমসা জানাইলেন, রামচন্দ্রকে সঞ্জীবিত করিবার মৌলিক উপায় নিকটেই আছে ['সঞ্জীবনোপায়স্তু মৌলিক এব রামভদ্রস্যাদ্য সন্নিহিতঃ') ; লক্ষ্মণ কর্তৃক নির্বাসিত হইয়া সীতা গঙ্গায় আত্মবিসর্জনে উদ্যতা হইলে তাঁহার লবকুশ নামে দুই যমজ পুত্র প্রসূত হয়। দেবী ভাগীরথী ও পৃথিবী সীতাকে পাতালে লইয়া যান এবং স্তন্যত্যাগের পর সন্তান দুইটিকে বাল্মীকির করে সমর্পণ করেন। সম্প্রতি রামভদ্র পঞ্চবটীতে প্রবেশ করিবেন শুনিয়া ভাগীরথী দেবীও শংকিতা হইয়াছেন। তিনি পুত্রের দ্বাদশবার্ষিক গ্রন্থিবন্ধন (সংখ্যামঙ্গল) উপলক্ষ্যে সীতাকে স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া আদিত্যদেবের অর্চনা করিতে নির্দেশ দিয়া পঞ্চবটীতে পাঠাইয়াছেন। মর্ত্যে পুষ্পচয়ন কালে সীতাকে কেহ দেখিতে পাইবে না। তমসা সীতার সহচরীরূপে থাকিতে আদিষ্টা হইয়াছেন। ইহার পরেই মূল ছায়াংকের সূচনা। মঞ্চে দৃশ্য রামচন্দ্র ও সীতাসখী বাসন্তী, আর অদৃশ্য অবস্থায় আছেন সীতা ও তমসা। নেপথ্যে রামের জলদ গম্ভীর কণ্ঠ শুনা গেল, মুহূর্তে ময়ূরীর মত সচকিতা হইলেন সীতা। পঞ্চবটী দর্শনে নিরুদ্ধ শোকাগ্নিধূমে রাম মোহাচ্ছন্ন হইলেন, 'হা প্রিয়ে জানকি' বলিয়া তিনি চৈতন্যহারা হইয়া পড়িলেন। সীতাও আকুলস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'ভঅবদি তমসে পরিত্তাহি পরিত্তাহি জীবাবেহি অজ্জউত্তম্'। তমসা বলিলেন, 'ত্বমেব ননু কল্যাণি সঞ্জীবয় জগৎ-পতিম্'। সীতার অদৃশ্য স্পর্শে রাম সঞ্জীবিত হইলেন। এ যেন প্রত্যক্ষ স্পর্শ ['স্পর্শঃ পুরা পরিচিতো নিয়তং স এষ সঞ্জীবনশ্চ মনসঃ পরিমোহনশ্চ']। রাম-সীতার এই ভাবসমাগম সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে এক অভিনব সামগ্রী।

একদিকে ধীরপ্রকৃতি প্রেমিক রামচন্দ্রের শোক, মোহ, মূর্ছা—অপরদিকে প্রেমময়ী সীতার ব্যাকুলতার দৃশ্যটি করুণ মধুর। প্রেমের সূক্ষ্ম গতি, ক্রিয়া ও অনুভূতি বিশ্লেষণের দিক হইতেও ইহা অনুপম। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'কাব্যাংশে ইহার তুল্য রচনা অতি দুর্লভ' [বিবিধ প্রবন্ধ—উত্তরচরিত]। কৃতী ভবভূতি এই অঙ্কে দেখাইয়াছেন, একই করুণ রস নিমিত্তভেদে বিভিন্ন প্রকার রূপান্তর প্রাপ্ত হয় ['একো রসঃ করুণ এব নিমিত্ত ভেদাদ্ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্তান্']। চতুর্থ অঙ্কে 'কৌশল্যা-জনক-যোগ'। বাল্মীকির আশ্রমে এই যোগ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই দৃশ্যেই লবের আবির্ভাব। জনক ও কৌশল্যা উভয়েই সস্নেহে ও সবিস্ময়ে দেখিলেন, লব যেন রামেরই 'সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব'—'সৈবাকৃতিঃ সা দ্যুতিঃ'। কিন্তু এই বালকের পরিচয় কেহই জানেন না, লব নিজেও নয়। সকলে বাল্মীকির নিকট জানিতে গেলেন, কে এই বালক। ইতিমধ্যে আশ্রমে লক্ষ্মণ-তনয় চন্দ্রকেতু-রক্ষিত অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব প্রবেশ করিল। রক্ষকের দম্ভোক্তি শ্রবণে লব ক্ষাত্রবীর্যবেশে সে অশ্ব বন্ধন করিল।

পঞ্চম অঙ্কে চন্দ্রকেতুর সৈন্যগণের সঙ্গে লবের যুদ্ধ ও জৃম্ভকাস্ত্র-প্রয়োগে সৈন্যগণের স্তম্ভ এবং চন্দ্রকেতুর সহিত লবের সাক্ষাৎ ও বাগ্‌যুদ্ধ। ষষ্ঠ অঙ্কে বিদ্যাধর দম্পতী সংবাদে চন্দ্রকেতু ও লবের যুদ্ধ বর্ণনা, রামের আগমন, যুদ্ধ বিরতি ও রামের সঙ্গে লবকুশের সামান্য পরিচয়। এখানেও লবকুশের পরিচয় অনুদ্ঘাটিত। তবে লবকুশের আকৃতি, তাহাদের স্পর্শে হৃদয়ে বাৎসল্যের স্ফুরণ রামচন্দ্রকে সংশয়াচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে, তিনি ভাবিতেছেন,

অঙ্গাদঙ্গাৎ স্রুতইব নিজো দেহজঃ স্নেহসারঃ।
প্রাদুর্ভূয় স্থিত ইব বহিশ্চেতনা ধাতুরেব ॥

—এ যেন আমারই অঙ্গ হইতে নিঃসৃত স্নেহসার, আমারই চেতনা-ধাতু বাহিরে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া অবস্থিত।

সপ্তম অঙ্ক ভবভূতির আর এক নূতন পরিকল্পনা। তিনি এখানে করুণ রসোচ্ছল রামায়ণের মিলনান্ত পরিণতি দান করিয়াছেন। ভগবান বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণের নাট্যরূপ প্রদর্শিত হইবে। ভরতমুনি উহার প্রয়োগকর্তা, অপ্সরাগণ নট-নটী। ভাগীরথীর মনোজ্ঞ তীরভূমিতে সামাজিকগণের সমাবেশ হইয়াছে। প্রেক্ষাগৃহে সমুপস্থিত পৌরজানপদাঃ প্রজাঃ'; রাম-লক্ষ্মণ, লব-কুশ সকলেই দর্শকের আসনে উপবিষ্ট। অভিনয় আরম্ভ হইল। নেপথ্যে আসন্ন প্রসববেদনাকাতর সীতার ক্রন্দন ধ্বনি শ্রুত হইল, তিনি ভাগীরথীজলে আত্মবিসর্জনে উদ্যত। সহসা দেখা গেল, গঙ্গা ও পৃথিবীদেবী দুইজনে দুইটি শিশু ক্রোড়ে লইয়া সীতাকে ধারণ করিয়া প্রবেশ করিয়াছেন। সীতা দুইটি রঘুবংশধর প্রসব করিয়াছেন। জন্মমাত্র তাহাদের নিকট অলৌকিক জৃম্ভাকাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে। সীতার সান্ত্বনা নাই। পৃথিবী দেবী কোন প্রকারে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া নিজের কাছে লইয়া গেলেন। সীতা অন্তর্হিতা হইতেই রাম মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণ বলিয়া উঠিলেন, 'ভগবন্ বাল্মীকে পরিত্রায়স্ব। কিং তে কাব্যার্থঃ'। সহসা নেপথ্যে আদেশ প্রচারিত হইল, 'অপনীয়তামাতোদ্য-

কম্'—গীতবাদ্যাদি নিবৃত্ত কর। এমন সময় ভাগীরথীর কলকলধ্বনি শ্রুত হইল। নেপথ্যবাণীতে দেবী ভাগীরথী নিষ্পাপ জানকীকে অরুন্ধতীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। অরুন্ধতী সীতাকে লইয়া প্রবেশ করিয়া কহিলেন, 'তরস্ব বৎসে বৈদেহি ! এহি জীবয় মে বৎসং প্রিয়স্পর্শেন পাণিনা।' সীতার স্পর্শে রামচন্দ্রের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। দেবী অরুন্ধতীর অনুজ্ঞায় পৌরজন অবনত মস্তকে সম্মতি জানাইলে, সর্বসমক্ষে স্বভাবপবিত্রা সীতা পুনরায় গৃহীতা হইলেন। কুশলবকেও আনয়ন করা হইল এবং হর্ষান্ত 'সম্মেলন' দ্বারা নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটিল। সপ্তম অঙ্কে নাটক মধ্যে আর এক নাটকের অবতারণা করিয়া ভবভূতি রঙ্গমঞ্চের অভিনেতৃবর্গ ও প্রেক্ষক সামাজিকবর্গকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন।

ভবভূতি নিঃসন্দেহে একজন শক্তিমান কবি। বিভিন্ন রসসৃষ্টিতে ভবভূতি অদ্বিতীয়। বিশেষতঃ রৌদ্র, ভয়ানক, অদ্ভুত ও বীর রসসৃষ্টিতে তাঁহার তুলনা বিরল। মালতী-মাধব নাটকের শ্মশানের বিভীষিকা, মহাবীরচরিতে জামদগ্ন্য পরশুরামের রুদ্র পৌরুষ ও ধীর-গম্ভীর রামচন্দ্রের বীরত্ব যে কোন চিত্তে রেখাপাত করে। উত্তরচরিত করুণে-মধুরে অপূর্ব। কালিদাসেও রসের এত বৈচিত্র্য নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, বীভৎসাদি রসে কালিদাস সফল হয়েন নাই ; 'মধুরে কালিদাস অদ্বিতীয়—উৎকটে ভবভূতি'। উক্তিটি কিয়দংশে সত্য। কারণ, মধুররস পরিবেশনে ভবভূতিও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। প্রেমচিত্রাঙ্কনে কালিদাস ও ভবভূতি সগোত্র নন। কালিদাসের প্রেম-বর্ণনা শিল্প-সমুজ্জ্বল। তাহাতে দীপ্তি আছে, ঐশ্বর্য আছে, বৈচিত্র্য আছে। ভবভূতি সেস্থলে অনুভূতির নিবিড়তায় সান্দ্র। ভবভূতির প্রেম স্পর্শ-কাতর, স্পর্শে অভিভূত ও সঞ্জীবিত। এ স্পর্শ অনির্বাচ্য—'বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা'। 'ভদ্র প্রেম' সম্পর্কে তাঁহার ধারণা ঃ

অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্বাস্ববস্থাসু যদ্
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারেস্থিতং
ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি যৎ প্রাপ্যতে ॥ [উঃ. চ. ১ম অঙ্ক]

—যে প্রেম একনিষ্ঠ, সুখে-দুঃখে সর্ব অবস্থায় সমান, যাহা হৃদয়ের বিশ্রাম, বার্ধক্যেও যাহার তারতম্য ঘটে না, কালে পরিণত বয়সে যাহা স্নেহসার রূপে অবস্থান করে, সুজনের সেই ভদ্র প্রেম কদাচিৎ লাভ করা যায়।

এই প্রেম (সৌখ্য) হয়তো কিছুই করে না, তথাপি মনের দুঃখ দূর করিয়া দেয়। যে যাহার প্রিয়, সে যেন তাহার পক্ষে এক অপূর্ব বস্তু ঃ

অকিঞ্চিদপি কুর্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখান্যপোহতি।
তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়ো জনঃ ॥ [উ. চ. ২য় অঙ্ক]

লৌকিক উপাচারে স্নেহ-প্রেমকে বলা হয়, 'তারামৈত্রকং চক্ষুরাগ ইতি' ; কিন্তু ইহার মূল জন্মান্তরে নিবন্ধ ['পুরাগো বা জন্মান্তরনিবিড়বন্ধঃ পরিচয়ঃ'] ; ইহা কোন 'নিমিত্ত সাপেক্ষ'ও নয় ঃ

ব্যতিষজতি পদার্থানান্তর কোঽপি হেতুঃ
ন খলু বহিরুপাধীন্ প্রীতয়ঃ সংশ্রয়ন্তে।
বিকসতি হি পতঙ্গস্যোদয়ে পুণ্ডরীকং
দ্রবতি চ হিমরশ্মাবুদ্গতে চন্দ্রকান্তঃ ॥ [উ. চ. ষষ্ঠ অংক, মা. মা. ১ম.]

—আন্তরিক কোন গূঢ় কারণেই একে অন্যে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হয়; প্রীতি বা স্নেহ বাহ্য কারণের উপর নির্ভর করে না। সূর্যোদয়ে পুণ্ডরীক বিকসিত হয়, চন্দ্রকিরণের স্পর্শে চন্দ্রকান্তমণি বিগলিত হইয়া যায়।

ভবভূতির প্রেমানুভবে সর্বত্রই এই সূক্ষ্মতা। বাৎসল্য, বন্ধুপ্রীতি, প্রেম—সকলই এই এক রসের প্রকারভেদ। এই প্রেমের সবই সুখদ, দুঃখপ্রদ কেবল বিরহ। কিন্তু ভবভূতি বিরহেও এই প্রেমের সৌন্দর্য আবিষ্কার করিয়াছেন। রামচন্দ্র বলিতেছেন, বিরহে যে কোন সান্ত্বনা নাই, একথা বলা যায় না; বিরহের ধ্যানে প্রিয়জনের মূর্তি যেন আকারিত হইয়া চক্ষুর সম্মুখে স্থাপিত হয়। কল্পনার চক্ষুকে যখন আমরা হারাই, তখনই জগৎ জীর্ণারণ্যে পরিণত হয়ঃ

চিরং ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা নিহিত ইব নির্মায় পুরতঃ
প্রবাসেঽপ্যাশ্বাসং ন খলু ন করোতি প্রিয়জনঃ।
জগজ্জীর্ণারণ্যং ভবতি হি বিকল্পব্যুপরমে
কুকূলানাং রাশৌ তদনু হৃদয়ং পচ্যত ইব ॥ [উ. চ. ৬ষ্ঠ অংক]

ভবভূতির প্রকৃতি-বর্ণনায় সূক্ষ্ম বস্তুজ্ঞানের পরিচয় রহিয়াছে। দণ্ডক তথা পঞ্চবটীর অরণ্যশ্রী, জনস্থানের গিরি-দরীর বর্ণনাগুলি জীবন্ত ও স্বাভাবিক। প্রকৃতি কোন কোন স্থলে জড় প্রকৃতি মাত্র নয়, মূর্তিমতী মানব-বিগ্রহ। বনদেবী বাসন্তী মূর্তিমতী, তেমনই মুরলা, তমসা ও ভাগীরথী। এক্ষেত্রে ভবভূতি পৌরাণিক সংস্কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শ্মশান-বর্ণনাতেও ভূত-প্রেত-পিশাচাদির আবির্ভাব কল্পনা পৌরাণিক সংস্কারের পরিচয় বহন করে।

ভবভূতির ভাষায় 'বাচি বিদগ্ধতা' প্রচুর পরিমাণেই আছে। সে ভাষার যেমন অর্থগৌরব, তেমনই দৃঢ়তা। কিন্তু যে লালিত্য ও প্রাঞ্জলতা থাকিলে ভাষা অতি সহজে মর্মস্পর্শ করে, ভবভূতিতে তাহা নাই। ভবভূতির ভাষা দুরূহ, দুরুচ্চার্য, সমাস-পরিকীর্ণ। শব্দঝংকার যেন ধনুর টংকার। এ যেন 'ভীমস্তামসো বৈদ্যুতশ্চ', 'অনল-স্ফুলিঙ্গ-কলিতঃ সুধাবর্ষঃ'। তুলনায় কালিদাসের ভাষা সাবলীল, মসৃণ, প্রসাদ গুণসম্পন্ন; তাহাতে মাধুর্য আছে, সৌরভ আছে। জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের ভাষায় বলা যায়, 'কালিদাসের রচনা পরিপাটি, সুন্দর, সুমার্জিত, সুবিন্যস্ত সুরম্য উদ্যান এবং ভবভূতির রচনা—সুন্দর, ভীষণ, বীভৎসময়, নিবিড়, জটিল, বিপুল মহারণ্য'। [মালতীমাধব নাটকের 'অনুবাদকের মন্তব্য']।

॥ শ্রীহর্ষ ॥

'রাজ্ঞঃ শ্রীহর্ষদেবস্য' 'অপূর্ব বস্তুরচনালংকৃতা' তিনটি নাটিকা আছে—রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা ও নাগানন্দ। পণ্ডিতপ্রবর Wilson মনে করিয়াছিলেন, ইনি কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষ [খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী]। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনে করেন, ইনি কান্যকুব্জাধিপতি শ্রীহর্ষ [সপ্তম শতাব্দী]। অষ্টম শতকের দামোদর গুপ্তের প্রসিদ্ধ, 'কুট্টনীমতম্' গ্রন্থে রত্নাবলী নাটকের প্রশংসা রহিয়াছে।[১] অতএব সপ্তমশতকের ইতিহাসবিশ্রুত সম্রাট হর্ষবর্ধনই যে এই নাট্যকার—এ বিষয় নিঃসংশয়িত।

অনেকে মনে করেন, রত্নাবলী প্রভৃতি নাটক, শ্রীহর্ষের রচনা নয়, তাঁহার সভাকবি বাণভট্টাদির রচনা। রত্নাবলী নাটকের 'দ্বীপাদন্যস্মাদপি' শ্লোকটি বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' গ্রন্থেও দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই সকল যুক্তি দ্বারা শ্রীহর্ষের নাট্যকারখ্যাতি নিরাকৃত হয় না। ইতিহাস হইতে জানা যায়, সম্রাট হর্ষবর্ধন যেমন ছিলেন শক্তিমান রাজা, তেমনই কলাভিজ্ঞ। নাটকেও বলা হইয়াছে, 'শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ'। তাঁহার নাট্যাবলীতে এই নিপুণতার স্বাক্ষর আছে। তাঁহার নাটিকা নাট্যশাস্ত্রের নিয়মানুগ। পরবর্তীকালের প্রতিটি অলংকার শাস্ত্রে শ্রীহর্ষ-প্রণীত নাটকের উদ্ধৃতি সংগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীহর্ষের সুবিখ্যাত নাটিকা 'রত্নাবলী' ('শ্রীহর্ষদেবেনাপূর্ববস্তু রচনালংকৃতা রত্নাবলী নাম নাটিকা')। ইহার 'মদনমহোৎসব', 'কদলী গৃহ', 'সংকেত' ও 'ইন্দ্রজাল' নামে চারিটি অংক। বৎসরাজ উদয়নের সহিত সিংহলরাজকন্যা রত্নাবলীর মিলন এই নাটকের মূল বিষয়। সিদ্ধাদেশ ছিল, 'যেয়ং সিংহলেশ্বরস্য দুহিতা সা সিদ্ধেনাদিষ্টা, যথা যোঽস্যাঃ পাণিগ্রহণং করিষ্যতি স সার্বভৌম রাজা ভবিষ্যতি' [চতুর্থ অংক]। এই প্রত্যয়বশতঃ মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ সিংহলেশ্বরের নিকট রত্নাবলীকে প্রার্থনা করেন। কিন্তু সিংহলরাজ প্রথমে তাহাতে সম্মত হন না, কারণ উদয়ন বিবাহিত এবং তাঁহার পত্নী বাসবদত্তা তাঁহার আত্মীয়া। যৌগন্ধরায়ণ কৌশলে প্রচার করেন, বাসবদত্তা অগ্নিদগ্ধা হইয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণে সিংহলেশ্বর উদয়নের সহিত সম্পর্করক্ষার জন্য সালঙ্কারা রত্নাবলীকে প্রেরণ করেন। সমুদ্রপথে তরী ভগ্ন হয়। যৌগন্ধরায়ণের নিয়োগে রত্নাবলী উদ্ধারপ্রাপ্ত হয় এবং পরিচয় গোপন রাখিয়া তাহাকে বাসবদত্তার হস্তে অর্পণ করা হয়। সাগর হইতে প্রাপ্ত বলিয়া রাজঅন্তঃপুরে রত্নাবলীর নাম হয় 'সাগরিকা'। সাগরিকা অভিজাত, সুন্দরী ও কলানিপুণা। বাসবদত্তার চেষ্টা সে যাহাতে উদয়নের চোখে না পড়ে।

উদয়নের অন্তঃপুরের 'মকরন্দ-উদ্যানে' সেদিন মদনমহোৎসব। বাসবদত্তা সে

১. আশ্লিষ্ট-সন্ধি-বন্ধং সৎপাত্রসুবর্ণ যোজিতং সুতরাম্।
নিপুণ পরীক্ষক দৃষ্টং রাজতি রত্নাবলীরত্নম্ ॥

উৎসবে স্বামীকে আহ্বান করিয়াছেন। পূজোপকরণ লইয়া আসিয়াছে সাগরিকা। বাসবদত্তা সারিকাপোষণের ছলে সাগরিককে সরাইয়া দিলেন। কিন্তু সাগরিকার কৌতূহল সে মদনমহোৎসব দেখে, সে-ও কুসুমোপচারে মদনকে পূজা করে। অলক্ষ্যে থাকিয়া সে দেখিল, বাসবদত্তা প্রদ্যুম্ন দেবের পূজা করিয়া প্রত্যক্ষাকৃতি কুসুমায়ুধকে কুসুমবিলেপনে অর্চনা করিলেন। সাগরিকা মনুষ্যরূপ মদনের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইল, অলক্ষ্যে থাকিয়া সে-ও প্রার্থনা করিল, 'নমো দে ভঅবং কুসুমা-উহ, সুভ দংসণো মে ভবিস্সসি'। সাগরিকা জানে না, কে এই প্রত্যক্ষ মদন। বৈতালিক-কণ্ঠে উদয়নের নাম ঘোষিত হইলে সাগরিকা বিস্মিতা হইল—এই উদয়ন, যাহার উদ্দেশ্যে পিতা তাহাকে প্রেরণ করিয়াছেন। সস্পৃহ লোচনে সে রাজাকে দেখিল, তাহার পর কেহ দেখিয়া ফেলিবে ভাবিয়া সত্বর প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় অংকে দেখা যাইতেছে, উদয়নকে দেখিয়া সাগরিকা মুগ্ধা। আবার দেখিবার কৌতূহল। অনঙ্গশরে আহতা মন্দভাগিনী কদলীগৃহে চিত্রপটে অভিমত জনের চিত্র অংকন করিলেন। আসিল সখী সুসঙ্গতা। সুসঙ্গতা দেখিয়াই বুঝিতে পারিল, তবু বলিল, সখি, ইনি কে? সাগরিকা উত্তর দিল, ভগবান অনঙ্গ। সুসঙ্গতা বলিল, চিত্রটিকে শূন্য মনে হইতেছে, আমি ইহাকে রতি-সনাথ করিতেছি—এই বলিয়া উদয়নের পার্শ্বে সাগরিকার চিত্র অংকন করিল। সখীর নিকট ধরা পড়িয়া সাগরিকা চিত্ত উদ্ঘাটন করিল, দুর্লভ জনে তাহার অনুরাগ; এই বিষম প্রেমে মরণই একমাত্র শরণ।[১]

ইতিমধ্যে এক বানর আসিয়া বিভ্রাট সৃষ্টি করিতে ভয়ে সখীদ্বয় একটি তমাল-বিটপের অন্তরালে আত্মগোপন করিল। বানর সারিকার পিঞ্জরদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়ায় বাক্‌পটু সারিকা উড়িয়া গেল। চিত্রপট পড়িয়া রহিল, দুই সখী সারিকাকে খুঁজিতে লাগিল। ঘটনাক্রমে গৃহীতাক্ষরা মেধাবিনী সারিকা দুই সখীর সংলাপ আলাপ করিয়া নায়কের প্রতি নায়িকার প্রেমকথা প্রকাশ করিল। সে আলাপ শুনিলেন স্বয়ং রাজা ও বিদূষক। সারিকা-কথিত চিত্রপটখানিও আবিষ্কৃত হইল—সে পটে আলিখিত উদয়ন ও সাগরিকা। রাজা তখন রূপমুগ্ধ, ঔৎসুক্য—'মান-সমুপৈতি কেয়ং চিত্রগতা রাজহংসীব।' ঘটনাক্রমে কৌতূহল নিবারিত হইল। অদূরে কদলীগুল্ম-অন্তরিত 'জগত্রয় ললামভূতা' সাগরিকা। উদয়ন ও সাগরিকার সংক্ষিপ্ত মিলন হইতে না হইতেই বাধা সৃষ্টি হইল। বাসবদত্তার নিকট বিষয়টি প্রকাশিত হওয়ায় তিনি মানিনী হইলেন। রাজার তখন উভয় সংকট।

তৃতীয় অংকের নাম 'সংকেত'। প্রকৃতপক্ষে ইহা সংকেতজনিত এক ভ্রান্তিবিলাস। সুসঙ্গতা প্রস্তাব করিয়াছিল, সে বাসবদত্তাবেশিনী সাগরিকাকে লইয়া প্রদোষে মাধবীলতা মণ্ডপে রাজার নিকট আসিবে। কিন্তু এই গোপন সংকেতের কথা বাসব-

---

১. দুল্লহ জণ অনুরাআে লজ্জা গরুই পরবসো অপ্পা।
পিঅসহি! বিসমং পেম্মং মরণং সরণং ন বরিঅমেক্কং।

দত্তার সখী কাঞ্চনমালা শুনিতে পাইয়া বাসবদত্তাকে লইয়া লতামণ্ডপে আসে। সাগরিকা ভাবিয়া রাজা তাহাকে প্রণয় নিবেদন করিতে গেলে ভুল ধরা পড়িয়া যায়। রুষ্টা বাসবদত্তা বলিয়া উঠেন, আর্যপুত্র, তুমি সাগরিকার চিন্তায় উৎক্ষিপ্ত, সবই এখন সাগরিকাময় দেখ ['সুব্বং সাঅরিআমঅং পেক্খসি']। অভিমানিনী অভিমানভরে প্রস্থান করিলেন। রাজা মহাঅনর্থ আশংকা করিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, কারণ, 'প্রকৃষ্টস্য প্রেমণঃ স্খলিতমবিষহ্যং হি ভবতি।' এই সময় আসিল সত্যকার বাসবদত্তাবেশিনী সাগরিকা। নৈরাশ্যে সে হতাশহৃদয়। মাধবীলতার পাশ গলায় পরিয়া অশোকপাদপে সে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিবে। সে লতাপাশরচনায় প্রবৃত্ত হইল। রাজা ভাবিলেন, অভিমানে বাসবদত্তাই বুঝি এই দুঃসাহসে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তিনি কণ্ঠ হইতে পাশ অপনয়ন করিয়া নারীর হাত ধরিলেন। মুহূর্তে ভুল ভাঙ্গিল। নারী বাসবদত্তা নয়, সাগরিকা। এ যেন 'অনভ্রা বৃষ্টি' (বিনামেঘে জল)। রাজা সাদরে সাগরিকার বাহুপাশ নিজের কণ্ঠে ধারণ করিলেন। সেই ক্ষণে প্রবেশ করিলেন বাসবদত্তা। তাঁহার নির্দেশে উদ্বন্ধন-লতাপাশে বন্দী হইল সাগরিকা।

চতুর্থ অংকে 'ইন্দ্রজাল'। সাগরিকা অবরুদ্ধা। রাজার স্বস্তি নাই। এমন সময় আসিল 'সম্বরসিদ্ধি' নামক এক ঐন্দ্রজালিক। সে অসাধ্য সাধন করিতে পারে। অসাধ্যই সাধিত হইল। নেপথ্যে মহান্ কোলাহল, অন্তঃপুরে আগুন লাগিয়াছে। ওদিকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা সাগরিকা। রাজা সাগরিকাকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্নির দিকে অগ্রসর হইলেন এবং 'নিগড়-সংযতা' সাগরিকাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিলেন কিন্তু কোথায় গেল হুতবহ। রাজা ভাবিলেন, 'কিং স্বিদমিন্দ্রজালম্'। সত্যই ইহা ইন্দ্রজাল। প্রকাশিত হইল, এই সাগরিকা সিংহল-রাজকন্যা রত্নাবলী, বাসবদত্তার মাতুলকন্যা। বাসবদত্তা 'বহিণি' বলিয়া রত্নাবলীকে জড়াইয়া ধরিলেন। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ প্রবেশ করিয়া সাগরিকা-রহস্য উদ্ঘাটন করিলেন। বাসবদত্তা নিজে উদ্যোগী হইয়া 'বহিণ' রত্নাবলীকে উদয়নের হস্তে সমর্পণ করিলেন। হর্ষান্ত পরিণামে নাটক সমাপ্ত হইল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন, 'রত্নাবলী' এক অত্যুৎকৃষ্ট নাটক—এমন উৎকৃষ্ট যে অনেকে রত্নাবলীকে যাবতীয় নাটক অপেক্ষা সমধিক মনোহর জ্ঞান করিয়া থাকেন। উক্তিটি একদিক হইতে সত্য। রত্নাবলীকারের প্রতিভা কালিদাস-ভবভূতির সমকক্ষ নয় বটে, কিন্তু নাটকীয় ঘটনা সৃষ্টিতে তিনি দক্ষ শিল্পী। রত্নাবলী আগাগোড়া কৌতূহলোদ্দীপক। দৃশ্যে দৃশ্যে রহস্যময় ভ্রান্তি এবং প্রসন্ন হাস্যকৌতুকের তরঙ্গ। সাগরিকার চিত্রপটাঙ্কন, শুক-সারিকার সংলাপ, মিলনের অন্তরায় হেতু সাগরিকার প্রণয়-দুঃখ ও মাধবীলতার উদ্বন্ধনে আত্মহত্যার উদ্যোগ, বাসবদত্তার প্রণয়-কোপ, বিদূষকের সদাপ্রসন্ন কৌতুক এবং সর্বোপরি ইন্দ্রজাল নির্মাণকৌশল প্রভৃতি নিরতিশয় উপভোগ্য। মনে হয়, সমগ্র নাটিকাটিই যেন 'স্বপ্নে মতিভ্রমতি কিংস্বিন্দ্রজালম্ !' চরিত্রগুলিও উজ্জ্বল। সাগরিকা-সখী 'লীলাবিস্তারিকা' সুসঙ্গতা, বাসবদত্তা-সখী কুশলী কাঞ্চনমালা, মুগ্ধা নায়িকা সাগরিকা, খণ্ডিতা প্রেমিকা তেজস্বিনী বাসবদত্তা

এবং পরিহাসপ্রিয় বিদূষক এই নাটিকার বিশিষ্ট আকর্ষণ। নাটিকাটিতে ভাসের নাটক-চক্রান্তর্গত 'স্বপ্ন নাটকম্'-এর ছায়া আছে। রূপসী নায়িকার রূপচিত্রনে, নায়কের রূপানুরাগ বর্ণনে, রাজ-অন্তঃপুরের আলেখ্যাংকনে রত্নাবলী গতানুগতিক। প্রেমের প্রকৃতি বিশ্লেষণেও মৌলিকতা তেমন নাই। কিন্তু নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টিতে ও রহস্যপ্রিয়তায় এবং স্বল্পরেখায় চরিত্রসৃষ্টিতে নাট্যকারের কৌশল ও কৃতিত্ব প্রশংসার দাবি রাখে।

শ্রীহর্ষের অপর নাটিকা 'প্রিয়দর্শিকা'। ইহা চারি অংকে বিভক্ত এবং বিষয়-সন্নিবেশের দিক হইতে রত্নাবলীরই দ্বিতীয় প্রতিলিপি। অঙ্গরাজদুহিতা প্রিয়দর্শিকার সহিত রাজা উদয়নের মিলন ইহার বিষয়। উদয়নের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য প্রিয়দর্শিকাকে বৎসরাজ্যে প্রেরণ করা হয়। পথিমধ্যে রাজকন্যা কলিঙ্গসেনা কর্তৃক আক্রান্ত হন এবং উদয়নের সেনাপতির সহায়তায় উদ্ধার লাভ করিয়া 'আবণ্যকা' নামে উদয়নের অন্তঃপুরে স্থান লাভ করেন। উদয়ন-আরণ্যকা প্রণয়াসক্ত হইলে পট্টমহিষী বাসবদত্তা ক্রুদ্ধা হইয়া আরণ্যকাকে অবরুদ্ধ করেন। পবে 'আরণ্যকা' যে বাসবদত্তার মাতুলকন্যা প্রিয়দর্শিকা, এই পরিচয় প্রকাশিত হয় এবং প্রিয়দর্শিকা বহুমানে উদয়নের হস্তে সমর্পিতা হন। বিষয়, বিষয-বিন্যাস ও প্রেমদ্বন্দ্বের দিক হইতে রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা এক ছাঁচে ঢালা।

শ্রীহর্ষপ্রণীত আর একখানি উল্লেখযোগ্য নাটক 'নাগানন্দ'। ইহা করুণামুদিত বোধিসত্ত্বের মহিমময় আলেখ্য। নাগশত্রু গরুড়ের আক্রমণ হইতে নাগগণকে মুক্ত করার জন্য নাগকুলের আনন্দস্বরূপ জীমূতবাহনের নামে নাটকের নাম 'নাগানন্দ।' জীমূতবাহন বিদ্যাধর-অধীশ্বর, পিতৃভক্ত সন্তান। সিদ্ধ রাজকন্যা মলয়বতীকে দেখিয়া তিনি প্রেমাকৃষ্ট হন এবং মাতাপিতার নির্দেশে জীমূতবাহনের সহিত মলয়বতীর বিবাহ সম্পন্ন হয়। নাটকের প্রথম তিন অংকে মলয়বতী ও জীমূতবাহনের পরস্পর সন্দর্শন, অনুরাগ ও মিলনের বিষয়। এ বিষয়ে সংস্কৃত নাটকের গতানুগতিক প্রণয়-ব্যাপার হইতে অভিন্ন। কিন্তু অন্য সুর ধ্বনিত হইয়াছে নাটকের চতুর্থ ও পঞ্চম অংকে। পিতৃভক্ত, প্রেমিক জীমূতবাহন শেষ দুই অংকে দয়াবীর বোধিসত্ত্বেও প্রতীক। শত্রুতা-বশে বিনতানন্দন গরুড় সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া নাগকুলকে ধ্বংস করিতেন, তাহাতে নাগরাজ বাসুকী এই নিয়ম করিয়া দেন, প্রত্যহ একটি নাগ গরুড়ের আহার্যরূপে বধ্যবেশে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইবে। বিবাহের পব সমুদ্রকূল দর্শন করিতে আসিয়া দয়াবীর জীমূতবাহন এই সংবাদ শ্রবণে ব্যথিত হন। সেদিন শঙ্খচূড় নামে এক নাগের পালা। তাহার বৃদ্ধা মাতা ক্রন্দন করিতে করিতে পুত্রের পশ্চাতে বধ্যভূমিতে আসিলেন। জীমূতবাহন এ দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া শঙ্খচূড়কে রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। 'সম্বর্তজলদসম' পক্ষ বিস্তার করিয়া 'দ্বাদশাদিত্য সম' গরুড় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং 'বজ্রচণ্ডচঞ্চু' দ্বারা নাগভ্রমে জীমূতবাহনকে আকর্ষণ করিয়া ভক্ষণার্থ মলয় পর্বতে উঠিয়া গেলেন [৪র্থ অংক]। পঞ্চম অংক কারুণ্য-উচ্ছ্বাসে পূর্ণ। জীমূতবাহনের বৃদ্ধা মাতা ও নব পরিণীতা পত্নীর সম্মুখে সহসা

রক্তাক্ত মাংসসংলগ্ন একটি চূড়ামণি পতিত হইল। শংখচূড়ের মুখে জীমূতবাহনের আত্মত্যাগের কথা শুনিয়া তাঁহারা আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন এবং শোকে জীবনবিসর্জনে কৃতসংকল্প হইয়া পর্বতের দিকে অগ্রসর হইলেন। ওদিকে গরুড় সর্পভ্রমে জীমূতবাহনের দেহ ভক্ষণ করিতেছেন। কিন্তু তিনি বিস্মিত—বধ্য বিপন্ন হইয়াও তৃপ্ত ও পুলকিত। গরুড় প্রশ্ন করিলেন, কে তুমি! শংখচূড়ের কথায় প্রকাশ পাইল, ভক্ষ্য স্বয়ং বিদ্যাধরকুলতিলক জীমূতবাহন। আত্মশোচনায় গরুড় মর্মাহত হইলেন। হাহাকার করিতে করিতে তখন ঘটনাস্থলে প্রবেশ করিলেন, আত্মবিসর্জনে কৃতনিশ্চয় পিতা, মাতা ও বধূ। তখন জীমূতবাহনের অন্তিম দশা। মর্মাহত গরুড় এ দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া জীমূতবাহনকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে স্বর্গ হইতে অমৃত আহরণ করিতে গেলেন। এমন সময় স্বয়ং গৌরী আবির্ভূত হইয়া কমণ্ডলু হইতে অমৃতবারি সিঞ্চন করিয়া মৃত জীমূতবাহনকে বাঁচাইয়া তুলিলেন। এইখানে শোকাশ্রুর মধ্যে হর্ষান্ত পরিণতিতে নাটকের সমাপ্তি।

'নাগানন্দ' নাটিকায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাবের সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। হিউয়েনসাঙের বিবরণ হইতে জানা যায়, দ্বিতীয় শিলাদিত্য শ্রীহর্ষ (নাট্যকার নিজে) ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ—উভয় ধর্মের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। নাটকেও সেই বিশ্বাসের ছায়া। প্রথম অঙ্কে দেখা যায়, নায়িকার 'গৌরীপূজা'র দৃশ্য, আবার শেষ দুই অংকে করুণাঘন বোধিসত্ত্বের মহাকরুণার আদর্শ। জীমূতবাহনের চরিত্র অতি উজ্জ্বল। তিনি পিতৃভক্ত, একনিষ্ঠ প্রেমিক—তেমনই শ্রেষ্ঠ দানবীর। পরের জন্য জীমূতবাহন আত্মবিসর্জন করিতেছেন, নাগভ্রমে গরুড় তাঁহার তীক্ষ্ণ চঞ্চুপুটে দেহমাংস ছেদন করিতেছেন, কিন্তু জীমূতবাহন অম্লান। গরুড় বধ্যের ধৈর্যবৃত্তি দেখিয়া মাংসাহারে বিরত হইলে জীমূতবাহন বলিলেন,

> শিরামুখৈঃ স্যন্দত এব রক্তম্
> অদ্যাপি দেহে মম মাংসমস্তি।
> তৃপ্তিং ন পশ্যামি তবাপি যাবৎ
> কিং ভক্ষণাত্ত্বং বিরতো গরুত্মন্॥ [পঞ্চম অংক]

—হে গরুত্মন্, শিরামুখ হইতে এখনও রক্ত ক্ষরিত হইতেছে, আমার দেহে এখনও মাংস রহিয়াছে—তবু তোমার তৃপ্তি হইতেছে না কেন? মাংস ভক্ষণ হইতেই বা তুমি বিরত হইতেছ কেন?

সজ্ঞানে পরার্থে জীবন বিসর্জনের এ আদর্শ দুর্লভ।

শূদ্রক : মৃচ্ছকটিক

রাজা শূদ্রক-প্রণীত 'মৃচ্ছকটিক' (মৃৎ+শকটিক) একখানি বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক। প্রস্তাবনা হইতে রাজা শূদ্রকের যে পরিচয় উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, তিনি রূপবান্ ['পরিপূর্ণেন্দুমুখঃ সুবিগ্রহশ্চ'], বিদ্বান্, চতুঃষষ্টি

কলায় পারদর্শী এবং 'সমরব্যসনী' (সমরপ্রিয়) ক্ষিতিপাল। কিন্তু তিনি কে, কোথায় জন্ম, কোন্ সময়ে আবির্ভূত—তাহার কোন ঠিকানা পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুমান করিয়াছিলেন, 'সংস্কৃতভাষায় এক্ষণে যত নাটক আছে, মৃচ্ছকটিক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।' উহা যে কত প্রাচীন নিঃসংশয়ে তাহা নিরূপিত হয় নাই। সংস্কৃত নাটক হইলেও মৃচ্ছকটিকের প্রাকৃতাংশ অত্যন্ত মূল্যবান। ইহাতে তৎকাল-প্রচলিত শৌরসেনী, আবন্তী, প্রাচ্যা, মাগধী প্রভৃতি প্রাকৃতের পরিচয় রহিয়াছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জনসাধারণের জীবন ইহাতে জীবন্ত রেখায় চিত্রিত।

এই নাটকের নায়ক চারুদত্ত একজন সচ্চরিত্র, সুশীল, উদারহৃদয় গৃহস্থ বণিক। ভাগ্য বিপর্যয়ে তিনি ঘোর অর্থদৈন্যে পতিত হন। কামদেবের মন্দির-উদ্যানে এই চারুদত্তকে দেখিয়া বসন্তসেনা নাম্নী এক বিত্তশালিনী পণ্যাঙ্গনা তাঁহার প্রতি আকৃষ্টা হন। এ আকর্ষণ দেহের নয়, মনের ['হঞ্জে রমিদুমিচ্ছামি ন সেবিদুং']। কিন্তু বসন্তসেনার দেহপ্রার্থী কূট-কৌশলী, গণ্ডমূর্খ 'শ-কার'; সে অত্যাচারী রাজা পালকের শ্যালক। সুন্দরী বসন্তসেনা তাহাকে কামনা করেন না, ভয় পান। একদিন সন্ধ্যায় রাজপথে 'শ-কার' বিট-সহ তাহার পিছু নেয়। বসন্তসেনা প্রাণভয়ে চারু-দত্তের গৃহে প্রবেশ করেন। শ-কার শাসাইয়া নিষ্ফল আক্রোশে ফিরিয়া আসে। মুগ্ধা বসন্তসেনা নিজের বহুমূল্য অলংকার চারুদত্তের নিকট গচ্ছিত রাখেন। শুধু অলঙ্কার নয়—মনও। ['অলংকার-ন্যাস' নামক প্রথম অংক]। দ্বিতীয় অঙ্ক 'দ্যূতকর সংবাহক'-সংবাদ। দাসী মদনিকার নিকট বসন্তসেনা নিজ হৃদয় উদ্ঘাটন করিতেছেন। তিনি 'দলিদ্দপুলিসসংকন্তমণা' অর্থাৎ দরিদ্র পুরুষ চারুদত্তে আসক্ত। তখন রাজ-পথে জুয়া খেলায় পরাজিত সংবাহককে তাড়া করিতেছে আড্ডাধারী মাথুর। কারণ, জুয়াখেলায় দশ সুবর্ণ মুদ্রা হারিয়া সংবাহক ফাঁকি দিয়া পলায়ন করিতেছে। কিন্তু পলাইয়াও মুক্তি নাই, জুয়াড়ীর পাশাখেলার 'করতা' শব্দে ['কত্তা শব্দে'] আকৃষ্ট হইয়া সে ধরা পড়িল। চড়-চাপড়, মার-ধর। সংবাহক ছুটিয়া বসন্তসেনার গৃহে আশ্রয় লইল। এই সংবাহক ছিল চারুদত্তের সেবক। চারুদত্তের নামে বসন্ত-সেনা আড্ডাধারীর দশ সুবর্ণমুদ্রা শোধ করিয়া সংবাহককে মুক্ত করিলেন। সংবাহকের মন ফিরিয়া গেল। জুয়াড়ী হইল বৌদ্ধ পরিব্রাজক। তৃতীয় অংকের নাম 'সন্ধি-বিচ্ছেদ।' শর্বিলক নামে এক ব্রাহ্মণ যুবক বসন্তসেনার দাসী মদনিকার প্রেমাসক্ত ছিল। তাহার ইচ্ছা, উপযুক্ত মূল্য দিয়া সে মদনিকাকে দাসীত্ব হইতে মুক্ত করিয়া গৃহিণী করে। কিন্তু কোথায় অর্থ ? চুরিবিদ্যায় পারদর্শী শর্বিলক অর্থের সন্ধানে গভীর নিশীথে সিঁধ কাটিয়া চারুদত্তের গৃহে প্রবেশ করিয়া বসন্তসেনার গচ্ছিত অলংকার অপহরণ করিল। অতি আশ্চর্য তাহার চৌর্য-নৈপুণ্য। ওদিকে দাসী রদনিকা জাগিয়া উঠিয়াছে। 'উট্‌ঠেহি উট্‌ঠেহি চোরো শিক্কমিত' বলিয়া চিৎকার করিতে সকলে জাগিয়া উঠিলেন। গচ্ছিত ধন অপহৃত দেখিতে চারুদত্ত মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। ভয়—লোকে ভাবিবে, দারিদ্র্য বশে চারুদত্তই অলঙ্কার গোপন করিয়া

মিথ্যা বলিতেছেন। চারুদত্ত-গৃহিণী ধূতা দেবী স্বামীকে মিথ্যা অপবাদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার চতুঃসাগরের সারভূতা রত্নমালা প্রদান করিলেন। চারুদত্তের দুঃখের অন্ত নাই। তিনি বলিতে লাগিলেন, 'কথম্ ব্রাহ্মণী মামনুকম্পতে। কষ্টম্।' তথাপি 'বিভবানুগতা ভার্যা'-এই মনে করিয়া তিনি সান্ত্বনা লাভ করিলেন এবং বন্ধু বিদূষককে সেই রত্নাবলীসহ বসন্তসেনার গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। চতুর্থ অঙ্কের নাম 'মদনিকা-শর্বিলক'। শর্বিলক অপহৃত অলঙ্কার মদনিকার হস্তে দিতেই মদনিকা উহা বসন্তসেনার বলিয়া চিনিতে পারিল এবং শর্বিলককে দিয়া তাহা বসন্তসেনাকে ফিরাইয়া দিল। বসন্তসেনা সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়াই মদনিকাকে শর্বিলকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। মদনিকা মুক্ত হইয়া শর্বিলকের সহিত যাত্রা করিতেই পথে ঘোষণা শুনা গেল ঘোষপল্লীর আর্যক রাজা হইবে, এই সিদ্ধবাক্য শুনিয়া রাজা পালক তাঁহাকে বন্দী করিয়াছেন। আর্যক শর্বিলকের বন্ধু। বন্ধুর বিপদে শর্বিলক স্থির থাকিতে পারিল না, তাহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল। ওদিকে বিদূষক মৈত্রেয় আসিয়াছেন বসন্তসেনার বাসভবনে, উদ্দেশ্য 'চারুদত্ত জুয়া খেলার গহনা হারাইয়াছেন' বলিয়া রত্নাবলীটি বসন্তসেনাকে অর্পণ করা। বিলাসিনী বসন্তসেনার অমিত বিত্ত, তাঁহার আটমহলা পুরী। বিস্মিত বিদূষক মৈত্রেয়। তাঁহার মুখে শুধু 'হী হী ভো' বিস্ময়সূচক শব্দ। হস্তীদন্তনির্মিত তোরণ পার হইয়া প্রথমে স্বর্ণমণ্ডিত শুভ্র প্রাসাদ, তারপর গো-মহিষ-হয়-হস্তীশালা, তৃতীয়ে কামশাস্ত্র-বিচার গৃহ, চতুর্থে নৃত্য-গীতমন্দির, পঞ্চমে রন্ধনশালা, ষষ্ঠে শিল্প-ভবন, সপ্তমে বিহঙ্গ-বাটী (পক্ষি-শালা), অষ্টমে বসন্তসেনার মাতার আবাসগৃহ। ইহার পরে নন্দনবন উদ্যান। সেই উদ্যানে উপস্থিত হইয়া মৈত্রেয় বসন্তসেনাকে রত্নমালা অর্পণ করিলেন। বসন্ত-সেনা প্রত্যুত্তর পাঠাইলেন, সন্ধ্যায় তিনি চারুদত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। 'দুর্দিন' নামক পঞ্চম অঙ্কে বাদলঘন সন্ধ্যায় উজ্জ্বল অভিসারিকার বেশে চারুদত্তের উদ্দেশ্যে বসন্তসেনার অভিসার। সঙ্গে ছত্রধারিণী ও বিট। বাদলাভিসারের এই দৃশ্যটির কাব্যসৌন্দর্য অতিশয় উপভোগ্য। জলদ-সমাগমে বজ্রনাদ ও বিদ্যুৎ-বিকাশের পটভূমিকায় কান্ত চারুদত্তের সহিত কান্তা বসন্তসেনার মিলন হইল। ষষ্ঠ অঙ্কে চারুদত্ত বসন্তসেনাকে 'পুষ্পকরণ্ডক' উদ্যানে যাত্রার নির্দেশ দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। বসন্তসেনা ধূতা দেবীকে তাঁহার রত্নমালা প্রত্যর্পণ করিলেন। কিন্তু ধূতাদেবী রত্নমালা ফিরাইয়া দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, স্বামীই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কণ্ঠহার। এমন সময় চারুদত্তের পুত্র রোহসেনকে লইয়া প্রবেশ করিল রদনিকা। রদনিকা রোহ-সেনের জন্য মৃৎ-শকট আনিয়াছে, কিন্তু রোহসেনের বায়না—তাহার সোনার গাড়ী চাই। বসন্তসেনা বালককে সোনার গাড়ী গড়াইয়া দিবার জন্য স্বর্ণ অলংকারগুলি প্রদান করিলেন এবং চারুদত্তের নির্দেশমত উদ্যানের দিকে যাত্রা করিলেন। কিন্তু ভুল করিয়া উঠিয়া বসিলেন রাজ-শ্যালক শ-কারের বলদ-ঠেলা গাড়ীতে। ওদিকে চারুদত্তের গাড়ীতে উঠিয়াছেন ঘোষপল্লীর আর্যক। তিনি শর্বিলকের সহায়তায় কারাগার হইতে মুক্ত হইয়াছেন। অংকটির নাম 'প্রবহণ-পরিবর্ত'।

সপ্তম অংকের নাম 'আর্যক-অপহরণ'। এখানে আর্যকের সহিত চারুদত্তের সাক্ষাৎ এবং বন্ধুত্বের সূচনা। অষ্টম অংকে 'বসন্তসেনা-মোটন'। বসন্তসেনা ভুলক্রমে শ-কারের গাড়ীতে উঠিয়া শ-কারের জীর্ণ পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত। নিষ্ঠুর শ-কার তখন উদ্যানে নিজের গাড়ীর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। বসন্ত-সেনাকে দেখিয়া সে প্রণয় নিবেদন করিতে গিয়া লাভ করিল বসন্তসেনার পদাঘাত। শ-কারের রোষবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সে বসন্তসেনাকে ভীষণ প্রহার করিয়া গলা টিপিয়া ধরিল। চৈতন্যহীন বসন্তসেনা মাটিতে পড়িয়া গেল। শ-কার তাহাকে মৃত মনে করিয়া সেইখানে ফেলিয়া পলায়ন করিল, মনে মনে ফন্দী আঁটিল, বিচারা-ধিকরণে গিয়া সে জানাইবে, চারুদত্তই অর্থের লোভে বসন্তসেনাকে হত্যা করিয়াছে। এদিকে বসন্তসেনা মরেন নাই, সংজ্ঞাহীন হইয়াছেন মাত্র। বৌদ্ধ ভিক্ষু সংবাহক স্নানার্থ সেই জীর্ণ উদ্যানে আসিয়াছিল। তাহারই শুশ্রূষায় বসন্তসেনা সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলেন। নবম অংকে বিচার—নাম 'ব্যবহার'। চারুদত্ত রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি স্তম্ভিত। বসন্তসেনাকে তিনি হত্যা করিয়াছেন, এই মিথ্যা অভি-যোগকে অস্বীকার করিতেও তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। তিনি শুধু বলিতেছেন,

মর়া কিল নৃশংসেন লোকদ্বয়মজানতা।
স্ত্রীরত্নং চ বিশেষেণ শেষমেষোঽভিধাস্যতি ॥

'আমি গো নৃশংস অতি পরলোক জ্ঞান নাহি কোনো।
রতিতুল্য ললনারে কি করেছি—ওর মুখে শোনো ॥' [অনুবাদ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ]

বিচারে চারুদত্ত দোষী সাব্যস্ত হইলেন। রাজা পালকের আজ্ঞায় দ্বিজ চারু-দত্তের শূলদণ্ডাদেশ হইল। দশম অংকের নাম 'সংহার'। সংহার মানে উপসংহার। এই অঙ্কে প্রসৃত ঘটনাবলীকে সংহৃত করা হইয়াছে। চণ্ডাল ঘাতকদ্বয় ঘোষণা করিতে করিতে চারুদত্তকে দক্ষিণ মশানে লইয়া আসিতেছে। সুজন চারুদত্তের কণ্ঠে আজ রক্তকরবীর মালা, দেহে লিপ্ত রক্তচন্দন। ইহারই ভিতর বালক রোহসেনকে লইয়া আসিলেন সুহৃদ্ মৈত্রেয়। অশ্রুতে হাহাকারে এ মিলনদৃশ্য অতি করুণ। চণ্ডালদ্বয়ের ঘোষণা তখন উচ্চরবে প্রচারিত হইতেছে। সে ঘোষণা বসন্তসেনার কর্ণে পেঁছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুককে লইয়া তিনি দ্রুত অগ্রসর হইলেন। শ্মশানে উপস্থিত হইয়া বসন্তসেনা চারুদত্তের বক্ষে মুখ লুকাইলেন। মুহূর্তে সকল ঘটনা প্রকাশিত হইল। ইতিমধ্যে শর্বিলক আসিয়া জানাইল, রাজা পালককে নিহত করিয়া ঘোষপল্লীর আর্যক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন এবং তিনি বন্ধুত্ববশে চারুদত্তকে মুক্তি দিয়া কুশাবতী রাজ্য দান করিয়াছেন। এদিকে শ-কারকে পশ্চাদবাহুবন্ধ করিয়া ধরিয়া আনা হইয়াছে। পৌরগণ দাবি করিতেছে, পাপীর শাস্তি মৃত্যু। শ-কার চারুদত্তের পায়ে লুটাইয়া পড়িল। শরণাগতবৎসল চারুদত্ত কহিলেন, 'শত্রুঃ কৃতাপরাধঃ শরণমুপেত্য পাদয়োঃ পতিতঃ শস্ত্রেণ ন হন্তব্যঃ।' চারুদত্তের নির্দেশে শ-কারকে ক্ষমা করা হইল। রাজা আর্যকের নির্দেশে বসন্তসেনা চারুদত্তের বধূরূপে পরিগৃহীতা হইলেন।

মৃচ্ছকটিক দশ অংকে বিভক্ত ঘটনাবহুল নাটক। অলঙ্কারশাস্ত্রে এইরূপ নাটককে বলা হয় 'প্রকরণ'। এই প্রকরণখানি নানাদিক হইতে বিশিষ্ট এবং সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে একটি ব্যতিক্রম। সংস্কৃত সাহিত্য বলিতে সাধারণতঃ বুঝায়, অভিজাত শ্রেণীর সাহিত্য। জনসাধারণের জীবন-চিত্র সেখানে বিরল। কিন্তু মৃচ্ছকটিক গণ-জীবন বিচিত্রা। গণ-অভ্যুত্থান এই নাটকের একটি মূল ঘটনা। রাষ্ট্রবিপ্লবে এখানে রাজা সাব্যস্ত হইয়াছেন ঘোষপল্লীর আর্যক, এখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘের কুলপতি নিযুক্ত হইয়াছেন একজন জুয়াড়ী, মন্ত্রী হইয়াছেন একজন চৌর্যবিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণ, আর কুলবধূর মর্যাদা লাভ করিয়াছেন একজন গণিকা। সমাজের অতি সাধারণ মানুষ এখানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে—গণিকা, সংবাহক, জুয়ার আড্ডাধারী, চোর, গাড়োয়ান, নগররক্ষী, দাস, চণ্ডাল প্রভৃতি। ইহারা হীনকুলজাত, হীনবৃত্তিসম্পন্ন। কিন্তু সমগ্র নাটকে পরিস্ফুট হইয়াছে এই সত্য যে, ইহারা নিম্নবিত্ত হইয়াও প্রাণবান, সহৃদয় এবং সুজন। এই সুজনতা ও সহৃদয়তাই মনুষ্যত্বের মাপকাঠি। সেই গুণে ইহারা চিরকালের মানুষ এবং শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। কিন্তু সমাজ ইহাদিগের সে দাবিতে কর্ণপাত করে না—'পালকে'র মত অত্যাচারী দাম্ভিকই রাজাসন লাভ করেন, শ-কারের মত অসচ্চরিত্র, ধূর্ত পাষণ্ডই নগরপাল নিযুক্ত হন। মৃচ্ছকটিকের বিদ্বান্ লেখক সমাজের এই অসম ব্যবস্থাপনার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন এবং 'ছোটর দাবি'কে যোগ্য মর্যাদা দান করিয়াছেন।

নাটকের চরিত্রগুলিও স্বল্প রেখায় সমুজ্জ্বল। দুইটি বিদূষক—চারুদত্তের সখা মৈত্রেয় এবং শ-কারের পণ্ডিত পারিষদ 'বিট'। ইহারা চিরাচরিত বিদূষক মন। মৈত্রেয় পরিহাসপটু, বন্ধুবৎসল; 'বিট' ও পণ্ডিত, সহৃদয়—অসৎসঙ্গে থাকিয়াও ধর্মভীরু ও আদর্শবাদী। নায়ক চারুদত্ত চিরকালের সজ্জন, প্রেমিক, বন্ধুবৎসল ও পুত্রবৎসল; দারিদ্র্যের মধ্যেও তাঁহার সৌজন্য, সততা ও সদাশয়তা আদর্শস্থানীয়। শর্বিলক ব্রাহ্মণ হইয়াও ঘটনাচক্রে চোর; কিন্তু তাঁহার প্রেমিকসত্তা, সর্বোপরি বন্ধুত্বের জন্য ত্যাগ প্রশংসার যোগ্য। দাস স্থাবরক সাধারণ অবস্থার মানুষ, কিন্তু জীবন বিপন্ন হইলেও মিথ্যাকে সে প্রশ্রয় দেয় নাই, মিথ্যার দায়ে অভিযুক্ত চারুদত্তকে রক্ষা করিবার জন্য দ্বিতল প্রাসাদ হইতে মাটিতে লাফাইয়া পড়িয়াছে। জুয়াড়ী সংবাহক সংসারের ছলা-কলায় বিরক্ত হইয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুর চারিত্রিক দৃঢ়তা, অহিংসানীতি ও কল্যাণ-মৈত্রীর আদর্শ রক্ষা করিয়াছে। চণ্ডালক-দ্বয়ের চরিত্ররেখাও উজ্জ্বল, ঘাতক হইলেও তাহারা হৃদয়হীন নয়, সুজনের দুঃখে তাহাদেরও প্রাণ কাঁদে। বালক রোহসেন ক্রীড়াচঞ্চল শিশু, কিন্তু পিতার দুঃখে আত্ম-হারা। গৌণ স্ত্রীচরিত্রগুলির ভিতর দাসী রদনিকার প্রভুভক্তি, বসন্তসেনার মাতার স্নেহার্দ্র হৃদয়, চারুদত্ত-গৃহিণী পতিব্রতা ধূতাদেবীর নিঃস্বার্থ পতিপরায়ণতা ও নির্লোভ চরিত্র যে কোন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মৃচ্ছকটিক নাটক সজীব মানুষের চিত্রশালা, নিম্নবিত্ত সমাজের অমর আলেখ্য ও জনসাধারণের মুখের ভাষা প্রাকৃতের মহামূল্য ভাণ্ডার।

বিশাখদত্ত : মুদ্রারাক্ষস

বিশাখদত্ত ছিলেন সামন্ত বটেশ্বরদত্তের পৌত্র ; তাঁহার পিতা মহারাজ উপাধি-ধারী পৃথু। নাটকের ভরতবাক্যে কোন-কোন পুঁথিতে 'অবতু মহীং পার্থিবশ্চন্দ্র-গুপ্তঃ' স্থলে পাওয়া যায়, 'অবতু মহীং পার্থিবাবন্তিবর্ম্মা'। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, এই অবন্তিবর্মা হর্ষবর্ধনের ভগ্নী রাজ্যশ্রীর স্বামী [৬২৫-৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ]। বিশাখদত্ত তাঁহার সভাকবি হইলে নাটকটি সপ্তম শতাব্দে লিখিত। এক অবন্তিবর্মা ছিলেন মগধের রাজা। শরৎঋতুবর্ণনায় কিংবা প্রাকৃত কথোপকোথনে মগধাঞ্চলের প্রকৃতি ও মাগধী প্রাকৃতের প্রভাব বিদ্যমান। মনে হয়, নাটকটি মগধাঞ্চলেই রচিত।

মুদ্রারাক্ষস নায়িকা-ভূমিকা বর্জিত। একটি স্ত্রীচরিত্র আছে (চন্দনদাসের কুটুম্বিনী), তাহা নিতান্ত গৌণ। ইহা সম্পূর্ণরূপে রাজনীতি বিষয়ক রসোত্তীর্ণ নাটক। ইহার অঙ্গী বীররস। কূটনীতির জালে কিভাবে শত্রুকে নির্জিত ও বশীভূত করা যায়, সমগ্র নাটকে তাহারই রোমহর্ষক ও চিত্তাকর্ষক দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ভারতের রাজনীতি সাম-দান-দণ্ড-ভেদের নীতি ; এ নীতি গার্হস্থ্যনীতি ও অধ্যাত্মনীতি হইতে স্বতন্ত্র। রাজনীতি নির্মম, কঠোর। ইহাতে 'ফলং কোপপ্রীত্যোর্দ্বিষতি চ বিভক্তং সুহৃদি চ' [মুদ্রা. ১ম অংক]—কোপ ও প্রীতির ফল তুল্যরূপে যথাক্রমে শত্রু ও মিত্রে বিভক্ত হয় ; 'চিত্রাকারা নিয়তিরিব নীতির্নয়বিদঃ'—নয়বেত্তার নীতি নিয়তির মতই রহস্যঘন। এই সুকঠিন রাজনীতির প্রয়োগকর্তা ক্ষুরধারবুদ্ধি কৌটিল্য বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য। তিনিই এই নাটকের আসল সূত্রধার। নাটকেও চাণক্য-নীতিরই জয়।

চাণক্যের নীতিবলে নন্দবংশ ধ্বংস হয়। তিনি নন্দের দাসীপুত্র মৌর্য (মুরার পুত্র) চন্দ্রগুপ্তকে পাটলিপুত্রের (কুসুমপুরের) সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। নন্দপক্ষের দুর্ধর্ষ মন্ত্রী 'রাক্ষস'। নন্দবংশ ধ্বংস হইলেও তিনি প্রীতিবশতঃ সেই বংশের আনুকূল্য করিতে থাকেন। বন্ধু চন্দনদাসের গৃহে নিজপত্নীকে রাখিয়া রাজধানী হইতে পলায়ন করিয়া রাক্ষস মলয়কেতু নামক পার্বত্যরাজার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্যত হন। চাণক্য জানেন, রাক্ষস তীক্ষ্ণধী ও চতুর ; তাঁহার ইচ্ছা রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হন। তাই তিনি গোপনে নিপুণক গুপ্তচর দ্বারা রাক্ষসের যাবতীয় কর্ম ও চেষ্টা পর্যবেক্ষণ করিয়া কূটনীতি বিস্তারপূর্বক তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেন। চাণক্যের কৌশলে রাক্ষস মলয়কেতুর বিরাগভাজন হইয়া উঠেন এবং চাণক্যেরই চক্রান্তে মলয়কেতু পরাজিত হয়। এদিকে চন্দনদাসেরও শূলদণ্ডাজ্ঞা হয়। রাক্ষস অনন্যোপায় হইয়া বন্ধু চন্দনদাসকে রক্ষা করিবার জন্য চাণক্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। চাণক্য রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করেন। মন্ত্রী রাক্ষসের নামাচিহ্নিত মুদ্রা দ্বারা চাণক্য রাক্ষসকে সপক্ষে আনয়ন করেন এই জন্য নাটকের নাম 'মুদ্রারাক্ষস' ['মুদ্রাসংগৃহীতো রাক্ষসো মুদ্রারাক্ষসঃ']।

সাত অংকে গ্রথিত মুদ্রারাক্ষস নাটকে সংস্কৃত নাটকের গতানুগতিক কোন প্রণয়-চিত্র নাই, কিন্তু যাহা আছে তাহা অনন্য। ঘটনার পর ঘটনা, বিচিত্র উপায়ে (কখনও সাপুড়ের বেশে, কখনও যমপট প্রদর্শনকারীর বেশে) গুপ্তচরের খবর সংগ্রহ, কূট-নীতি ও হত্যা-হানাহানিতে পরিকীর্ণ এই নাটক মুহূর্তের জন্য চিত্তকে বিশ্রাম দেয় না : যুগপৎ ভয়, বিস্ময়, রোমাঞ্চ ও উৎসাহে হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া রাখে। নাটকের আরম্ভ মুক্তশিখ কৌটিল্য চাণক্যের জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর লইয়া, 'কথয় ক এষ ময়ি স্থিতে চন্দ্রগুপ্তমভিভবিতুমিচ্ছতি' [বল, আমি বর্তমান থাকিতে, কে চন্দ্রগুপ্তকে অভিভব করিতে চায় ?]। তাহার পর একে একে ঘটনার বিস্তার। প্রতিপক্ষের মন্ত্রী রাক্ষসকে স্বদলে আনয়ন করাই চাণক্যের লক্ষ্য। প্রভুভক্ত রাক্ষসের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাযুক্ত। তিনি বলেন, 'সাধু অমাত্য রাক্ষস সাধু ! সাধু ! শ্রোত্রিয় সাধু ! মন্ত্রী-বৃহস্পতে সাধু !' এই শ্রদ্ধোক্তিই তীক্ষ্ণধী রাক্ষসের পরিচয়। কিন্তু রাক্ষস হইতেও কূটনীতিপরায়ণ চাণক্য। নাটকে চাণক্যনীতিরই জয়। পরাজিত রাক্ষস স্বীকার করিয়াছেন, 'অয়ং স দুরাত্মা অথবা মহাত্মা কৌটিল্যঃ'—যিনি 'আকরঃ সর্বশাস্ত্রাণাং রত্নানামিব সাগরঃ' [সপ্তম অংক]।

মুদ্রারাক্ষস নাটক হইতে ভারতীয় রাজনীতির কঠোরতা অনুভবনীয়। এই কূট রাজনীতি বিষকন্যা নিয়োগে প্রতিপক্ষের প্রাণ নাশ করিতে দ্বিধা করিত না ['কন্যা তস্য বধায় যা বিষময়ী গূঢ়ং প্রযুক্তো ময়া' —রাক্ষস-বাক্য, ২য় অংক], শত্রুবধের জন্য বৈদ্য নিযুক্ত হইতেন, তাঁহারা 'যোগচূর্ণমিশ্রিত' বিষাক্ত ঔষধ প্রস্তুত করিতেন [২য় অংক]। গুপ্তসংবাদ সংগ্রহের জন্য 'বহুবিধ দেশ-বেশ-ভাষাচার সঞ্চারবেদিনঃ' গুপ্ত-চর নিযুক্ত করা হইত : চাণক্যের নিযুক্ত গুপ্তচর 'যমপট'-প্রদর্শনকারী, রাক্ষস-নিযুক্ত গুপ্তচর বিরাধগুপ্ত 'আহিতুণ্ডিক' (সাপুড়ে)। রাজনীতির নিকট দৈবও অগ্রাহ্য ; চাণক্য বলেন, 'দৈবমবিদ্বাংসঃ প্রমাণয়ন্তি' [মূর্খেরাই ভাগ্য মানিয়া থাকে]। 'মুদ্রারাক্ষস' সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের নাটক।

ভট্টনারায়ণ : বেণীসংহার

সিংহলক্ষণান্বিত কবি ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' বহুবিখ্যাত নাটক। উদাত্ত আখ্যানবস্তুর গৌরবে এবং নাট্যকৌশলের নবীনতায় বেণীসংহার বিশিষ্ট। মহারাজ আদিশূরের নির্দেশে কান্যকুব্জ হইতে যে সাগ্নিক পঞ্চব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আগ-মন করেন, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ তাঁহাদের অন্যতম। আদিশূরের সময় লইয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কুলপঞ্জিকার মতে আদিশূর নবম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। অতএব 'বেণীসংহার' নাটক, তথা নাট্যকার ভট্টনারায়ণ নবম শতাব্দীর—ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ধ্বন্যালোক গ্রন্থে [২, ১০] দীপ্তি গুণের উদাহরণ স্বরূপ 'বেণীসংহার' হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। আচার্য Keith-এর মতে উহার রচনাকাল 860 A. D.

'বেণীসংহার' নাটক মহাভারতোক্ত বিখ্যাত বৃত্ত ভীম কর্তৃক কৃষ্ণার অবেণীবন্ধ কেশের পুনরায় সংহার অর্থাৎ বন্ধন। ছয়টি অঙ্কে রচিত এই নাটকে মহাভারতের উদ্যোগপর্ব হইতে শল্যপর্ব পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। ভীম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, গদাদ্বারা দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করিয়া ঘনরক্তলিপ্ত হস্তে তিনি কৃষ্ণার মুক্তকেশ বন্ধন করিয়া দিবেন।[১] এই প্রতিজ্ঞার পরিপূর্ণতাদ্বারা নাটকের পরিসমাপ্তি। এই নাটক কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের ঘোর কোলাহল, কৌরব-পাণ্ডবের জয়-বিজয়ের সংশয়, হাহাকার ও উল্লাসের শব্দে মুখর। ঠিক বীররস নয়, রৌদ্ররসই এই নাটকের সিদ্ধরস। স্থানে স্থানে বীর ও বীভৎস রস সঞ্চারী হইয়া এই রৌদ্ররসের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছে। নাটকের ঘটনাগুলি বর্ণনাভারাক্রান্ত। শীর্ষনামানুসারে মধ্যম পাণ্ডব ভীমকেই এই নাটকের নায়ক বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু নাটকে উজ্জ্বলরেখায় চিত্রিত হইয়াছে প্রতিনায়ক মহামানী, গর্বান্ধ, কূটনীতিবিশারদ যুযুৎসু রাজা দুর্যোধন। ছয়টি অঙ্কের মধ্যে, দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম—এই চারিটি অঙ্কে কুরু-ক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় দুর্যোধনের শৃঙ্গার, দুর্যোধনের মন্ত্রণা, দুঃশাসন ও কর্ণের মৃত্যুতে দুর্যোধনেব শোকার্ত আর্তনাদ এবং পিতা ধৃতরাষ্ট্র ও মাতা গান্ধারীর স্নেহানুশাসন উপেক্ষা করিয়া প্রতিশোধ কামনায় দুর্যোধনের রণক্ষেত্রে প্রবেশ—প্রভৃতি চিত্র বর্ণাঢ্য রেখায় চিত্রিত। তৃতীয় অঙ্কে যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তলোলুপ বিকৃতবেশা রাক্ষসী বসাগন্ধা ও রাক্ষস রুধিরপ্রিযের কথোপকথন ভীষণ মহাসমরে Dramatic relief-এর কাজ করিয়াছে। নাটকেব মধ্যে দুর্নিমিত্ত শান্তির জন্য যাগযজ্ঞ, ব্রত ইত্যাদি পালনের কথা আছে এবং অভিষেকাদির উল্লেখও রহিয়াছে। তাহাদ্বারা বৈদিক ক্রিয়া-কর্মের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকের প্রথম দুইটি নান্দীশ্লোক কৃষ্ণ-বিষয়ক, তৃতীয়টি ধূর্জটি-বিষয়ক ঃ ভরতবাক্য ভগবান কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা। ইহা হইতে তখনকার দিনে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের গতি-প্রকৃতির আভাস পাওয়া যায়। শৃঙ্গাররসপ্রধান সংস্কৃত নাটকাবলীর মধ্যে রসের স্বাতন্ত্র্যে, অভিনব ঘটনাবিন্যাসে ও নাটকীয় কৌশলে বেণীসংহার নিঃসংশয়ে নবত্বের দাবি করিতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণমিশ্র ঃ প্রবোধচন্দ্রোদয়

'প্রবোধচন্দ্রোদয়' একটি স্বতন্ত্র রসাশ্রয়ী বিশিষ্ট নাটক। ইহার প্রণেতা শ্রীকৃষ্ণ-মিশ্র। মিশ্রের পরিচয়প্রসঙ্গ অনুদ্ঘাটিত। নাটকের প্রস্তাবনা অংশ হইতে অনুমিত হয়, ইনি ছিলেন বঙ্গের কীর্তিবর্মদেবের মন্ত্রী ও সেনাপতি গোপালদেবের সভা-পণ্ডিত। চেদিরাজ কর্ণকে পরাভূত করিয়া কীর্তিবর্মদেব সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে শান্তি-

---

১. চঞ্চদ্ভুজ ভ্রমিত চণ্ড গদাভিঘাত-সংচূর্ণিতোরুযুগলস্য দুর্যোধনস্য।
স্ত্যানাববদ্ধ ঘনশোণিত শোণপাণিরুত্তংসয়িষ্যতি কচাংস্তব দেবি ! ভীমঃ ॥
[প্রথম অঙ্ক]

প্রিয় (শান্তরসপ্রিয়) গোপালদেবের নির্দেশে এই নাটকখানি অভিনীত হয়। সম্ভবতঃ ইহা একাদশ শতকের শেষভাগে রচিত।

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে মানুষের মানস-বৃত্তিগুলিই পাত্র-পাত্রী। একদিকে আছেন মানসজাত বিবেকাদি, অপরদিকে মহামোহ প্রভৃতি। আত্মার কল্পিত বন্ধন ও মুক্তিই ইহার প্রতিপাদ্য। কাহিনীসূত্রটি এইরূপ ঃ সঙ্গহীন আদি পুরুষের সংস্পর্শরহিত হইয়াও অনাদিনিত্যা মায়া 'মন' নামে এক পুত্র প্রসব করেন। এই মনের দুই জায়া 'প্রবৃত্তি' ও 'নিবৃত্তি'। প্রবৃত্তিতে উৎপন্ন মহামোহের কুল, নিবৃত্তিতে উৎপন্ন বিবেককুল। 'মন' মহামোহাদি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া নিজে বন্ধ হইয়াছে, জগৎপতি আত্মাকেও বন্ধ করিয়াছে। তাই বিবেকের চেষ্টা—মন, তথা আত্মাকে এই বন্ধনপাশ হইতে মুক্ত করা। বিবেকের উপনিষৎ-পত্নীতে প্রবোধচন্দ্রোদয় (উদয়=জন্ম) হইলে এই মুক্তি সম্ভব। ইহা লইয়াই দুইকুলের দ্বন্দ্ব। মহামোহের চেষ্টা বিবেককে পরাভূত করা, প্রবোধচন্দ্রের জন্মে বাধা সৃষ্টি করা। তাহার সহায় অহংকার, দম্ভ, মদ, কাম, রতি, চার্বাক প্রভৃতি। বিবেকের সহায় শান্তি, করুণা, মৈত্রী, ক্ষমা, শ্রদ্ধা। ভীষণ দ্বন্দ্বে বিবেককুলের জয় হইল। প্রবোধচন্দ্রের উদয়ে মন, তথা আত্মা বন্ধন-মুক্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

'প্রবোধচন্দ্রোদয়' একটি রূপক নাটক। ইহা ছয়টি অঙ্কে বিভক্ত। অঙ্কগুলির নামও তাৎপর্যবোধক, 'সংসারাবতারোনামপ্রথমোঽঙ্কঃ', 'মহামোহপ্রধানো নাম দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ', 'পাষণ্ডবিড়ম্বনো নাম তৃতীয়োঽঙ্কঃ', 'বিবেকোদ্‌যোগো নাম চতুর্থোঽঙ্ক', 'বৈরাগ্যোৎপত্তির্নাম পঞ্চমোঽঙ্কঃ' এবং 'জীবন্মুক্তির্নাম ষষ্ঠোঽঙ্কঃ'। মানবীয় বৃত্তি-গুলির চরিত্রচিত্র অতিশয় জীবন্ত। যেমন গৌড়ের অন্তর্গত রাঢ়াপুরীর ভূরিশ্রেষ্ঠ নগরবাসী 'অহঙ্কারের' এই চিত্র ঃ

জ্বলন্নিবাভিমানেন প্রসন্নিব জগত্রয়ীম্।
ভর্ৎসয়ন্তীব বাগ্‌জালৈঃ প্রজ্ঞয়োপহসন্নিব ॥ [২য় অঙ্ক]

—ইনি যেন অভিমানে জ্বলিত হইয়া ত্রিজগতকে গ্রাস করিতেছেন, বাগ্‌জালে সকলকে ভর্ৎসনা করিতেছেন ও বুদ্ধিবলে সকলকে উপহাস করিতেছেন।

কাপালিক সোমসিদ্ধান্তের চরিত্রটিও উপভোগ্য ঃ তিনি বলেন, 'ব্রহ্মকপাল-কল্পিত সুরাপানেন নঃ পারণা' (ব্রহ্মকপালে সুরাপানই আমাদের পারণ), আর পার্বতীর প্রতিরূপ দয়িতাদ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া চন্দ্রচূড়ের মত সুখে বিচরণ করাই মুক্তি। এই নাটকের চার্বাক, মহামোহ, দম্ভ, হিংসা, বিভ্রমবতী প্রভৃতির ব্যঙ্গচিত্রগুলি স্বাভাবিক ও কৌতুকপ্রদ। নাটকখানি সর্বভারতীয় সমাদর লাভ করিয়াছে।

॥ ক্ষেমীশ্বর ঃ চণ্ডকৌশিক ॥

আর্য ক্ষেমীশ্বরের চণ্ডকৌশিক নাটকটিও বিখ্যাত। নাটকখানি গৌড়েশ্বর মহীপাল দেবের অনুজ্ঞায় রচিত। প্রস্তাবনায় শ্রীমহীপালদেবের প্রশস্তি আছে।

তিনি নাটকের প্রয়োগ আদেশ করিয়া 'বস্ত্রালংকারহেম' দান করিয়াছিলেন। নাটক হইতে ক্ষেমীশ্বরসম্পর্কে এইটুকু মাত্র জানা যায়, কবি ছিলেন বিজয়প্রকোষ্ঠের প্রপৌত্র ['বিজয়প্রকোষ্ঠপ্রণপ্তুঃ কবেরার্য ক্ষেমীশ্বরস্য কৃতিরভিনবং চণ্ডকৌশিকং নাম নাটকম্']।

নাটকের বিষয় সুপরিচিত হরিশ্চন্দ্র-বিশ্বামিত্র-কাহিনী। কুশিক গোত্রীয় কৌশিক বিশ্বামিত্রের কোপে হরিশ্চন্দ্র রাজার দুর্গতি হেতু নাটকের নাম 'চণ্ডকৌশিক'। কিন্তু কৌশিক বিশ্বামিত্র অপেক্ষা এই নাটকে প্রোজ্জ্বল দানবীর, ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার প্রতীক রাজা হরিশ্চন্দ্রের চিত্র। নাটকের প্রতিপাদ্যও এই নেপথ্য-বাণী ঃ

অহোদানমহোশীলমহো ধৈর্যমহোক্ষমা !
অহোসত্যমহোজ্ঞানং হরিশ্চন্দ্রস্য ধীমতঃ ।। [পঞ্চম অঙ্ক]

নাটকটি পঞ্চাঙ্কে বিভক্ত। মানিনী শৈব্যার মানভঙ্গ দিয়া নাটকের সূচনা হইলেও নাটকের মূল বিষয় শুরু হইয়াছে দ্বিতীয় অঙ্কে। রৌদ্রকর্মা বিশ্বামিত্রের মন্ত্রপূত হোমানলে অভিতপ্তা ত্রিবিদ্যা ভয়ার্তস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন, 'পরিত্তাঅধ অজ্জা পরিত্তাঅধ' (আপনারা রক্ষা করুন)। হরিশ্চন্দ্র সে স্বর শুনিয়া অগ্রসর হইলেন, বলিলেন, 'অভয়মভয়ং ভয়ার্তানাম্। তিষ্ঠ রে দুরাত্মন্ !' হরিশ্চন্দ্র-বাক্যে কৌশিকের তপোবিঘ্ন হইল, তিনি অভিশাপদানে উদ্যত হইলেন। রাজা কুপিত কৌশিকের চরণতলে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, বলিলেন, 'স্বধর্মাক্ষিপ্ত চেতসা' তিনি এ কার্য করিয়াছেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন, 'দুরাত্মন্ ! কথয় কথয় কশ্চ তে ধর্ম ইতি' ; রাজা উত্তর দিলেন,

দাতব্যং রক্ষিতব্যং চ যোদ্ধব্যং ক্ষত্রিয়ৈরিতি ।
গীতঃ পুরাণৈর্মুনিভিরেষ ধর্মঃ সনাতনঃ ।। [দ্বিতীয় অঙ্ক]

বিশ্বামিত্র প্রশ্ন করিলেন, 'কস্মৈ দাতব্যম্ !' রাজা উত্তর করিলেন, 'গুণবদভ্যো দ্বিজাতিভ্যো দেয়ম্'। বিশ্বামিত্র বলিলেন, তাহা হইলে আমাদের কিঞ্চিৎ দান কর। হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে সমগ্র বসুমতী দান করিলেন। এই দানের দক্ষিণা লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। তৃতীয় অঙ্কে এই দক্ষিণাসংগ্রহের চিত্র। বারাণসীধামে শৈব্যা ব্রাহ্মণরূপী শিবের নিকট আত্মবিক্রীতা হইলেন, সঙ্গে গেল শিশু রোহিতাশ্ব ; রাজা বিক্রীত হইলেন চণ্ডালরূপী ধর্মের নিকট। সসাগরা পৃথিবীর রাণী হইলেন দাসী, আর রাজার কর্ম নির্দিষ্ট হইল দক্ষিণ মশানে অহোরাত্র জাগিয়া মৃতের গাত্রবস্ত্র আহরণ। চতুর্থ অঙ্কের নাম 'শ্মশানচরিত্র'। ইহাতে শ্মশানের অতি ভয়াবহ দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে—সে দৃশ্য বীভৎস, রুদ্র ও ভয়ানক। এখানে কর্তব্যপরায়ণ চণ্ডাল-দাস রাজার ধর্ম পরীক্ষা। বিদ্যাত্রয় লাভ করিয়াও নির্লোভ হরিশ্চন্দ্র কুপিত কৌশিকের প্রীত্যর্থে বিদ্যাদেবীদের বলিলেন, 'ভগবন্তং কৌশিকমুপতিষ্ঠধ্বম্' ; সিদ্ধবিদ্য কাপালিক-প্রসাদে লব্ধ মহানিধি তিনি নিজ প্রভুর জন্য গ্রহণ করিলেন। পঞ্চম অঙ্কে আরও কঠিন পরীক্ষা। মহাশ্মশানে উপস্থিত মৃতপুত্র সহ শৈব্যা। রাজার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, তথাপি তিনি কর্তব্যভ্রষ্ট হইলেন না। এই অবস্থায় আকাশে পুষ্পবৃষ্টি

হইল, ধর্মের বরে রোহিতাশ্ব জীবন লাভ করিল, দুঃখ অন্তে রাজা হরিশ্চন্দ্র স-প্রজা ব্রহ্মলোকের অধিকারী হইলেন।

॥ অন্যান্য নাটক ॥

সংস্কৃতে আরও বহু নাটক রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে নবম-দশম শতাব্দের নাট্যকার রাজশেখরের 'বালরামায়ণ', 'বালভারত', 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা' ও 'কর্পূরমঞ্জরী' নাটক উল্লেখযোগ্য। 'কর্পূরমঞ্জরী' আগাগোড়া প্রাকৃতে নিবদ্ধ প্রণয়মূলক নাটক। রাজশেখর প্রতিভাবান্ রসিক কবি।

ঠিক প্রহসন বলিতে যাহা বুঝায়, প্রাচীন সংস্কৃতে তাহা নাই। তবে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে 'চতুর্ভাণী' নামে চারিটি প্রহসন প্রকাশিত হয়। বররুচির 'উভয়াভিসারিকা', শূদ্রকের 'পদ্মপ্রাভৃতক', ঈশ্বরদত্তের 'ধূর্তবিটসংবাদ' এবং শ্যামিলকের 'পাদতাড়িতক'। 'ভাণ' বলিতে বুঝায় একের আত্মভাষণমূলক নাট্য-রচনা। এই ভাণগুলিতে প্রহসনের প্রাণবস্তু হাস্য-কৌতুক ও ব্যঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিটি চরিত্র সজীব। ভাণগুলি জীবনরসেও উচ্ছল। সম্ভবতঃ এগুলি পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের রচনা।

অন্যান্য প্রহসনের ভিতর কাঞ্চীরাজ মহেন্দ্রবিক্রম বর্মার (সপ্তমশতাব্দ) 'মত্তবিলাস' উল্লেখযোগ্য। ইহাতে ব্যভিচারী কাপালিকদের মদ্যাসক্তির বিদ্রূপাত্মক চিত্র অংকিত হইয়াছে।

৪। মহাকাব্য

(i) ভূমিকা

পূর্বে রামায়ণ ও মহাভারতকে 'মহাকাব্য' বলা হইয়াছে। কিন্তু অলংকারশাস্ত্রে মহাকাব্যের যে সংজ্ঞার্থ নির্দিষ্ট হইয়াছে, রামায়ণ-মহাভারত সে অর্থে মহাকাব্য নয়। 'মহাকাব্য' শব্দটি পরবর্তীকালের এবং উহা সম্পূর্ণরূপে অলংকারশাস্ত্র নির্দিষ্ট একটি কাব্য-বিভাগ। এইজন্য রামায়ণ-মহাভারত হইতে ইহাদের স্বাতন্ত্র্য বুঝাইবার জন্য আর্ষ মহাকাব্যকে বলা হয় 'জাত মহাকাব্য' (Epic of growth) এবং পরবর্তী মহাকাব্যকে বলা হয় 'অলংকার শাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য' (Literary Epic)।

অলংকারসম্মিত মহাকাব্যের আকৃতি স্বতন্ত্র, প্রকৃতিও। উহা এক হিসাবে জাত মহাকাব্যের খণ্ডাংশ। জাত মহাকাব্যের বিস্তৃতি ও সমুন্নতি, ঘটনার বৈচিত্র্য ও জটিলতা, কাহিনীবাহুল্য ও চরিত্রসংখ্যা উহাতে থাকে না। উন্মুক্ত সারল্য ও স্বাভাবিকতাও অনুপস্থিত। স্বভাবজাত মহাকাব্যকে যদি বলা যায়, 'পুরুষোত্তম', তাহা হইলে অলংকারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্যকে বলিতে হয় 'পুরুষ'। শিল্পিত রূপ ও কবি-ব্যক্তিত্বের স্পর্শ সাহিত্যিক মহাকাব্যের অন্যতম লক্ষণ।

সাহিত্যিক মহাকাব্যের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা পাওয়া যাইতেছে, দণ্ডীর কাব্যাদর্শে। দণ্ডী

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের। দণ্ডীর পূর্বেও পূর্বাচার্য ছিলেন এবং তিনি স্বীকার করিয়াছেন পূর্বসূরীরা বিচিত্ররূপা বাণীর বন্ধন-বিধি নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।[১] কিন্তু সে সকল বন্ধন-বিধি আজ দুষ্প্রাপ্য।

আচার্য দণ্ডীর মতে—মহাকাব্য সর্গবন্ধ হইবে, প্রারম্ভে আশীর্নমস্ক্রিয়া বা বস্তুনির্দেশ থাকিবে, ইহার বিষয় হইবে 'ইতিহাসকথোদ্ভূতম্', উহা চতুর্বর্গের সাধক হইবে, উহার নায়ক হইবেন চতুর ও উদাত্ত ['চতুরোদাত্ত নায়কম্'], উহাতে নগর, অর্ণব, শৈল, চন্দ্রার্কোদয়, উদ্যান-সলিলক্রীড়া, বিপ্রলম্ভ, বিবাহ, কুমারসম্ভব, মন্ত্রণা, দূতপ্রয়াণ ও যুদ্ধজয় প্রভৃতির বর্ণনা থাকিবে এবং মহাকাব্য হইবে—'অলঙ্কৃতম-সংক্ষিপ্তং রসভাবনিরন্তরম্' (সালঙ্কৃত, অসংক্ষিপ্ত ও রসভাবাঢ্য)। আচার্য দণ্ডী মহাকাব্যের নাটকীয় গুণের কথাও স্বীকার করিয়াছেন।

মহাকাব্যের এই সকল লক্ষণ কতকটা বহিরঙ্গ লক্ষণ মাত্র। লৌকিক মহাকাব্য রচনায় এই লক্ষণগুলিকেই অনুসরণ করা হইয়াছে এবং পরবর্তী অলঙ্কারশাস্ত্রে দণ্ডী-উক্ত লক্ষণগুলিকেই কিঞ্চিৎ সম্প্রসারিত ও বিশুদ্ধ করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথের মতেও—

১ মহাকাব্য সর্গবন্ধে রচিত হইবে, ২ ইহাতে সদ্বংশজাত ধীরোদাত্ত গুণান্বিত একজন নায়ক থাকিবেন ; একবংশের বহু নায়কও থাকিতে পারেন (যেমন, কালি-দাসের রঘুবংশ), ৩ শৃঙ্গার, বীর ও শান্ত রসের মধ্যে একটি রস অঙ্গী (প্রধান) হইবে এবং অন্যান্য রস অঙ্গরূপে থাকিবে, ৪ ইহাতে নাটকের পঞ্চসন্ধি থাকিবে, ৫ কাহিনী কোন ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা সজ্জনকে আশ্রয় করিবে, ৬ মহাকাব্য পাঠে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের চারিটি অথবা একটি ফল লাভ হইবে, ৭ গ্রন্থারম্ভে নমস্কার, আশীর্বাদ অথবা বস্তুনির্দেশ থাকিবে, ৮ কোথাও বা খলজনের নিন্দা, কোথাও সজ্জনের প্রশংসা কীর্তিত হইবে ; ৯ ইহা একই ছন্দে রচিত হইবে, কিন্তু সর্গশেষে অন্য ছন্দ যোজিত হইবে, ১০ ইহাতে নাতিহ্রস্ব, নাতিদীর্ঘ আটটির বেশি সর্গ থাকিবে—কোথাও সর্গ নানা ছন্দময় হইতে দেখা যায়, ১১ প্রত্যেক সর্গের শেষে পরবর্তী সর্গের বিষয়বস্তুর সূচনা থাকিবে, ১২ ইহাতে সন্ধ্যা, সূর্য, চন্দ্র, রজনী, প্রদোষ, অন্ধকার, দিন, প্রভাত, মধ্যাহ্ন, মৃগয়া, শৈল, ঋতু, বন, সাগর, সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ, মুনি, স্বর্গ, পুর, যজ্ঞ, যুদ্ধযাত্রা, বিবাহ, মন্ত্র, পুত্রজন্ম প্রভৃতি বিষয়ের যথাযোগ্য অঙ্গ ও উপাঙ্গ বর্ণিত হইবে, ১৩ কবি, কাহিনী, নায়ক বা অপর কাহারও নামে কাব্যের নামকরণ এবং সর্গস্থ কোন উপাদেয় কথার নামে সর্গের নাম-করণ হইবে।[২]

---

১. 'বাচাং বিচিত্র মার্গাণাং নিরবন্ধুঃ ক্রিয়াবিধিম্ ॥ [কাব্যাদর্শ ১, ৯]

২. সর্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রৈকো নায়কঃ শুরঃ।
সদ্বংশঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি ধীরোদাত্ত গুণান্বিতঃ ॥
একবংশভবাভূপাঃ কুলজা বহবোঽপি বা।
শৃঙ্গারবীরশান্তানামেকোঽঙ্গী রস ইষ্যতে ॥

যদিও উপরে উল্লিখিত মহাকাব্যের লক্ষণ অনেকটা আকৃতি-গত, তথাপি উহাতে যে মহাকাব্যের প্রকৃতিগত মাহাত্ম্য বিধৃত হয় নাই, তাহা বলা চলে না। অষ্টাধিক সর্গসংখ্যায় এবং বিভিন্ন বস্তুবর্ণনার নির্দেশে উহার বিস্তারের বিপুলতা আভাসিত ; ইতিহাসোদ্ভব বৃত্ত বা সদ্বংশজাত ধীরোদাত্ত নায়কের স্বীকৃতিতে মহত্ত্বের গুরুত্ব সঙ্কেতিত। সংস্কৃতে রচিত প্রায় প্রত্যেকটি মহাকাব্যের পশ্চাতে রহিয়াছে মহৎ প্রেরণা ঃ কোন কাব্যের প্রেরণা মহৎ চরিত্র, কোন কাব্যের প্রেরণা মহনীয় বংশগৌরব। সর্বোপরি কৃত্রিমবন্ধ মহাকাব্যের প্রধান গৌরব দীপ্তি—কি বিষয়-নির্বাচনে, কি চরিত্র চিত্রনে, কি প্রকাশভঙ্গীতে। এই দীপ্তিই পরবর্তী মহাকাব্যের মহত্ত্ব, ভারত্ব, সমুন্নতি ও দৃঢ়তা রক্ষা করিয়াছে।

অনেকেই মনে করেন, অলঙ্কারশাস্ত্রের নির্দিষ্ট লক্ষণ গ্রথিত হইয়াছে কালিদাসের পরবর্তীকালে, কারণ, কালিদাসের কাব্যে উক্ত লক্ষণাবলীর কতিপয় ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। কিন্তু ব্যতিক্রম লক্ষিত হইলেও কালিদাস-পূর্ব মহাকাব্য, কালিদাসের মহাকাব্য এবং কালিদাসের পরবর্তী মহাকাব্যগুলি বিচার করিলে এই ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হয় যে, বহু প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে মহাকাব্য রচনার একটি বিশিষ্ট রীতি প্রচলিত ছিল এবং কবিগণ মহাকাব্য রচনায় মোটামুটি সেই নিয়ম মানিয়া চলিয়াছেন।

প্রকৃত মহাকবি অবশ্য কোন বন্ধনেই আবদ্ধ হন না। কৃত্রিম বন্ধনে কল্পনা পঙ্গু হয়, বর্ণনা কৃত্রিম হইয়া উঠে এবং সৌন্দর্য ব্যাহত হইতে বাধ্য হয়। তথাপি দেখা গিয়াছে, শক্তিমান্ কবিগণ অলঙ্কারশাস্ত্রের নির্দেশকে মান্য করিয়াও আশ্চর্য সিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন। নিয়মবন্ধনের আনুগত্য স্বীকার করিয়াই কালিদাসের রসসিদ্ধি। বন্ধন সেখানে রসের পরিপন্থী না হইয়া রস-বৈচিত্র্য সৃষ্টির সহায়ক হইয়াছে।

অঙ্গানি সর্বেঽপি রসাঃ সর্ব্বে নাটকসন্ধয়ঃ।
ইতিহাসোদ্ভবং বৃত্তমন্যদ্বা সজ্জনাশ্রয়ম্ ॥
চত্বারস্তস্য বর্গাঃ স্যুস্তেষ্বেকঞ্চ ফলং ভবেৎ।
আদৌ নমস্ক্রিয়াশীর্ব্বা বস্তুনির্দেশ এব বা ॥
ক্বচিন্নিন্দা খলাদীনাং সতাঞ্চ গুণকীর্তনম্।
একবৃত্তময়ৈঃ পদ্যৈরবসানেঽন্য বৃত্তকৈঃ ॥
নাতিস্বল্পা নাতিদীর্ঘাঃ সর্গা অষ্টাধিকা ইহ।
নানাবৃত্তময় ক্বাপি সর্গঃ কশ্চন দৃশ্যতে ॥
সর্গান্তে ভাবিবৃত্তস্য কথায়াঃ সূচনা ভবেৎ।
সন্ধ্যা সূর্যেন্দুরজনী প্রদোষ ধ্বান্ত বাসরাঃ।
প্রাতর্মধ্যাহ্ন মৃগয়া শৈলর্তুবন সাগরাঃ।
সম্ভোগবিপ্রলম্ভৌ চ মুনিস্বর্গ পুরাধবরাঃ ॥
রণপ্রয়াণোপযম মন্ত্র পুত্রোদয়াদয়ঃ।
বর্ণনীয়া যথাযোগ্য সাঙ্গোপাঙ্গো অমী ইহ ॥
কবের্বৃত্তস্য বা নাম্না নায়কস্যেতরস্য বা।
নামাস্য সর্গোপাদেয় কথয়া সর্গনাম তু ॥ [সাহিত্যদর্পণ, ষষ্ঠ]

কালিদাস নিজে শৃঙ্গারী হইয়া অগ্নিপুরাণের এই বচন সার্থক করিয়াছেন, 'শৃঙ্গারী চেৎ কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ' (অগ্নি. ৩৩৯ অঃ)।

কিন্তু কালিদাসের পরবর্তীকালে রচিত কোন কোন মহাকাব্যে অলঙ্কারশাস্ত্রের আনুগত্য কাব্যের স্বতঃস্ফূর্ত গতি ও স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে ক্ষুন্ন করিয়াছে। সেখানে সার্থক হইয়াছে অগ্নিপুরাণের আর একটি বাক্য—'স চেৎ কবির্বীতরাগো নীরসং ব্যক্তমেব তৎ'—কবি রসে বীতরাগ হইলে জগতও নীরস প্রতিভাত হয়। অবশ্য পরবর্তীকালের কবিগণও শক্তিমান্, কিন্তু তাঁহাদের শক্তি অলঙ্করণ ও কাব্যের বহিরঙ্গ সজ্জায় ব্যয়িত হওয়ায় রসবস্তু কিঞ্চিৎ ক্ষুন্ন হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও কাহারও কাব্যের অর্থ গৌরব, কাহারও পদলালিত্য তাঁহাদিগকে কালের বুকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

(ii) মহাকবি ও কাব্যপ্রসঙ্গ

॥ অশ্বঘোষ ॥

কালিদাস পূর্ব যুগের উল্লেখযোগ্য কবি মহাকবি অশ্বঘোষ। একদিকে বাল্মীকির রামায়ণ, অপরদিকে কালিদাসের মহাকাব্য। আর্ষ কাব্য ও লৌকিক কাব্য রচনার মধ্যে কালের ব্যবধান অল্প নয়। অথচ দেখা যায়, বহুস্থলে বাল্মীকির সহিত কালিদাসেব অত্যাশ্চর্য মিল আছে। এই মিল সোজাসুজি বাল্মীকি হইতে কালিদাসে আসিয়াছে কিনা, এই প্রশ্ন মনে জাগিত। অশ্বঘোষের কাব্য আবিষ্কৃত হওয়ায় আর্ষ ও লৌকিক কাব্যের বিবর্তনধারায় একটি যোগসূত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ঠিকই বলিয়াছেন—'অনেক সময় মনে হইত, বাল্মীকির রামায়ণের কাব্য-রীতি এবং কালিদাসের কাব্যরীতির ভিতরে যে ব্যবধান আছে তাহাকে লঘু করিবার জন্য মাঝখানে কোন মধ্যধর্মালম্বী কবির আবির্ভাবের প্রযোজন ছিল। অশ্বঘোষের আবিষ্কার আমাদের মনের এই কৌতূহলকে একেবারেই নিবৃত্ত করে।' (ত্রয়ী)

কিন্তু, দুঃখের বিষয় অশ্বঘোষের জীবনী ও পরিচয় সম্পর্কে অতি অল্প তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে; যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা চীন ও তিব্বত হইতে। উহা হইতে জানা যায়, অশ্বঘোষ ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। সা-পাও-সাঙ-কিঙ (Tash-pao-tsam-kin) নামক চীনদেশীয় গ্রন্থের একস্থানে বলা হইয়াছে,[১] অশ্বঘোষ 'চন্দন-কণিক' বা কণিষ্কের ধর্মোপদেষ্টা ও বোধিসত্ত্ব ছিলেন এবং তিনি কণিষ্কের বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতিতে (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক) অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিব্বতের ইতিহাসলেখক লামা তারানাথ আবার অশ্বঘোষ নামে তিনজন বৌদ্ধাচার্যের উল্লেখ করিয়াছেন: বৃদ্ধ অশ্বঘোষ, মধ্যম অশ্বঘোষ ও শূর অশ্বঘোষ। কিন্তু, বীল্ সাহেব মনে করেন, অশ্বঘোষ একজন।

---

১. দ্রষ্টব্য 'বৌদ্ধ গ্রন্থকোষ'।

অশ্বঘোষের দুইখানি মহাকাব্য—১. বুদ্ধ চরিত ও ২. সৌন্দরনন্দ। তাঁহার একখানি নাটকও ('সারিপুত্ত প্রকরণ') আবিষ্কৃত হইয়াছে। হিউয়েন-সাঙ বলেন, অশ্বঘোষ ছিলেন মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিখ্যাত আচার্য, দিক্‌পাল পণ্ডিত ; চৈনিক পরিব্রাজক yi-tsing বলেন, অশ্বঘোষ একাধারে কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ। অশ্বঘোষের প্রতিভার স্বকীয়তা অসাধারণ। তিনি নিজেকে 'মহাকবি', 'মহাবাদিন্', 'আচার্য' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

কাউয়েল সাহেব সম্পাদিত 'বুদ্ধচরিত' কাব্যখানি সপ্তদশ সর্গে সম্পূর্ণ। কিন্তু এই পুঁথিখানি নানাদিক হইতে অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। ইহার চতুর্দশ সর্গের কিয়দংশ এবং পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ সর্গ অমৃতানন্দ নামে কোন কবির সংযোজনা। অন্যান্য সর্গেও কিছু কিছু প্রক্ষেপ আছে।

'বুদ্ধচরিত' মহাকাব্যের বর্ণনীয় বিষয় বুদ্ধদেবের মহনীয় জীবন—তুষিত স্বর্গ হইতে বুদ্ধদেবের অবতরণ, মায়াদেবীর স্বপ্ন, বোধিসত্ত্বের জন্ম ও বিবাহ, পিতা শুদ্ধোদনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া সিদ্ধার্থের অভিনিষ্ক্রমণ, প্রব্রজ্যা, মারবিজয়, বুদ্ধত্বলাভ, ধর্মচক্রপ্রবর্তন ও লুম্বিনী যাত্রা। গ্রন্থখানি মাহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বলিয়া উল্লেখিত হইলেও ইহাতে হীনযান সম্প্রদায়ে প্রচলিত বুদ্ধের জীবন ও ধর্মাদর্শই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। অশ্বঘোষের কাব্যের উৎস পালি খন্ধক, মহাবগ্‌গ, চুল্লবগ্‌গ প্রভৃতি।

কাব্যের সূচনা 'শ্রিয়ঃ পরার্ধ্যাং বিদধদ্ বিধাতৃজিৎ' পংক্তিটি লইয়া। এই সূচনার সহিত ভারবির গ্রন্থারম্ভের মিল আছে। বিষয়বিন্যাসে ও প্রকাশনৈপুণ্যে বুদ্ধচরিতের কাব্যত্ব অবিসংবাদী। কুমার সিদ্ধার্থ ক্রমে ক্রমে তরুণ উদয়সূর্য বা শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় বড় হইয়া উঠিতেছেন, কবি মালা উপমায় তাহার বর্ণনা দিতেছেন,

> ততঃ স বালার্ক ইবোদয়স্থঃ সমীরিতো বহ্নিরিবানিলেন।
> ক্রমেণ সম্যগ্ ববৃধে কুমার স্তারাধিপঃ পক্ষ ইবাতমস্কে ॥ [বুদ্ধ. চ. ২. ২০]

কিংবা আহার্য হস্তে সমাগতা শুভ্র শঙ্খভূষিতা নীলবসনা সুন্দরী সুজাতার এই বর্ণনা

> সিত শঙ্খোজ্জ্বলভুজা নীলকম্বলবাসিনী।
> সফেন মালা নীলাম্বু যমুনেব সরিম্বরা ॥ [বুদ্ধ. চ. ১২. ১০৭]

অশ্বঘোষের অপর কাব্য 'সৌন্দরনন্দ'। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে এই কাব্যখানি আবিষ্কার করিয়া প্রকাশ করেন। বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দ কিভাবে সুন্দরী স্ত্রীর মোহ কাটাইয়া বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহাই এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। রূপাসক্ত ও রূপবিবিক্ত মনের দ্বন্দ্বে এ বিষয় অপূর্ব। কবির লক্ষ্য বৌদ্ধধর্মের আদর্শ প্রচার—কিন্তু কি বর্ণনায় ভঙ্গিমায়, কি অলঙ্করণের সৌন্দর্যে প্রচার কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যখানি অষ্টাদশ সর্গে বিভক্ত। প্রথমেই কপিলাবস্তু নগরের বর্ণনা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গে বুদ্ধদেবের জীবন। চতুর্থ

সর্গ হইতে সুন্দরী ও নন্দের কাহিনী। সুন্দরীর অপরূপ রূপে মুগ্ধ নন্দ, উভয়ের মধ্যে নিবিড় প্রেম। কিন্তু বুদ্ধদেবের নির্দেশে নিতান্ত অনিচ্ছায় নন্দ গৃহত্যাগ করেন। পঞ্চম সর্গে দীক্ষা। ষষ্ঠ সর্গে বিরহিণী সুন্দরীর বর্ণনা : 'পদ্মাননা পদ্ম-দলায়তাক্ষী' সূর্যতাপে শুষ্ক পদ্মমাল্যের ন্যায় ম্লান, প্রিয়বিরহে প্রতিটি প্রিয়বস্তুতে আজ তাঁহার বিরাগ। সপ্তম-নবম সর্গে নন্দ-হৃদয়ের দ্বন্দ্ব, সংসার-সম্ভোগের প্রতি আসক্তি ও বুদ্ধদেবের উপদেশাবলীর বর্ণনা। দশম-একাদশে নন্দের মোহভঙ্গের জন্য বুদ্ধদেবের অলৌকিক কৌশল। নন্দ স্বর্গের অপ্সরা-সভায় নীত হন, অপ্সরাদের রূপে নন্দের নূতন মোহ উৎপন্ন হয়। এই অবস্থায় তিনি মর্ত্যে ফিরিয়া আসেন। তখন নন্দের মনে পার্থিব ও অপার্থিব রূপের দ্বন্দ্ব। দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ সর্গে এই দ্বন্দ্বের অবসান, মোহের বিনাশ ও পরিশেষে বুদ্ধের নিকট নন্দের আত্মসমর্পণ ও অর্হত্ব লাভ।

'সৌন্দরনন্দ' সত্যই অপূর্ব কাব্য। যেমন বর্ণনার চাতুর্য, তেমনই অলংকরণ-কৌশল। ডঃ সুকুমার সেন বলেন, 'সৌন্দরনন্দ বুদ্ধচরিতের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ'[১]। মন্তব্যটি অভ্রান্ত। এই কাব্যের অনেকগুলি রূপকল্প ও বর্ণনার প্রভাব কালিদাসের কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। মনে হয়, অনেক স্থলে অশ্বঘোষের ধ্বনিই যেন প্রতিধ্বনিত হইয়াছে কালিদাসের কাব্যে।

॥ কালিদাস ॥

সংস্কৃত কাব্যের কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস।

কালিদাসের দুইখানি মহাকাব্য—কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ। দুইখানি কাব্যই সুউচ্চ কল্পনা, বহুশ্রুতত্ব এবং মানবস্বভাব পরিজ্ঞানের স্বাক্ষর। সংস্কৃত কাব্য-ভাণ্ডারে এরূপ মহার্ঘ রত্ন নাই বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না।

তারক অসুরের অত্যাচারে পর্যুদস্ত দেবগণের সৈনাপত্য করিবার জন্য শিবের ঔরসে হিমরাজদুহিতা পার্বতীর গর্ভে কুমার কার্তিকেয়ের জন্ম-সম্ভাবনা 'কুমার সম্ভব' কাব্যের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। অধুনা প্রচলিত কাব্যে ১৭টি সর্গ দৃষ্ট হয়। কিন্তু মল্লিনাথ ইহার সাতটি সর্গের মাত্র টীকা লিখিয়াছেন। অষ্টম সর্গও যে কালিদাসের রচনা, আচার্য আনন্দবর্ধন তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। অধিকাংশ সমালোচকেরই মত এই যে, প্রথম আটটি সর্গই কালিদাসের রচনা, বাকি অংশ অন্য কোন লেখকের যোজনা। কিন্তু এই মত মানিয়া লইলে, মহাকাব্যে 'নাতি স্বল্পা নাতি দীর্ঘাঃ সর্গা অষ্টাধিকা ইহ'—এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। কিন্তু কেহ কেহ ঈশান-সংহিতায় নির্দিষ্ট মহাকাব্যের লক্ষণ—'অষ্ট সর্গান্নতু ন্যূনং ত্রিংশৎ সর্গাচ্চ

১. 'অশ্বঘোষের মহাকাব্যদ্বয়'—ডঃ সুকুমার সেন [হরপ্রসাদ সংবর্ধন লেখমালা, ১ম খণ্ড]

নাধিকম্' বাক্যটি উদ্ধার করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, মহাকাব্য অষ্ট সর্গেও রচিত হইতে পারে।

'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ'—নগাধিরাজ হিমালয়ের এই বর্ণনা লইয়া কুমারসম্ভব কাব্যের আরম্ভ। হিমালয় এখানে অচেতন প্রস্তরস্তূপ মাত্র নহেন, তিনি চেতনগুণসম্পন্ন। হিমরাজ উদার, মহৎ, শরণাগতবৎসল। অতুলনীয় তাঁহার ঐশ্বর্য, তিনি 'অনন্ত রত্নপ্রভব'। প্রকৃতির ঐশ্বর্যও হিমালয়ে কম নয়। হিমালয়ের কটিমেখলারূপে খেলা করে জলভারাক্রান্ত মেঘ ['আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাং'] রজনীতে সুরত প্রদীপের মত জ্বল্ জ্বল্ করে এক প্রকার ওষধি। সমীরণ-বাহিত ভাগীরথীর জলকণার আঘাতে মুহুর্মুহুঃ কম্পিত দেবদারু ['ভাগীরথী-নির্ঝর-শীকরাণাং বোঢ়া মুহুঃ কম্পিত-দেবদারুঃ']। হিমালয় শৈলাধিপত্যে নিযুক্ত এবং প্রজাপতি-কল্পিত যজ্ঞভাগের অধিকারী।

এই হিমালয়ের পত্নী পিতৃগণের মানসীকন্যা মেনকা। দক্ষকন্যা ভবপূর্বপত্নী সতী পতির অপমানে দক্ষজ তনু ত্যাগ করিয়া শৈল-বধূ মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। দিনে দিনে তিনি চন্দ্রকলার ন্যায় পরিবর্ধিত হইতে লাগিলেন ঃ

দিনে দিনে সা পরিবর্ধমানা লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা।

পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষান্ জোৎস্নান্তরানীব কলান্তরাণি ॥ [কুমার ১.২৫]

তাহার নাম হইল 'পার্বতী' অপর নাম 'উমা'। নব যৌবনের অভ্যাগমে তিনি সূর্যাংশুভিন্ন অরবিন্দের ন্যায় বিকশিত হইয়া উঠিলেন। দেবর্ষি নারদ আসিয়া জানাইলেন ইনি প্রেমের প্রভাবে হরের অর্ধাঙ্গিনী হইবেন। তখন বিপত্নীক 'বিমুক্তসঙ্গ' পশুপতি তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। হিমরাজ সংযত-স্বভাবা কন্যাকে তাঁহার পরিচর্যায় নিযুক্ত করিলেন। [প্রথম সর্গ]

ইতিমধ্যে স্বর্গে বিপর্যয় উপস্থিত হইল। তারক অসুরের পরাক্রমে পরাজিত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র অন্যান্য দেবগণকে লইয়া ম্লানমুখে ব্রহ্মার সকাশে উপনীত হইলেন। ব্রহ্মা নির্দেশ দিলেন, তপোনিরত মহাদেবের মনকে উমার দিকে আকর্ষণ করিতে হইবে। শিতিকণ্ঠ শিব হইতে উমাতে যে 'কুমার সম্ভব' হইবে, তিনিই সুর-সুন্দরীদের বেণীসংহার করিবেন। ব্রহ্মার নির্দেশ শ্রবণে দেবরাজ ইন্দ্র কন্দর্পকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র পুষ্পধন্বা উপস্থিত হইলেন ঃ তাঁহার কণ্ঠে বিলম্বিত চাপ, হস্তে 'চূতাঙ্কুরাস্ত্র'। [দ্বিতীয় সর্গ]

তৃতীয় সর্গ কুমারসম্ভব কাব্যের বিশিষ্ট অংশ। এই সর্গেই পুরাণ-প্রসিদ্ধ 'মদনভস্ম' ঘটনা। ভাষার মাধুর্যে, বর্ণনার চাতুর্যে এবং ঘটনার চমৎকারিত্বে সর্গটি এক স্তম্ভিত বিস্ময়। মদন ইন্দ্র কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া কহিলেন, 'আজ্ঞাপয় জ্ঞাতবিশেষ', কোমল কুসুমমাত্র আমার অস্ত্র হইলেও আমি হরেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইতে সক্ষম। ইন্দ্র কহিলেন, সখে, এই কাজই তোমাকে করিতে হইবে, হিমাদ্রি-তনুজার প্রতি 'যতাত্মনে রোচয়িতুং যতস্ব'।

ইন্দ্রের নির্দেশে সখা বসন্ত ও সখী রতিকে লইয়া মদন শঙ্কান্বিত হইয়াই

স্থাণুর আশ্রমে গমন করিলেন। সহসা ধ্যানস্থলীতে তপস্যার পরিপন্থী অকাল বসন্তের আবির্ভাব হইল। অসময়ে সূর্য উত্তরায়ণে যাত্রা করিলেন, দক্ষিণদিক হইতে গন্ধবহ প্রবাহিত হইল, সুন্দরীগণের নূপুরশিঞ্জনের অপেক্ষা না করিয়াই অশোকতরু পুষ্পিত হইল, আম্রবৃক্ষে নব পল্লব দেখা দিল, কর্ণিকার পুষ্প গন্ধহীন হইয়াও বর্ণপ্রকর্ষে চিত্ত হরণ করিতে লাগিল এবং অতিলোহিত পলাশ পুষ্প 'বালেন্দুবক্রাণ্য-বিকাশভাবাদ্বভুঃ'। দেখিতে দেখিতে মৃগ মদোদ্ধত হইয়া উঠিল, চূতাঙ্কুর আস্বাদন করিয়া পুংস্কোকিল মধুর স্বরে কূজন করিতে লাগিল, আর বনভূমিতে তির্যক প্রাণিজগতে দেখা দিল অদ্ভুত চাঞ্চল্য :

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ ।
শৃঙ্গেন চ স্পর্শ-নিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ ॥ [কুমারঃ ৩.৩৬]

বসন্তের এই অভ্যাগম হর-হৃদয়ে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না। লতাগৃহদ্বারে স্বর্ণবেত্রে ভর দিয়া দণ্ডায়মান নন্দী অকালবসন্তে বনভূমির চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া ওষ্ঠে অঙ্গুলি দিয়া ভূতগণকে চাপল্য প্রকাশে নিষেধ করিলেন ['মুখার্পিতৈকাঙ্গুলিসংজ্ঞয়ৈব মা চাপলায়েতি গণান্ ব্যনৈষীৎ']। তন্মুহূর্তে বৃক্ষ নিষ্কম্প হইল, মধুকর নীরব হইল, মৃগগণ শান্ত হইল—সমস্ত কানন যেন নন্দীর শাসনে 'চিত্রার্পিতারম্ভমিবাবতস্থে'। মদন তখন মহাদেবের দৃষ্টি এড়াইয়া বৃক্ষান্ত-রালে দাঁড়াইয়া ভূতপতিকে দেখিলেন, দেখিলেন ধ্যাননিরত মহাদেবের মূর্তি : আসনে স্থির পূর্বকায় ঋজু ও সমুন্নত, অংকে সন্নিবিষ্ট প্রস্ফুটিত পদ্মের মত পাণিযুগল, বায়ু নিরোধ হেতু দেহ যেন 'নিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্' ; ললাটনেত্র হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছে একটি জ্যোতি। দেখিয়া ভয়ে মদনের হস্ত হইতে শরচাপ স্খলিত হইল।

তখন বনে প্রবেশ করিলেন 'স্থাবররাজকন্যা' উমা। তিনি পুষ্পাভরণে ভূষিতা ['বসন্ত পুষ্পাভরণং বহন্তী'], রক্ত বসন পরিহিতা, স্তনভারে ঈষৎ নমিতা :

আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুণার্করাগম্ ।
পর্যাপ্ত পুষ্প স্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব ॥ [কুমার ৩.৫৪]

তাঁহাকে দেখিয়া মদন পুনরায় স্বকার্য সিদ্ধির আশা করিলেন।

মহাদেব তখন পরম জ্যোতি দর্শন করিয়া যোগে বিরত হইয়াছিলেন। নন্দী পর্বত-নন্দিনীর আগমনসংবাদ জানাইলে শিব ভ্রূ-সংকেতে তাঁহাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। পার্বতীর সখীদ্বয় ত্র্যম্বক পাদমূলে অবচিত পুষ্পের অঞ্জলি প্রদান করিলেন। উমাও বৃষভধ্বজকে প্রণাম করিলেন। প্রণামকালে তাঁহার নীলালক হইতে কর্ণিকার ও কর্ণ হইতে নবপল্লব ভূতলে পতিত হইল। মহাদেব তাঁহাকে 'অনন্য-ভাজং পতিমাপ্নুহি' বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

ঠিক সেই সময়ে মদন তাঁহার শরাসন স্পর্শ করিলেন। গৌরী যখন রক্ত পদ্ম-

বীজে গ্রথিত একছড়া মালা মহাদেবের হস্তে অর্পণ করিতেছিলেন এবং ত্রিলোচন যখন প্রণয়ীর প্রিয়ত্ববশে সেই মালা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন পুষ্পধন্বা মদন সম্মোহন নামক অমোঘ বাণ ধনুতে যোজনা করিতেই,

হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।
উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি ॥ [কুমার ৩.৬৭]

—মহাদেব চন্দ্রোদয়ে চঞ্চল অম্বুরাশির মত কিঞ্চিৎ ধৈর্যহারা হইয়া উমার পক্ক-বিম্বরূপ অধরোষ্ঠে দৃষ্টি বিস্তার করিলেন। উমাও 'স্ফুরদ্‌বালকদম্বে'র ন্যায় কণ্টকিত হইলেন এবং 'সাচীকৃতা চারুতরেণ তস্থৌ মুখেন পর্যস্ত বিলোচনেন।'

হঠাৎ এই ইন্দ্রিয়-বিক্ষোভের কারণ অবগত হইবার জন্য 'মহাদেব' বনপ্রান্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, দেখিলেন—'চক্রীকৃত চারুচাপ', 'দক্ষিণাপাঙ্গ নিবিষ্টমুষ্টি', 'নতাংস', 'আকুঞ্চিত সব্যপাদ' মদন তাঁহাকে বাণপ্রহার করিতে উদ্যত। মুহূর্তে ক্রোধ বর্দ্ধিত হইল, রুদ্র ভ্রূভঙ্গি করিলেন, তাঁহার তৃতীয় লোচন হইতে জ্বলদর্চির্বহ্নি নির্গত হইল। আকাশবায়ুচারীদের 'হে প্রভো সংহর, সংহর'—এইরূপ বাক্য নিঃসরিত হইতে না হইতেই—'তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার।' মহাদেব তপস্যার বিঘ্ন দেখিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। শৈলাত্মজা উমাও পিতার অভিলাষ ব্যর্থ হইল মনে করিয়া লজ্জিতা হইলেন এবং শূন্যহৃদয়ে স্বীয় ভবনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। [তৃতীয় সর্গ]

তাহার পর রতিবিলাপ। রতির করুণ ক্রন্দনে বনতল ভরিয়া উঠিল ঃ হে প্রিয় অধীনাকে ফেলিয়া কোথায় গেলে? 'কিংকারণমেব দর্শনং বিলপন্ত্যৈ রতয়ে ন দীয়তে?', 'অয়ি সম্প্রতি দেহি দর্শনং স্মর!' 'নৃণাং ন খলু প্রেম চলং সুহৃজ্জনে।' রতি স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় অনুপ্রবেশে মতিস্থির করিলেন, সহসা অন্তরীক্ষে বাণী উচ্চারিত হইল, হে কুসুমায়ুধপত্নি, তোমার ভর্তা অচিরেই তোমার সহিত মিলিত হইবেন। যখন শিব পার্বতীকে বিবাহ করিবেন, তখন তিনিই আবার অনঙ্গকে স্বীয় অঙ্গে যোজনা করিবেন। [চতুর্থ সর্গ]

এইবার পার্বতীর তপস্যা। প্রত্যাখ্যাতা পার্বতী মনে মনে নিজ রূপকে ধিক্কার দিলেন—'নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী'। তপস্যাদ্বারা তিনি নিজের বন্ধ্যা রূপকে অবন্ধ্যা করিতে সংকল্প করিলেন—'ইয়েষ সা কর্তুমবন্ধ্যরূপতাং সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ।' তিনি কণ্ঠহার ত্যাগ করিলেন, 'ববন্ধ বালারুণ বভ্রু বল্কলং', কেশে জটাভার ধারণ করিলেন এবং কটিতে বন্ধন করিলেন ত্রিগুণ মুঞ্জামেখলা। 'তপো মহৎ সা চরিতুং প্রচক্রমে'—দারুণ গ্রীষ্মে চতুর্দিকে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া শুচিস্মিতা পার্বতী প্রচণ্ড মার্তণ্ডের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন, নিদারুণ হিমে তিনি জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া তপস্যা করিতেন ; পর্ণ পর্যন্ত আহার না করিয়া এইরূপে তিনি 'অপর্ণা' নামে খ্যাত হইলেন। এমন সময় একদিন এক জটাধারী তপস্বী সেই বনে প্রবেশ করিয়া উমার রূপের ও তপস্যার প্রশংসা করিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'কিমি-ত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে ধৃতং ত্বয়া বার্দ্ধকশোভিবল্কলম্'—যৌবনের আভরণ ত্যাগ

করিয়া বার্ধক্যের উপযোগী বল্কল পরিধান করিয়াছ কেন ? উমার ইঙ্গিতে পার্শ্ববর্তী সখী জানাইলেন, ইনি 'পিণাকপাণিং পতিমাপ্তুমিচ্ছতি'। শুনিয়া তপস্বী অতি তীব্র শ্লেষবাক্যে মহাদেবের নিন্দা করিতে লাগিলেন ঃ মহাদেবের হস্তে বলয়িত সর্প, অঙ্গে ভস্মরজঃ ; সে অক্ষম বৃদ্ধ দিগম্বর ঃ 'ক্ক তদ্বিধস্ত্বং ক্ক চ পুণ্যলক্ষণা'। ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া উমার অধর ক্রোধে কম্পিত হইল। রক্তান্তনেত্রে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি কহিলেন, 'হরং ন বেৎসি নূনং'—তুমি নিশ্চয় হরকে জান না ; বিবাদে প্রয়োজন নাই, হর যেরূপই হউন, 'মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতং ন কামবৃত্তির্বচনীয়-মীক্ষতে'—স্বেচ্ছায় আমার মন তাঁহাতেই সমর্পিত, স্বেচ্ছার বিচার নাই।

এই কথা বলিয়া পার্বতী গমনোদ্যত হইলে বটু স্বরূপ ধারণ করিলেন। তিনিই স্বয়ং মহেশ্বর ; সহাস্যে তিনি উমার গতিরোধ করিলেন। তখন উমার 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা। মহাদেব কহিলেন, হে অনবদ্যাঙ্গি, আজ হইতে আমি তোমার দাস, তপস্যা দ্বারা তুমি আমাকে ক্রয় করিয়াছ। [পঞ্চম সর্গ]

পার্বতী ফিরিয়া আসিলেন। মহাদেব জ্যোতির্ময় সপ্তর্ষিকে স্মরণ করিলেন। বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতী সহ সপ্তর্ষিকে দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, 'ক্রিয়াণাং খলু ধর্মাণাং সৎপত্নী মূলকারণম্'। ভার্য্যার্থ উমাকে প্রার্থনা করিবার জন্য তিনি সপ্তর্ষিগণকে হিমপ্রস্থে প্রেরণ করিলেন। সপ্তর্ষিগণ প্রকৃতির অপূর্ব লীলাভূমি, নানা রত্নের আকর, নানা ওষধির আগার হিমালয়ে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং হিমরাজকর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া ঋষি অঙ্গিরা জানাইলেন, শম্ভু হিম-দুহিতা উমাকে প্রার্থনা করিতেছেন। ঋষি যখন এই কথা হিমরাজকে জানাইলেন, তখন পার্বতী পিতার পার্শ্বেই ছিলেন। তিনি অধোমুখে হস্তের লীলাকমলের পত্র গণনা করিতে লাগিলেন। শৃঙ্গারজনিত লজ্জার সে এক অপরূপ ব্যঞ্জনাময় চিত্র ঃ

এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী ॥ [কুমার ৬.৮৪]

হিমরাজ পত্নী মেনকার দিকে তাকাইলেন, মেনকাও এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। স্থির হইল, তিনদিন পরে বিবাহ হইবে। (ষষ্ঠসর্গ)

সপ্তমসর্গে হর-পার্বতীর বিবাহবর্ণনা। হিন্দুর শুভবিবাহের প্রতিটি অনুষ্ঠান এবং সেই সঙ্গে বিবাহকালে মাতা, পিতা, প্রতিবেশী, বর ও কন্যার মনোভাবের বর্ণনায় মানব-হৃদয়ের নিপুণ চিত্রকর কালিদাসের বাস্তব সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ লক্ষণীয়। গায়েহলুদ, মঙ্গলস্নান, অঙ্গসজ্জা, কৌতুকসূত্রবন্ধন, বরযাত্রা, নূতন বরকে দেখিবার জন্য পুরসুন্দরীদের ব্যগ্রতা কিছুই বাদ যায় নাই। বরণকার্য সম্পন্ন হইলে শিবকে উমার নিকট লইয়া যাওয়া হইল, বরবধূর দৃষ্টিবিনিময় হইলে হিমরাজ উমাকে অষ্টমূর্তি শিবের করে অর্পণ করিলেন। অগ্নি প্রদক্ষিণান্তর লাজাহোম সম্পন্ন হইল, বর বধূকে ধ্রুব দর্শন করাইলেন। অতঃপর বরবধূ চতুষ্কোণ সুবর্ণা-সনে উপবিষ্ট হইলে সমবেত দেবদেবী আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। বাগদেবী

সরস্বতী সংস্কৃতবন্ধে শিবের এবং সুখগ্রাহ্য প্রাকৃতনিবন্ধে শঙ্করীর স্তব করিলেন।[১]

অতঃপর বরবধূ অপ্সরাগণ অভিনীত আদ্য নাটক দর্শন করিলেন ('অপশ্যতামপ্সরসাং মুহূর্তং প্রয়োগমাদ্যং ললিতাঙ্গহারম্')।[২] দেবগণের প্রার্থনায় ভস্মীভূত অনঙ্গ মদন আবার অঙ্গ লাভ করিলে শঙ্করীকে লইয়া শঙ্কর কৌতুকাগারে প্রবেশ করিলেন। (সপ্তমসর্গ)

অষ্টমসর্গের বর্ণনীয় বিষয় হর-পার্বতীর শৃঙ্গার। কোন কোন সমালোচকের মতে দেবতার সম্ভোগশৃঙ্গার বর্ণনায় কাব্যে 'প্রকৃতিবিপর্যয়' দোষ ঘটে। অষ্টমসর্গে এই বর্ণনা আছে, অতএব উহা কালিদাসের রচনা নয়। রবীন্দ্রনাথও সপ্তমসর্গের বিশ্বব্যাপী বিবাহ-উৎসবকেই কুমারসম্ভবের উপসংহার বলিয়াছেন।[৩] কিন্তু আনন্দবর্ধনাদি আচার্যগণ এই সর্গকে কালিদাসের রচনা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াই উহার সমালোচনা করিয়াছেন। অষ্টমসর্গও কালিদাসের রচনা। দেবদম্পতীর এই শৃঙ্গার লঘুচপল মানুষের ভোগ-বিলাস মাত্র নয়, ইহা ভারতীয় জীবনে পবিত্র দাম্পত্যের ফল শুভ 'কুমারসম্ভব'-এর ভূমিকা। ইহাদ্বারা প্রেম গাঢ় অনুরাগে পরিণত হইয়া পরস্পরের আশ্রয় স্বরূপ হইয়া উঠে ('তয়োঃ প্রেম গূঢ়মিতরেতরাশ্রয়ম্') এবং বরকন্যা পরস্পর পরস্পরের অভিমুখী হইয়া 'আত্মসদৃশ' হয়। অষ্টম সর্গ প্রকৃতি-বর্ণনার দিক হইতেও উল্লেখযোগ্য। মানব জীবনের কামনা-বাসনাকে প্রকৃতিদর্পণে প্রতিবিম্বিত করিয়া প্রেম-সৌন্দর্যের কবি কালিদাস এক অপূর্ব নিসর্গদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন।

কুমারসম্ভব কাব্যের কাহিনী কালিদাসের মৌলিক সৃষ্টি নয়। শিবপুরাণে (১২-১৪), পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে (৪৩-৪৪ অঃ) এবং বামন পুরাণে (৫১-৫৩, ৫৭ অঃ) এই কাহিনীর বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সকল পুরাণ হইতে বিষয় আহরণ করিলেও বিষয়ের উপস্থাপন ও বর্ণনার নৈপুণ্য কালিদাসের নিজস্ব। পুরাণ-কাহিনী নিরলঙ্কার বিবৃতিমাত্র, কালিদাসের বর্ণনা অলঙ্কৃত ও কাব্যগুণে সমৃদ্ধ। উক্তিবৈচিত্র্যে কালিদাস পুরাণাতিশায়ী। যেমন,

১. 'উমা'-নামকরণ প্রসঙ্গে বামন পুরাণে আছে,

তপসো বারয়ামাস উমেত্যেব অব্রবীচ্চ সা।
তদেব মাতা নামাস্যাশ্চক্রে পিতৃপ্রভুতা শুভা॥ [বামন. ৫১. ২১-২২]

সেখানে কালিদাসের উক্তি ঃ

উ-মেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম॥ [কুমার. ১.২৬]

---

১. দ্বিধা প্রযুক্তেন চ বাঙ্ময়েন সরস্বতী তন্মিথুনং নুনাব।
সংস্কার পূতেন বরং বরেণ্যং বধূং সুখ গ্রাহ্য-নিবন্ধনেন॥ (কুমার. ৭.৯০)

২. এই নাটক সন্ধি-সমন্বিত ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিদ্বারা ব্যঞ্জিত, রসের অনুকূল রাগসম্বলিত ও ললিত অঙ্গবিক্ষেপে পূর্ণ।

৩ প্রাচীন সাহিত্য—কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা।

২. শিবপুরাণে শিবনিন্দা-তৎপর বটুর প্রতি রুষ্টা পার্বতীর উক্তি,

ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা পার্বতী ক্রোধসংযুতা।
উবাচ ক্রুধ্যমানা সা শিবনিন্দাপরন্তু তম্ ॥
এতাবধি ময়া জ্ঞাতং কশ্চিদন্যো ভবিষ্যতি।
পরন্তু সকলং জাতমবন্ধো দৃশ্যসেঽধুনা ॥ [শিবপু. ১৪ অঃ]

সেস্থলে 'কুমারসম্ভবে'র বর্ণনা,

ইতি দ্বিজাতৌ প্রতিকুলবাদিনি প্রবেপমানাধরলক্ষ্য কোপয়া।
বিকুঞ্চিত ভ্রূলতমাহিতে তয়া বিলোচনে তির্যগুপান্তলোহিতে ॥
উবাচ চৈনং পরমার্থতো হরং ন বেৎসি নূনং যত এবমাত্থ মাম্।
অলোকসামান্যমচিন্ত্য হেতুকং দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম্ ॥ [৫.৭৪-৭৫]

এই বিষয়ে একটি কথা স্মরণীয়। পুরাণের কোন কোন অংশে প্রক্ষেপ থাকিলেও পুরাণ কালিদাসের পরবর্তী নয়। একাধিকবার তিনি 'পুরাণবিদ্' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। পুরাণে কালিদাসের অধিকারও অসামান্য। পৌরাণিক সংস্কার ও বিশ্বাসকে কোথাও তিনি ক্ষুণ্ণ করেন নাই। কিন্তু পুরাণ-প্রবক্তা সূতের মত তিনি প্রসঙ্গকে কেবল জানাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সৌন্দর্য সৃষ্টির উপকরণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। পুরাণের দিব্যাঙ্গনা—অপ্সরা, কিন্নরী, সিদ্ধাঙ্গনা কালিদাসের কাব্যে এক আশ্চর্য স্বপ্নমায়া বিস্তার করিয়াছে।

"সংস্কৃত ভাষায় যত মহাকাব্য আছে, তন্মধ্যে কালিদাস প্রণীত রঘুবংশ সর্বাপেক্ষা সর্বাংশে উৎকৃষ্ট।"—মন্তব্যটি প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের। উক্তিটির মধ্যে আতিশয্য থাকিলেও, অলীকতা নাই। যদিও এই কাব্যে মহাকাব্যের একনায়কত্ব এবং রসৈকসিদ্ধির নিয়ম লঙ্ঘিত হইয়াছে, তথাপি ইহা শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, বিচিত্র অভিজ্ঞতা, জীবন-সম্পর্কে গভীর জ্ঞান, কল্পনার মৌলিকতা এবং মননধর্মিতা এই কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উক্তি-বৈচিত্র্যে ইহার প্রায় প্রতিটি শ্লোক যেন এক একটি নিটোল মুক্তা। রসপরিণামের উপরই কাব্যের উৎকর্ষ নির্ভর করে। এই কাব্যে শান্ত, বীর, করুণ শৃঙ্গারাদি রসের প্রবাহ স্বতন্ত্রভাবে অবিরোধে প্রবাহিত হইয়াছে। এ যেন বহুবিচিত্র রসের নদীতে ঘেরা এক রস-নদীমাতৃক কাব্য।

'রঘুবংশম্' ভারতবর্ষের বহু গুণভূষিত একটি রাজবংশের ঐতিহাসিক কাব্যরূপ—অনেকটা পুরাণের বংশবর্ণনার মত। কিন্তু পুরাণের বংশবর্ণনায় নামের তালিকাটিই সর্বস্ব, কালিদাসের কাব্যে নামের অন্তরালে নামীর চরিত্র-গৌরব। একটি রাজবংশে কত বিচিত্র চরিত্রের মানুষের আবির্ভাব হইয়াছে, ধর্মে-কর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি বংশ কেমন করিয়া ক্রমশঃ অধঃপতিত হইয়াছে, কালিদাস সেই দিকে অঙ্গুলি সংকেত করিয়াছেন। এই বংশ পুরাণের বহুখ্যাত সূর্যবংশ। এই বংশের ধুরন্ধর পূর্বপুরুষ,—বৈবস্বত মনু, ইক্ষ্বাকু, সগর, ভগীরথ ; এই বংশের কুলগুরু ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ। গ্রন্থারম্ভে কবি এই বংশের মহিমা কীর্তন করিয়া বলিয়াছেন, এই

বংশ আজন্ম বিশুদ্ধ, চিরকাল সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর, যজ্ঞক্রিয়, দানশীল ও দণ্ড-প্রয়োগকুশল ঃ

'ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্ ।
যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্ ।।
শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্ ।
বার্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্ ।। [রঘু. ১.৭-৮]

—ত্যাগের জন্য ইঁহাদের অর্থসঞ্চয়, সত্যের জন্য মিতভাষণ, যশের জন্য জয়েচ্ছা, বংশরক্ষার জন্য বিবাহ। ইঁহারা শৈশবে বিদ্যাভ্যাস করেন, যৌবনে বিষয়ভোগ করেন, বার্ধক্যে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া অন্তিমে যোগাভ্যাস দ্বারা দেহত্যাগ করেন।

'রঘুবংশ' কাব্য এই বংশের কীর্তি-কাহিনী। ভারতবর্ষের অন্তরে মানবতার যে সমুন্নত আদর্শ আছে এবং যাহার প্রেরণায় কবিগুরু বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়াছেন, সেই একই আদর্শ কবি কালিদাসকেও অনুপ্রেরিত করিয়াছে। রঘুবংশ ভারতীয় সমুন্নত মানবাদর্শের মহাকাব্য ; এই আদর্শই এই কাব্যের অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করিয়াছে। ঊনিশটি সর্গে রাজা দিলীপ হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত ২৯ জন রাজার কাহিনী কবি এই কাব্যে বিবৃত করিয়াছেন ; তন্মধ্যে প্রথম সতেরটি সর্গে দিলীপ, রঘু, অজ, দশরথ, রামচন্দ্র, কুশ ও অতিথির কাহিনী, অষ্টাদশ সর্গে অন্যান্য রাজার কাহিনী এবং শেষ সর্গে এই বংশের শেষ রাজা অগ্নিবর্ণের কাহিনী। বৈবস্বত মনুর অন্বয়ে সূর্যবংশে রঘু হইতে বংশ-গৌরব বৃদ্ধি পায়। রঘু হইতেই বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—তাই গ্রন্থের নাম 'রঘুবংশম্'। প্রথমদিকে রাজা রঘুই কেন্দ্রীয় চরিত্র।

কাব্যারম্ভে পার্বতী-পরমেশ্বরের বন্দনাদ্বারা কবি কাব্য শুরু করিয়াছেন।[১] তাহার পর নিজের দীনতার স্বীকৃতি—কোথায় অতি মহৎ সূর্যবংশ, আর কোথায় আমার মত অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি ['ক্ব সূর্য-প্রভবো বংশঃ ক্বচাল্প-বিষয়া মতিঃ'] ঃ

মন্দঃকবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্ ।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামন ।। [রঘু. ১.৩]

—বামন হইয়া উচ্চবৃক্ষের ফলে লোভ করার মত মন্দমতি হইয়াও কবিযশ প্রার্থনা করায় আমি উপহাসাস্পদ হইব।

কিন্তু কবির ভরসা এই যে, এই সুমহৎ বংশের কীর্তি-কাহিনী লইয়া অনেকেই কাব্য রচনা করিয়াছেন। মণি-বেধক বজ্রদ্বারা বংশ-মণিতে ছিদ্র পূর্বেই করা হইয়াছে। সেই ছিদ্রপথে সূত্রের ন্যায় কবির গতি ঃ

অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্বসূরিভিঃ ।
মণৌ বজ্র সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ ।। [রঘু. ১.৪]

---

১. বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী-পরমেশ্বরৌ ।। [রঘু. ১.১]

অতি বিশুদ্ধ যে রঘুবংশ, সেই 'রঘূণামন্বয়ং বক্ষ্যে,'—ইহাই কবির প্রতিজ্ঞা।

মাননীয় বৈবস্বত মনুর গোত্রে 'ব্যূঢোরস্কো বৃষস্কন্ধঃ' দিলীপ নামে রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আকারসদৃশ প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অনুরূপ শাস্ত্রজ্ঞান, শাস্ত্র-জ্ঞানের অনুরূপ কর্ম ও কর্মের অনুরূপ সিদ্ধি। তিনি আদর্শ মানুষ, আদর্শ রাজা। তিনি অপুত্রক। পুত্রকামনায় পত্নী সুদক্ষিণার সহিত তিনি কুলগুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে উপনীত হন। অভীষ্ট লাভের জন্য গুরু তাঁহাকে নন্দিনী নাম্নী এক গাভীর সেবায় নিযুক্ত করেন। আশ্রিতবাৎসল্য এই কুলের বিশিষ্ট ধর্ম। এক-দিন নন্দিনী গঙ্গাপ্রপাতের অন্তর্গত তৃণভূমিতে প্রবেশ করিতেই একটি সিংহ তাঁহাকে আক্রমণ করে। নন্দিনী চিৎকার করিয়া উঠিতেই রাজা সিংহকে বধ করিবার জন্য ধনু উত্তোলন করেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, রাজার দক্ষিণ কর তূণস্থিত বাণে সংলগ্ন হইয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল এবং তিনি চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিলেন ঃ

বামেতরস্তস্য করঃ প্রহর্তুর্নখ প্রভাভূষিত কঙ্কপত্রে।
সক্তাঙ্গুলিঃ সায়কপুঙ্খ এব চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে॥ [রঘু. ২.৩১]

মন্ত্রৌষধি প্রয়োগে রুদ্ধবীর্য সর্পের ন্যায় রাজা নিজের মনে জ্বলিতে লাগিলেন। রাজাকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া সিংহ মানুষের মত কথা বলিতে লাগিল। রাজা বুঝিলেন, চেষ্টা নিষ্ফল। অনন্যোপায় হইয়া তিনি গাভীর পরিবর্তে নিজেকে সিংহের মুখে সমর্পণ করিতে চাহিলেন। সিংহ হাসিয়া উঠিল, রাজাকে উপহাস করিয়া সে বলিল, রাজন্, জগতে আপনার একচ্ছত্র অধিকার, তাহার উপর এই নবীন বয়স, এই সুন্দর দেহ। তুচ্ছ বস্তুর জন্য মহামূল্য জীবন বিসর্জন দিতে উদ্যত হইয়াছেন, নিশ্চয় আপনি বিচারমূঢ় ঃ

একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং নবং বয়ঃ কান্তমিদং বপুশ্চ।
অল্পস্য হেতোর্বহু হাতুমিচ্ছন্ বিচারমূঢ়ঃ প্রতিভাসি মে ত্বম্॥ [রঘু. ২.৪৭]

কিন্তু অটল রাজা দিলীপ। তিনি ক্ষত্রিয়। তিনি জানেন, 'ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুদগ্রং ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢ়ঃ' ; তিনি জানেন, পিণ্ডদেহ একান্তবিধ্বংসী। সুতরাং সেই দেহ দান করিয়া তিনি গাভী রক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন। এই মহত্ত্ব, ঔদার্য ও ত্যাগব্রত রাজা দিলীপের জন্য সৌভাগ্য বহন করিয়া আনিল। নন্দিনী বলিলেন, 'সাধো! মায়াং ময়োদ্ভাব্য পরীক্ষিতোঽসি', 'প্রীতাস্মি তে পুত্র! বরং বৃণীষ্ব'। রাজা পুত্রবর প্রার্থনা করিলেন। অভীষ্ট লাভ করিয়া দম্পতী রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন এবং অচিরেই রাণী দিলীপের তেজ ধারণ করিলেন। (রঘু ১-২ সর্গ)

এই তেজ হইতে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন, তাঁহার নাম রাখা হইল রঘু। রঘু বড় হইলেন। তাঁহার 'গাম্ভীর্যমনোহর' বপু, কপাটবিশাল বক্ষ (কপাটবক্ষাঃ), সমুন্নত গ্রীবা। দিলীপ তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া 'শতাশ্বমেধ' সম্পন্ন করিতে মনস্থ করিলেন। রঘু হইলেন যজ্ঞাশ্বের রক্ষক! শততম যজ্ঞ নিষ্পন্ন হইল না। কীর্তিনাশের ভয়ে ইন্দ্র অদৃশ্য থাকিয়া যজ্ঞাশ্ব হরণ করিলেন। ইন্দ্রের সহিত

মহাঘোর যুদ্ধ হইল ('বভূব যুদ্ধং তুমুলং')। দেবরাজ রঘুর বীরত্বে তুষ্ট হইলেন এবং শততম যজ্ঞ সম্পন্ন না করিয়াও দিলীপ শতাশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হইলেন। সুযোগ্য পুত্রের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া দিলীপ বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। (৩ সর্গ)

'রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ'—রঘু রাজার এই সংজ্ঞা সার্থক করিলেন। রঘুর এক কীর্তি দিগ্বিজয়, অপর কীর্তি বিশ্বজিৎ যজ্ঞান্তে কৌৎসমুনিকে প্রার্থিত অর্থদান। দিগ্বিজয়-কাহিনী অপূর্ব উৎসাহোদ্দীপক। প্রথমে রঘুর বিজয়বাহিনী পূর্বদিকে অগ্রসর হইল। সুহ্মদেশ জয় করিয়া তিনি বঙ্গদেশে উপনীত হইলেন। বঙ্গীয় সৈন্য বিপুল রণতরী লইয়া রঘুকে বাধা দিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু,

বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ ॥ [রঘু. ৪.৩৬]

—নৌবলে বলীয়ান্ যুদ্ধেচ্ছু বঙ্গীয়দিগকে পরাভূত করিয়া তিনি গঙ্গা-প্রবাহের অন্তর্বর্তী দ্বীপে জয়স্তম্ভ প্রোথিত করিলেন। রঘু হইলেন দিগ্বিজয়ী সম্রাট। (৪ সর্গ)

দিগ্বিজয় অন্তে তিনি বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্বস্ব দান করিয়া রিক্ত হইলেন। এমন সময় আসিলেন বরতন্তু নামা মুনির এক শিষ্য কৌৎস। হিরন্ময় পাত্রের অভাবে ('বীতহিরন্ময়াৎ') রঘু তাঁহাকে মৃন্ময় পাত্রে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া আদেশ প্রার্থনা করিলেন। রাজার অকিঞ্চনত্ব দেখিয়া কৌৎস স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, 'স্বস্ত্যস্তু তে নির্গলিতাম্বুগর্ভং শরদ্ঘনং নার্দতি চাতকোঽপি'—হে রাজন্ আপনার কল্যাণ হউক, চাতকও শরতের জলহীন মেঘের নিকট জল যাচঞা করে না। বরতন্তুশিষ্য ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। রঘু তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, 'কিংবস্তু বিদ্বন্ গুরবে প্রদেয়ম্'? কৌৎস উত্তর করিলেন, 'কোটিশ্চতস্রোদশ' (চতুর্দশ কোটি)। গুর্বর্থী রঘুর নিকট হইতে ফিরিয়া যাইবে, এ পরিবাদ অযশস্কর। রঘু কৌৎসকে কহিলেন, হে অর্হন্, দুই-তিনদিন আমার অগ্ন্যাগারে অপেক্ষা করুন। অর্থসংগ্রহের জন্য তিনি কুবেরভবন জয় করিতে সংকল্প করিলেন। তাঁহার সংকল্পই সিদ্ধি। দেখিতে দেখিতে রঘুর শূন্য ভাণ্ডারে স্বর্ণবৃষ্টি হইল। রাজাও মুনিকে তাঁহার অভীষ্ট প্রদান করিয়া ধন্য হইলেন। মুনি আশীর্বাদ করিলেন, 'পুত্রং লভস্বাত্মগুণানুরূপম্'। এই পুত্রের নাম হইল 'অজ'।

পঞ্চম সর্গের মধ্যভাগ হইতে অষ্টম সর্গ পর্যন্ত এই অজ-রাজার কাহিনী। রঘু-বংশের বংশ-দীপ যেন এক প্রদীপ হইতে জ্বালানো আর একটি প্রদীপ ('দীপ ইব প্রদীপাৎ') অজও পিতার মত রূপবান্, ওজস্বী, বীর্যবান। অজ-উপাখ্যানে ইন্দু-মতীর স্বয়ম্বর, অজ-ইন্দুমতীর পরিণয়, দেবর্ষি নারদের মাল্যস্পর্শে ইন্দুমতীর মৃত্যু এবং অজ-বিলাপ বিখ্যাত ঘটনা। স্বয়ম্বর সভার বর্ণনায় (৬ষ্ঠ-সর্গ) তৎ-কালীন ভারতের বিভিন্ন রাজ্য—মগধ, অঙ্গ, অবন্তী, মাহিষ্মতী, শূরসেন, কলিঙ্গ, উরগ-পুর (নাগপুর), পাণ্ডু প্রভৃতি দেশের চিত্র অতি জীবন্ত। স্বর্ণবেত্রধারিণী

সুনন্দার ভাষণে কালিদাস এই অংশে তাঁহার দেশদর্শনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা রূপায়িত করিয়াছেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রূপচিত্রে, লোকচরিত্রবিশ্লেষণে, পুরাণজ্ঞানে, উক্তির বৈচিত্র্যে ও কবিত্বের ছটায় এই সকল বর্ণনা তুলনারহিত। ইন্দুমতী ইহাদের মধ্যে কোন রাজাকেই বরণ করিলেন না। সঞ্চারিণী দীপশিখার ন্যায় এক এক রাজাকে তিনি অতিক্রম করিয়া যান, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই রাজা বিবর্ণভাব প্রাপ্ত হন ;

সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ যং যং ব্যতীয়ায় পতিংবরা সা।
নরেন্দ্রমার্গাট্ট ইব প্রপেদে বিবর্ণ-ভাবং স স ভূমিপালঃ॥ [রঘু. ৬.৬৭]

কিন্তু অজের সম্মুখে গিয়া ইন্দুমতী আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, প্রফুল্ল সহকারকে প্রাপ্ত হইলে ভ্রমর আর অন্য বৃক্ষের প্রতি আকৃষ্ট হয় না ['নহি প্রফুল্লং সহকারমেত্য বৃক্ষান্তরং কাঙ্ক্ষতি ষট্পদালী']। তাঁহার অঙ্গলতিকা রোমাঞ্চিত হইল এবং তিনি ধাত্রীকর হইতে চূর্ণ গৌর বরমাল্য লইযা অজের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন।

ইহার পর অজ-ইন্দুমতীর পরিণয়। কুমারসম্ভব কাব্যের হরপার্বতীর বর্ণনার সহিত ইহার হুবহু মিল দৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ বর দেখিবার জন্য পুরসুন্দরীদের ব্যাকুল বিচেষ্টা ['ত্যক্তান্যকার্যাণি বিচেষ্টিতানি']। অশ্বঘোষের কাব্যেও অনুরূপ বর্ণনা। মনে হয়, এই বর্ণনার একটি সাধারণ উৎস ছিল। কবিগণ সেই সাধারণ উৎস হইতেই ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই আবার সংস্কৃত কাব্য হইতে বাংলা মঙ্গল কাব্যে পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে। নূতন বরকে দেখিবার আগ্রহ পুরসুন্দরীদের চিরা-গত। তখন তাঁহাদের কর্তব্যাকর্তব্য বোধ থাকে না, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানও হারাইয়া যায়। কাহারও কবরীবন্ধন খুলিয়া যায়, কেহ কেহ শিথিল কেশপাশ একহাতে ধরিয়াই ['করেণ রুদ্ধোঽপি চ কেশপাশঃ'] ছুটিতে থাকেন ; কেহ প্রসাধন কলা অসম্পূর্ণ রাখিয়াই দৌড়াইয়া আসেন। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রেমব্যাকুলা গোপাঙ্গনাগণও ঠিক এইভাবেই ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। স্বয়ংবর-বরণের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম প্রত্যাখ্যাত রাজন্যবর্গের সহিত মনোনীত বরের যুদ্ধ। রঘু-বংশের সপ্তম সর্গে এই যুদ্ধবর্ণনা। অজ শুধু রূপবান্ নন, বীর্যবান। সমরবিজয়-লক্ষ্মী অবশেষে বীর অজকেই বরণ করিলেন এবং বিজয়ী বীর ইন্দুমতীসহ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

অষ্টম সর্গের বর্ণনীয় বিষয় অজের রাজ্যশাসন, রঘুর যোগাভ্যাস, দশরথের জন্ম, ইন্দুমতীর মৃত্যু, অজবিলাপ ও অজের দেহত্যাগ। ভারতীয় জীবনে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি একই জীবনধর্মসাধনার দুইটি দিক—'অপবর্গ মহোদয়ার্থয়োর্ভুবমংশাবিব' ; এখানে যতি ও ভূপতির চিহ্ন একপ্রকার। এই সত্যই পরিস্ফুট হইয়াছে রঘুর নিবৃত্তি সাধনায় ও অজের প্রবৃত্তি সাধনে। এই সর্গের বিশিষ্ট অংশ অজ-বিলাপ। দেবর্ষি নারদের বীণাচ্যুত মধুগন্ধী কুসুমমাল্য সহসা বায়ুতাড়িত হইয়া ইন্দুমতীর স্তনাগ্রে পতিত হওয়ায় বিহ্বলা বালা গতায়ু হইলেন। গতপ্রাণা মহিষীর দেহ অঙ্কে ধারণ করিয়া শোকার্ত অজ বিলাপ করিতে লাগিলেন—'বিললাপ স বাষ্পগদগদং।'

অজবিলাপ অতি করুণ ও মর্মস্পর্শী। ইন্দুমতী শুধু তাঁহার নর্মসঙ্গিনী ছিলেন না, তিনি ছিলেন অজের মর্মসঙ্গিনী। তাই প্রিয়াবিরহে ব্যাকুল দয়িতের খেদোক্তি,—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্ ।। [রঘু. ৮.৬৭]

পত্নী-বিয়োগের পর অজ আর রাজত্ব করিতে পারিলেন না। কুলগুরু বশিষ্ঠ-প্রেরিত সান্ত্বনাবাক্য—'মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাং বিকৃতির্জীবিতমুচ্যতে বুধৈঃ,' কোন প্রভাবই বিস্তার করিতে পারিল না। তিনি পুত্র দশরথের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া শোকবিধুর অন্তরে গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গমে প্রায়োপবেশনে তনুত্যাগ করিলেন।

রঘুবংশের নবম সর্গ হইতে পঞ্চদশ সর্গের কাহিনী বস্তুতঃ রামায়ণেরই কাহিনী: দশরথের রাজত্ব, অন্ধমুনির পুত্রবধ, দশরথের প্রতি মুনির অভিশাপ—'দিষ্টান্তমাপ্স্যতি ভবানপি পুত্রশোকাদন্ত্যে'—[৯ম সর্গ], পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, নারায়ণের অংশরূপে রাম-লক্ষ্মণের জন্ম, তাড়কাবধ, অহল্যা-উদ্ধার, হরধনুভঙ্গ, রামসীতাদির বিবাহ, রামের বনবাস, চিত্রকূট পর্বতে রাম-ভরত মিলন, রামপাদুকা সহ ভরতের প্রত্যাবর্তন ও নন্দিগ্রামে থাকিয়া রামচন্দ্রের প্রতিনিধি রূপে রাজ্যপালন ('রাজ্যং ন্যাসমিবাভুনক্'), ঐন্দ্রকাকের উপাখ্যান, পঞ্চবটী গমন, শূর্পনখার কাহিনী, মায়া মৃগের প্রসঙ্গ, সীতাহরণ, সুগ্রীব-রামের সখ্য, হনুমানের লংকা গমন ও অভিজ্ঞান-রত্ন আনয়ন, রামবিভীষণের মৈত্রী, সেতুবন্ধন, লংকাযুদ্ধ—লক্ষ্মণের শক্তিশেল, কুম্ভকর্ণ বধ, রামরাবণের যুদ্ধ, রাবণবধ, বিভীষণের অভিষেক ও পুষ্পকরথে রামসীতার অযোধ্যা যাত্রা (দ্বাদশ সর্গ), বিমান পথে লংকা হইতে সাগর অতিক্রমণ পূর্বক অযোধ্যা আগমন পর্যন্ত যাত্রাপথের বর্ণনা (১৩শ সর্গ), রামের রাজ্যাভিষেক, রাজা রামের চরিত্র ('তেনাস লোকঃ পিতৃমান্ বিনেত্রা তেনৈব শোকাপনুদেন পুত্রী' —১৪.২৩), সীতার বনবাস, বাল্মীকির আশ্রমে সীতার আশ্রয় লাভ (১৪শ সর্গ), সীতার যমজ সন্তান প্রসব, মহর্ষি বাল্মীকি কর্তৃক লবকুশের সাঙ্গ বেদ ও রামায়ণ গান শিক্ষা ('স্বকৃতিং গাপয়ামাস কবি-প্রথম-পদ্ধতিম্'), শূদ্র শম্বুক-বধ, অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বমোচন, লবকুশের রামায়ণ গান, কবি কারুণিক বাল্মীকি কর্তৃক লবকুশের পরিচয় প্রদান, সীতার পাতালপ্রবেশ, লক্ষ্মণ-বর্জন ও রামের মহাপ্রস্থান (১৫ সর্গ) রামায়ণের এই সকল অতি পরিচিত বিষয় রঘুবংশের সাতটি সর্গে (৯-১৫) বর্ণিত হইয়াছে। রামায়ণের বর্ণনা বিশদ। কালিদাস অতি সংক্ষেপে কবি প্রতিভার স্পর্শে তাহাকে সংহত রশ্মির মত উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। বাল্মীকির নিকট কালিদাসের ঋণ অল্প নয়। কালিদাস অধমর্ণ, বাল্মীকি উত্তমর্ণ। কিন্তু ঋণ গ্রহণ করিলেও কালিদাস মৌলিক, তাঁহার প্রতিভা অম্লান। রঘুবংশের প্রতিটি শ্লোক স্বয়ংপ্রভ মণির ন্যায় সমুজ্জ্বল।

ষোড়শ সর্গে রাজা কুশের আখ্যান। রামচন্দ্র কুশকে কুশাবতী রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। অযোধ্যা ছিল পরিত্যক্ত। সহসা একদিন গভীর রাত্রিতে যখন

পুরী নিদ্রামগ্ন, তখন রাজা কুশ নিজের শয্যাগৃহে স্তিমিত প্রদীপের আলোকে একটি অদৃষ্ট-পূর্বা নারী-মূর্তি দর্শন করিলেন ঃ

অথার্দ্ধরাত্রে স্তিমিত প্রদীপে শয্যাগৃহে সুপ্তজনে প্রবুদ্ধঃ।
কুশঃ প্রবাসস্থকলত্রবেষামদৃষ্টপূর্বাং বনিতামপশ্যৎ ॥ [রঘু. ১৬.৪]

রুদ্ধদ্বার কক্ষে এই নারীমূর্তি দেখিয়া কুশ অর্দ্ধোত্থিত হইয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, 'কা ত্বং শুভে।' বিষাদময়ী নারী বলিলেন, তিনি অযোধ্যার অনাথ অধিদেবতা। অবাঙ্‌মুখে তিনি রামহীন অযোধ্যার সকরুণ অবস্থা বর্ণনা করিয়া কাতর ভাবে কুশকে কুল-রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ জানাইলেন। কুশের আগমনে শিবারাবে মুখর হতশ্রী অযোধ্যা আবার পূর্বশ্রী ফিরিয়া পাইল। (১৬শ সর্গ)।

সপ্তদশ সর্গে কুশ-পুত্র অতিথির রাজগৌরবের বর্ণনা। অষ্টাদশ সর্গে পর পর ২১ জন রাজার রেখাচিত্র ঃ নিষধ, নল, নভঃ. পুণ্ডরীক, ক্ষেমধন্বা, দেবানীক, অহীনগু পারিযাত্র, শিল, উন্নাভ, বজ্রনাভ, শঙ্খন, ব্যুষিতাশ্ব, বিশ্বসহ, হিরণ্যনাভ, কৌসল্য, ব্রহ্মিষ্ঠ. পুত্র, পুষ্য, ধ্রুবসন্ধি ও সুদর্শন। ঊনবিংশ সর্গ রাজা অগ্নিবর্ণের কাহিনী। ত্রিজগদ্বিদিত রঘুবংশ কি ভাবে শোচনীয় ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছিল, অগ্নিবর্ণের কামোন্মত্ত জীবন তাহার দৃষ্টান্ত। যে বংশের রাজগণ শুধু বংশরক্ষার জন্য গৃহমেধী হইতেন, সেই বংশের নৃপতি সচিবগণের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া 'স্ত্রীবিধেয়নবযৌবনোঽভবৎ'। অগ্নিবর্ণের কামক্ষুধা প্রচণ্ড, উদ্দাম বিলাস-বিহার। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল রাজযক্ষ্মা। বলিষ্ঠ অগ্নিবর্ণ তখন হীনবল—'সাবলম্বগমনা মৃদুস্বনা'। যে বংশের দীপ্তি ছিল রাকা চন্দ্রের মত, যাহার পূর্ণতা ছিল পূর্ণ জলাশয়ের মত, যাহার তেজ ছিল দীপ্তশিখ দীপাধারের মত—সেই কুল হইল ঃ

ব্যোম পশ্চিমকলাস্থিতেন্দু বা পঙ্কশেষমিব ঘর্মপল্বলম্।
রাজ্ঞি তৎকুলমভূৎ ক্ষয়াতুরে বামনার্চিরিব দীপ-ভাজনম্ ॥ [রঘু. ১৯.৫১)

অগ্নিবর্ণের মৃত্যু ও গোপনে রাজঅন্তঃপুরে নিভৃত চিতায় অগ্নিবর্ণের অন্ত্যেষ্টি বর্ণনা দ্বারা কবি কাব্য সমাপ্ত করিয়াছেন। এই সমাপ্তি অতি করুণ। কাব্যশেষে রঘুবংশের নূতন সম্ভাবনা সঙ্কেতিত হইলেও কারুণ্য অপনীত হয় নাই।

॥ বাল্মীকি ও কালিদাস ॥

রঘুবংশের আলোচনা প্রসঙ্গে 'আদ্য কবি' বাল্মীকির কথা স্বভাবতই মনে পড়ে। কালিদাস বাল্মীকির নিকট ঋণী। রূপবর্ণনায়, প্রকৃতি-বর্ণনায়, উপমাসৃষ্টিতে কালিদাস বহুস্থলে বাল্মীকিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। বাল্মীকির দশরথ 'বলবান্ নিহতামিত্রো মিত্রবান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ (রামা. বাল. ৬.৩). কালিদাসে পাই, 'সমাধি জিতেন্দ্রিয়ঃ' (রঘু. ৯.১) ; বাল্মীকির রাম 'কাক পক্ষধর' (বাল. ১৯.৯), কালিদাসের রামও 'কাক-পক্ষধর' (রঘু. ১১.১) ; বাল্মীকির সীতা 'অযোনিজা', 'বীর্য-শুল্কা' ('বীর্যশুল্কেতি মে কন্যা স্থাপিতেয়মযোনিজা'—বাল. ৬৬.১৫), কালিদাসের

সীতাও 'বীর্যশুল্কা', 'অযোনিজা' (১১.৪৭)। এমন কি, কালিদাসের কতকগুলি উক্তি বাল্মীকির উক্তির প্রতিলিপি। যথা,

১. শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা (বাল. ২.১৮)
শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শোকঃ (রঘু. ১৪.৭০)

২. দৃষ্টা মুনিগণাঃ সর্বে পার্থিবাশ্চ মহৌজসঃ।
পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভিঃ পশ্যন্তি স্ম মুহুর্মুহুঃ ॥
উচুঃ পরস্পরং চেদং সর্ব এব সমাহিতাঃ।
উভৌ রামস্য সদৃশৌ বিম্বাদ্বিম্বমিবোত্থিতৌ ॥ (উত্তর. ৯৪.১২-১৩)
বয়ো বেষবিসংবাদি রামস্য চ তয়োস্তদা।
জনতা প্রেক্ষ্য সাদৃশ্যং নাক্ষিকম্পং ব্যতিষ্ঠত ॥ (রঘু. ১৫.৬৭)

৩. মনসা কর্মনা বাচা যথা রামং সমর্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥ (উত্তর. ৯৭.১৫)
বাঙ্মনঃ কর্মভিঃ পত্যৌ ব্যভিচারো যথা ন মে।
তথা বিশ্বম্ভরে দেবি মামন্তর্ধাতুমর্হসি ॥ (রঘু. ১৫.৮১)

কিন্তু কালিদাস বাল্মীকির অধমর্ণ হইলেও কোন কোন স্থানে অধমর্ণের কল্পনা-চাতুর্য উত্তমর্ণ হইতেও চমকপ্রদ। রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গ সেই বিজয়ের স্বাক্ষর। বিমানযোগে রাম ও সীতার লংকা হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের যে রেখাচিত্র মাত্র বাল্মীকি অংকন করিয়াছেন, কালিদাস অদ্ভুত কবিত্ববলে তাহাকে পরিবর্ধিত করিয়া অতুলনীয় রূপ প্রদান করিয়াছেন। বাল্মীকি-রামাযণে সাগর, পাহাড় ও অরণ্যশ্রীর বর্ণনা রহিয়াছে কিষ্কিন্ধ্যা ও সুন্দরকাণ্ডে, কালিদাস সমুদ্র-পর্বত-অরণ্যের সেই শ্রী বর্ণনা করিয়াছেন রঘুর ত্রয়োদশ সর্গে। কালিদাসের এই বর্ণনা সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের গৌরব। বিমান হইতে দেখা যাইতেছে, তমাল-তালীবনশোভিত বলয়াকার বেলাভূমি, রামচন্দ্রের মুখে কবি তাহার বর্ণনা করিতেছেন,

দূরাদয়শ্চক্র-নিভস্য তন্বী তমালতালী বনরাজি নীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারা নিবদ্ধেব কলংকরেখা ॥ (রঘু. ১৩.১৫)

এই সর্গের প্রায় প্রতিটি প্রকৃতি বর্ণনাই স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে।

বাল্মীকি ও কালিদাসের প্রধান পার্থক্য যুগ-চেতনার দিক-হইতে। বাল্মীকি ও কালিদাস দুই কালের প্রতিভূ। উভয়ের কাব্যেই জনপদ-সভ্যতার বিবরণ আছে, উভয়েই মনুশাসিত ব্রাহ্মণ্য সমাজের চিত্র অংকন করিয়াছেন। তথাপি মনে হয়, বাল্মীকির সমগ্র কাব্যে আরণ্য সভ্যতার এক সহজ, শান্ত-শ্রী বিস্তৃত হইয়াছে। বাল্মীকির উপমানগুলিও অরণ্য-পরিবেশ হইতে সমাহৃত। বাল্মীকি শুধু নর-সমাজের চিত্রই অংকন করেন নাই, বানর সমাজের চিত্রও অংকন করিয়াছেন। তাঁহার যুগে সমাজ অরণ্য হইতে বহুদূরে সরিয়া যায় নাই। তাই সেই যুগের দৃষ্টিতেই কবির জীবন-দর্শন।

কালিদাস রাজসভায় বিদগ্ধ পণ্ডিত, নাগর সভ্যতার প্রতিভূ। নাগরিকের দৃষ্টি

লইয়া শ্রদ্ধা-বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তিনি বনভূমির সৌন্দর্য ও প্রশান্তিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। কালিদাসের কাব্যেও বনপ্রকৃতির অতি সুন্দর বর্ণনা আছে, কিন্তু তাহা নাগর কবির দৃষ্টিতে বিধৃত প্রকৃতি। কালিদাসের অলংকরণ, বর্ণনা-নৈপুণ্য ও প্রকৃতির বর্ণনায় মানবজীবনের গূঢ়ানুভূতির আরোপ নাগর ঐশ্বর্যের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করে। কালিদাসের উপমাগুলিও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে ও বহুশ্রুতত্বে সমুজ্জ্বল। তিনি কেবল বন-পাহাড় হইতে অপ্রস্তুত বিষয় সংগ্রহ করেন নাই, তাঁহার বিদগ্ধ মন সমভাবে জ্যোতিষ শাস্ত্র, জ্যোতিষ্ক লোক, যোগ-বেদান্ত, নীতি শাস্ত্র ও মানব গৃহের অতি সাধারণ প্রদীপখানি হইতেও উপাদান সংগ্রহ করিয়াছে। কালিদাসের যে-কোন বর্ণনায় বুদ্ধির প্রাখর্য, রাজসিক দীপ্ত ও নাগর কবিসুলভ চাতুর্য। বাল্মীকির বর্ণনায় সেখানে স্থির প্রজ্ঞার স্নিগ্ধতা ও সাত্ত্বিক প্রশান্তি। তাঁহার কাব্যে সারল্য ও অকৃত্রিমতার চিহ্ন। কালিদাসের যুগ ঔজ্জ্বল্য প্রকাশের যুগ, চাকচিক্যের যুগ, পরিপাটির যুগ। ভারতীয় জীবনে সৌন্দর্যচর্চা ও প্রেমচর্চা তখন সুপরিণত পদ্ধতিতে অনুশীলিত হইতেছে; রাজন্যবর্গের প্রতিটি কর্ম—দান, ধ্যান, প্রজানুরঞ্জন, বীরত্ব, রাজ্যশাসন, পারিপাট্যের চিহ্ন বহন করে। প্রতিটি কর্ম সৌন্দর্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কালিদাস এই যুগের কবি। তিনি প্রধানতঃ অনুশীলিত প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি। বিক্রমাদিত্যের কালে কাব্য-মণ্ডলে আদিত্যবিক্রম কালিদাস। তাই তাঁহার বর্ণনায় পরিপাটি বর্ণনার ছাপ।

আরও কয়েকটি দিক হইতে বাল্মীক ও কালিদাসের স্বাতন্ত্র্য বর্তমান। বাল্মীকির কাব্যে যত বিচিত্র চরিত্রের জীব আসিয়া ভিড় করিয়াছে, কালিদাসে সে চরিত্র-বৈচিত্র্যের অভাব। কালিদাসের গণ্ডী সীমাবদ্ধ। কালিদাসে কোন কুটিল চরিত্র নাই। প্রেম ও সৌন্দর্যের দৃষ্টিতে জগতকে সন্দর্শন করার ফলে কবি বুঝি কুটিলতার জগতটিকে দেখিতে পান নাই। বাল্মীকির দৃষ্টি সেখানে সমগ্রতাকে খুঁজিয়া ফিরিয়াছে। বাল্মীকি ভালরও কবি, মন্দেরও কবি—সুন্দরেরও কবি, ভয়ঙ্কর-বীভৎসতারও কবি। বাল্মীকি সমগ্রতাকে খুঁজিয়াছেন বলিয়াই ধীর ও মন্থর। কাব্যের গতিও ধীর ও মন্থর, যেন গজেন্দ্র-গতি। কিন্তু কালিদাসের কাব্যের গতি অতি দ্রুত, যেন ভুজঙ্গগতি। দুই কবির এই বিশিষ্টতাও দুই যুগের বিশিষ্টতাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কালিদাসে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন অতি স্পষ্ট।

॥ কালিদাসের ঋণ ও মৌলিকতা ॥

বাল্মীকি-রামায়ণই 'রঘুবংশম্' কাব্যের একমাত্র উৎস নয়। গ্রন্থারম্ভে কবি স্বীকার করিয়াছেন, তিনি পূর্বসূরীদের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়াছেন। উত্তমর্ণ বহুবচনান্ত ['পূর্বসূরিভিঃ']। মনে হয়, উত্তমর্ণ আরও ছিলেন। বাল্মীকি মাত্র রামচরিতের কবি ['বৃত্তং রামস্য বাল্মীকেঃ কৃতিঃ'—রঘু. ১৫.৬৪]; রঘুবংশের বিষয় আরও ব্যাপক, সমগ্র রঘুবংশ। রঘুবংশের বিবরণ ইতস্ততঃ হরিবংশে ও

পুরাণে ছড়ানো আছে। কালিদাস সে সমস্ত উৎস হইতেও ঋণ সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। বাল্মীকি-রামায়ণে অজ-পূর্ব রাজগণের যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে [বাল, ৭০.৩৮-৪৩] কালিদাস তাহার অনুসরণ করেন নাই। সম্ভবতঃ এবিষয়ে কালিদাসের উৎস হরিবংশে প্রদত্ত সূর্যবংশের তালিকা [হরি-হরি. ১৫.২৫-২৬]।

কুশের পরবর্তী রাজগণের প্রসঙ্গ বাল্মীকি-রামায়ণে নাই। কুশোত্তর সূর্যবংশের তালিকা পাওয়া যায় হরিবংশে, বায়ুপুরাণে [৮৮ অঃ], মৎসপুরাণে [১২শ অঃ] এবং বিষ্ণুপুরাণে [৪র্থ অংশ ৪র্থ অঃ]। মনে হয়, এ বিষয়ে কালিদাসের উত্তমর্ণ হরিবংশ ও অন্যান্য পুরাণ।

কিন্তু হরিবংশে বা পুরাণে সূর্যবংশের তালিকা থাকিলেও রাজগণেব জীবন বা কীর্তিকাহিনীর কোন বর্ণনা নাই। ভাসের 'প্রতিমা' নাটকে দেবকুলিক-প্রদত্ত প্রতিমা-গুলির পরিচয় প্রসঙ্গে দিলীপ, রঘু ও অজের কোন-কোন কীর্তির উল্লেখ বীজাকারে পাওয়া যায়। যেমন, দিলীপ 'বিশ্বজিতো যজ্ঞস্য প্রবর্তয়িতা', অজ 'প্রিয়া বিযোগ-নির্বেদপরিত্যক্তরাজ্যভারঃ' [৩ অঙ্ক] ইত্যাদি।

ভাস কালিদাসের পূর্ববর্তী। হইতে পারে, কালিদাস ভাসের কাহিনী-বীজ-গুলিকে বিস্তৃত করিয়াছেন। কিংবা এমনও হইতে পারে, প্রসিদ্ধ সূর্যবংশের বৃত্তান্ত লইয়া সুপ্রাচীন কাল হইতে যে-সকল কাহিনী লোকপরম্পরায় প্রচলিত ছিল, কবি-গণ কাব্য রচনায় রামায়ণ ব্যতিরিক্ত সেই কাহিনী অবলম্বন করিতেন। কালিদাসও সেই সূত্রে জনশ্রুতি হইতে দিলীপের অশ্বমেধ যজ্ঞ, রঘুর দিগ্বিজয় ও বিশ্বজিৎযজ্ঞ এবং অজ-ইন্দুমতীর কাহিনীগুলি গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। কোন কোন আখ্যান কালিদাসের নিজস্বও হইতে পারে। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—১. দিলীপের অপুত্রকত্বের কারণ সুরভীগাভীর প্রতি অবহেলা, (১ম সর্গ), ২. পুত্রলাভার্থ দিলীপের নন্দিনী-পরিচর্যা ও মায়াসিংহেব বিবরণ (২য় সর্গ), ৩. মতঙ্গের অভিশাপে মাতঙ্গরূপধারী গন্ধর্বের নিকট অজের গান্ধর্ব অস্ত্র লাভ (৫ম সর্গ), ৪. ঋষি তৃণ-বিন্দুর অভিশাপে হরিণী-নামা সুরকামিনীর ইন্দুমতীরূপে জন্মগ্রহণ (৮ম সর্গ), ৫. দশরথের চরুবণ্টন পদ্ধতি, অর্থাৎ চরুর অর্ধার্ধ ভাগ কৌশল্যার ও কৈকেয়ীকে প্রদান এবং কৌশল্যা-কৈকেয়ী হইতে সুমিত্রার ভাগ প্রাপ্তি (১০ম সর্গ),[১] ৬. রামের জন্মক্ষণে রাবণের কিরীট মস্তকচ্যুত হওয়া ('দশাননকিরীটেভ্যস্তৎক্ষণং রাক্ষসশ্রিয়ঃ। মণিব্যাজেন পর্যস্তাঃ পৃথিব্যামশ্রুবিন্দবঃ ॥' রঘু. ১০. ৭৫), ৭. কুশাবতী নগরে অর্ধরাত্রে কুশের স্বপ্ন ও নাগকন্যা কুমুদ্বতীকে পত্নীরূপে গ্রহণ (১৬শ সর্গ), ৮. জৈমিনীর নিকট রাজা পুষ্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ (১৮শ সর্গ) এবং ৯ অগ্নিবর্ণের কাম-ক্ষুধা ও যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হওয়ার বিবরণ।

কিন্তু উপকরণ যেখানকারই হউক, বর্ণনা কালিদাসের নিজস্ব। পুরাণের

---

১. বাল্মীকি-রামায়ণ নয়, অধ্যাত্ম রামায়ণের বর্ণনার সহিত, এবিষয়ে কালিদাসের মিল আছে (অধ্যাত্ম, ৩.১২-১৪)।

নির্জীব তালিকা কালিদাসে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং পুরাণের অনলঙ্কৃত বিবৃতি কালিদাসের মণ্ডন-নৈপুণ্যের স্পর্শে অভিনব রূপসজ্জায় বিভূষিত হইয়াছে।

অশ্বঘোষের বর্ণনার সহিত কোন কোন স্থলে কালিদাসের বর্ণনার সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সুন্দর পুরুষ-দর্শনার্থ পুরসুন্দরীদের বিচেষ্টা (বুদ্ধ. চ. ৩.১৩ ; রঘু. ৭.৫) উভয় কবিতেই প্রায় এক প্রকার। পরম্পরাগত এ ঋণ কাব্যজগতে অনুমোদিত। তাহাদ্বারা কালিদাসের মৌলিকতা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

॥ উপমা কালিদাসস্য ॥

'উপমা কালিদাসস্য' একটি বহুখ্যাত লোকশ্রুতি। ইহার অর্থ এ নয় যে, কালিদাস বহু উপমা সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার অর্থ—উপমা সৃষ্টিতে কালিদাস অনুপম। এখানে 'উপমা' বলিতেও শুধু পূর্ণোপমা, লুপ্তোপমা বা মালোপমা বুঝায় না, বুঝায় রূপক, অতিশয়োক্তি, উৎপেক্ষা, দৃষ্টান্ত, প্রতিবস্তূপমা নামক যাবতীয় ঔপম্যগর্ভ অলঙ্কার। এইদিক হইতে 'উপমা' অলঙ্কাররাজ্যের রাজা। সমগ্র অলঙ্কারের অর্ধেকেরও বেশি ঔপম্যবচন, এমন কি বৈসাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারেরও সার্থকতা উপমার বৈষম্য প্রদর্শনে। কবি কালিদাস এই উপমানির্মাণে নিপুণ শিল্পী।

উপমার সৌন্দর্য নির্ভর করে, উপমান বা অপ্রস্তুত বিষয়ের চমৎকারিত্বে। অপ্রস্তুত বিষয়টিই প্রস্তুত বিষয়কে সুস্পষ্ট, সুন্দর ও ব্যঞ্জনাময় করিয়া তুলে। কবি-কল্পনার চাতুর্য ও স্ফূর্তিও প্রকাশ পায় অপ্রস্তুত বিষয়াহরণে। প্রস্তুত তো প্রত্যক্ষ, হাতের কাছেই আছে—কিন্তু তাহাকে পাঠকহৃদয়ে সঞ্চার করিয়া দিবার জন্য প্রয়োজন যে অপ্রস্তুত বিষয়, তাহা হাতের কাছে থাকে না, তাহাকে হাতড়াইয়া বাহির করিতে হয়। তাই অপ্রস্তুত বিষয়-চয়নের উদ্দেশ্যে কবি-কল্পনার বিশ্বাভিসার।

যে কবির অভিজ্ঞতা বহুদর্শনে ও ভূয়োদর্শনে যত প্রবৃদ্ধ, যাঁহার জ্ঞানের পরিধি যত বহুবিস্তৃত এবং যাঁহার দৃষ্টি-শক্তি যত প্রখর, মর্মভেদী ও দূরসঞ্চারী—উপমাসৃষ্টিতে তাঁহার তত অধিকার। কিন্তু অধিকার থাকিলেই সৃষ্টিনৈপুণ্য অর্জন করা যায় না। তাহার জন্য প্রয়োজন ঔচিত্যবোধ, রুচিবোধ ও সৌন্দর্যবোধ ; তাহার জন্য প্রয়োজন নির্বাচন ও প্রয়োজনদক্ষতা, প্রয়োজন মননের গভীরতা। উপমাসৃষ্টিতে কালিদাস এই সকল গুণের অধিকারী।

কালিদাসের দৃষ্টি স্বর্গ-মর্ত-বিহারী। সভ্যতা ও সৌন্দর্য সমৃদ্ধির দিক হইতে যে যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে যুগটিও ছিল প্রাগ্রসর। তখন ভারতবর্ষের পুনর্জাগরণের যুগ। হিন্দুসভ্যতার তখন দিকে দিকে বিজয় যাত্রা। শ্রুতি ও স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্র, দর্শন, গান্ধর্ববিদ্যা—এককথায় অষ্টাদশ বিদ্যা ও চতুঃষষ্টিকলার চর্চা তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। কালিদাস সেই যুগের সরস্বতীর বরপুত্র—অসাধারণ তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বহুদর্শিতা, অপরিমেয় ধীশক্তি ও সূক্ষ্মদর্শিতা। কালিদাসের উপমান তাই অশেষ বৈদগ্ধ্যের পরিচায়ক।

গাভীর পশ্চাতে রাণী চলেন, 'শ্রুতেরিবার্থং স্মৃতিরন্বগচ্ছৎ' (যেন শ্রুত্যর্থের অনুগামিনী স্মৃতি—রঘু. ২.২) ; পার্বতী পরমেশ্বরের অবিনাবন্ধ যোগকে তিনি মনে করেন 'বাগর্থাবিবসম্পৃক্তৌ' (শব্দ ও অর্থের নিত্য সম্বন্ধের ন্যায়—রঘু. ১.১) বরবধূর সমাগম তাঁহার নিকট প্রকৃতি-প্রত্যয় যোগের অনুরূপ ['বরবধূসমাগমঃ প্রত্যয়-প্রকৃতি-যোগসন্নিভঃ'—রঘু ১১.৫৬] ; রাজা ও রাণীর মিলন যেন শিশিরা-বসানে চিত্রা-চন্দ্রমা-যোগ ['হিমনির্মুক্তয়ো র্যোগে চিত্রাচন্দ্রমসোরিব'—রঘু. ১.৪৬]। পৌরাণিক উপমাগুলিও অশেষ বৈচিত্র্য-মণ্ডিত, যেমন, রাজ্ঞী সুদক্ষিণার দিলীপ-নিহিত তেজ ধারণ প্রসঙ্গে এই উপমাটি ঃ

নয়ন সমুত্থং জ্যোতিরত্রেরিব দ্যৌঃ
সুরসরিদিব তেজোবহ্নিনিষ্ঠ্যুতমৈশম্ । [রঘু. ২.৭৫]

—আকাশ যেমন অত্রিমুনির নয়নোত্থ তেজ ধারণ করে, সুরসরিৎ যেমন অগ্নি-নিহিত ঐশ তেজ ধারণ করে।

এই সকল উপমায় কালিদাসের বহুশ্রুতত্বের পরিচয়। কিন্তু কালিদাসের বিদগ্ধ হৃদয় কেবল শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-জ্যোতিষের রাজ্যেই বিচরণ করে নাই, তাঁহার সূক্ষ্ম-দৃষ্টি ঘরের ক্ষুদ্র প্রদীপখানির উপরও পতিত হইয়াছে। প্রদীপকে ভিত্তি করিয়া তিনি কয়েকটি অতি সুন্দর উপমা সৃষ্টি করিয়াছেন। হিমপ্রস্থের ওষধিলতা স্বয়ং সুরত-প্রদীপ ['ভবন্তি যত্রৌষধয়ো রজন্যামতৈলপূরাঃ সুরতপ্রদীপাঃ'—কুমার. ১.১০] উমাদ্বারা হিমালয় উদ্ভাসিত যেন মহতী-শিখাদ্বারা উদ্ভাসিত দীপ ['প্রভা মহত্যা শিখয়েব দীপঃ'—কু. ১.২৮] ; বাসুকী প্রমুখ নাগের শিখামণিগুলি তারকের সেবা করে স্থির প্রদীপের ন্যায় ['স্থির প্রদীপতামেতা ভুজঙ্গাঃ পর্যুপাসতে'—কু. ২.৩৮]; যোগমগ্ন নিশ্চল মহাদেব যেন 'নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্' [কু. ৩.৪৮]। তাহা ছাড়া 'দীপ ইবানিলহতঃ' [কু. ৪.৩০], 'প্রবর্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ' (দীপ হইতে জ্বালা অন্য একটি প্রদীপ—রঘু. ৫.৩৭), 'সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ' (রঘু. ৬.৬৭) প্রভৃতি উপমাও সুন্দর ; সর্বাপেক্ষা সুন্দর ইন্দুমতীর পতনে পতিত অজের অবস্থা প্রকাশে দীপাশ্রিত এই উপমাটি ঃ

বপুষা করণোজ্ঝিতেন সা নিপতন্তী পতিমপ্যপাতয়ৎ।
ননু তৈলনিষেক বিন্দুনা সহ দীপার্চিরুপৈতি মেদিনীম্ ॥ (রঘু. ৮.৩৮)

—প্রজ্জলিত দীপাশিখা হইতে একবিন্দু তেল ক্ষরিত হইলে যেমন তাহার সঙ্গে দীপার্চি ভূতলে পতিত হয়, তেমনই ইন্দুমতীর পতন অজকেও ভূমিতে পাতিত করিল।

উপমা সৃষ্টিতে নিসর্গ জগৎ একটি সমৃদ্ধ উৎস, আর কবি কালিদাসের নিকট এই উৎস-দ্বার চির উন্মুক্ত। বন, পাহাড়, সিন্ধু—দূর আকাশের সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র—অন্তরীক্ষলোকের মেঘ ও বিদ্যুৎ কালিদাসের মর্মসহচর। অবশ্য উপমা-রচনায় নিসর্গ লোক চিরকালের সাধারণ ভাণ্ডার। পদ্মানন, নীলেন্দীবর নয়ন, চন্দ্রকান্তি, চমরী-কেশ, চরণ-সরোজ প্রভৃতি রূপকোপমা চিরাগত। আবার সূর্য-কমলের প্রেম, চন্দ্র-

কমলিনীর সম্পর্ক, বৃক্ষ-ব্রততীর আশ্রয়াশ্রিত ভাব, সাগর-সরিতের দাম্পত্য এবং মেঘ-বিদ্যুতের প্রণয়—এগুলিও চিরকালের কবি-প্রসিদ্ধি। কালিদাসের বহু উপমা এই সকল কবি-প্রসিদ্ধির অনুসারী। মেঘদূতের বিখ্যাত উপমা 'সূর্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বামভিখ্যাম্' (সূর্যের অভাবে কমল শোভা ধারণ করে না—উ. মে. ১১৯), 'সাভ্রেঽহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্ (মেঘাবৃত দিবসে না-ফোটা, না-বোজা স্থলকমলিনীর ন্যায়—উ. মে. ২৯)। তেমনই রঘুর 'কুমুদ্বতী ভানুমতীব ভাবম্' (৬.৩৬), 'শশীব পর্যাপ্তকলো নলিন্যাঃ' (৬.৪৪), 'দিবাকরাদর্শন বদ্ধকোশে নক্ষত্রনাথাংশুরিবারবিন্দে' (৬.৬৬) প্রভৃতি। কিন্তু ভাব পুরাতন হইলেও কালিদাসের কবিপ্রতিভায় ইহাদের প্রকাশ নূতন। প্রেমের কবির প্রেমের দৃষ্টিতে নিসর্গ জগতের উপমানগুলিও জীবন্ত প্রেমিক হইয়া উঠিয়াছে—সম্ভোগে-বিপ্রলম্ভে তাহাদের বহুবিচিত্র রূপ।

সর্বাপেক্ষা বড় কথা, কালিদাসের নৈসর্গিক উপমায় মানুষ ও প্রকৃতি একাকার—মানুষে ও প্রকৃতিতে নিত্য রূপ-বিনিময় ও ভাববিনিময়। রামায়ণেও অনুরূপ উপমা আছে, তবু 'অন্যোন্য শোভাজননাদ্ বভূব সাধারণো ভূষণ-ভূষ্যভাবঃ'—কালিদাসের নিসর্গ-উপমার ইহাই যেন মূল কথা। এইজন্য শকুন্তলা বন-প্রকৃতি হইতে অভিন্ন, উমার দেহশোভা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দ্বিতীয় প্রতিরূপ—যৌবনোদ্ভিন্ন দেহ 'সূর্যাংশু ভিন্নমিবারবিন্দম্', চরণ 'স্থলারবিন্দশ্রী', বাহু শিরীষপুষ্পাধিক সুকুমার; যক্ষ 'ব্যতিরেক' আশ্রয়ে প্রিয়ার সাদৃশ্য দেখেন প্রকৃতিতে ঃ

> শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণী প্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
> বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
> উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
> হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি। সাদৃশ্যমস্তি ॥ (উ. মে. ৪৩)

—শ্যামালতায় অঙ্গ, হরিণের চকিত দৃষ্টিতে দৃষ্টি, চন্দ্রে মুখছায়া, শিখী-কলাপে কেশ-শোভা, নদীর বীচিভঙ্গে ভ্রূবিলাস, হায় চণ্ডি। কোথাও তোমার সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাই না।

কালিদাসে উপমান ও উপমেয়ে এই ভূষণ-ভূষ্য ভাবের আধিক্য।

একই নিসর্গোপমানকে কালিদাস ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সহিত উপমিত করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ চন্দ্রোদয়ে স্ফীত সাগরের উপমানটির কথাই ধরা যাইতেছে। কুমারসম্ভবে দেখি মদনের বাণ-যোজনায়, উমা মুখ দর্শনে 'হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্ত ধৈর্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ' (কু. ৩.৬৭), আবার বিবাহস্থলেও দেখি, অন্তঃপুররক্ষকগণ হরকে উমাসমীপে লইয়া গেলেন—'বেলাসমীপং স্ফুটফেন-রাজির্নবৈরুদন্বানিব চন্দ্রপাদৈঃ' (কু. ৩.৭৩ ; র. ৭.১৯)। রঘুতে রঘুর জন্মের পর নবজাত পুত্রকে দেখিয়া দিলীপেরও 'মহোদধেঃ পূর ইবেন্দু দর্শনাদ্ গুরুঃ প্রহর্ষঃ প্রবভূব' (র. ৩.১৭), আবার অজকে অভ্যর্থনা করিতে গিয়া বিদর্ভরাজ ভোজেরও আনন্দোদ্বেল অবস্থা—'প্রত্যুজ্জগাম ক্রথকৈশিকেন্দ্রশ্চন্দ্রং প্রবৃদ্ধোর্মিরিবোর্মিমালী'

(র. ৫.৬১)। প্রেম বা বাৎসল্যের উচ্ছ্বসিত অবস্থার পরিস্ফুটনেই একই উপমান আশ্চর্য চমৎকার ভাবের অভিব্যঞ্জক হইয়া উঠিয়াছে।

কালিদাসের রচনার প্রধান গৌরব রসানুকূল উপমাসৃষ্টিতে। প্রায় প্রত্যেকটি উপমা কোন-না-কোন রসের পরিপোষক। যেমন,

(i) শৃঙ্গারজনিত কম্পস্বেদাকুলিত উমার এই স্তম্ভিত মূর্তি :

তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টির্নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতমুদ্বহন্তী।
মার্গাচল ব্যতিকরা কুলিতেব সিন্ধুঃ শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ ॥
(কু. ৫.৮৫)

—প্রিয়তমকে সম্মুখে দেখিয়া উমা স্তম্ভিতা। অথচ ক্ষণকাল পূর্বে বিপ্রিয় বাণী শ্রবণে এই উমাই ছিলেন উপান্তলোহিতনয়না, স্ফুরিতাধরা। ক্রোধবশতঃ গমনোদ্যত হইয়া তিনি চরণ উত্তোলন করিয়াছেন সহসা সম্মুখে প্রিয়তমের আবির্ভাব। ফলে উমার যেন শৈলে প্রতিহত বহতা নদীর 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা ; গতি রুদ্ধ, কিন্তু হৃদয় উচ্ছ্বসিত। এখানে উপমার বস্তুটিই উমার শৃঙ্গারানুভাব-বিভূষিতা মূর্তিটিকে ব্যঞ্জনাময় করিয়া তুলিয়াছে।

(ii) কিংবা অকাল বসন্তের আবির্ভাবে বনপ্রকৃতি ও তির্যক যোনিতে শৃঙ্গার-চেষ্টার অতিচাঞ্চল্যের ভিতর রুদ্ধশ্বাস মহাদেবের এই ধ্যানগম্ভীর প্রশান্ত মূর্তিটি :

অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহমপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্ ॥ (কু. ৩.৪৮)

—এখানে তিনটি উপমার মালা : জলহীন মেঘের মত, অনুত্তরঙ্গ সাগরের মত, নিবাতস্থানে রক্ষিত নিষ্কম্প প্রদীপের মত। প্রাণায়ামে নিরুদ্ধশ্বাস স্থাণুর সুকঠিন স্থাণুত্বের দ্যোতনায় প্রত্যেকটি উপমান ধীর-গম্ভীর প্রশান্তির অনুকূল।

(iii) কিংবা ভয়াল অবস্থার অভিব্যঞ্জনায় তাড়কা রাক্ষসীর এই মূর্তি,—

জ্যা-নিনাদমথ গৃহ্নতীতয়োঃ প্রাদুরাস বহুল ক্ষপাছবিঃ।
তাড়কা চলকপালকুণ্ডলা কালিকেব নিবিড়া বলাকিনী ॥ (রঘু. ১১.১৫)

—রাম-লক্ষ্মণ ধনুতে জ্যা আরোপ করিয়াছেন। জ্যা-নির্ঘোষ শ্রবণমাত্র তাড়কা আসিয়া উপস্থিত। তাড়কা ভয়ংকরী হইলেও নারী। কোমলতায় এই ভয়ঙ্করত্বের আভাস ফুটিয়াছে উপমাটিতে : সে যেন চলন্ত বলাকাযুক্ত নিবিড় কৃষ্ণ একখানি মেঘ।

কালিদাসের সমগ্র রচনায় যে বস্তুটি সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা 'বিশেষ লাবণ্য'। এই 'লাবণ্য'ই কালিদাসীয় রচনার প্রাণ। পর্বতনন্দিনী উমার সৌন্দর্য বর্ণনায় তিনি বলিয়াছিলেন, উমার দেহ 'পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষান্' ; কালিদাসের রচনাও 'পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষান্'। উপমাতেও এই লাবণ্য বিশেষের প্রকাশ। উপমা হয়তো অনেকেই সৃষ্টি করেন। তাহা বহিরঙ্গ আভরণের মত কাব্য-শোভাকর হয়, লাবণ্য হইয়া উঠে না। কালিদাসের উপমার লাবণ্য যেন স্বর্ণলতার আত্মভাস। এ লাবণ্য বাহিরের নেপথ্য-বিধান মাত্র নয়, কাব্যের অঙ্গভূত মাধুর্য। ইহা কৃত্রিম নয়, স্বতঃস্ফূর্ত। কালিদাসের ভাষাতেই বলা চলে, শরৎকালে হংসমালা

যেমন আপনিই আসিয়া গঙ্গায় মিলিত হয় ('হংসমালা শরদীব গঙ্গাং') অথবা রাত্রি-কালে যেমন আলোকলতায় স্বভাবতই জ্যোতির স্ফুরণ ঘটে ('মহৌষধিং নক্তমিবাত্মভাসঃ'), তেমনই কালিদাসীয় রচনায় উপমার স্ফূর্তি।

এই লাবণ্যের শক্তি নিহিত রহিয়াছে ভাবানুকূল শব্দ ও ধ্বনি যোজনার নৈপুণ্যে। আলংকারিকগণ একদিন 'বৃত্তি' নামক এক রসানুকূল বাগ্‌ভঙ্গির কল্পনা করিয়াছিলেন। বৃত্তিগুলি 'পরুষা' (রৌদ্রাদিরসের), 'গ্রাম্যা' (কোমল ভাবের) এবং 'উপনাগরিকা' (শৃঙ্গারাদি রসের) ভেদে তিন প্রকার। ভাব ভেদে এই বৃত্তির প্রয়োগেই কালিদাসের রচনার লাবণ্য। উপমাসৃষ্টিতেও এই বৃত্তির সুষ্ঠু প্রয়োগ লক্ষণীয় ঃ

(i) দিনে দিনে পার্বতী পরিবর্ধিত হইতেছেন। 'সর্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়ে' পার্বতীর রূপ-কল্পনা। তাঁহার বৃদ্ধি কলাক্রমে বর্ধিত চন্দ্রলেখার মত, যেন 'লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা'। এখানে তরল তালব্য ধ্বনির সমাবেশে পরিবর্ধমানা বালিকা উমার লাবণ্য যেন তরলিত চন্দ্রিকার মত ক্রমে উপচাইয়া পড়িতেছে।

(ii) তেমনই পুষ্পাভরণে সজ্জিতা উমার 'সঞ্চারিণী-পল্লবিনী লতেব' ছবিখানি। পল্লবিনী লতা মৃদু সমীরণেও দোদুল্যমানা। ধ্বনিগুলিই এখানে দোলা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে।

(iii) তনুক্ষীণতার দুইটি উপমা—মেঘদূতের বিরহিণী যক্ষপ্রিয়া—'প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ', আর দোহদলক্ষণান্বিতা বিশীর্ণা সুদক্ষিণা—'তনু প্রকাশেন বিচেয়তারকা প্রভাতকল্পা শশিনেব শর্বরী' (রঘু. ৩.২)। উভয় ক্ষেত্রেই 'শ' ধ্বনির অস্পষ্ট শিশ্ এই ক্ষীণতার দ্যোতনা সৃষ্টি করিয়াছে।

(iv) যুদ্ধ বর্ণনায় 'স', 'র', 'হ' প্রভৃতি বহ্নি-বর্ণগুলির উপযোগিতা। রৌদ্রাদি দীপ্ত রসের উপমাসৃষ্টিতে কালিদাসে ইহাদের অমোঘ প্রয়োগ ঃ যেমন,

'রণক্ষিতিঃ শোণিতমদ্যকুল্যা ররাজ মৃত্যোরিব পানভূমিঃ' (রঘু. ৭.৪৯)

অভিজ্ঞতার বহুব্যাপকতায়, মননের গভীরতায়, বাচ্য ও বাচকের অবিনাবন্ধ যোগে, প্রকৃতির সহিত মানুষের একাত্মতায়, রসানুকূল উপমান চয়নে এবং ভাবানুসারী ধ্বনির সংযোজনে 'উপমা কালিদাসস্য' কাব্যজগতের অনুপম সামগ্রী।

॥ ভারবি ॥

কালিদাসের পরবর্তী কবিগণের ভিতর ভারবি বহুখ্যাত। Aihole Inscription-এ ভারবির নাম কালিদাসের সহিত একসঙ্গে গ্রথিত হইয়াছে ঃ 'কবিতাশ্রিত কালিদাসভারবিকীর্তিঃ'। Aihole Inscription খোদিত হয় ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ('পঞ্চাশৎসু কলৌ কালে ষট্‌সু পঞ্চাশৎসু চ'=৫৫৬ শকাব্দ)। Keith সাহেব মনে করেন, ভারবির কাব্যের রচনাকাল 550 খ্রীষ্টাব্দ।

ভারবির পরিচয় জনশ্রুতি-নির্ভর। তাঁহার কাব্যে ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমার

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের বর্ণনা দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন, তিনি 'পূর্বঘাট' অঞ্চলের কবি। ভারবি কৌশিক গোত্রীয় শৈব ব্রাহ্মণ।

ভারবির কাব্যের নাম 'কিরাতার্জুনীয়ম্'। একটি তীরবিদ্ধ বরাহকে কেন্দ্র করিয়া কিরাতবেশী মহাদেব ও মধ্যম পাণ্ডব অর্জুনের যে যুদ্ধ, তাহারই পূর্বাপর বর্ণনা কিরাতার্জুনীয় কাব্য। ইহা অষ্টাদশ সর্গে বিভক্ত। দ্বৈতবনে যুধিষ্ঠির-প্রেরিত দূত-সংবাদ লইয়া এই কাব্যের আরম্ভ। দূত আসিয়া দুর্যোধনের ঐশ্বর্য, রাজকর্ম ও দয়াদাক্ষিণ্যের কথা বিবৃত করিল। দ্রৌপদী ও অনুজগণের নিকট যুধিষ্ঠির এই সংবাদ বলিলে দ্রৌপদী ক্ষুব্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরের ক্ষমাধর্ম ও সহিষ্ণুতাকে অতি তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করিলেন। যুধিষ্ঠির বুঝিলেন, তাঁহাকে মহাযুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইবে। অর্জুন তাঁহার ভরসাস্থল। ব্যাসদেবের নির্দেশে তিনি অর্জুনকে দিব্য অস্ত্র লাভের জন্য তপস্যায় প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্র অর্জুনকে পাশুপত অস্ত্র লাভের নিমিত্ত উদ্যোগী হইতে নির্দেশ দিলেন। অর্জুন ইন্দ্রকীল পর্বতে যখন শিবারাধনায় নিযুক্ত, তখন একদিন এক ভীষণ দর্শন বরাহ ['স্থির দংষ্ট্রোগ্র মুখ'] তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। উহাকে মুনিব্রতের মূর্তিমান্ বিঘ্ন শংকা করিয়া অর্জুন একটি উপলব্ধগুণ শুদ্ধ বাণ উহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ঠিক সেই সময়ে আর একটি শর বরাহদেহে বিদ্ধ হইল। বরাহ রক্তাক্ত কলেবরে প্রচণ্ড শব্দ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে অর্জুন নিজের বাণ সংগ্রহ করিতে যাইবেন, এমন সময় এক কিরাত আসিয়া বলিল, এ বাণ তাঁহার প্রভুর। কথায় কথায় কলহের সূচনা হইল। কিরাতবেশী মহাদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অর্জুনের বীরত্বে তুষ্ট হইয়া মহাদেব স্বমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া অর্জুনকে দিব্য পাশুপত অস্ত্র দান করিয়া তাঁহাকে তাহার ধারণ, মোক্ষণ ও সংহার-কৌশল শিখাইয়া দিলেন। শৈবঅস্ত্রে শক্তিমান্ সিদ্ধকাম অর্জুন দ্বৈতবনে যুধিষ্ঠিরের নিকট ফিরিয়া আসিলেন।

কেহ কেহ মনে করেন, কিরাতের বিষয়বস্তু লেপ্‌চা-ভুটিয়া প্রভৃতি কিরাত জাতির মধ্যে প্রচলিত লোককথা হইতে সংগৃহীত।[১] কিন্তু ভারবির কাহিনী যে মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত কৈরাতপর্ব [বন. ২৪-৩৫] হইতে গৃহীত, তাহাতে দ্বিমতের অবকাশ নাই। ভারবির বর্ণনা ও সংলাপেও মহাভারতের প্রভাব আছে। তবে মহাভারতে যাহা রেখা, ভারবিতে তাহা বর্ণাঢ্য চিত্র।

কিরাতার্জুনীয় অলংকারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য। ইহা সর্গবন্ধে রচিত, সর্গসংখ্যা আটের অধিক অর্থাৎ অষ্টাদশ। কাব্যের নায়ক সদ্বংশজাত ক্ষাত্রবীর অর্জুন। ইহার অঙ্গী রস বীররস, তাহার সহিত শান্ত রস অঙ্গভাবে যুক্ত। এই কাব্যের আরম্ভ বস্তু-নির্দেশ দিয়া ঃ

শ্রিয়ঃ কুরূণামধিপস্য পালনীং
প্রজাসু বৃত্তিং যমযুঙ্ক্ত বেদিতুম্।

১. Journal Buddhist Text Society of India Pt. III, 1896.

স বর্ণলিঙ্গী বিদিতঃ সমাযযৌ
যুধিষ্ঠিরং দ্বৈতবনে বনেচরঃ ॥ [কিরাত. ১.১]

—কুরুরাজ প্রজাগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন—ইহা জানিবার জন্য যুধিষ্ঠির যে দূতকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ব্রাহ্মণবেশী সেই বনেচর দূত সকল সংবাদ বিদিত হইয়া দ্বৈতবনে যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন।

ভারবির কাব্য শুধু অলংকারশাস্ত্রসম্মত নয়, উহা অলংকারাঢ্য। কথায় বলে, 'ভারবেরর্থগৌরবম্'। একই শব্দকে ভিন্নার্থে কত ভাবে কাব্যে প্রয়োগ করা যায়, ভারবি সুকৌশলে তাঁহার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। 'বিষমৈকপদে'র বন্ধনে গ্রথিত এই কাব্যবন্ধ দীপ্ত পাণ্ডিত্যের প্রদীপ্ত স্বাক্ষর।

কিন্তু এই অর্থের গৌরব ও পাণ্ডিত্যের দীপ্তি কাব্যের দোষেও পরিণত হইয়াছে। ভারবির কঠিন ভাষা, অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ এবং অলংকার-বাহুল্য বহুস্থলে রসের পরিপন্থী। যেন কেহ শাণিত কৃপাণ হস্তে রসের দ্বারে প্রহরী সাজিয়া বসিয়াছে।

তথাপি স্বীকার করিতে হইবে, ভারবি শক্তিমান্ কবি। টীকাকার মল্লিনাথ বলেন, ভারবির কাব্যও 'রসগর্ভ'—'নারিকেলফল সম্মিতং বচো ভারবেঃ'। নারিকেলের কঠিন বহিরাবরণ উন্মোচন করিয়া যেমন নারিকেলের রস গ্রহণ করিতে হয়, তেমনই বিষমৈক পদের বন্ধন উন্মোচন করিয়া কিরাতার্জুন কাব্যের রসের আস্বাদ লইতে হয়। ভারবির ভাষা, অলংকার ও পাণ্ডিত্য সর্বত্রই রসের পরিপন্থী হয় নাই; কোথাও উহা রসসৃষ্টির অনুকূলে 'অপৃথগ্ যত্নে নির্বর্তিত,' কোথায়ও উহা 'সৌষ্ঠ-বৌদার্য-বিশেষশালিনী'—সর্বত্রই অমোঘ ভাষা-শক্তির প্রকাশ, ভাষার পৌরুষ-দীপ্তি। বিচিত্র অর্থযুক্ত বলিষ্ঠ ভাষার এই পৌরুষ দীপ্তিই ভারবির অন্যতম গৌরব।

ভারবির বর্ণনাশক্তিও অসাধারণ। চতুর্থসর্গের শরৎবর্ণনা, পঞ্চমসর্গের হিমালয়-বর্ণনা এবং পঞ্চদশ-সপ্তদশ সর্গের যুদ্ধবর্ণনা যে কোন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমসর্গে 'অক্ষমা' দ্রৌপদীর চিত্র চিরকাল চিত্তে গ্রথিত হইয়া থাকিবার মত। শত্রুর সমৃদ্ধির কথা শ্রবণ করিয়া দ্রৌপদী ক্ষুভিতা হইলেন, যুধিষ্ঠিরকে উদ্বোধিত করিবার জন্য তিনি 'মনুব্যবসায় দীপনী' বাক্য বলিতে লাগিলেন :

ভবাদৃশেষু প্রমদাজনোদিতঃ
ভবত্যধিক্ষেপ ইবানুশাসনম্।
তথাপি বক্তুং ব্যবসায়য়ন্তি মাং
নিরস্ত নারীসময়া দুরাধয়ঃ ॥ [কিরাত. ১.২৭]

দ্রৌপদীর বিনয়মিশ্রিত এই ক্ষোভ কাব্যজগতে অতুলনীয়। মহাভারতেও এই অনুযোগ আছে। সেখানেও 'প্রিয়া চ দর্শনীয়া চ পণ্ডিতা চ পতিব্রতা' দ্রৌপদী স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া কঠিন অপভাষ প্রয়োগ করিয়াছেন [বন ২৪]। কিন্তু ভারবির দ্রৌপদীর বাক্য আরও তীব্র ; উপরন্তু উহা অর্থগৌরবে উপভোগ্য।

॥ ভট্টি ॥

ভট্টি-প্রণীত 'রাবণবধম্' আর একখানি অলংকারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য। ইহা 'ভট্টিকাব্য' নামেই অধিক পরিচিত। ভট্টির পরিচয়ও তিমিরাবৃত। কাব্যশেষে তিনি এই মাত্র বলিয়াছেন যে, তিনি বলভীর রাজা শ্রীধরসেনের অনুজ্ঞায় কাব্য রচনা করেন। এই ধরসেন কে? বলভীরাজ্যে ধরসেন নামে চারজন রাজা ছিলেন। অনেকেই মনে করেন, চতুর্থ ধরসেন [৬৫১ খ্রীষ্টাব্দ] ভট্টির পোষ্টা।

কাহারও মতে ভর্তৃহরি ও ভট্টি একই ব্যক্তি। 'ভট্টি' সংস্কৃত ভর্তৃ শব্দের অপ-ভ্রংশ। কিন্তু ভর্তৃহরি ও ভট্টিকে এক ব্যক্তি বলিয়া মনে হয় না। শতকত্রয়ের রচয়িতা ভর্তৃহরির রচনারীতি ও লক্ষ্যও স্বতন্ত্র। বল্লভদেবের সুভাষিতাবলীসংগ্রহে ভট্টি ও ভর্তৃহরির কবিতা পৃথক সংকলিত হইয়াছে।

ভট্টি প্রধানতঃ বৈয়াকরণ। ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যেই তিনি কাব্য রচনা করেন। কথিত আছে, একদিন ভট্টি যখন শিষ্যগণকে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতেছিলেন, তখন অধ্যাপক ও শিষ্যদের মধ্য দিয়া একটি হস্তী চলিয়া যায়। শাস্ত্রমতে এরূপ ঘটনা ঘটিলে এক বৎসর অনধ্যায় পালন করিতে হয় এবং সংবৎসর বেদপাঠ স্থগিত রাখিতে হয়। ব্যাকরণ বেদেরই অঙ্গ। কিন্তু অনুরূপ ঘটনায় বেদপাঠ নিষিদ্ধ হইলেও কাব্যপাঠ নিষিদ্ধ নয়। কাজেই ভট্টি কাব্যপাঠের ছলে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে মনস্থ করিলেন। ইহারই ফল ভট্টি-প্রণীত 'রাবণবধ' মহাকাব্য।

কাব্যের প্রকরণগুলিও ব্যাকরণের নামে বিভক্ত: প্রকীর্ণ কাণ্ড, প্রসন্ন কাণ্ড, অলংকার কাণ্ড ও তিঙন্ত কাণ্ড। এই চারি কাণ্ড সমন্বিত কাব্য ২২টি সর্গে বিভক্ত। প্রথম কাণ্ডে পাঁচটি সর্গে 'রাম-সম্ভব', 'সীতাপরিণয়', 'রাম-প্রবাস' ও 'সীতাহরণ' পর্যন্ত ঘটনা। ৬ষ্ঠ হইতে ৯ম সর্গ দ্বিতীয় কাণ্ডের অন্তর্গত—উহাতে আছে 'সুগ্রীবাভিষেক', 'সীতান্বেষণ', ও 'অশোকতনিকাভঙ্গ' ও 'মারুতি সংযম'। ১০ম—১৩শ সর্গে তৃতীয় কাণ্ড, ইহাদের বিষয়—'সীতাভিজ্ঞানদর্শন', 'লংকাগতপ্রভাত 'বিভীষণগমন' ও 'সেতুবন্ধ'। চতুর্থ কাণ্ডে ১৪শ হইতে ২২শ সর্গ: 'শরবন্ধ', 'কুম্ভকর্ণবধ', 'রাবণ-বিলাপ', 'রাবণ-বধ', 'বিভীষণ-প্রলাপ', 'বিভীষণাভিষেক' 'সীতাপ্রত্যাখ্যান', 'সীতাসংশোধন' ও 'অযোধ্যা-প্রত্যাগমন'। বালকাণ্ড হইতে যুদ্ধ-কাণ্ড পর্যন্ত রামায়ণোক্ত প্রসিদ্ধ ঘটনাই ভট্টিকাব্যের বর্ণনীয় বিষয়।

কাব্যের আবেদন প্রধানতঃ হৃদয়ের কাছে, কিন্তু ভট্টিকাব্যের আবেদন বুদ্ধির নিকট। ব্যাকরণের তত্ত্ব জানা থাকিলে ইহার রসাস্বাদন সম্ভব। কবি নিজেও বলেন,

ব্যাখ্যাগম্যমিদং কাব্যমুৎসবঃ সুধিয়ামলম্।
হতা দুর্মেধসশ্চাস্মিন্ বিদ্বৎপ্রিয়তয়া ময়া ॥

—আমার এই কাব্য ব্যাখ্যাদ্বারা বোধ্য; ইহা সুধীগণের উৎসবস্বরূপ; দুর্মেধা ব্যক্তি ইহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

পাণিনির সূত্রব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে রচিত হওয়ায় ইহাতে 'শব্দ লক্ষণ'ই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি ব্যাকরণের সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া ইহাতে প্রবেশ করিতে

পারিলে ইহার কাব্যসৌন্দর্যে মুগ্ধ হইতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ ভট্টিকাব্যের দ্বিতীয় সর্গের শরৎবর্ণনার অংশ উল্লেখ করা যাইতে পারে। রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের তপোবনে যাইতেছেন ; পথে শরতের অপূর্ব শোভা। সরোবরে প্রস্ফুটিত রক্ত-তাম্র উৎপল, পাপড়িগুলি অগ্নিশিখার ন্যায় দীপ্ত-শ্রী, তাহাতে আকুল ভ্রমরের বেষ্টন। সরোবরে প্রতিবিম্বিত এই শারদশ্রীর বর্ণনায় কবি চমৎকার উৎপ্রেক্ষার সৃষ্টি করিয়াছেন,

বিম্বাগতৈস্তীরবনৈঃ সমৃদ্ধিং নিজাং বিলোক্যাপহৃতাং পয়োভিঃ।
কূলানি সামর্ষতয়েব তেনুঃ সরোজলক্ষ্মীং স্থলপদ্মহাসৈঃ॥ [ভট্টি. ২.৩]

—তীরবনের শোভা জলে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় তীর মনে করিল, জল তাহার সৌন্দর্য অপহরণ করিয়াছে। অমনি সে ঈর্ষ্যার বশবর্তী হইয়া জলপদ্মের শোভা নির্জিত করিবার মানসে স্থলপদ্মের হাসি বিস্তার করিল।

এসকল স্থলে ব্যাকরণগত দুরূহতা যাহাই থাকুক, কাব্যসৌন্দর্য নিঃসংশয়িত।

॥ মাঘ ॥

তাবদ্ভা ভারবের্ভাতি যাবন্মাঘস্য নোদয়ঃ।
উদিতে তু পুনর্মাঘে ভারবের্ভারবেরিব॥

—ভারবির ভাস্বরতা ততক্ষণ, যতক্ষণ মাঘের আবির্ভাব হয় নাই। মাঘ মাসে সূর্যের দীপ্তি যেমন ক্ষীণ হয়, কবি মাঘের উদয়ে ভারবির প্রভাও তেমনই ম্লান হইয়াছে।

ভারবির পরে মাঘের আবির্ভাব সম্পর্কে এই লোকশ্রুতি। মাঘ নিঃসংশয়ে একজন প্রথম শ্রেণীর কবি। কালিদাস, ভারবি ও ভট্টি প্রভৃতি পূর্বসূরীদের পরে জন্ম গ্রহণ করায় তিনি তাঁহাদের বজ্রবিদ্ধ মণিপথে অতি সহজেই বিচরণ করিতে পারিয়াছেন।

মাঘ 'শিশুপালবধম্' কাব্য প্রণয়ন করেন। কাব্যশেষে কবির আত্মপরিচয় হইতে জানা যায়, তাঁহার পিতামহ সুপ্রভদেব ছিলেন শ্রীবর্মলাখ্য রাজার সেনাপতি, পিতার নাম দত্তক। কবি-জীবনী সম্পর্কে ভোজপ্রবন্ধাদি গ্রন্থ হইতেও কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যায়। কবি নাকি দারিদ্র্য দুঃখের বর্ণনা করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। খুব সম্ভব মাঘ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন।

শিশুপালবধ ২০ সর্গে বিভক্ত। মহাভারতের সভাপর্বোক্ত (৩৫-৪৪ অধ্যায়) শিশুপালবধ কাহিনী অবলম্বনে এই কাব্য রচিত। প্রথমে নারদ-শ্রীহরি সংবাদে শিশুপালের অত্যাচারের ভীষণতা বর্ণনা ; শিশুপাল এ যুগে হিরণ্যকশিপুর অবতার। ['হিরণ্যপূর্বংকশিপুং প্রচক্ষতে' ১.৪২], রাবণের দ্বিতীয় প্রতিমূর্তি ['স রাবণো নাম···বভূব রক্ষঃ ১.৪৮] ; অতএব কৃষ্ণের নিকট ইন্দ্রের প্রার্থনা, তিনি যেন ইহার প্রতিকার করেন। দ্বিতীয়ে বলরাম-উদ্ধবের সহিত কৃষ্ণের মন্ত্রণা ; একদিকে ইন্দ্রের আবেদন, অপরদিকে রাজসূয় যজ্ঞে যোগদানের জন্য যুধিষ্ঠিরের আমন্ত্রণ। মন্ত্রণায় স্থির হইল, কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থেই যাইবেন। তৃতীয় হইতে দ্বাদশ সর্গ পর্যন্ত এই কৃষ্ণ-

যাত্রার বিবরণ এবং সেই সুযোগে মহাকাব্যোচিত সমুদ্র, শৈল, ঋতু, জলক্রীড়া, চন্দ্রোদয়, সম্ভোগ ও প্রভাত বর্ণনা। ত্রয়োদশে কৃষ্ণ-পাণ্ডব সমাগম ও যুধিষ্ঠির-সভার বর্ণনা। চতুর্দশে যোগ্যতম বিবেচনায় শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘদান ও ভীষ্মের কৃষ্ণস্তুতি। পঞ্চদশে শিশুপালের ক্ষোভ ও তীব্রভাষায় কৃষ্ণনিন্দা এবং শিশুপাল-সৈন্যসজ্জার বর্ণনা। ষোড়শে দূত প্রেরণ, সপ্তদশে শ্রীকৃষ্ণের ক্ষোভ ও সৈন্যসজ্জা। অষ্টাদশ হইতে বিংশ অধ্যায়ত্রয়ে যুদ্ধবর্ণনা এবং শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শিশুপালবধ বৃত্তান্ত দ্বারা কাব্যের সমাপ্তি।

মহাভারত হইতে কাহিনী গৃহীত হইলেও বিষয়-বিন্যাসে, চরিত্র উদ্ভাবনে ও প্রকাশ-চাতুর্যে মাঘ স্বতন্ত্র। রাজনীতি আলোচনায় উদ্ধব-বলরাম মন্ত্রণা সম্পূর্ণ নূতন। দ্বারকা হইতে কৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থ-যাত্রার প্রসঙ্গও মাঘের অভিনব কল্পনা। সর্বোপরি বর্ণনাভঙ্গি: মহাভারতে যাহা সংক্ষিপ্ত ও অনলংকৃত—শিশুপালবধে তাহা বিস্তৃত ও অলংকার-সমৃদ্ধ। অর্ঘদানের প্রস্তাব করিয়া মহাভারতে ভীষ্ম বলিয়াছেন,

অসূর্যমিব সূর্যেণ নির্বাতমিব বায়ুনা।
ভাসিতং হ্লাদিতঞ্চৈব কৃষ্ণেনেদং সদো হি নঃ॥ [সভা. ৩৫.২৯]

মাঘের কৃষ্ণ-স্তুতি আরও কারুকার্যমণ্ডিত। সালংকার স্তুতি-শেষে ভীষ্ম বলেন,

ধন্যোঽসি যস্য হরিরেষ সমক্ষ এব
দূরাদপি ক্রতুষু যজ্বভিরজ্যতে যঃ।
দত্ত্বার্ঘমত্র ভবতে ভবনেষু যাবৎ
সংসারমণ্ডলমবাপ্নুহি সাধুবাদম্॥ [শিশু. ১৪.৮৭]

মাঘের ঋণ সর্বাপেক্ষা বেশি ভারবির নিকট। কেহ কেহ মনে করেন, শৈব ভারবির কীর্তিকে ম্লান করিবার জন্য বৈষ্ণব মাঘ কিরাতার্জুনীয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী শিশুপালবধ রচনা করেন। কিরাতের সূচনা যেমন 'শ্রিয়ঃ' শব্দ দিয়া এবং সর্গান্তে যেমন 'লক্ষ্মী' শব্দের প্রয়োগ, মাঘের সূচনা ও সমাপ্তিও সেইরূপ। মাঘের নারদ, বলরাম ও উদ্ধব চরিত্র যথাক্রমে ভারবির ব্যাস, ভীম ও যুধিষ্ঠিরের প্রতিরূপ। মাঘের কাব্য নানাগুণসমন্বিত হইলেও ভারবির ভাষাগৌরব, দৃঢ়তা ও সংহতি মাঘে নাই।

শিশুপালবধ অলঙ্কারশাস্ত্র সম্মত মহাকাব্য। বলা যায়, সিদ্ধরীতির জয়স্তম্ভ—যেমন উপমার কারুকার্য, তেমনই অর্থগৌরব ও অলঙ্কারের মহিমা। কিন্তু সিদ্ধরীতির যেমন গুণ, তেমনই দোষ; সৌন্দর্যের অতিমার্জনে স্বভাবসৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হয়, কৃত্রিমতা প্রকট হয়। মাঘের অতিমার্জিত কারুকার্যের এই ত্রুটি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, ঊনবিংশ সর্গের চিত্রযুদ্ধবর্ণনার অংশটি। উহা কৃষ্ণ-শিশুপালের সমরসজ্জা নয়, বর্ণ ও শব্দের সজ্জা-সমারোহ।

॥ শ্রীহর্ষ ॥

শ্রীহর্ষের 'নৈষধীয় চরিত' বা সংক্ষেপে 'নৈষধ' বহুখ্যাত আর একখানি মহাকাব্য। প্রতি সর্গশেষে কবি যে ধ্রুবান্তিক আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা

যায়, তাঁহার পিতার নাম শ্রীহীর, মাতার নাম মামল্লদেবী ['শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যম্']। তিনি কান্যকুব্জেশ্বরের নিকট হইতে সম্মান স্বরূপ তাম্বূল ও আসন লাভ করেন ('তাম্বূলদ্বয়মাসনং চ লভতে যঃ কান্যকুব্জেশ্বরাৎ') এই কান্যকুব্জেশ্বর সম্ভবতঃ বিজয়চন্দ্রের পুত্র জয়চন্দ্র। নৈষধীয় চরিত দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগের রচনা। রাজশেখরের মতে, 'শ্রীহর্ষো গৌড় দেশীয়ঃ'। কাব্যমধ্যে বাঙ্গালত্বের কিছু কিছু চিহ্নও আছে।

নৈষধ কাব্যের মূল উৎস মহাভারতের বনপর্বোক্ত নলোপাখ্যান। মহাভারতে নলোপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে ২১টি অধ্যায়ে (বন, ৪৫-৬৫), কিন্তু শ্রীহর্ষ তাহার প্রথম চারিটি অধ্যায়ের ঘটনা (নল-দময়ন্তীর বিবাহ পর্যন্ত) লইয়া ২২টি সর্গে নৈষধ রচনা করিয়াছেন। নলের রাজ্যভ্রংশ, নলদময়ন্তীর বিরহ ও পুনর্মিলন প্রভৃতি অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই জন্য কেহ কেহ মনে করেন, কাব্যখানি অসমাপ্ত। নৈষধীয় চরিতের বর্ণনীয় বিষয়, ১. নলদময়ন্তীর রূপবর্ণনা ও পূর্বরাগ. ২-৩. হংসদৌত্য, ৪-৯. স্বয়ম্বরের আয়োজন, ইন্দ্রাদি কর্তৃক নলকে দূতরূপে প্রেরণ ও নল-দময়ন্তীর সাক্ষাৎ, ১০-১২. স্বয়ম্বরসভার বর্ণনা, ১৩-১৪. নলের পঞ্চমূর্তি দর্শনে দময়ন্তীর বিভ্রান্তি ও অবশেষে প্রকৃত নলকে বরণ, ১৫-১৬. বিবাহ বর্ণনা ও বরযাত্রীদের হাস্য কৌতুক এবং ১৭-২২. নলদময়ন্তীর স্বদেশযাত্রা ও সম্ভোগ-শৃঙ্গারাদির বর্ণনা।

নৈষধে মহাভারতের ঋণ থাকিলেও মৌলিকতা ও পরিবর্ধন সহজলক্ষ্য। আর্ষ-মহাকাব্যে যাহা রেখা, নৈষধে তাহা অলংকারাঢ্য চিত্র। মাত্র চারিটি শ্লোকে মহাভারতকার নলের রূপ ও শৌর্য বর্ণনা করিয়াছেন,[1] নৈষধকার সেখানে ৩০টি শ্লোকে নল-মহিমা খ্যাপন করিয়াছেন। কাব্যের সূচনা এই বর্ণনা লইয়া ঃ

নিপীয় যস্য ক্ষিতিরক্ষিণঃ কথাংস্তথাদ্রিয়ন্তে ন বুধাঃ সুধামপি।
নলঃ সিতচ্ছত্রিতকীর্তি মণ্ডলঃ স রাশিরাসীন্মহসাং মহোজ্জ্বলঃ ॥ [নৈ. ১.১১]

—যাঁহার কথা শ্রবণে দেবগণ সুধাকে অনাদর করেন, শ্বেত ছত্রের মত যাঁহার কীর্তি, সেই নল ছিলেন মহাপ্রেমিক, দীপ্তিমান্।

যেমন নায়কের রূপবর্ণনা, তেমনই নায়িকার। মহাভারতের দময়ন্তীর রূপ-বর্ণনাও সংক্ষিপ্ত।[2] অতিভাষণে ও অতিশয়োক্তিতে নৈষধে উহা বহুবিস্তৃত। 'হিরন্ময়' হংসের ভাষণে নায়িকার অপূর্ব রূপ ব্যঞ্জিত হইয়াছে (নৈ. ২)।

কথিত আছে আলংকারিক মম্মট ভট্ট ছিলেন শ্রীহর্ষের মাতুল। কাব্যখানি বিচার করিবার জন্য তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলে তিনি নাকি মন্তব্য করিয়াছিলেন, কাব্য-

---

১. আসীদ্রাজা নলো নাম বীরসেন সুতো বলী।
উপপন্নো গুণৈরিষ্টৈ রূপবানশ্বকোবিদঃ ॥ [মহা. বন. ৪৫.১]

২. দময়ন্তী তু রূপেণ তেজসা বপুষা শ্রিয়া।
সৌভাগ্যেন চ লোকেষু যশঃ প্রাপ সুমধ্যমা ॥ [ঐ. বন. ৪৫.১০]

খানি পূর্বে পাইলে 'দোষ'-পরিচ্ছেদ রচনায় দৃষ্টান্ত সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে শ্রম করিতে হইত না। অবশ্য নৈষধে ত্রুটি অনেক আছে—প্রধান ত্রুটি অতিবিস্তৃতি ও স্থানে স্থানে দুর্বোধ্যতা। অবক্ষয় যুগের নিষ্প্রাণতা, আড়ম্বরপ্রিয়তা, অলংকারপ্রাচুর্য ও অতিপাণ্ডিত্য নিঃসন্দেহে কাব্যখানিকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। প্রায় প্রতিটি শ্লোকে শ্লেষ-যমক-অনুপ্রাসের ঘটা, উৎপ্রেক্ষা-অতিশয়োক্তির ছটা এবং অষ্টাদশ বিদ্যা-প্রকাশের সমারোহ। কথিত হয়, নৈষধং বিদ্বদৌষধম্'। পাণ্ডিত্য পণ্ডিতের ভূষণ, কিন্তু কাব্যের দোষ। নৈষধ এই দোষে দুষ্ট।

তথাপি নৈষধচরিত কাব্যে অবিরল সৌন্দর্য ও চমৎকৃতির দৃষ্টান্ত আছে। প্রকৃতিবর্ণনায় শ্রীহর্ষের স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। নৈষধ আগাগোড়া শৃঙ্গাররসাঢ্য। শৃঙ্গার-জনিত অনুভাবগুলি স্থানে স্থানে অতি মনোহর। বর্ণনাতেও শ্রীহর্ষ প্রথম শ্রেণীর কবি। হিরণ্ময় হংসের বর্ণনা, স্বয়ম্বর সভার বর্ণনা ও বিবাহের বর্ণনায় সূক্ষ্ম কবি-দৃষ্টির পরিচয় রহিয়াছে। সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য নৈষধকারের কৌতুকবোধ। ১৫-১৬ সর্গের পরিহাস-প্রিয়তার চিত্র কোথাও গ্রাম্যতাকে ছুঁইয়া গেলেও মহাকাব্যের মহাগম্ভীর পরিবেশে ইহা অভিনব। অন্যত্রও এই কৌতুক-হাস্যের স্পর্শ দুর্লভ নয় : যেমন, ১ম সর্গে নলের বিলাসবনবর্ণনায় এই শ্লোকটি ঃ

দিনে দিনে ত্বং তনুরোধে রেহধিকং পুনঃ পুনর্মূর্ছ চ মৃত্যুমৃচ্ছ চ।

ইতীব পান্থং শপতঃ পিকান্ দ্বিজান্ সখেদমৈক্ষিষ্ট স লোহিতেক্ষণান্ (১.৯০)

—তিনি দেখিলেন, রক্তচক্ষু পিক রক্তচক্ষু ব্রাহ্মণের ন্যায় যেন পথিককে অভি-শাপ দিতেছে, দিনে দিনে তোর তনু ক্ষীণ হোক্, তুই মূর্ছিত হ, তোর মরণ হোক্।

৫. খণ্ডকাব্য, চূর্ণ কবিতা ও কোষকাব্য

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ 'Lyric poetry' নামে সংস্কৃত কবিতার একটি শাখা নির্দেশ করিয়াছেন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে পাই খণ্ডকাব্য ও মুক্তকাদি পদ্য বিভাগ। লিরিক নামটি আধুনিক, উহার সকল বৈশিষ্ট্য সংস্কৃত কবিতায় নাই। ব্যক্তিগত অনুভূতির সঙ্গীতময় প্রকাশকেই লিরিক বা গীতিকবিতা বলে। উহার মর্মমূলে থাকে 'অহং'-এর অনুভব, উহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিনিষ্ঠ। প্রাচীন কবিতা প্রায়শঃ বস্তুনিষ্ঠ। তথাপি কোন-কোন কবিতায় ব্যক্তি-মানসের স্পর্শ দুর্লভ নয়—বিশেষতঃ প্রেমের কবিতায় বা স্তুতি প্রার্থনামূলক কবিতায়। এই দিক হইতে খণ্ডকাব্য বা মুক্তকাদি পদ্যাবলীকে গীতিকবিতা বলা চলে।

একার্থ প্রতিপাদক পদ্যবন্ধকে বলে খণ্ডকাব্য ঃ

একার্থ প্রবণৈঃ পদ্যৈঃ-সন্ধিসামগ্র্যবর্জিতম্।

খণ্ড কাব্যং ভবেৎ কাব্যস্যৈকদেশানুসারীচ ।। [সাহিত্য দঃ. ষষ্ঠ অঃ]

অর্থাৎ খণ্ডকাব্য কাব্যের একদেশানুসারী ('কিয়দংশানুরূপমিত্যর্থঃ'—টীকা জীবানন্দ বিদ্যাসাগর) পদ্য রচনা। উহা কাব্যেরই অনুরূপ—তবে মহাকাব্যের ব্যাপ্তি,

প্রসার ও সমগ্রতা উহাতে থাকে না। কাব্যের মত সর্গবন্ধ হইবার প্রয়োজনও উহার নাই, মুখ-প্রতিমুখাদি সন্ধির সমগ্রতাও না থাকিতে পারে। সর্বোপরি উহা একার্থ-প্রবণ পদ্য, অর্থাৎ উহাতে থাকে ভাবের ঐক্য। খণ্ডতা ও একার্থপ্রবণতাই খণ্ডকাব্যের প্রধান লক্ষণ বলিয়া ইহা অনেকটা গীতিকবিতার সমধর্মী।

মুক্তকাদি পদ্যে গীতিকবিতার লক্ষণ অধিকতর স্পষ্ট। এগুলি ক্ষুদ্র, সংহত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। ক্ষুদ্র পরিসরে এক একটি ভাব নিটোল মুক্তার মত ঝকঝক করে। কবিচিত্তের স্পর্শও উহাতে অল্প নয়। গীতিকবিতার মতই উহা স্বয়ংপ্রভ। এই ধরনের কবিতা পাঁচ প্রকারের হইতে পাবে ঃ এক শ্লোকে নিবন্ধ কবিতা 'মুক্তক', দুই শ্লোকের কবিতা 'যুগ্মক', তিন শ্লোকের 'সন্দানিতক', চারি শ্লোকের 'কলাপক' এবং পাঁচ বা ততোধিক শ্লোকের 'কুলক'। (সাহিত্য-দর্পণ. ৬)

এই প্রসঙ্গে কোষকাব্যের কথাও উল্লেখযোগ্য। একটি ভাবকে অবলম্বন করিযা যে স্বয়ংসম্পূর্ণ শ্লোক রচিত হয়, রজ্যাক্রমে গ্রথিত সেইরূপ সজাতীয় শ্লোকাবলীর সমষ্টিই কোষকাব্য। কোষকাব্যকে বলা চলে পরস্পরনিরপেক্ষ প্রকীর্ণ শ্লোকাবলীর শৃঙ্খলাবন্ধ চয়নিকা। ইহার বিছিন্ন শ্লোকগুলিও মুক্তকজাতীয় ক্ষুদ্র গীতিকবিতা। আলংকারিকগণ বলেন, 'স এবাতি মনোরমঃ'।

আধুনিক গীতিকবিতার বিষয়-বৈচিত্র্য যেমন অনন্ত, সংস্কৃত খণ্ডকবিতার বিষয় তেমন বহুবিচিত্র নয়। সাধারণভাবে হিন্দুর চতুর্বর্গ—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষই ইহার বিষয় এবং ইহাদের মূল ভিত্তি কামশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র (নীতিশাস্ত্র) ও ধর্মশাস্ত্র। ইহাদের সহিত প্রকৃতি বর্ণনাও একটি বিশিস্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বিষয়-বস্তুর দিক হইতে খণ্ড কবিতাগুলিকে এই কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ ১. প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতা ২. প্রেমমূলক কবিতা ৩. নীতিকবিতা এবং ৪. ধর্ম ও ভক্তিভাবের কবিতা।

(i) প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতা

ভাবুক মানুষের দৃষ্টিতে প্রকৃতি এক অপার বিস্ময়। একদিকে ইহার অনন্ত রূপ, অপরদিকে মানব-মনে ইহার অপরিমেয় প্রভাব। ভারতীয় কাব্যে প্রকৃতি-বর্ণনার একটি ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। বৈদিক ঋষিগণ প্রকৃতিতে দেখিতেন দেবসত্তার প্রকাশ ; কোথাও ভয়াল, কোথাও সুন্দর। মানুষ এই প্রকৃতির ভক্ত। মহাকাব্যে প্রকৃতি দেবসত্তা-বিরহিত একটি স্বতন্ত্র সত্তা। প্রকৃতি এখানে বস্তু-প্রকৃতি, কোথাও জীবনধর্মে জীবন্ত। মানব জীবনে উহার প্রভাবও অপরিসীম। সংস্কৃত কবিতায় এই প্রকৃতি একাট বিভাব। সর্বত্রই উহা কোন-না-কোন ভাবের উদ্বোধক, বিশেষতঃ প্রেমভাবের। সংস্কৃত কবিতায় তাই একদিকে পাওয়া যায় বস্তু-প্রকৃতির নিখুঁত চিত্র, অপরদিকে উদ্দীপন বিভাবরূপে ইহার শক্তির পরিচয়।

নাট্যশাস্ত্রে কাব্যাধ্যায়ে (৩২ অধ্যায়) প্রকৃতির বর্ণনা আছে। তবু প্রকৃতি-বিষয়ক

রচনা হিসাবে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য কবিকুলতিলক কালিদাসের 'ঋতুসংহার'। কেহ কেহ কাব্যখানিকে কবির প্রথম বয়সের রচনা বলিয়া মনে করেন, কারণ উহাতে সুনিপুণ শিল্পী-হস্তের স্বাক্ষর নাই। পরিণত হস্তের চিহ্ন না থাকিলেও কালিদাসের মনন-শীলতার পরিচয় উহাতে দুর্লভ নয়। এই কাব্যে ছয়টি সর্গে যথাক্রমে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত—এই ছয়টি ঋতুর বর্ণনা। এই ধরনের বর্ণনা রামায়ণেও পাওয়া যায়। বর্ণনা প্রধানতঃ চিত্রধর্মী। চিত্রের রঙ একটু গাঢ়, রেখাগুলি ঈষৎ স্থূল। প্রকৃতিব এই রঙে-রেখায় মানুষের মনে কি রঙ-রেখা ফুটিয়া উঠে, কবি তাহারও আভাস দিয়াছেন। প্রত্যেকটি ঋতু এক এক প্রকার রতিভাবের উদ্দীপক, কোথাও সম্ভোগের, কোথাও বা বিপ্রলম্ভের। যেমন, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড ভয়াল মূর্তি। প্রখর তাপে 'তাপিতা মহী'; বৃক্ষগুলি 'সংশুষ্কে পর্ণাঃ', নদীগুলি 'ক্ষীণতোয়া', 'দিশি দিশি পরিদগ্ধা ভূময়ঃ'। জীবজগতও বৈরীভাব ত্যাগ করিয়া মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ। এই পরিবেশে 'অভ্যুপশান্ত মন্মথঃ'। বর্ষায় রাজার ন্যায় মেঘাগম ('রাজ-বদুদ্ধতদ্যুতির্ঘনাগমঃ'[১]); কোথাও এই মেঘ 'নীলোৎপলপত্র কান্তি', কোথাও 'প্রভিন্নাঞ্জনরাশি সন্নিভঃ'। এই মেঘে ঘোর অশনি-গর্জন, আর অশ্রান্ত ধারাপতন শব্দ। বর্ষায় ময়ূর কলাপ মেলিয়া নৃত্য করে, সমীরণ কদম্ব-কেতকীকে কম্পিত করিয়া তুলে। এই বর্ষা 'কং ন করোতি সমুৎসুকম্'—কাহাকে না বিহ্বল করে? সর্বাপেক্ষা দুঃখ প্রবাসীর—'হরন্তি চেতো যুগপৎ প্রবাসীনাম্'। শরৎ 'নববধূরিব রূপরম্যা', আকাশ, জল, রাত্রি শুক্লীকৃত; অপক্ক শালিধানের ক্ষেতে সমীরণদোলা; কাশকুসুমে আর শেফালিকায় সজ্জিতা মহী। এই পরিবেশে 'নার্যাঃ প্রহৃষ্ট মন-সোহদাঃ'। প্রভূত শালিধান সংগ্রহের কাল হেমন্ত, ইহাও 'বহুগুণরমনীয়ঃ' এবং 'যোষিতাং চিত্তহারী'। শিশিরকালে তুষারসংঘাতনিপাত শীতল রজনী, তারাগণ বিপাণ্ডুর। একালে সেব্য অগ্নি, সূর্যকিরণ ও গরম বস্ত্র ('হুতাশনো ভানুমতো গভস্তয়ো গুরূণি বাসাংসি')। শীত ঋতুতে 'জাতকন্দর্প দর্পঃ'। বসন্তে প্রফুল্ল চূতাঙ্কুর; অশোক স্তবক প্রস্ফুটিত হইয়া 'কুর্বন্তি অশোকা হৃদয়ং সশোকম্'। বসন্তকালের পৃথিবী যেন রক্তাম্বর পরিহিতা নববধূ; ইহা উদাসীন মুনি-মানসেও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে ('চিত্তং মুনেরপি হরন্তি নিবৃত্তিরাগম্')।

'ঋতুসংহারে' প্রকৃতি প্রধানতঃ প্রেম-চেতনার রঙে অনুরঞ্জিত: বর্ষা বিরহের, বসন্ত মিলনের। পরবর্তী কাব্য-নাটকে কালিদাসের নিসর্গ-চেতনা আরও অগ্রসর।

সংস্কৃত খণ্ড কবিতায় প্রকৃতি-বর্ণনায় অধিক বিশেষত্ব নাই। প্রায় সর্বত্রই বর্ণনা বস্তুনিষ্ঠ ও কামোদ্দীপক। উদাহরণ স্বরূপ ভর্তৃহরির শৃঙ্গারশতকে বর্ণিত (২৯-৪৭ সংখ্যক) শ্লোকাবলীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভর্তৃহরি ঋতুবর্ণনা সুরু করিয়াছেন 'বসন্ত' বা মধুঋতু দিয়া, সমাপ্ত শিশিরর্তুর বর্ণনায়। এখানেও 'মধু-

১. পাঠান্তর 'রাজবদুন্নতধ্বনিঃ'।

রয়ং মধুরৈরপি...বিরহিণঃ প্রণিহন্তি' ; গ্রীষ্মের উপকরণও হর্ষকামের বর্ধক—'গ্রীষ্মে মদং চ মদনং চ বিবর্ধয়ন্তি'। আর প্রাবৃট ?

বিয়দুপচিত মেঘং ভূময়ঃ কন্দলিন্যো
নবকুটজ কদম্বামোদিনী গন্ধবাহাঃ।
শিখিকুলকল কেকারাবরম্যা বনান্তাঃ
সুখিনমসুখিনং বা সর্বমুৎকণ্ঠয়তি॥ [শৃ. শ. ৩৮]

—বর্ষার মেঘপুষ্ট গগন, নবাঙ্কুরিত ভূমি, কুটজকদম্বে আমোদিত বায়ু, ময়ূরের কেকারবে মন্দ্রিত বনান্ত সুখী বা অসুখী সকলকেই উৎকণ্ঠিত করে।

ভর্তৃহরির প্রকৃতি-বর্ণনায় ভাবোপযোগী শব্দঝংকারগুলি মনোহর। চিত্ররচনায় নিখুঁত বস্তুদৃষ্টিও প্রশংসনীয়। প্রাকৃতিক পরিবেশে মানবচিত্তের গাঢ় উৎকণ্ঠার ব্যঞ্জনাগুলিও সুন্দর।

(ii) প্রেমমূলক কবিতা

জীবের আদিমতম বৃত্তি কাম। রসশাস্ত্রের মতেও রসের আদি শৃঙ্গাররস। সংস্কৃতসাহিত্যে এই শৃঙ্গাররসই সর্বাগ্রগণ্য। যদিও এই সাহিত্যে ধর্মবিরুদ্ধ প্রেম প্রাধান্য লাভ করে নাই, সংজ্ঞাস্পত্যে পর্যবসিত কামই এখানে প্রেম নামে মান্য হইয়াছে, তথাপি কাম ও প্রেমের বিভাবে বা অনুভাবে এবং তাহার সম্ভোগ-বাসনায় বিশেষ কোন পার্থক্য রক্ষিত হয় নাই। এখানে রতিশাস্ত্রের অপর নাম কামশাস্ত্র।

প্রাচীন প্রেম-কবিতা বুঝিতে হইলে অলংকারশাস্ত্রের কতকগুলি সংজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কারণ, প্রেমকবিতাগুলি এই সংজ্ঞার্থের দৃষ্টান্ত। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে (২৪ অধ্যায়) এই সংজ্ঞাগুলির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রেমের সাধারণ নাম 'রতি'। মনের অনুকূলে সুখের অনুভবকেই রতি বলে ['মনোঽনুকূলেঽনুভবং সুখস্য রতিরিষ্যতে'—অগ্নিপু. ৩৩৯.১৩]। এই রতির আলম্বন বিভাব বা প্রধান আশ্রয় নায়ক ও নায়িকা। নায়ক চার প্রকার—ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীরললিত ও ধীর প্রশান্ত ; ইহারা প্রত্যেকে দক্ষিণ, ধৃষ্ট, অনুকূল, শঠ প্রভৃতি ভেদে ষোল প্রকার হইতে পারেন। দক্ষিণ নায়ক বহুবল্লভ হইয়াও সকল নায়িকার প্রতি সমরাগ-বিশিষ্ট ; ধৃষ্ট নায়ক নিঃশঙ্ক ও নির্লজ্জ, আর শঠ নায়ক বাহিরে অনুরাগ প্রদর্শন-কারী, অন্তরে বিপ্রিয় আচরণকারী। নায়িকা প্রধানতঃ দুই প্রকার ঃ স্বীয়া (স্বকীয়া) ও অন্যা (পরকীয়া)। শুদ্ধ শৃঙ্গারে আলম্বন পরোঢ়া-বর্জিতা স্বীয়া নায়িকা। নায়িকা মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা ভেদে তিন প্রকার। অবস্থাভেদে এই সকল নায়িকা আবার অষ্ট প্রকার ঃ ১. অভিসারিকা (মন্মথের বশবর্তী হইয়া যে নায়িকা প্রিয়-মিলনের জন্য যাত্রা করে) ২. বাসকসজ্জিকা (প্রিয়মিলনের জন্য যে সংকেত কুঞ্জে বেশভূষায় সজ্জিত হয়) ৩. উৎকণ্ঠিতা (প্রিয়তমের মিলন প্রতীক্ষা করিয়া যে ব্যাকুলা) ৪. বিপ্রলব্ধা (রাত্রিশেষেও যে প্রিয়-বিরহিতা) ৫. খণ্ডিতা (অন্য নায়িকা দ্বারা সম্ভোগে বারিতা) ৬. কলহান্তরিতা (কলহদ্বারা যে প্রিয়তম হইতে

অন্তরিতা বা দূরে অবস্থিতা) ৭. প্রোষিতভর্তৃকা (যে নায়িকার দয়িত প্রবাসগত) ৮. স্বাধীনভর্তৃকা (কান্ত যাহার একান্ত অধীন)। হাব-ভাব-বিলাসে নায়িকার ভাবান্তরও নানাপ্রকার।

যাহা দ্বারা রতিভাব উদ্রিক্ত হয়, তাহাকে বলে রতির উদ্দীপন বিভাব। বহিঃ-প্রকৃতির ঋতুপর্যায়, চন্দ্রোদয়—নায়ক-নায়িকার অলংকার-সজ্জা—গীতবাদ্য প্রভৃতি রতির উদ্দীপন বিভাব।

রতির অনুভাবগুলিও বিচিত্র। অষ্ট সাত্ত্বিকভাব[১] তো আছেই, উপরন্তু আছে ভ্রূবিক্ষেপ-কটাক্ষাদি। তেত্রিশ প্রকার ব্যভিচারী ভাবের মধ্যে উগ্রতা, মরণ, আলস্য ও জুগুপ্সা ব্যতীত অন্যান্য সবগুলিই রতির ব্যভিচারী।

রতির দুইটি প্রধান অবস্থাভেদ—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। মাল্য-অলঙ্কারাদি সংযোগে স্ত্রী-পুরুষের বিহার বা মিলনই সম্ভোগ। সম্ভোগ-বিরহিত অবস্থাকে বলে বিপ্রলম্ভ। উহাই বিরহ। প্রেমের কাব্য প্রধানতঃ এই মিলন-বিরহের কাব্য। মিলন-বিরহেরও নানাপ্রকার সূক্ষ্ম অবস্থাভেদ আছে। তন্মধ্যে বিপ্রলম্ভের অন্তর্গত পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস প্রধান।[২]

সংস্কৃত প্রেমের কবিতা এই সকল বিভাব, অনুভাব ও ভাবেরই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা।

প্রাকৃত কবিগণ কাম-তত্ত্বকে নিজস্ব বলিয়া দাবি করিয়াছেন। হাল-বিরচিত গাথাসপ্তশতী প্রাকৃত প্রেমকবিতার প্রাচীন সংকলন। কেহ কেহ মনে করেন, সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রেমকবিতার প্রেরণা প্রাকৃত হইতেই সংগৃহীত।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ও পিঙ্গল ছন্দ শাস্ত্রে বিভিন্ন ছন্দের উদাহরণস্বরূপ প্রকীর্ণ শ্লোকের সমাবেশ দেখা যায়। উহাদের মধ্যে কোন-কোনটি উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতা। এইগুলিকেই সংস্কৃত প্রেমকবিতার প্রাচীনতম নিদর্শন বলা যাইতে পারে। ভরতের নাট্যশাস্ত্র হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল ঃ

> ১. প্রেম্না শ্রিয়া বর্ণবিশেষণেন
> স্মিতেন কান্ত্যা সুকুমার ভাবাৎ।
> অমী গুণা রূপগুণানুরূপা
> বসন্তি তে কিং ত্বমুপেন্দ্র বজ্রা ॥ [নাট্যশাস্ত্র. ১৫.৩১]

---

১. স্তম্ভঃ স্বেদোঽহথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽহথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ ॥ [সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিঃ]
—এখানে 'প্রলয়' বলিতে বুঝায়, মৃত্যু নয়, মৃত্যুদশা।

২. সাহিত্যদর্পণে প্রেমবৈচিত্ত্য ধরা হয় নাই ঃ উহাতে বিপ্রলম্ভের অন্তর্গত পূর্বরাগ, মান, প্রবাস ও করুণ বিপ্রলম্ভ (প্রিয়জনের মৃত্যু হইলেও তাহার সহিত পুনর্মিলনের জন্য যে বিমনা ভাব) স্বীকার করা হইয়াছে। কালিদাসের 'রতি-বিলাপ' করুণ বিপ্রলম্ভের চমৎকার উদাহরণ। 'প্রেমবৈচিত্ত্যের' উদাহরণও কালিদাসে বা সংস্কৃত কবিতায় আছে।

—প্রেম, বর্ণশ্রী, স্মিতহাসি ও সুকুমার কান্তি—রূপের অনুরূপ এই সকল গুণ তোমার ; তুমি কি উপেন্দ্র বজ্রা ? [নায়কের পূর্বরাগ]

২. কথং ত্বিদং কমলবিশাললোচনে
গৃহং ঘনৈঃ পিহিতকরে দিবাকরে।
অচিন্তয়ন্ত্যাভিনব বর্ষ বিদ্যুত
স্বমাগতা সুতনু যথা প্রভাবতী ॥ [ঐ. ১৫.৫৫]

—সূর্য ঘন মেঘে আচ্ছাদিত, তদুপরি নববর্ষার এই বর্ষণ ও বিদ্যুৎ-বিকাশ ; এগুলি গণনা না করিয়া, ওগো পদ্মায়তলোচনে সুতনু, তুমি প্রভাবতীর মত এই গৃহে আগমন করিয়াছ [দুঃসাহসিকা অভিসারিকার প্রতি]

৩. সুরতরুজলপরীত লোচনং জলদনিরুদ্ধমিবেন্দুমণ্ডলম্।
কিমিদমপরবক্তুমিব তে শশিবদনেহদ্য মুখং পরাঙমুখম্ ॥ [ঐ. ১৫.১৩৬]

—চোখ জলে ভরা, মেঘে ঢাকা ইন্দুমণ্ডলের ন্যায় বদন ; ওগো শশিবদনে, তুমি আজ পরাঙমুখ কেন ? [মানিনী নায়িকার মানভঞ্জনে নায়কের উক্তি।]

প্রেমের কাব্য হিসাবে কালিদাসের 'মেঘদূত' সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে অদ্বিতীয়। মেঘদূত আকারে ক্ষুদ্র (কিঞ্চিদধিক একশত শ্লোক), কিন্তু প্রকারে সুমহৎ। আচার্য শ্রীঅরবিন্দের মতে, ইহা মহাকাব্য[1]। এই কাব্যের প্রতিটি শ্লোক গভীর ভাব-ব্যঞ্জক, যেন এক একটি নিটোল মুক্তা। একজন নির্বাসিত বিরহী যক্ষের হৃদয়-বেদনাকে উপলক্ষ্য করিয়া কালিদাসের কবি-মানস এই কাব্যে যেমন একদিকে গিরি-নদী-অরণ্য-প্রাসাদ শোভিত ভারতবর্ষ পরিক্রমা করিয়াছে, তেমনই অপরদিকে মানব-চিত্তের প্রেম-জনিত গূঢ়-গভীর ভাবকে অবারিত করিয়াছে।

মেঘদূত কাব্যে দূত মেঘ নীরব। ইহার প্রথম পাঁচটি শ্লোক ব্যতীত সবটাই বিরহী যক্ষের উক্তি। মন্দাক্রান্তা ছন্দের গুরুগম্ভীর মন্থর চালে, নাতিদীর্ঘ বিলম্বিত লয়ে ইহাতে হৃদয়ের কামনা রণিয়া রণিয়া উঠিয়াছে। বিরহের কাব্য হইলেও 'মেঘদূত' বিপ্রলম্ভের বেদনা-বিলসিত নয়—ইহা মিলনের স্মৃতিতে ও সম্ভোগের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ। অথবা বলা চলে, মেঘদূত সম্ভোগ-কামনা-মুখর বিপ্রলম্ভের কাব্য। বিরহের ক্রন্দনও যে ইহাতে নাই, তাহা নয়। কাব্যের শেষাংশ বিরহের বেদনায় বিধুর।

প্রভুর অভিশাপে কুবেরপুরী অলকার এক প্রেমিক যক্ষ তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর সঙ্গ হইতে দক্ষিণে সুদূর রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। বিরহী যক্ষ কোন প্রকারে কয়েক মাস কাটাইয়া 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' পর্বতসানুতে একখণ্ড মেঘ দেখিয়া উন্মনা হইলেন, কারণ,

1. Indian Inheritance—vol. I. Edt. by K. M. Munshi & R. R. Diwakar.

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ।
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনিজনে কিং পুনর্দূরসংস্থে ॥ [পূর্বমেঘ. ৩]

—মেঘ দর্শনে সুখী ব্যক্তিও ব্যাকুল হয় ; যাহারা অন্তরঙ্গ প্রণয়িনী হইতে দূরে অবস্থিত, তাহাদের আর কথা কি ?

কাজেই যক্ষ কুটজকুসুমে অর্ঘ্য রচনা করিয়া 'ধূমজ্যোতি সলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ' মেঘকে স্বাগত জানাইয়া প্রিয়তমার নিকট বার্তা বহন করিবার জন্য দৌত্যে বরণ করিলেন। কামার্ত ব্যক্তি চেতনে-অচেতনে পার্থক্য দেখে না ['কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু'], কামার্ত যক্ষও জড়-চেতনের বিচারহারা হইয়া মেঘের বংশগৌরব কীর্তন করিলেন, তাহার পর সানুনয়ে কহিলেন,

সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎপয়োদ
প্রিয়ায়াঃ সন্দেশং মে হর ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য। [পূর্বমেঘ. ৭]

ইহার পর আরম্ভ হইল যাত্রাপথের বিবরণ। মেঘদূত দুইখণ্ডে বিভক্তঃ পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ। রামগিরি হইতে অলকার পূর্ব পর্যন্ত যাত্রাপথের বর্ণনা 'পূর্বমেঘ' নামে খ্যাত। এই পথে আছে বহুখ্যাত গিরি, নদী ও সমৃদ্ধ জনপদ। প্রাকৃতিক শোভা, জনপদসমৃদ্ধি ও রতিসম্ভোগের দিক হইতে প্রত্যেকটি স্থানের অপরিমেয় আকর্ষণ। কোথায়ও মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাদের চকিত দৃষ্টি, কোথাও ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞ জনপদবধূদের প্রীতি-স্নিগ্ধ আলোকন। এই পথেই আছে সানুমান আম্রকূট, বিন্ধ্যপাদবাহিনী বিশীর্ণা রেবা, শ্যাম জম্বুবনে ঘেরা দশার্ণ, বেত্রবতী নদী-শোভিতা উদ্দাম নাগরলীলার স্থান বিদিশা, বিদিশার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে তটিনী নির্বিন্ধ্যা অতিক্রম করিয়া উদয়ন-কথা-কোবিদগণের কথাস্থান অবন্তী। এই অবন্তীর রাজধানী উজ্জয়িনী। উজ্জয়িনীর বর্ণনায় কবি হৃদয় ঢালিয়া দিয়াছেন। যক্ষ মেঘকে প্রলোভন দেখাইয়া বলিয়াছেন, উজ্জয়িনীর পৌরাঙ্গনাদের বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত চকিত লোলাপাঙ্গ দৃষ্টি যদি না দেখ, তোমার নয়নই বৃথা ঃ

বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত চকিতৈ স্তত্র পৌরাঙ্গনানাং
লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি ॥ [পূর্বমেঘ. ২৭]

শ্রীবিশালা বিশালা উজ্জয়িনী, দেহে তাহার 'দিবঃ কান্তি' (স্বর্গের লাবণ্য)। সেখানে প্রত্যূষকালে শিপ্রানদী হইতে পদ্মগন্ধ আহরণ করিয়া বায়ু প্রবাহিত হয়, বিলাসিনী রমণীরা ধূপধূমে কেশ সুরভিত করে, এখানকার হর্ম্যতল 'ললিত-বনিতা-পাদ-রাগাঙ্কিত' ; এইখানেই গন্ধবতী নদীর তীরে সুপ্রসিদ্ধ মহাকাল-মন্দির, সায়ংকালে সুন্দরী দেবদাসীর নৃত্যে সেখানে মহাকালের আরতি হয়, রাত্রিকালে সূচিভেদ্য অন্ধকারে রুদ্ধালোক রাজপথে যোষিৎ বৃন্দ অভিসারে যাত্রা করে। উজ্জয়িনীর পর নীলবসনা গম্ভীরা নদী, তাহার পর দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের অধিষ্ঠানভূমি দেবগিরি। তাহার পর চর্মণ্বতীনদী, দশপুর, ব্রহ্মাবর্ত, কুরুক্ষেত্র, সরস্বতী, কনখল, হিমাচল, কৈলাসধাম ও মানসসরোবর। এক একটি চিত্র যেন সুরতলীলার এক একটি

স্বপ্নমায়া। কামার্ত যক্ষ কামচারী কামুক মেঘকে এই চিত্রের প্রলোভন দেখাইয়া অলকার দিকে চালিত করিয়াছিলেন।

ইহার পর 'উত্তরমেঘ'। উত্তরমেঘের পটভূমি অলকা। অলকাপুরী সৌন্দর্যের লীলানিকেতন, নিত্যানন্দের বিহারভূমি—'যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপাঃ নিত্য পুষ্পাঃ'; সেখানে নিত্য পদ্ম ফুটে, ভবন-শিখী নিত্য কলাপ মেলিয়া নাচে, নিত্য জ্যোৎস্না অন্ধকার নাশ করে: সেখানে শুধু প্রেম আর প্রেম:

> আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈ নির্নিমিত্তৈ-
> র্নান্যস্তাপঃ কুসুম শরজাদিষ্ট সংযোগসাধ্যাৎ।
> নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্বিপ্রয়োগোপপত্তি-
> র্বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি ॥ [উত্তরমেঘ. ৪]
> হর্ষবিনা অশ্রুধারা, জানেনা কেমন ধারা
> সেথায় যাহারা করে বাস।
> যৌবনের নাহি শেষ, দুঃখের নাহিক লেশ
> নাহি আর বিচ্ছেদ হুতাশ। [অনুবাদ—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

এই সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রেমের অমরাবতীতে যক্ষের ভবন। সে ভবন ভোগবতী সদৃশ। ইন্দ্রধনুর তোরণে শোভিত গৃহের আঙ্গিনায় মন্দার তরু: অন্তঃপুরে মরকত শিলার সোপানযুক্ত একটি মনোহর বাপী; বাপিতটে ইন্দ্রনীলমণিখচিত ক্রীড়াপর্বত। তাহার সন্নিকটে মাধবীলতার কুঞ্জ, কুঞ্জপার্শ্বে অশোক ও বকুল বৃক্ষ, বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে নীলকণ্ঠী ময়ূর বসিবার একটি স্বর্ণনির্মিত 'দাঁড়'। এই ভবন-প্রাসাদের হর্ম্যতলে বিরহখিন্না যক্ষোবধূ, যক্ষের জীবন ধন, 'যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ':

> তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
> মধ্যে ক্ষামা চকিত হরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ। [উত্তরমেঘ. ২১]

যক্ষের কল্পনায় বিরহিণী প্রিয়ার চিত্র জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিরহীর অন্তরের রঙে অঙ্কিত এই আলেখ্য চির বিরহিণীর অন্তর্বেদনা ও বহির্মুদ্রাকে প্রমূর্ত করিয়া তুলিয়াছে। মেঘ দেখিবে, প্রিয়বিরহে যক্ষোবধূ যেন শিশিরমথিতা পদ্মিনী—'সন্ন্যস্তাভরণমবলা', 'প্রবল রুদিতোচ্ছুন নেত্রং', 'ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠম্', ক্লিষ্ট কান্তি যেন 'কলামাত্র শেষাং হিমাংশোঃ'। শুধু তাই নয়, 'উৎসঙ্গে বা মলিন বসনে সৌম্য। নিক্ষিপ্য বীণাং মদ্‌গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্‌গাতুকামা' (কোলের উপর মলিন বসনে বীণাটি রাখিয়া আমারই কথায় রচিত গান গাহিতেছে)। রাত্রিতেও তিনি উন্নিদ্র, বিরহশয়নে 'ন প্রবুদ্ধাং ন প্রসুপ্তাং' অবস্থা। এই প্রিয়তমা বিরহিণীকেই বার্তা নিবেদন করিতে হইবে। মেঘদূত কাব্যের এই অংশটুকুই প্রকৃত-পক্ষে দূতবার্তা—যক্ষের 'উৎকণ্ঠা বিরচিত পদম্'। প্রিয়ার বিরহে যক্ষের নিজদশার এই সংবাদ অতি করুণ ও মর্মস্পর্শী। গাঢ় তাপে তাঁহার তপ্ততনু, উষ্ণশ্বাসে উচ্ছ্বসিত বক্ষ, তাঁহার অবস্থা দর্শনে বনদেবতাও অশ্রুপাত করেন। তিনি শিলাতলে

প্রিয়ার ছবি আঁকেন, স্বপ্নে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে যান, প্রিয়ার অঙ্গস্পর্শের লোভে উত্তর বাতাসকে আলিঙ্গন করেন ; তাঁহার পক্ষে 'দীর্ঘযামা ত্রিযামা'। যক্ষের শেষ কথা, 'কল্যাণি ! ত্বমপি নিতরাং মা গমঃ কাতরত্বম্।' কার্তিকের উত্থান একাদশী তিথির শুক্লা রজনীতে 'শাপান্ত' হইবে, সেইদিন বিরহের অবসান। বিরহ-দুঃখে মিলনের এই পূর্বভাষ সূচনা করিয়া মেঘদূত কাব্যের পরিসমাপ্তি।

মেঘদূত সত্যই একখানি অপূর্ব গীতিকাব্য। বিরহী যক্ষের সাকাঙ্ক্ষ অনুভূতির স্পর্শ অতি তীব্র। এই কাব্যে সম্ভোগার্তি নিঃসন্দেহে অতি প্রবল। কিন্তু কালিদাসের প্রেম-চেতনা কেবল সম্ভোগের সঙ্গেই যুক্ত নয়। প্রেম সম্পর্কে কবির হৃদয়ে যে একটি পূর্ণতার আদর্শ বর্তমান ছিল, মেঘদূত সেই আদর্শের রূপ। কালিদাসকল্পিত অলকা সেই পরিপূর্ণ অখণ্ড নিত্য অফুরন্ত প্রেম, সৌন্দর্য ও আনন্দের রাজ্য। পার্থিব তুচ্ছ সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে ইহা এক স্বর্গীয় নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দের স্তর। এ স্তরে অভোগ দ্বারা ইষ্টবস্তুতে রস উপচিত হওয়ায় স্নেহ প্রেমরাশিতে পরিণত হয়। ['তে হ্যভোগাদিষ্টে বস্তুন্যুপচিতরসাঃ প্রেমরাশী ভবন্তি' —উত্তর. ৫১]

মেঘদূত কাব্যের প্রকৃতি-চেতনাও বিশিষ্ট। প্রকৃতি এখানে সচেতন, স্পর্শকাতর। উহাকে নিছক সমাসোক্তি অলংকারের বিলাস বলা চলে না। প্রকৃতিরও একটি স্বতন্ত্র সংসার আছে ঃ গিরি-দরী-মেঘ সেই সংসারের পাত্র-পাত্রী। নদী নায়িকা, মেঘ নায়ক, পর্বত মেঘের বিশ্বস্ত বন্ধু। মেঘ নায়ক মানবী নায়িকার সঙ্গেও লীলা করে। এখানেই প্রকৃতির সহিত মানুষের প্রকৃত যোগ। এই যোগ আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে।

মেঘদূতের প্রতিটি শ্লোক বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে সমুজ্জ্বল। ইহা কবি-প্রতিভার প্রৌঢ়ত্বই সূচনা করে। 'মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ', 'যাচ্‌ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা', 'আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং সদ্যঃপাতি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি', 'রিক্তঃ সর্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায়', 'মন্দায়ন্তে ন খলু সুহৃদামভ্যুপেতার্থ কৃত্যাঃ', 'সূর্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বামভিখ্যাম্', 'প্রায়ঃ সর্বো ভবতি করুণাবৃত্তিরার্দ্রান্তরাত্মা', 'নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ'—প্রভৃতি প্রৌঢ়োক্তি বহুবিখ্যাত।

কাব্যজগতে 'মেঘদূত' অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহার অনুকরণে অনেকগুলি 'দূতকাব্য' রচিত হইয়াছে। জৈন কবিরাও ইহার অনুকরণে কাব্য রচনা করিয়াছেন। বাংলাদেশে রচিত হইয়াছে লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ধোয়ী কবির 'পবন-দূত' [দ্বাদশ শতাব্দী], রূপগোস্বামীর উদ্ধবসন্দেশ ও হংসদূত [ষোড়শ শতাব্দী]।

ধোয়ী কবি সম্পর্কে জয়দেব বলিয়াছেন, ধোয়ী ছিলেন, 'শ্রুতিধর', 'কবিক্ষ্মা-পতি' ['শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতি']। রাজা লক্ষ্মণসেন ও গন্ধর্বকন্যা কুবলয়-বতীর কল্পিত প্রেমের কাহিনী 'পবনদূত' কাব্যের বিষয়। লক্ষ্মণসেন দিগ্বিজয় উপলক্ষ্যে একবার মলয় পর্বতে উপনীত হইলে, গন্ধর্বকন্যা কুবলয়বতী মদনশরের

বশীভূত হন এবং বিরহাতুরা হইয়া পবনকে দূতরূপে গৌড়ে প্রেরণ করেন। কালিদাসের কাব্যে যেমন রামগিরি হইতে অলকা পর্যন্ত পথের বর্ণনা আছে, এই কাব্যেও তেমনি মলয় পর্বত হইতে গৌড় পর্যন্ত পথের বর্ণনা আছে। ইহাতে সুহ্ম, ত্রিবেণী, গৌড়, বিজয়পুর (লক্ষ্মণসেনের রাজধানী) প্রভৃতির বর্ণনা পাওয়া যায়। উহা হইতে জানা যায়,—সুহ্মের পবিসরভাগ ছিল গঙ্গাতরঙ্গবিধৌত, গৌড়ে মহাদেবের নগর ছিল শ্বেত অট্টালিকাশোভিত, উহা কৈলাস পর্বতের ন্যায় শোভা-সম্পন্ন, ত্রিবেণীর সন্নিকটে প্রদ্যুম্ননগর ছিল অতিশয় সমৃদ্ধিশালী। বিজয়পুরের রাজবাড়ীর বর্ণনা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ঃ রাজভবন সাতমহলা, রাজপ্রাসাদের প্রাচীরে খোদিত অনেক পুতুল, ভবনে এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা, প্রকাশ্য রাজপথ বারাঙ্গনাদের মঞ্জীর-নিক্কণে চমকিত ; নিশীথে অভিসারিকাগণের বিলাসাভিসার শুরু হয় এবং প্রেমিকা কামিনীগণের প্রেমালাপে রাজপুরী মুখর হয়। ধোয়ী কবি কাব্য রচনা করিয়া 'কবিরাজ' [কবিক্ষ্মাপতি] উপাধি ও হস্তী ও সুবর্ণ চামরাদি লাভ করেন ঃ

দন্তিব্যূহং কনককলিতং চামরে হেমদণ্ডে
যো গৌড়েন্দ্রাদলভত কবিক্ষ্মাভৃতাং চক্রবর্তী।

'পবনদূত' কাব্যের রচনা মেঘদূতের সমকক্ষ না হইলেও মধুর। ধোয়ী নিজেই নিজের রচনা সম্পর্কে বলিয়াছেন, 'বাক্‌সন্দর্ভাঃ কতিচিদমৃতস্যান্দিনো নির্মিতাশ্চ'।

রূপগোস্বামীর হংসদূত এবং উদ্ধবসন্দেশ বা উদ্ধবদূত 'দূতকাব্যে'র অন্তর্ভুক্ত হইলেও, উহার সুর ও ধ্বনি পৃথক। উহা গৌড়ীয় রাধাপ্রেমের সুরে সাধা। উহা-দিগকে ঠিক লৌকিক প্রেমকাব্যের পর্যায়ভুক্ত করা সঙ্গত নয়। রূপগোস্বামীর রচনা অলংকৃত ও সরস।

লৌকিক প্রেমের চিত্র হিসাবে 'অমরুশতক' একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। ইহাতে ধারাবাহিক কোন কাহিনী নাই, আছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চূর্ণ শ্লোকে প্রেমের বিবিধ অবস্থার চিত্র। শত শ্লোকের সমষ্টি বলিয়া ইহার নাম 'শতক'। কিন্তু অমরুশতকের বিভিন্ন সংস্করণে শ্লোকসংখ্যার সমতা দেখা যায় না ; কোথাও সংখ্যা কিঞ্চিন্ন্যূন একশত, কোথায়ও সংখ্যা শতাধিক। শ্লোকগুলিও সকল সংস্করণে একপ্রকার নয়। কেহ কেহ মনে করেন, 'অমরুশতক' অমরুর একার রচনা নয়, উহা একটি চয়নিকা। এ সম্পর্কে নিঃসংশয়ে কিছু বলা দুষ্কর। অমরুর কবিতা পরবর্তী বহু চয়নিকাগ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে ; প্রেমকবিতার প্রণেতা হিসাবে অমরু অমর। আচার্য আনন্দবর্ধন বলেন 'অমরুকস্য কবের্মুক্তকাঃ শৃঙ্গাররসস্যান্দিনঃ প্রবন্ধায়মানাঃ প্রসিদ্ধা এব।' [ধ্বন্যালোক-কারিকা ৩.৭]

অমরুর পরিচয় ও কাল অন্যান্য কবির মতই সংশয়িত। কেহ মনে করেন, অমরু বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম রত্ন অমরসিংহ। কিন্তু কিংবদন্তী বলে, অমরু হইলেন শংকরাচার্যের সমসাময়িক [খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক] একজন রাজা। মণ্ডন মিশ্রের পত্নী ভারতীদেবীর সহিত শংকরাচার্যের বিচার হয় এবং ভারতী আচার্যকে

রতি-বিষয়ে প্রশ্ন করেন।[১] শঙ্করাচার্য উত্তরদানে অসমর্থ হইয়া যোগবলে নিজ দেহ ত্যাগ করিয়া মৃত রাজা অমরুর দেহ আশ্রয় করেন এবং অমরুর পত্নীদের সহিত বাস করিয়া কামকলা সম্পর্কে যে সকল শ্লোক রচনা করেন, তাহাই "অমরুশতক" নামে খ্যাত।

অমরুশতক প্রকৃতপক্ষে কাম বা প্রেমের বিভিন্ন অবস্থার দৃষ্টান্তমূলক শ্লোকের সমষ্টি : সম্ভোগ এবং বিপ্রলম্ভের অন্তর্গত পূর্বরাগ, মান, প্রবাস প্রভৃতির উদাহরণ। প্রসঙ্গতঃ ইহাতে বিভিন্ন অবস্থায় নায়িকার অভিসারিকা, কলহান্তরিতা, বিপ্রলব্ধা, উৎকণ্ঠিতা ও প্রোষিতভর্তৃকার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। প্রেম এখানে পার্থিব জগতের নায়ক-নায়িকাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এইজন্য লৌকিক জগতের মিলনবিরহের চিত্র হিসাবে ইহাদের মূল্য অসাধারণ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

১. [অনুরাগিণী নায়িকার প্রতি সখীবাক্য]

অলসবলিতৈঃ প্রেমার্দ্রার্দ্রৈর্মুহুর্মুকুলীকৃতৈঃ
ক্ষণমভিমুখৈর্লজ্জালোলৈর্নিমেষপরাঙ্মুখৈঃ।
হৃদয়নিহিতং ভাবাকৃতং বমদ্ভিরিবেক্ষণৈঃ
কথয় সুকৃতি কোঽয়ং মুগ্ধে ত্বয়াদ্য বিলোক্যতে ॥ [অমরু. ৪]

—ওগো মুগ্ধে, মন্থর তির্যক কটাক্ষে, প্রেমার্দ্র মুহুর্মুকুলীকৃত নয়নে, লজ্জা-লুলিত অনিমেষ লোচনে, হৃদয় নিহিত ভাবাকৃতির প্রকাশক দৃষ্টিতে কোন্ পুণ্যবানকে দেখিতেছ ?

২. [কলহান্তরিতা নায়িকার প্রতি সখীবাক্য]

অনালোচ্য প্রেম্নঃ পরিণতিমনাদৃত্য সুহৃদ-
স্ত্বয়াকাণ্ডে মানঃ কিমিতি সরলে সম্প্রতিকৃতঃ।
সমাকৃষ্টা হ্যেতে প্রলয়দহনোদ্ভাসুরশিখা
স্বহস্তেনাঙ্গারাস্তদলমধুনারণ্যরুদিতৈঃ ॥ [অমরু. ৮০]

—হে সরলে, প্রেমের পরিণাম বিচার না করিয়া, সুহৃদের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া তুমি মান অবলম্বন করিয়াছ, প্রণয়কালে দহনক্ষম জ্বলন্ত অঙ্গার নিজহস্তে গ্রহণ করিয়াছে। এখন অরণ্যে রোদন করিয়া লাভ কি ?

৩. [ত্যক্তমান নায়িকার আক্ষেপানুরাগ]

ভ্রূভঙ্গে রচিতেঽপি দৃষ্টিরধিকং সোৎকণ্ঠমুদ্বীক্ষতে
রুদ্ধায়ামপি বাচি সস্মিতমিদং দগ্ধাননং জায়তে।

---

১. ভারতীদেবীর প্রশ্ন : কামের লক্ষণ কি ? উহার কত কলা ? তাহাদের প্রত্যেকেরই বা লক্ষণ কি ? শরীরের কোথায় কোথায় তাহারা অবস্থিত করে এবং কিরূপ ক্রিয়াদ্বারা তাহাদের আবির্ভাব-তিরোভাব হয় ?

(শংকরচরিত্র—রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ)

কার্কশ্যং গমিতেঽপি চেতসি তনূ রোমাঞ্চমালম্বতে
দৃষ্টে নির্বহণং ভবিষ্যতি কথং মানস্য তস্মিন্ জনে ।। [অমরু.২৮]

—আমার ভ্রূকুটি-রচিত দৃষ্টি উৎকণ্ঠাভরে তাহাকেই দেখে, কথা বন্ধ করিলেও এই পোড়ামুখে হাসি ফুটিয়া উঠে, কার্কশ্য প্রদর্শন করিয়াও দেহ রোমাঞ্চিত হয় ; তাহাকে চোখে দেখিলে কি মান রক্ষা করা যায় ?

৪. [প্রিয়তমকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্বীয় দেহে কৃতমঙ্গলা নায়িকা]

দীর্ঘা বন্দনমালিকা বিরচিতা দৃষ্ট্যৈব নেন্দীবরৈঃ
পুষ্পানাং প্রকরঃ স্মিতেন রচিতো ন কুন্দজাত্যাদিভিঃ ।
দত্তঃ স্বেদমুচা পয়োধরভরেণার্ঘ্যো ন কুম্ভাম্ভসা
স্বৈরেবাবয়বৈঃ প্রিয়স্য বিশতস্তন্ব্যা কৃতং মঙ্গলম্ ।। [অমরু.৪৫]

—পদ্মমালায় নয়, নিজ দৃষ্টিদ্বারা রচিত বন্দনমালায়, কুন্দ-জাত্যাদি পুষ্পে নয়, স্মিতহাসির কুসুমে, কুম্ভজলে নয়, পয়োধরক্ষরিত স্বেদধারার অর্ঘ্যে নিজ অবয়বেই নায়িকা নায়কের গৃহপ্রবেশ-জনিত মাঙ্গল্য রচনা করিলেন ।

কথিত হয়, অমরুর এক একটি শ্লোক শত প্রবন্ধের কাজ করে ['অমরুক কবেরেকঃ শ্লোকঃ প্রবন্ধ শতায়তে'] ; উক্তিটি মিথ্যা নয় । প্রত্যেকটি শ্লোক রস-নিস্যন্দী ও ব্যঞ্জনাময় । অমরু প্রেমকে স্বর্গলোকে প্রেরণ করেন নাই, মর্ত্যে প্রেমের স্বর্গ রচনা করিয়াছেন : পার্থিব প্রেম কত গভীর, কত সূক্ষ্ম, কত বৈচিত্র্য-মণ্ডিত হইতে পারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লোকে তাহা উদ্ঘাটন করিয়াছেন । অমরুশতকে কেবল নায়িকার হৃদয় উন্মোচিত হয় নাই, নায়কের প্রেমোজ্জ্বল চিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে ঃ যেমন নায়িকা-বিয়োজিত নায়কের এই চিত্রটি ঃ

প্রাসাদে সা দিশি দিশি চ সা পৃষ্ঠতঃ সা পুরঃ সা
পর্যঙ্কে সা পথি পথি চ সা তদ্বিয়োগাতুরস্য ।
হং হো চেতঃ প্রকৃতিরপরানাস্তি মে কাপি সা সা
সা সা সা সা জগতি সকলে কোঽয়মদ্বৈতবাদঃ ।। [অমরু. ১০২]

—প্রাসাদে সে, দিকে দিকে সে, সে পশ্চাতে, সে পুরোভাগে ; পর্যঙ্কে সে, পথে পথে সে, তাহার বিরহাতুর আমার আর অন্য প্রকৃতি নাই । সকল জগৎ তাদাত্ম্য—ইহা এক আশ্চর্য অদ্বৈতবাদ ।

এই প্রসঙ্গে কবি ভর্তৃহরির 'শৃঙ্গারশতকে'র নাম উল্লেখযোগ্য । ভর্তৃহরি তিনখানি শতক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ঃ নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক ও বৈরাগ্যশতক । শৃঙ্গারশতকের কবি বৈরাগ্য শতক রচনা করিয়াছেন, ইহা কৌতূহলের বিষয় । চৈনিক পরিব্রাজক yi-tsing বলেন, ভর্তৃহরি নাকি সাতবার বৌদ্ধ সঙ্ঘে যোগ দিয়াছেন, সাতবার নিয়মভঙ্গ করিয়াছেন । ভর্তৃহরির কবিতায় এই দ্বিধাচিত্ততার পরিচয় অতি স্পষ্ট । তিনি স্পষ্টই বলেন, এই অসার সংসারে মানুষের জন্য দুইটি পথ খোলা আছে, এক তত্ত্বজ্ঞানামৃতের আস্বাদন, অপর অঙ্গনাসম্ভোগ [শৃঙ্গার. ১৯] । কৃতী পুরুষের হৃদয়ে বিবেকদীপ ততক্ষণই জ্বলে, যতক্ষণ তাঁহারা কুরঙ্গনয়নাদের দৃষ্টিপথে

না আসেন ঃ হরিহর ব্রহ্মা বিশ্বামিত্র পরাশর সকলেই স্ত্রীমুখের মোহে মুগ্ধ [শৃ.৩]

কামের মোহ এড়াইবার শক্তি কাহারও নাই। কাম দণ্ডধর রাজা ; যে ব্যক্তি তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করে, তিনি তাহাদিগকে বিষম দণ্ডে দণ্ডিত করেন [শৃ. ৫৯]; কখনও তস্করের মত তিনি মনঃপান্থের সর্বস্ব হরণ করেন [শৃ. ৪৯]; কখনও ধীবরের মত স্ত্রীসংজ্ঞিত বড়িশ দ্বারা মর্ত্য-মৎস্যকে আকর্ষণ করিয়া প্রেমাগ্নিতে পাক করেন [শৃ. ৬০]। কামের এই মোহকর পরিণামের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কবি শৃঙ্গারের প্রধান বিভাব, উদ্দীপন বিভাব ও অনুভাবের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। প্রেম-নায়িকাদের কত না প্রকারভেদ ঃ কেহ ভ্রূভঙ্গযুক্তা, কেহ লজ্জাশীলা, কেহ বা ত্রস্তা, কেহ বা বিলাসিনী [শৃ. ২১]। উহাদের স্বভাবসিদ্ধ ভূষণ—চন্দ্রবিড়ম্বী বক্র কটাক্ষ, পদ্মজিত লোচন, স্বর্ণজয়ী বর্ণ, ভ্রমরের চেয়েও কৃষ্ণ কুন্তলরাশি, গুরু নিতম্ব ও মনোহারী মৃদু বচন। এই ভূষণই নারীর আয়ুধ।

ভর্তৃহরির মতে অমৃত বা বিষ বলিয়া কিছু নাই ঃ অনুরক্তা নারীই অমৃতলতা, বিরক্তা নারী বিষবল্লরী [শৃ. ২৩], স্বর্গই যেন মনোহরা নারীরূপে মর্ত্যে আবির্ভূতা [৬৩]; তপস্যার ফল স্বর্গ, স্বর্গেও অপ্সরা আছে ['তপসোঽপি ফলং স্বর্গঃ স্বর্গেঽপি চাপ্সরসঃ'—৬৯]।

কবি বৈধ প্রেমকেই 'রম্য' বলিয়াছেন ['রম্যং কুলস্ত্রীরতম্'—৭৫]। তাঁহার প্রেম আদর্শ প্রেম। তিনি বলেন, পুণ্য ব্যতীত এ প্রেম লাভ করা অসম্ভব—'পুণ্যৈর্বিনা নহি ভবন্তি সমাহিতার্থাঃ' [৪৮]। তাঁহার মতে, নরনারীর একচিত্ততাই কাম বা প্রেমের ফল, যেখানে একচিত্ততার অভাব, সেখানে মিলন মৃতের মিলন ঃ

এতৎকামফলং লোকে যদ্দ্বয়োরেকচিত্ততা।
অন্যচিত্তকৃতে কামে শবয়োরিব সঙ্গমঃ ॥ [৫৭]

শুধু তাই নয়,

বিরহোঽপি সংগমঃ খলু পরস্পরং সঙ্গতঃ মনো যেষাম্।
যদ্ হৃদয়বিঘটিতঃ সঙ্গমোঽপি বিরহং বিশেষয়তি ॥ [৮৭]

—মন যেখানে পরস্পর সঙ্গত, সেখানে বিরহও মিলন ; আর মন যেখানে বিযুক্ত, সেখানে মিলনও বিরহ-বর্ধন।

ভর্তৃহরির প্রেম-চেতনায় বৈরাগ্য সংবদ্ধ হইয়া আছে। প্রেম ও বৈরাগ্যের, ভুক্তি ও মুক্তির মিলিত রূপটিই তাঁহার প্রেমের আদর্শ। এই আদর্শের প্রতীক সর্বত্যাগী প্রেমিক হর ঃ

একো রাগিষু রাজতে প্রিয়তমাদেহার্ধহারী হরো
নীরাগেষ্বপি যো বিমুক্তললনাসঙ্গো ন যস্মাৎপরঃ।
দুর্বার স্মরবাণ পন্নগবিষজ্বালাবলীঢো জনঃ
শেষঃ কামবিড়ম্বিতো হি বিষয়ান্ ভোক্তুং চ মোক্তুং ক্ষমঃ ॥ [৮৩]

—রাগিগণের মধ্যে তিনিই এক, যিনি প্রিয়তমার দেহার্ধ ধারণ করিয়া বিরাজমান্, বিরাগিগণের মধ্যেও তিনিই যিনি ললনাসঙ্গ বিমুক্ত। দুর্বার মদনবাণ ও সর্প-

বিষের জ্বালা তিনিই আস্বাদন করিয়াছেন, অবশিষ্ট মানুষ কামবিড়ম্বিত, তাহারা একই সঙ্গে বিষয়কে ভোগ ও ত্যাগ করিতে অসমর্থ।

ভর্তৃহরির প্রেম-চেতনা অমরুর প্রেম-চেতনা হইতে স্বতন্ত্র। অমরু পার্থিব জগতের নায়ক-নায়িকার হৃদয় উদ্ঘাটন করিয়া মানবপ্রেমের সুখ-দুঃখের ছবি আঁকিয়াছেন; রক্তমাংসের স্বাদে তাহা অপূর্ব। ভর্তৃহরির প্রেম-চেতনায় মোহমুদ্গর উদ্যত হইয়াই আছে। তৃষ্ণাকে জয় করিবার জন্য তিনি তৃষ্ণার মনোহারী চিত্র অংকন করিয়া তাহার শোচনীয় পরিণামের প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করিয়াছেন। অমরু লৌকিক, ভর্তৃহরি অলৌকিক; অমরু কাব্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠ ও সমাদৃত, ভর্তৃহরি অধ্যাত্মজগতে; অমরু শিল্পী, ভর্তৃহরি সাধক কবি। প্রেমের এই দুই কোটির যোগসূত্র বুঝি কবি কালিদাস।

কাশ্মীরের বিখ্যাত কবি 'বিহ্লণ' চৌরপঞ্চাশিকা নামক একখানি প্রেমের কাব্য রচনা করেন। ইনি 'বিক্রমাংকদেবচরিত্র' নামে একখানি ঐতিহাসিক কাব্যেরও প্রণেতা। ইঁহার পিতার নাম রাজকলশ ও মাতার নাম নাগদেবী। ইনি নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। সাঙ্গবেদ, শব্দশাস্ত্র ও সাহিত্যবিদ্যা সকল বিষয়েই তিনি পারদর্শী। ইনি কল্যাণরাজ ত্রিভুবনমল্লদেব কর্তৃক (একাদশ শতক) 'বিদ্যাপতি' উপাধিতে ভূষিত হন। ['চৌলুক্যেন্দ্রাদলভত কৃতী যোঽত্র বিদ্যাপতিত্বম্']।

কথিত আছে, কবি নাকি ছিলেন রাজা বীরসিংহের কন্যা চন্দ্রলেখার প্রণয়ী। রাজা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। বধ্যভূমিতে নীত হইয়া চন্দ্রকলার উদ্দেশ্যে কবি পঞ্চাশটি শ্লোক পাঠ করেন। তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা তাঁহাকে মুক্তি দেন ও কন্যাকেও তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। বিহ্লণ 'চৌর কবি' (চউর কবি বা চতুর কবি)। এই নামেরই স্বাক্ষর বহন করে 'চৌর পঞ্চাশিকা'।

Keith সাহেব চৌরপঞ্চাশিকাকে 'Of purely erotic type' বলিয়াছেন। চৌরপঞ্চাশিকা নিঃসন্দেহে প্রেমের কাব্য ['শৃঙ্গারসার'], ইহার প্রত্যেকটি শ্লোক 'অদ্যাপি' এই শব্দটিকে আদ্য শব্দ করিয়া লিখিত এবং প্রত্যেকটি শ্লোক নায়িকার দেহরূপের বর্ণনার সহিত আসঙ্গলিপ্সার কথায় পূর্ণ। যেমন, এই প্রথম শ্লোকটি;

অদ্যাপি তাং কনক চম্পকদামগৌরীং
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুলোমরাজিম্।
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বললালসাঙ্গীং
বিদ্যাং প্রমাদগণিতামিব চিন্তয়ামি॥

—এখন সেই চম্পকগৌরী, ফুল্লারবিন্দবদনা, লোমাবলী শোভিতা, সদ্য জাগরিতা, মদনবিহ্বলা অলসাঙ্গী বিদ্যাকে প্রমাদে পড়িয়া চিন্তা করিতেছি।

কিন্তু চৌরপঞ্চাশিকাকে নিছক শৃঙ্গাররসের কবিতা বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে। শ্লোকগুলি দ্ব্যর্থক। উহা নায়িকাবিদ্যা পক্ষে এবং মহাবিদ্যা বিদ্যাপক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য। উহা একই সঙ্গে প্রেমিকার প্রশংসা ও দেবতার স্তুতি। দেবীপক্ষে প্রথম শ্লোকটির অর্থ করিলে দাঁড়ায়ঃ

—এখন প্রমাদে পতিত হইয়া আমি সেই অগোরী (কালী)—প্রস্ফুটিত নীল-পদ্মের মত যাঁহার বদন, নাভিতে শোভিত লোমাবলী, সুপ্তশিবোপরি উত্থিতা মদনবিহ্বলাঙ্গী বিদ্যাকে (মহাবিদ্যাকে) চিন্তা করি।

'চৌরপঞ্চাশিকা' কাব্যের আদর এই শ্লেষ-বক্রোক্তি সৃষ্টির দিক হইতে। কবি নিজেও বিক্রমাঙ্কদেবচরিত্রে নিজ রচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, যাঁহারা রহস্যলুব্ধ, তাঁহাদিগকে আমার এই গ্রন্থে শ্রদ্ধা করিতে হইবে ['বৈচিত্র্যরহস্যলুব্ধাঃ শ্রদ্ধাং বিধাস্যন্তি']; আরও বলিয়াছেন, যাঁহারা রসধ্বনির পথে বিচরণ করেন, যাঁহারা বক্রোক্তির রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ, তাঁহারাই আমার প্রবন্ধ ধারণ করিবেন, অন্যে শুকপক্ষীর ন্যায় আবৃত্তি মাত্র করিবে।[১]

বস্তুতঃ 'চৌরপঞ্চাশিকা' একদিকে প্রেমস্তুতি, অপরদিকে দেবীস্তুতি। ইহাদ্বারা প্রেম-চেতনার গতিপরিবর্ত্তনের একটি ইতিহাস পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রেম কালিদাসের সময় হইতেই লোকজগৎ হইতে ক্রমশঃ দেবজগতে প্রবিষ্ট হইতেছিল। প্রথমদিকে এই প্রেম শিব-শিবানীকে আশ্রয় করিয়াই অগ্রসর হইয়াছিল। কালিদাসে পাই হর-পার্বতীর শৃঙ্গার। সন্ধ্যাঞ্জলিতে পার্বতীর প্রতিবিম্ব দেখিয়া প্রমত্ত শিবের চিত্র বহু প্রকীর্ণ কবিতারও বিষয়ীভূত হইয়াছে। কবি ভর্তৃহরি প্রেম ও বৈরাগ্যের যুগনদ্ধ মূর্তি মহাদেবের প্রেমাদর্শকেই আদর্শ প্রেম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পরবর্তীকালে এই প্রেম বিষ্ণু-লক্ষ্মী এবং আরও পরবর্তীকালে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-চিত্রাংকনে সার্থক হইয়াছে। সাহিত্যে প্রেমের যাত্রা নরলোক হইতে দেবলোকের দিকে। লোকজগতের নায়ক-নায়িকার রূপ, হাবভাব, মিলনবিরহ, প্রেমের স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা দ্বারা দেব-শৃঙ্গার অধিবাসিত হইয়াছে। চৌরপঞ্চাশিকা সেই প্রেমবিবর্ত-বিলাসের ইতিহাসের সূত্রধার। শাক্ত কবিগণ প্রাকৃত বিভাব-অনুভাব লইয়া শিব-শক্তির প্রেমলীলা কীর্তনে মাতিয়াছেন, আর বৈষ্ণব কবিগণ বিষ্ণু-বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রী অথবা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায়। দ্বাদশ শতকের কাব্যে প্রেমের এই বিবর্তন-পরিণাম বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়, বিশেষতঃ বাংলাদেশে।

দ্বাদশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গারী কবি সেনকুলতিলক রাজা লক্ষ্মণসেনের সভারত্ন গোবর্ধন আচার্য। কবি জয়দেব বলিয়াছেন, আদিরসাত্মক সৎকবিতা রচনায় গোবর্ধন আচার্যের প্রতিস্পর্ধী কেহ ছিল না ['শৃঙ্গারোত্তর সৎপ্রমেয় রচনৈরাচার্য গোবর্ধনঃ স্পর্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ']। গোবর্ধন আচার্য 'আর্যা সপ্তশতী' রচনা করেন। সাতশত শ্লোকে ইহা রতি-বিষয়ক কোষকাব্য। প্রথমে দেববন্দনা ও কবি-প্রশস্তি করিয়া কবি ক-কারাদি বর্ণক্রমে শ্লোক বিন্যাস করিয়াছেন। আদ্যাক্ষরের বর্ণসমকতাই এখানে 'ব্রজ্যা'র সজাতিয়ত্ব রক্ষা করিয়াছে। আর্যাসপ্তশতী 'মদনাদ্বয়োপনিষদঃ'-মদনদ্বারা উদ্বোধিত অদ্বৈত আনন্দ বিশেষ ; উহা সোৎকর্ষ শৃঙ্গাররসরাজ-

---

১. রস ধ্বনেরধ্বনি যে চরন্তি সংক্রান্ত বক্রোক্তি রহস্যমুদ্রাঃ।
তেঽস্মৎ প্রবন্ধানবধারয়ন্তু কুর্বন্তু শেষাঃ শুকবাক্য পাঠম্ ॥

শালী ['সূক্তিঃ সোৎকর্ষ শৃঙ্গারা'—উপোদ্ঘাত, ৪৭]। কবি বলিয়াছেন, 'বাণী প্রাকৃত সমুচিতরসা বলেনৈব সংস্কৃতিং নীতা' [উপো. ৫২], তিনি সাতবাহন হালাদি বিরচিত প্রাকৃত প্রেম কবিতার ভাবকে সংস্কৃতে রূপান্তরিত করিয়াছেন। আর্যাসপ্তশতী বিভিন্ন কবি রচিত শ্লোক-সংগ্রহ নয়, কবির নিজের রচনা—উহা প্রাকৃত কবিতার অনুবাদও নয়, মৌলিক সৃষ্টি।

আর্যাসপ্তশতী আর্যাছন্দে রচিত প্রেম-বিষয়ক মুক্তকের সমষ্টি। প্রেমের বিভিন্ন পর্যায়—সম্ভোগ বা বিপ্রলম্ভ; প্রেমের বিভিন্ন দশা—অভিলাষ, উদ্বেগ, চিন্তা; নায়িকার বিভিন্ন অবস্থা—অভিসারিকা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, প্রোষিতভর্তৃকা বা স্বাধীন-ভর্তৃকা প্রভৃতিই ইহার বর্ণনীয় বিষয়। হালের গাথা সপ্তশতী বা অমরু-শতক হইতে বিষয়বস্তুর দিকে ইহার কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। কিন্তু বর্ণনা সর্বত্রই ভঙ্গীপ্রধান। বক্রোক্তির প্রয়োগে কবি নিঃসন্দেহে নিপুণ। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা যে ব্যঞ্জনাহীন, তাহা নয়। প্রেমের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ও ভাবগভীরতা অনেকগুলি শ্লোকে আভাসিত। প্রেমবঞ্চিতা নারীর উক্তিগুলি স্থানে স্থানে অতি করুণ। যেমন এই খেদোক্তি ঃ

অনয়ন পথে প্রিয়ে ন ব্যথা যথা দৃশ্য এব দুষ্প্রাপে।
ম্লানৈব কেবলং নিশি তপনশিলা বাসরে জ্বলতি ॥ ২৬

—প্রিয় যতদিন নয়নপথে থাকেন না, ততদিন তত দুঃখ হয় না, যত দুঃখ দৃশ্য হইয়াও দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে; সূর্যকান্ত মণি দিনে দগ্ধ হয়, রাত্রিতে ম্লান।

গোবর্ধন আচার্য নিঃস্বার্থ আদর্শ প্রেমের কথাও বলিয়াছেন। যাহা উত্তপ্ত করে না, স্নেহ শোষণ করে না, নির্বাপিত হয় না, নিশি নিশি উজ্জ্বল থাকে, রত্ন-প্রদীপের মত তাহাই আদর্শ প্রেম—

নোত্তপতে ন স্নেহং হরতি ন নির্বাতি ন মলিনো ভবতি।
তস্যোজ্জ্বলা নিশি নিশি প্রেমা রত্নপ্রদীপ ইব ॥ ৩১৭

গোবর্ধন আচার্য অনেকগুলি শ্লোকে মানবীয় প্রেমের ভাব ও অনুভাব দিয়া দেবতার প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন। দেবায়ত প্রেমের যুগল হর-পার্বতী, বিষ্ণু-লক্ষ্মী ও রাধাকৃষ্ণ। সে প্রেমেও মানব প্রেমের উল্লাস, নৃত্যচাপল্য ও বেদনা। হর প্রেমোন্মত্ত, পার্বতী ও লক্ষ্মী ভোগে উদ্দাম, কৃষ্ণ শঠ, রাধা ভাবময়ী। রাধার অপ্রগল্ভ বক্রোক্তিতে করুণ প্রেমসৌভাগ্যের গর্ব ধ্বনিত। রাধা শুনিলেন, মথুরায় কৃষ্ণের অভিষেক সম্পন্ন হইয়াছে, নানা তীর্থের জলে কৃষ্ণের মস্তক অভিষিক্ত হইয়াছে। এই সংবাদে রাধা কোন কথা বলিলেন না, শুধু গর্ব-সজল দৃষ্টিতে নিজের চরণ কমলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

রাজ্যাভিষেক সলিল ক্ষালিত মৌলেঃ কথাসু কৃষ্ণস্য।
গর্বভর মন্থরাক্ষী পশ্যতি পদ পংকজং রাধা ॥ ৪৮৮

—ভাব এই যে, যে মস্তকের আজ রাজ সমাদর, তাহা একদিন এই রাধা চরণে নত হইয়াছে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, লোকজগতের প্রেমকবিতা ক্রমে ক্রমে দেবলোকের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। নরলোকের প্রেমের নেপথ্য-বিধানদ্বারা অধ্যাত্ম প্রেমের প্রসাধন নিষ্পন্ন হইয়াছে। লৌকিক প্রেম কেন্দ্রাতিগ হইয়া দেবদেবীর প্রেমে পরিণত হইয়াছে এবং প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার স্থান অধিকার করিয়াছেন হর-গৌরী, কিংবা রাধা-কৃষ্ণ।

প্রেমের এই দেবায়ন সার্থক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণসেনের অপর সভাকবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে। কবি জয়দেব কেন্দুবিল্ব গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী ['পদ্মাবতী চরণচারণচক্রবর্তী...... জয়দেবঃ কবিঃ']। গীতগোবিন্দ 'মধুরকোমলকান্তপদাবলী'—অর্থাৎ উহা মধুর, কোমল ও সুন্দর পদাবলীতে গ্রথিত।

গীতগোবিন্দের বিষয় রাধাকৃষ্ণের বসন্তরাস। এই কাব্য নায়ক, নায়িকা বা সখীর উত্তর-প্রত্যুত্তর ছলে নাটগীতের ধরনে রচিত। ইহা সঙ্গীত-প্রধান। কাব্যের অমূল্য সম্পদ এই গান: উহা গীতিকবিতার মত হৃদয়ভাবের প্রকাশে ঝঙ্কৃত। গীতগোবিন্দ দ্বাদশসর্গে বিভক্ত। সর্গগুলির নাম যথাক্রমে সামোদদামোদর, অক্লেশ-কেশব মুগ্ধমধুসূদন, স্নিগ্ধ মধুসূদন, সাকাঙ্ক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষ, ধৃষ্ট-বৈকুণ্ঠ, নাগর নারায়ণ, বিলক্ষ লক্ষ্মীপতি, মুগ্ধমুকুন্দ, মুগ্ধমাধব, সানন্দ গোবিন্দ ও সুপ্রীত পীতাম্বর।

সূচনায় এই মঙ্গলাচারণ শ্লোক:

মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্ বনভুবঃ শ্যামলস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ংত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ ॥ [গীতগো. ১.১]

—অম্বর মেঘে মেদুর (স্নিগ্ধ), বনভূমি তমালদ্রুমাকীর্ণ হওয়ায় তমঃশ্যামল, রাত্রির আগমনে ভীত এই কৃষ্ণ—হে রাধে, তুমি ইহাকে গৃহে লইয়া যাও। নন্দের নির্দেশে তাঁহারা পথপ্রান্তের কুঞ্জাভিমুখে চলিলেন এবং যমুনাকূলে রহঃকেলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাধামাধবের এই গোপনলীলার জয়।

ইহার পর কবি-পরিচিতি, হরিস্মরণ, কবি-প্রশস্তি ও বিখ্যাত 'প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্'-আদি দশাবতার স্তোত্র। মূল কাব্যের আরম্ভ অপূর্ব বসন্ত বর্ণনা লইয়া: সখী আসিয়া জানাইলেন,

ললিত লবঙ্গলতাপরিশীলন কোমল মলয়সমীরে
মধুকর নিকরকরম্বিত কোকিলকূজিত কুঞ্জকুটীরে।
বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্যদুরন্তে ॥ [গীতগো. ১.২৮]

সামোদ দামোদরের অভিরাম বেশ: 'চন্দনচর্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালী'॥ তিনি যেন মূর্তিমান্ শৃঙ্গার ['শৃঙ্গারঃ সখি মূর্তিমানিব']। শুনিয়া দীনা রাধা

সখীর নিকট কৃষ্ণের সহিত তাঁহার শারদরাসের মধুর স্মৃতির 'রসোদ্গার' করিয়া বলিলেন, সখি, তাঁহাব সহিত মিলনের ব্যবস্থা কর।

কৃষ্ণও ওদিকে রাধাকে হৃদয়ে ভাবিয়া অন্য ব্রজ সুন্দরীদের ত্যাগ করিয়াছেন :

কংসারিরপি সংসারবাসনাবন্ধ শৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ [গীতগো. ৩.১]

এবং অনুতপ্ত হৃদযে রাধার জন্য বিলাপ করিতেছেন : 'কিং ধনেন কিং জনেন কিং মম সুখেন গৃহেণ'। এমন সময়ে সখী আসিয়া রাধার বিরহাবস্থার বর্ণনা করিতে লাগিলেন। রাধা আজ 'নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্।' [গীত. ৪.১]। শুধু তাই নয়, রাধা এমন কৃশ হইয়া গিয়াছেন যে, স্তনার্পিত হারও ভারী বলিয়া মনে করিতেছেন, তাঁহার মুখে শুধু হরিব নাম,

হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম্
বিরহবিহিত মরণেব নিকামম্ ॥ [৪.১৭]

কৃষ্ণ রাধাকে কুঞ্জে লইয়া আসিতে বলিলেন। সখী রাধাসমীপে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণের বিরহদশার বর্ণনা করিলেন : 'সখি হে সীদতি তব বিরহে বনবালী' এবং আরও বলিলেন, 'রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্' ; প্রতীক্ষায় তিনি অধীর, পত্র পতনের শব্দেও তিনি সচকিত :

পতিত পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভববদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্ ॥ [গীতগো. ৫.১০]

কিন্তু মিলনে উৎকণ্ঠিতা হইলেও রাধা বিরহে শক্তিহীনা, তিনি 'গন্তুমশক্তা'। সখী কৃষ্ণকে গিয়া সে কথা জানাইলেন, আর জানাইলেন কৃষ্ণ-সঙ্গমের জন্য বাসক-সজ্জিকা রাধার ভ্রমময়ী প্রলাপ-চেষ্টার কথা : রাধা যেদিকে তাকান হরিকেই দেখেন, হরি আসিয়াছেন মনে করিয়া অন্ধকারকেই আলিঙ্গন করেন [ষষ্ঠ সর্গ]। এদিকে হরিবিরহে রাধা সত্যই উচ্চবিলাপ করিতেছেন ; হায়, বৃথাই আমার রূপযৌবন, 'মম মরণমেব বরম্'। প্রত্যাগত সখীকে দেখিয়া এই বিলাপ আরও করুণ, আরও সোচ্চার হইয়া উঠিল ; রাধা বলিলেন, নিশ্চয় হরি আজ অন্য কোন ভাগ্যবতীকে তৃপ্ত করিতে-ছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি 'বহুবল্লভ' এই ভাবিয়া আবার তাঁহার সহিত মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন [৭ম সর্গ]। প্রভাতে আসিলেন কৃষ্ণ। তখন মদনানলে জর্জরিত খণ্ডিতা রাধার মানিনী অবস্থা। ক্রুদ্ধ কটাক্ষে তিনি কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন, সারারাত্রি জাগিয়া তোমার নয়ন রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে, আলস্যবশে চোখ ঢুলুঢুলু ['অলস নিমেষং'],

হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদম্।
তামনুসর সরসীরুহলোচন যা তব হরতি বিষাদম্ ॥ [গীতগো. ৮.২]

নবমসর্গে কলহান্তরিতা রাধার প্রতি সখীর উপদেশ, 'মা পরিহর হরিমতি-শয়রুচিরম্।' দশমে মুগ্ধ মাধবের রাধার মানভঙ্গের প্রয়াস। অতি বিখ্যাত এই অনুনয়োক্তি :

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী
হরতিদর তিমিরমতি ঘোরম্ ।
স্ফুরদধর সীধবে তব বদন চন্দ্রমা
রোচয়তি লোচনচকোরম্ ॥
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্ ।
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধি রত্নম্ ।...
স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদপল্লব মুদারম্ । [১০, ২, ৪, ৮.]

একাদশে পুনরায় সখীর অনুরোধ এবং মানান্তরিতা রাধার কুঞ্জগৃহে গমন। কৃষ্ণের তখন চন্দ্রদর্শনে তুঙ্গতরঙ্গ জলনিধির মত অবস্থা। রাধারও প্রিয়তমদর্শনে স্বেদাক্ত সহর্ষ ভাব। এই অবস্থায় লজ্জা লজ্জা পাইয়া দূরে অন্তর্হিত হইল ['সলজ্জা লজ্জাপি ব্যগমদতিদূরং মৃগদৃশঃ']। দ্বাদশসর্গে সুপ্রীত পীতাম্বরের সহিত রাধার মিলন। রতি-বিলাস ও বিলাসান্তে 'পত্রলেখা' রচনা এবং প্রার্থনা দ্বারা কাব্যের পরিসমাপ্তি।

জয়দেবের কাব্য অতি মধুর। ভাষা সুললিত, পরিমার্জিত ও শ্রুতিসুখকর। মাধ্বীক মধুর রস-মাধুর্য এই 'শৃঙ্গার সারস্বত' এর নিকট পরাভূত। এই কাব্যে মানবপ্রেমের দেবায়ন সুপ্রতিষ্ঠিত। লৌকিক বিভাব এখানে রাধা-কৃষ্ণে পরিণত, লৌকিক প্রেমানুভাব এখানে দেবশৃঙ্গারানুভাবে রূপান্তরিত। জয়দেব স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, এই কাব্য হরির বিলাস-বর্ণনা। ইহা শ্রবণে হৃদয় সরস হয়।

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাস কলাসু কুতূহলম্ ।
মধুর কোমলকান্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্ ॥ [গীত. ১.৩]

কাব্যমধ্যে এবং কাব্য শেষেও জয়দেব একথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, এই প্রেমগীতি ('উজ্জ্বলগীতি') 'হরিচরণ স্মৃতি সার'।

এই কাব্য হইতে বৈষ্ণবধর্মে রাধার সুপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসটিও অবগত হওয়া যায়। পূর্ববর্তী প্রেমকাব্যে রাধা সাধারণ নায়িকা, গীতগোবিন্দে রাধা কৃষ্ণের 'সংসারবাসনা-বন্ধ শৃঙ্খলা' ; লোকজগতের নায়িকা এখানে প্রায় 'মহাভাবময়ী' রূপে চিত্রিতা। জয়দেবে আসিয়া যে প্রেমধারার প্রবল উচ্ছ্বাস কল্লোলিত হইয়াছে, সেই ধারাই প্রবাহিত হইয়াছে বাংলার বৈষ্ণবপদাবলীতে। প্রেম-কবিতার বিবর্তনেতিহাসে জয়দেব একটি সীমাচিহ্ন।

(iii) নীতি কবিতা

আধুনিক গীতিকবিতায় নীতি কবিতার স্থান নাই। কারণ, নীতি কবিতা ব্যক্তিনিষ্ঠ নয়, বস্তুনিষ্ঠ ; ইহাতে নানাপ্রকার হিতোপদেশ, নীতি বা তত্ত্বকথা থাকে। কিন্তু সংস্কৃতে নীতিকবিতাও গীতকবিতার অন্তর্ভুক্ত। সেখানে ইহাকে বলা হইয়াছে 'সুভাষিত' বা 'সদুক্তি'।

ভারতীয় কাব্য নীতিপ্রধান। বৈদিক যুগ হইতে শুরু করিয়া পুরাণে, ইতিহাসে (রামায়ণ-মহাভারত), কথাসাহিত্যে, মহাকাব্যে কত যে নীতিবাক্যের সমাবেশ করা হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। জাতক, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ নীতিকথার ভাণ্ডার। এই সকল নীতিকথায় কেবল তত্ত্ব উপদেশ বিতরণ করা হয় নাই, সামগ্রিক ভাবে জীবন-যাপনের জন্য সাম-দান-দণ্ড-ভেদাদির কথাও বলা হইয়াছে, বলা হইয়াছে চতুর্বর্গের অন্তর্গত ধর্ম, অর্থ ও কামের কথাও। কাম-কথা স্বতন্ত্রভাবে শৃঙ্গারাত্মক কবিতার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ; আর ধর্মাদির কথা নীতিকবিতার মধ্যে ধরা হইয়াছে। এই কবিতাগুলি একদিকে যেমন জীবনের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা, ভূয়োদর্শন ও বহুদর্শনের কথায় ভাবসমৃদ্ধ, তেমনই প্রকাশভঙ্গির কুশলতায় মনোহর। নীতি কবিতাগুলিকে বলা যায়, ভালভাবে বলা ভাল কথা অর্থাৎ সু উক্ত সূক্ত। পঞ্চতন্ত্রকার বলেন,

> সুভাষিতময়দ্রব্যসংগ্রহং ন করোতি যঃ
> স তু প্রস্তাবযজ্ঞেষু কাং প্রদাস্যতি দক্ষিণাম্ ।। [মিত্র সম্প্রাপ্তি]

বস্তুতঃ প্রস্তাব-যজ্ঞের দক্ষিণা সুভাষিত, ইহা সদালাপীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। শুধু তাই নয়—অর্থান্তরন্যাস, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি কাব্যালংকার সৃষ্টিতে সূক্তির গুরুত্ব অসাধারণ।

নীতি কবিতাবলীর ভিতর চাণক্যশ্লোক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চাণক্যশ্লোকের প্রচলিত সংগ্রহ নিঃসন্দেহে অর্বাচীন। তথাপি ইহা হইতে নীতিকবিতার স্বরূপপ্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। চাণক্যনীতি বিশেষভাবে ন্যায়শাস্ত্র অনুগামী ঃ

> ১. নদীনাঞ্চ নখীনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্র পাণীনাং ।
> বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ ।।
> ২. উপকার গৃহীতেন শত্রুণা শত্রুমুদ্ধরেৎ ।
> পাদলগ্নং করস্থেন কণ্টকেনৈব কণ্টকম্ ।।

বররুচির নামে প্রচলিত 'নীতিরত্ন' সাহিত্য জগতে সুপরিচিত। কথিত আছে, ইনি ছিলেন বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম রত্ন। বররুচির এই শ্লোকগুলি বহুখ্যাত ঃ[১]

---

১. রাজকৃষ্ণ ঘোষ সম্পাদিত 'সর্বার্থপূর্ণচন্দ্র' (৬ষ্ঠ সংখ্যা) হইতে সংগৃহীত। অতি প্রচলিত বোধে শ্লোকগুলির অনুবাদ দেওয়া হইল না।

১. ইতর পাপফলানি যথেচ্ছয়া বিরত তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রহস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ ॥
২. সংসার বিষবৃক্ষস্য দ্বে এব রসবৎ ফলে।
কাব্যামৃত রসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সুজনৈঃ সহ ॥
৩. অগাধজলসঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিতঃ।
গণ্ডূষজল মাত্রেণ সফরী ফরফরায়তে ॥
৪. মণিলুণ্ঠতি পাদেষু কাচঃ শিরসি ধার্যতে।
যথৈবাস্তে তথৈবাস্তাং কাচঃ কাচো মণি র্মণিঃ ॥

ভর্তৃহরির 'নীতিশতক'[১] আর একটি অমূল্য সম্পদ। ইহা কিঞ্চিদধিক শতশ্লোকের সমষ্টি। শ্লোকগুলি জ্ঞানগভীর; কোন কোন শ্লোক প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। এই শ্লোকগুলি লক্ষণীয়ঃ

১. জয়ন্তি তে সুকৃতিনো রসসিদ্ধাঃ কবীশ্বরাঃ।
নাস্তি যেষাং যশঃকায়ে জরামরণজং ভয়ম্ ॥ [নীতি. ২৪]

—রসসিদ্ধ কবিগণই ধন্য; তাহাদের যশঃকায়ে জরা-মরণের ভয় নাই।[২]

২. সিংহঃ শিশুরপি নিপততি মদমলিনকপোলভিত্তিষু গজেষু।
প্রকৃতিরিয়ং সত্ত্ববতাং ন খলু বয়স্তেজস্য হেতুঃ ॥ [নীতি. ২৮]

—সিংহশিশু শিশু হইলেও মদমত্ত গজকে আক্রমণ করে; বলবানের প্রকৃতিই এইরূপ; বয়সের তারতম্য তেজের কারণ নয়।

৩. ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলোদ্গমে
নবাম্বুভির্ভূমি বিলম্বিনো ঘনাঃ।
অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ
স্বভাব এবৈষ পরোপকারিনাম্ ॥ [নীতি. ৭১]

—ফলভারে বৃক্ষ নমিত হয়, নবজলভারে মেঘ ভূমিতে নামিয়া আসে, সৎপুরুষগণ ঐশ্বর্যে অনুদ্ধত থাকেন, পরোপকারী ব্যক্তিদের এইই স্বভাব।

রাজর্ষি ভর্তৃহরি কর্মবাদের উপর জোর দিয়াছেন। যদিও তিনি বলেন, 'যৎপূর্বং বিধিনা ললাটলিখিতং তন্মার্জিতুং কঃ ক্ষমঃ,' তথাপি তিনি স্বীকার করেন, 'ফলং কর্মায়ত্তম্'—ভাগ্য বা ললাটলিখনও পূর্বজন্মের সঞ্চিত কর্মফল।

কুসুমদেব সংগৃহীত 'দৃষ্টান্তশতক' গ্রন্থখানিও হিতকথার আকর। সাধারণ উক্তিদ্বারা ইহাতে এক একটি বিশেষ উক্তি সমর্থিত হইয়াছে। যেমন,

১. স্বজাতীয়ং বিনা বৈরী ন জয্যঃ স্যাৎ কদাচন।
বিনা বজ্রমণিং মুক্তামণি র্ভেদ্যঃ কথং ভবেৎ ॥

---

১. নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে মুদ্রিত সংস্করণ।
২. মধুসূদনের 'যশের মন্দির' কবিতাও এইভাবের প্রতিধ্বনি।

—সজাতীয় ছাড়া শত্রুকে জয় করা যায় না, বজ্রমণি ব্যতীত কি মুক্তামণি ছিদ্র করা সম্ভব ?

২. নয়েনাঙ্কুরিতং শৌর্যং জয়ায় নতু কেবলম্ ।
অন্যাযুক্তং বিষং ভুক্তং পথ্যং স্যাদন্যথা মৃতিঃ ।।

—শৌর্য নয়যুক্ত হইলেই জয়ের কারণ হয়, অন্যথা শূরত্ব বিপরীত ফল দান করে ; বিষ অন্যবস্তু সংযোগে ভুক্ত হইলে হিতকর পথ্য হয়, নচেৎ তাহা মৃত্যুর কারণ।

রাজা লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধের নামে প্রচলিত 'ধর্মবিবেক'-এর নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইহার অনেকগুলি সূক্তি বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত। 'ধর্মস্য সূক্ষ্মাগতি', 'চিত্রা গতি কর্মণাম', 'দৈবী বিচিত্রাগতিঃ', 'লাভঃ পরং গোবধঃ', 'ফলেন পরিচীয়তে', 'যতো ধর্মস্ততোজয়ঃ' প্রভৃতি পৌরাণিক সূক্তি পৌরাণিক প্রসঙ্গদ্বারা ইহাতে সমর্থিত হইয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে এইরূপ অসংখ্য নীতি কবিতা আছে। কবিদের নব নব অভিজ্ঞতা ও প্রৌঢ়োক্তি দ্বারা যুগে যুগে ইহার সংখ্যা বর্ধিত হইয়াছে।

(iv) ধর্ম ও ভক্তিভাবের কবিতা

সংস্কৃত গীতিকবিতার একটি অংশ ধর্ম ও ভক্তিভাবের কবিতাদ্বারা সমৃদ্ধ। স্তুতিমিশ্রা প্রার্থনায় এই কবিতাগুলি আবেগকম্পিত। এগুলিতে হিন্দু জীবনের অন্যতম আকূতি বৈরাগ্য, শরণাগতি ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হইয়াছে। হিন্দু-জীবনের এক আকূতি যেমন ভুক্তি—তেমনই অন্য আকূতি মুক্তি। সংস্কৃত ভক্তিমূলক কবিতায় ভুক্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয় নাই, ব্যক্ত হইয়াছে শুধু মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। এইদিক হইতে বৈদিক ও পৌরাণিক স্তোত্র কবিতা হইতে ইহাদের স্বাতন্ত্র্য আছে।

স্তোত্রকবিতার আদি উৎস বৈদিক সূক্ত। কিন্তু বৈদিক সূক্তে শ্রীকামনা অর্থাৎ জাগতিক প্রেয়বস্তুর কামনা একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। পুরাণের স্তুতিগুলিতেও মুক্তিকামনার সহিত ভুক্তিকামনা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর নারায়ণী স্তুতিতেও রক্ষাপ্রার্থনায় সমৃদ্ধি প্রার্থনার কথা আছে। কিন্তু সংস্কৃত স্তোত্র বা ধর্মমূলক কবিতাগুলি একান্তভাবে বৈরাগ্যের সুরে বাঁধা। জাগতিক ভোগ-সুখের প্রতি বিরক্তি, পার্থিব কামনার অসারতা প্রদর্শন করাই এই স্তোত্র কবিতা-গুলির বিশেষত্ব। অন্তরের এই কামনা অত্যন্ত আবেগানুবিদ্ধ। পৌরাণিক স্তোত্রা-বলীতে আবেগ ও ভক্তির প্রকাশ থাকিলেও উহার প্রকাশভঙ্গীতে শিল্পীমনের স্বাক্ষর নাই ; সংস্কৃত ভক্তি স্তবগুলি সংস্কৃত কাব্যরীতিসিদ্ধ। ছন্দের ঝংকারে ও সুনির্বা-চিত শব্দের প্রয়োগে উহাদের মধ্যে সচেতন শিল্পী-মানসের প্রকাশ অতি স্পষ্ট।

এইরূপ স্তোত্ররচনায় সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য শংকরাচার্যের নাম। শংকরাচার্য মায়াবাদী দার্শনিক। কিন্তু লোক ব্যবহারের জন্য তিনি প্রপঞ্চজগতের একটি সুদীর্ঘ অধ্যারোপিত অবস্থাও স্বীকার করিয়াছেন। এই ব্যবহারিক স্তরের জন্য প্রয়োজন পূজা, জপ, ভক্তি ও প্রার্থনা। বিভিন্ন মূর্তিতে প্রকট ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ,

ভক্তি বিলসিত চিত্তে তাঁহার নাম স্মরণ ও গুণ কীর্তন এই স্তরের উপাসনা। শঙ্করাচার্যের স্তোত্র কবিতায় ঐকান্তিক ভক্তি ও আত্মনিবেদনের সুর বাজিয়া উঠিয়াছে।

শংকরাচার্য নাকি ছিলেন শ্রীবিদ্যার উপাসক। মহাশক্তির শ্রীরূপে প্রকাশ বিশেষতঃ ষোড়শী (ত্রিপুরা), অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতির মধ্যে। আচার্যের ভক্তিমূলক কবিতার অধিকাংশ এই সকল দেবীর বন্দনা। ত্রিপুরা, ললিতা, মীনাক্ষী, ভ্রামরী, শারদা, অম্বা, ভবানী রূপে যিনি বিশ্বশক্তিতে প্রকট, শংকরাচার্য অতি দীন-ভাবে তাঁহাদের চরণে শরণ প্রার্থনা করিয়াছেন। রচনায় একদিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে সৌন্দর্যরূপিণী দেবীর বিশ্ববিমোহিনী মূর্তি, অপরদিকে ভক্তহৃদয়ের সকাতর মিনতি। যেমন এই ত্রিপুরাসুন্দরী স্তোত্রটি ঃ

কদম্ববনচারিণীং মুনি-কদম্ব-কাদম্বিনীং
নিতম্বজিতভূধরাং সুরনিতম্বিনী সেবিতাম্।
নবাম্বুরুহলোচনামভিনবাম্বুদ শ্যামলাং
ত্রিলোচনকুটুম্বিনীং ত্রিপুরসুন্দরীমাশ্রয়ে ॥

—যিনি কদম্ববনচারিণী, যিনি মুনিগণের হৃদয়ে মেঘমালাস্বরূপ, যাঁহার নিতম্ব ভূধরজিত, যিনি সুরকন্যাসেবিতা, নবোদ্ভিন্ন কমলের মত যাঁহার নয়ন, নব নীরদের মত যিনি শ্যামল—ত্রিলোচন গৃহিণী সেই ত্রিপুরসুন্দরীর আমি আশ্রয় গ্রহণ করি।

সৌন্দর্যবর্ণনা ও ভাবব্যঞ্জনার দিক হইতে শংকরাচার্যের 'সৌন্দর্যলহরী' বা 'আনন্দলহরী' অপূর্ব কাব্য [দ্রষ্টব্য. এই গ্রন্থের ১ম খণ্ড]

শংকরাচার্যের কতকগুলি মাতৃস্তবে সন্তানের সকাতর আর্তি ধ্বনিত হইয়াছে। মীনাক্ষীদেবীর উদ্দেশ্যে 'মাং পাহি মীনাম্বিকে', শারদাদেবীর উদ্দেশ্যে 'ভজে শারদাম্বামজস্রং মদম্বাম্' ব্যাকুতিগুলি মনোরম। কবির দীনার্তি চরমে উঠিয়াছে 'ভবান্যষ্টক স্তোত্রে'

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন দাতা
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব
তদেকা গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ভবানি ॥

—আমার পিতা নাই, মাতা নাই; বন্ধু নাই, দাতা নাই; পুত্র নাই, পুত্রী নাই; ভৃত্য নাই, ভর্তা নাই; জায়া নাই, বিদ্যা নাই—বৃত্তিও নাই; আছ তুমি একা। ওগো ভবানি, তুমিই আমার গতি, তুমিই আমার গতি।

বিবাদে-বিষাদে, প্রমাদে-প্রবাসে, জলে-অনলে, পর্বতে শত্রুমধ্যে বা অরণ্যে তিনিই একমাত্র শরণ্য। পদে পদে যেমন শরণাগতি, তেমনই আবার কোন পদে অনুযোগ-অভিযোগের সুর। দেব্যপরাধক্ষমাপণ স্তোত্রে প্রপত্তির সহিত এই মৃদু অনুযোগ ঃ

পৃথিব্যাং পুত্রাস্তে জননি বহবঃ সন্তি সরলাঃ
পরং তেষাং মধ্যেঽবিরল-তরলোঽহং তব সুতঃ।

মদীয়োঽহং ত্যাগ সমুচিতমিদং নো তব শিবে
কুপুত্রো জায়তে ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥

ওগো জননি, এজগতে তোমার অনেক সন্তান আছে ; সকলেই সরল, আমিই একমাত্র চঞ্চল (তরল)। তাহার জন্য আমাকে ত্যাগ করা উচিত নহে, কারণ, কুপুত্র অনেক হয়, কিন্তু মাতা কখনও কুমাতা হন না।

শঙ্করাচার্যের 'শিবাপরাধক্ষমাপন' স্তোত্রটির ধ্রুবান্তিক পদের 'ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেবশম্ভো' ধ্বনিটিও অতি করুণ।

আচার্য শঙ্করের রচনার প্রধান লক্ষ্য দ্বৈতবাদের মধ্য দিয়া অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠা। অনেকগুলি কবিতায় সংসারাসক্তির প্রতি অতি কঠিন মোহমুদ্গর উদ্যত হইয়াছে। সংসারের আসক্তি ও সম্ভোগ যে মায়া—জীবন যে অতি নশ্বর—যেগুলি আপাত মনোরম সেগুলি যে অত্যন্ত কুৎসিত—তাহার প্রতি অঙ্গুলিসংকেত করা হইয়াছে। এ বিষয়ে শঙ্করাচার্যের 'মোহ-মুদ্গর' ভোগবৈরাগ্যের রাগে অনুরঞ্জিত একটি বিশিষ্ট কবিতা। ইহা পজ্ঝটিকা ছন্দে রচিত এবং প্রতিটি শ্লোক যেন সুকঠিন বজ্রনাদ ঃ

১. মূঢ় জহীহি ধনাগম তৃষ্ণাং কুরু তনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাম্।
যল্লভসে নিজকর্মোপাত্তং বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্ ॥

২. অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং নাস্তি ততঃ সুখলেশ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ সর্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ ॥

৩. কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বংবা কুত আয়াত স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥

৪. মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বং হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥
নলিনীদলগত জলমতিতরলম্ তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম্।
বিদ্ধি ব্যাধি ব্যালগ্রস্তং লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তম্ ॥

৬. তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে পরিহর চিন্তাং নশ্বর বিত্তে।
ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব-তরণ নৌকা ॥

ইহার পর আরও আছে ঃ আছে লোকের তাড়না, আত্মীয়স্বজনের স্বার্থলোভ ও আশার রঙীন নেশার কথা। আশার কি শেষ আছে ?

কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ুঃ ॥

শঙ্করাচার্যের এই বৈরাগ্যবিধুর উদাসীনতার ভাবই পরবর্তীকালের বাংলা বৈষ্ণব প্রার্থনার পদে এবং শাক্ত গীতাবলীর নির্বেদাকাঙ্ক্ষায় সুর যোজনা করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। শঙ্করাচার্য বৈরাগ্যের কথা কহিয়াছেন বটে, কিন্তু অকর্মা হইতে বলেন নাই। শঙ্করপন্থীই পরম ঔদার্যে এই শেষ কথাটি বলিতে পারেন,

মাতা মে পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ ॥

বিশ্বাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ভারতীয় ধর্ম-সাধনার মর্মকথা।

স্তোত্রকবিতার দিক হইতে ময়ূর কবির 'ময়ূরাষ্টক' ও 'সূর্যশতক' এবং বাণের 'চণ্ডীশতক' উল্লেখযোগ্য। বাণ ও ময়ূর উভয়েই কনৌজরাজ হর্ষবর্ধনের সভাকবি ছিলেন। কথিত আছে ময়ূর ছিলেন বাণের শ্বশুর। ময়ূরাষ্টকে ময়ূর বাণ-পত্নীর রূপ বর্ণনা করায় কন্যা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দেন এবং ময়ূর কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। ময়ূর তখন শতশ্লোকে সূর্যের স্তব করিয়া রোগমুক্ত হন ঃ ইহাই সূর্যশতক। বাংলা ধর্মমঙ্গলকাব্যের আদি কবিরূপে এক ময়ূরভট্টের নাম করা হয়। ইনি এই 'সূর্যশতক' রচয়িতা ময়ূর হইতে পারেন, কারণ ধর্মঠাকুর সূর্যেরও প্রতীক এবং তিনি কুষ্ঠরোগ ভাল করিয়া দেন। ময়ূরের রচনায় উক্তি-চাতুর্য ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে।[১]

মনে হয়, বাণের 'চণ্ডীশতক' সূর্যশতকের অনুকরণে রচিত। 'চণ্ডীশতক' মহিষমর্দিনী চণ্ডীর প্রশস্তি। ইহাতে ময়ূর কবির রচনার মত দৃঢ়তা ও পারিপাট্য নাই। শ্লেষ ও অনুপ্রাসে রচনা ভারাক্রান্ত।

ভক্তিমাধুর্য ও আবেগানুকম্পিত প্রকাশভঙ্গির দিক হইতে আর একখানি গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য, তাহা লীলাশুক বিল্বমঙ্গলকৃত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত। কর্ণামৃত অপূর্ব গ্রন্থ। মনে হয়, গ্রন্থখানি দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন, ইহার তিনটি শতক। যদিও তিনটি শতকই আবিষ্কৃত হইয়াছে, তথাপি প্রথম শতকটিই (১১২টি শ্লোকের সমষ্টি) অধিক প্রচলিত। ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে জানা যায়, বিল্বমঙ্গল ছিলেন দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণবেণ্বা নদীতীরবাসী ব্রাহ্মণ। তিনি বারাঙ্গনা চিন্তামণির প্রেমাসক্ত ছিলেন। পিতৃশ্রাদ্ধের দিন ঝটিকাসংকুল রজনীতে কাষ্ঠ মনে করিয়া শব আশ্রয়ে নদী পার হন এবং রজ্জু মনে করিয়া একটি সর্পপুচ্ছ ধরিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্বক অনুরাগবশে চিন্তামণির গৃহে উপস্থিত হন। ঘটনা জানিতে পারিয়া চিন্তামণি তাঁহাকে বলেন, এই অনুরাগ যদি কৃষ্ণে সমর্পিত হইত, তাহা হইলে বিল্বমঙ্গলের জীবন সার্থক হইত। মুহূর্তে বিল্বমঙ্গলের মন পরিবর্তিত হয় এবং তিনি তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্তবৎ হইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন। পথে সোমগিরি তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করেন। দীক্ষা লাভ করিয়াও তাঁহার নয়ন এক বণিকপত্নীর রূপে আকৃষ্ট হয়। তিনি বণিকপত্নীর চুলের কাঁটা লইয়া নিজ চক্ষু বিদ্ধ করেন এবং অন্ধ নয়নে কৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদন করিতে করিতে পথ চলিতে থাকেন। কৃষ্ণ বালকবেশে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া চলেন। বিল্বমঙ্গল বুঝিতে পারিয়া কৃষ্ণের হস্ত ধারণ করেন- কিন্তু কৃষ্ণ বলপূর্বক হাত ছাড়াইয়া লন। তখন বিল্বমঙ্গল বলেন,

> হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
> হৃদয়াদ্ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে [কর্ণামৃত. ৩. ৯৬]

ভাগবতকার শুকদেব গোস্বামীর মত কৃষ্ণের মধুর লীলা আস্বাদন ও বর্ণনা করার

---

১. A Hist. of Sans. Lit.—Keith (p. 211).

জন্য বিল্বমঙ্গলকে বলা হয় 'লীলাশুক'। শুকপক্ষীর মতই তিনি যেন নিত্য বৃন্দাবনের মধুররসের দ্রষ্টা ও উদ্গাতা। বৈষ্ণব পদাকর্তারাও সাধন-ভজনে-কীর্ত্তনে 'লীলাশুক'।

বিল্বমঙ্গলের শ্লোকাবলী সত্যই কর্ণামৃত। শ্রুতিমধুর শব্দ ও ললিত পদের ঝঙ্কারে ও আবেগস্পন্দিত অনুভূতির প্রকাশে ইহার প্রতিটি শ্লোক চমৎকার গীতি-কবিতা। প্রথমেই গুরুবন্দনা.

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছ মৌলিঃ।
যৎপাদ কল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলা স্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ ॥ [কর্ণা. ১. ১]

—চিন্তামণির জয়, যেয় গুরু সোমগিরির ; আর জয় হউক আমার শিক্ষাগুরু শিখি-পিঞ্ছমৌলি ভগবানের, তাহার পদকল্পতরু শেখরে লীলাসুখ লাভ করেন জয়শ্রী।

বিল্বমঙ্গল কৃষ্ণের মধুর রূপের ভিখারী। মহামধুর নবীনকিশোর কৃষ্ণই তাঁহার 'প্রেমদ' 'কামদ' 'জীবন' ও 'জীবিত'। শ্লোকে শ্লোকে সেই মহামাধুরীর বর্ণনা। মাধুর্যের সার কিশোর কৃষ্ণের সবই মধুর—অঙ্গ মধুর, আনন মধুর, অতি মধুর মৃদুহাসি—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥ [কর্ণা. ১. ৯২]

বিল্বমঙ্গল এই মাধুর্যে উন্মাদ। তাই প্রতিক্ষণে তাঁহার ব্যাকুলতাময়ী দর্শনোৎকণ্ঠা ঃ

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো '
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥ [কর্ণা. ১. ৪০]

চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্মে বিল্বমঙ্গলের প্রেম-সাধনার প্রভাব অপরিসীম। মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে কর্ণামৃত নকল করাইয়া আনাইয়াছিলেন। তিনি ভাবোন্মত্ত হইয়া এই গ্রন্থ আস্বাদন করিতেন। মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের কতিপয় শ্লোক কর্ণামৃতেরই প্রতিধ্বনি। কবিরাজ গোস্বামী বলেন,

কর্ণামৃত সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হইতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম জ্ঞানে ॥
সৌন্দর্য মাধুর্য কৃষ্ণলীলার অবধি।
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি ॥ [চৈ. চ. মধ্য. ৯]

(v) চূর্ণ কবিতার চয়নিকা বা কোষকাব্য

বিভিন্ন বিষয়ে সংস্কৃত কবিগণ যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসোত্তীর্ণ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালের কোন-কোন কবি তাহাদের সংকলন গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন বলেন, 'নানা কবির রচনা হইতে মাধুকরী বৃত্তিতে সংগ্রহ করিবার কাজটা হয়তো বাংলাদেশেই আরম্ভ হইয়াছিল'।[১] এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কারণ, প্রাচীন সংগ্রহ গ্রন্থগুলি বাংলাদেশ হইতে প্রথম পাওয়া যাইতেছে। এই ধরনের গ্রন্থসংকলনের পশ্চাতে দুইটি মনোভাব ক্রিয়াশীল হইয়াছে ঃ

প্রথমতঃ সাহিত্য জগতে মহাকাব্যের যুগ তখন বোধ হয় শেষ হইয়া গিয়াছিল। কবিগণ 'কণিকা'-কবিতা রচনা করিয়া হৃদয়ভাবকে ধরিয়া রাখিতেছিলেন। কবিতাগুলি বিষয়বস্তুর দিক হইতে ছিল বহুবিচিত্র। বিষয়গুলিকে শৃংখলাবদ্ধ করিয়া বিভিন্ন কবির রচিত সমজাতীয় শ্লোকগুলিকে এক পর্যায়ে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। সংকলন-গ্রন্থ নির্মাণের পশ্চাতে এই মনোভাবটিই প্রধানতঃ ক্রিয়াশীল। ইহাতে 'ব্রজ্যা'য় একজাতীয় কবিতার সমাবেশ।

দ্বিতীয়তঃ ভিন্ন ভিন্ন কবি ভিন্ন ভিন্ন ভাবের অসংখ্য কবিতা রচনা করিয়াছেন। ক্ষণিক বিদ্যুদ্বিকাশের মত তাহাদের দীপ্তি, ক্ষণপ্রভার মতই তাহাদের স্থায়িত্ব। এই কবিতাগুলি যাহাতে কালের কবলে লুপ্ত হইয়া না যায় তাহাও লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন ছিল। উপরন্তু চূর্ণ কবিতাবলীর সব কবিতাই যে বিশিষ্ট তাহাও নহে। আবর্জনা স্তূপ হইতে অমূল্য মণিগুলিকে বাছাই করিয়া রাখিবার আবশ্যকতাও ছিল।

সংকলন গ্রন্থগুলির ভিতর সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়'[২]; কে এই গ্রন্থের সংকলয়িতা, তাহা প্রথমে জানা যায় নাই। পরে জানা গিয়াছে গ্রন্থখানির নাম 'সুভাষিত রত্নকোষ' এবং গ্রন্থখানির সম্পাদক বিদ্যাকর নামক একজন বৌদ্ধ আচার্য। গ্রন্থখানিতে মোট ৫২৫টি কবিতা। কবিদের মধ্যে কেহই একাদশ শতকের পরবর্তী নহেন। কাজেই অনুমিত হয়, খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের মধ্যে গ্রন্থখানি সংকলিত হইয়াছিল।

'ব্রজ্যা' ক্রমে কবিতাগুলি সজ্জিত হইয়াছে। প্রথমেই 'সুগত ব্রজ্যা'। তাহার পর 'লোকেশ্বর ব্রজ্যা'। তাহার পর 'হরিব্রজ্যা' ও 'সূর্যব্রজ্যা'। ইহার পর 'বসন্ত,' 'মালিনী', 'বিরহিণী' প্রভৃতি ব্রজ্যা।

'হরিব্রজ্যা'য় উদ্ধৃত শ্লোকগুলি হইতে রাধা-কৃষ্ণ লীলার মধুর রসের পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এই লীলা যে অধ্যাত্মলোকের সামগ্রী তাহারও স্পষ্ট ইঙ্গিত ইহাতে রহিয়াছে। ২১ নং শ্লোকে পাই রাধা-কৃষ্ণের রহস্যমধুর একটি সংলাপ ঃ

---

১. চিন্ময় বঙ্গ—ক্ষিতিমোহন সেন।
২. F. W. Thomas সম্পাদিত সংস্করণ।

কোঽয়ং দ্বারি হরিঃ প্রয়াহ্যুপবনং শাখা মৃগেণাত্র কিং
কৃষ্ণোঽহং দয়িতে বিভেমি সুতরাং কৃষ্ণঃ কথং বানরঃ।
মুগ্ধেঽহং মধুসূদনো ব্রজ লতাং তামেব পুষ্পাসবাম্
ইত্থং নির্বচনীকৃতো দয়িতয়া হ্রীণো হরিঃ পাতু বঃ॥

—দ্বারে কে ও ? হরি। শাখামৃগের এখানে প্রয়োজন কি ? উপবনে যাও। ওগো দয়িতে, আমি কৃষ্ণ। কৃষ্ণ ! তবে তো আরও ভয় পাইতেছি। বানর কি কালো ? ওগো মুগ্ধে, আমি মধুসূদন। তাহা হইলে মধু পুষ্পলতার কাছে যাও। প্রিয়াদ্বারা এই প্রকারে নিরুত্তরীকৃত লজ্জিত হরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

[এখানে হরি (বানর, কৃষ্ণ), মধুসূদন (মধুকর, কৃষ্ণ) শব্দগুলি দ্ব্যর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় চমৎকার কৌতুকরসের অবতারণা হইয়াছে। রাধাপ্রিয় কৃষ্ণ যে ভগবান, 'হরিঃ পাতু বঃ' বাক্যাংশ দ্বারা তাহা স্পষ্ট করা হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের এই লীলাই বর্ণিত হইয়াছে জয়দেবের গীতগোবিন্দে এবং পরবর্তীকালে বাংলার বৈষ্ণব পদাবলীতে]

সুভাষিত রত্নকোষ গৌড়ীয় রাধাকৃষ্ণলীলার প্রাক্ রূপ। বিরহিণী বা অসতী ব্রজ্যায় যে-সকল লৌকিক প্রেমের কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণ প্রেমের সূক্ষ্মতা ও সৌকুমার্য সম্পাদনে সেগুলিকে গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন এই দুইটি শ্লোক ঃ

১. মা মুঞ্চাগ্নিমুচঃ করান্ হিমকরং প্রাণাঃ ক্ষণং স্থীয়তাম্।
নেত্রে মুদ্রয় লোচনে রজনি হে দীর্ঘাতি দীর্ঘা ভব॥ [বিরহিণী ব্রজ্যা]

—সূর্য যেন উদিত না হয়, স্নিগ্ধ কিরণ কঠিন হউক ; প্রাণ একটু স্থির হও। ওগো নিদ্রে, লোচনদ্বয়কে মুদ্রিত কর, ওগো রজনি, তুমি দীর্ঘাতিদীর্ঘ হও। [মিলনের ক্ষণকে দীর্ঘতর করিবার জন্য ভাবী বিরহের আশংকায় শংকিতা নায়িকার কাতরোক্তি]

২. যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তাশ্চন্দ্রগর্ভা নিশাঃ
প্রোন্মীলন্নব মাধবী সুরভয়স্তে তে চ বিন্ধ্যানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি চৌর্যসুরত ব্যাপার লীলাভৃতাং
কিং মে রোধসি বেতসীবনভুবাং চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥ [অসতী ব্রজ্যা]

—যে আমার কৌমাহর, তিনিই এখন বর ; তেমনই চন্দ্রগর্ভা নিশা, তেমনই মাধবীগন্ধ, তেমনই বিন্ধ্যবাহিত সমীরণ ; আমিও সেই আমি ; তথাপি চুরি করিয়া বেতসীবনভূমির তীরে আমাদের যে সুরতলীলা হইয়াছিল তাহাতেই আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।

বাংলাদেশে সংকলিত আর একটি বিখ্যাত চয়নিকা 'সদুক্তি কর্ণামৃত'। সংকলক ছিলেন রাজা লক্ষ্মণসেনের 'প্রেমৈকপাত্র সখা' বটুদাসের সুযোগ্য পুত্র মহামাণ্ডলিক' শ্রীধরদাস। গ্রন্থটির সংকলনকাল দ্বাদশ শতকের শেষে [১১২৭ শকাব্দ]।

সদুক্তি কর্ণামৃতে তৎকালীন বঙ্গীয় কবিগণের রচিত বহু শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে। লক্ষ্মণ-সভার পঞ্চরত্ন—উমাপতি, জয়দেব, শরণ, গোবর্ধন ও ধোয়ীর পদ

তো আছেই, আছে সেনরাজগণ কর্তৃক রচিত প্রকীর্ণ শ্লোক। ইঁহাদের মধ্যে লক্ষ্মণসেন ও কেশবসেনের নাম উল্লেখযোগ্য।

সদুক্তি কর্ণামৃতের সংগৃহীত শ্লোকাবলী হইতে বাংলার চিরকালীন প্রকৃতি-শ্রী, বাংলার সমাজ, বাঙালীর আচার-ব্যবহার, ধর্ম, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সর্বোপরি বাংলার বৈষ্ণব ও শাক্ত সাহিত্যের স্বরূপ সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

বাংলায় পৌষমাস পাকা ফসলের মাস। এই সময় হালিকের ঘর শালিধানে পূর্ণ হয়, মাঠে মাঠে ষাঁড় ও ছাগ চরিয়া বেড়ায়, গ্রামগুলি ইক্ষুযন্ত্রের শব্দে মুখর হইয়া উঠে। কবির বর্ণনায় ইহা জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে ঃ

শালিচ্ছেদসমৃদ্ধ হালিকগৃহাঃ সৃষ্টনীলোৎপল-
স্নিগ্ধশ্যামযবপ্ররোহ নিবিড়ব্যাদীর্ঘসীমোদরাঃ।
মোদন্তে পরিবৃত্তধেন্বনডুহশ্ছাগাঃ পলালৈর্নবৈঃ
সংসক্তধ্বনদিক্ষুযন্ত্রমুখরা গ্রামাগুড়ামোদিনঃ ॥

কিন্তু এই ধরনের ঐশ্বর্য থাকিলেও বাংলার চিরদারিদ্র্যের ছবিও দুর্লভ নয়। কুটীরে ঘেরা বাংলার গ্রাম। বর্ষায় এই কুটীরগুলির বড় দুরবস্থা। কাঠের খুঁটি প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়ে, মাটির দেওয়াল ধসিয়া যায়, জীর্ণ গৃহ মণ্ডুকাকীর্ণ হয় ঃ

চলৎকাষ্ঠং গলৎকুড্যমুত্তানতৃণসঞ্চয়ম্।
গণ্ডূপদার্থি মণ্ডুকাকীর্ণং জীর্ণং গৃহং মম ॥

ইহাদের সঙ্গে আছে শৃঙ্গাররসের বহুবিচিত্র শ্লোক, বিশেষতঃ অভিসারিকা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা প্রভৃতি নায়িকার চিত্র। যেমন,

১. [বয়ঃ সন্ধির নায়িকা]
গতে বাল্যে চেতঃ কুসুমধনুষা সাবধহতং
ভয়াদ্বীক্ষ্যোবাস্যাঃ স্তনযুগমভূন্নির্জিগমিষু।
সকম্পা ভ্রূবল্লী চলতি নয়নং কর্ণকুহরং
কৃশং মধ্যং ভুগ্না বলিবলসিতঃ শ্রোণিফলকঃ ॥

—বাল্য গত হইলে চিত্ত মদনবাণে আহত হইল ; ভয়ে স্তনযুগল বাহির হইতে ইচ্ছুক হইল ; ভ্রূবল্লী কম্পিত, নয়ন আকর্ণ বিস্তৃত, মাজা কৃশ এবং শ্রোণিফলক ভারী হইল।

২. [বিরহিণী নায়িকার প্রতি সখীর ভর্ৎসনা]
দৃষ্টোঽয়ং বিষবৎপুরা পরিজন দৃষ্টৈর্যাতির্বারয়ন্
পৌর্বাপর্যবিদাং ত্বয়া নহি কৃতাঃ কর্ণে সখীনাং গিরঃ।
হস্তে চন্দ্রমিবাবতার্য সরলে ধূর্তেন ধিগ্‌বঞ্চিতা
তৎ কিং রোদিষি কিং বিষীদসি কিমুন্নিদ্রাসি কিং দূয়সে ॥

—পরিজন বারণ করা সত্ত্বেও, পূর্বপরাভিজ্ঞ সখীদের কথা কানে না শুনিয়া হে সরলে, তুমি ধূর্তের দ্বারা বঞ্চিত হইয়াছ ; এখন রোদন করিতেছ কেন, কেনই বা বিষাদ করিতেছ, কেন বিনিদ্র হইয়াছ, কেন কষ্ট ভোগ করিতেছ ?

চয়নিকা গ্রন্থাবলীর মধ্যে কাশ্মীরী কবি জহ্লণ-সংকলিত 'সুভাষিত মুক্তাবলী'র নামও উল্লেখযোগ্য। জহ্লণ ছিলেন রাজা কৃষ্ণের মন্ত্রী। গ্রন্থখানি ১২৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সংকলিত হয়। ইহাতে দয়া, দৈব, দুঃখ, প্রেম প্রভৃতি বিষয়ে শ্লোকগুলি সযত্ন বিন্যস্ত। বিভিন্ন কবি ও কবিতা সম্পর্কে প্রদত্ত তথ্যগুলিও অতিশয় মূল্যবান।

সংকলন গ্রন্থাবলীর মধ্যে রূপ গোস্বামীকৃত 'পদ্যাবলী'ও বহুখ্যাত। রাধা-প্রেমের দৃষ্টান্তস্বরূপ ইহাতে প্রাচীন কবিদের শ্লোকাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে পার্থিব প্রেম কবিতাই বৈষ্ণব প্রেমের সূক্ষ্ম সৌকুমার্যের বিধায়ক হইয়া উঠিয়াছে।

৬. গদ্যরচনা

মানুষের প্রথম সাহিত্য সৃষ্টির বাহন পদ্য। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে ইহা পরীক্ষিত সত্য। সরল অনাড়ম্বর অকৃত্রিম জীবনের সঙ্গে ছন্দোবদ্ধ কবিতার সাদৃশ্য আছে। গদ্যের প্রকাশ পরবর্তীকালের ; গদ্যের সৃষ্টি প্রয়োজনের তাগিদে। ইহা ব্যবহারিক বুদ্ধির বাহন।

প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রথম কাব্য বৈদিক সূক্ত ঃ সপ্তছন্দে তাহার প্রমুক্ত প্রকাশ। 'ব্রাহ্মণ' ঈষৎ পরবর্তীকালের, তাই উহাতে আসিয়াছে পদ্যের ভাষ্য রূপে গদ্য। উপনিষদেও গদ্য আছে। কোন কোন স্থলে উহা কবিতার মতই ছন্দোময়। গদ্যের প্রকাশ মহাভারতেও দেখা যায়। কোন কোন পুরাণের কোন কোন অংশ [যেমন, বিষ্ণুপুরাণের ঐতিহাসিক অংশ] গদ্যে লিপিবদ্ধ। কিন্তু গদ্যের এই সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত থাকিলেও, গদ্য দ্বারা প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে পরবর্তীকালে। ব্রাহ্মণের কোন কাহিনীতে বা উপনিষদের কোন অংশে গদ্যে কাব্য রচনার সম্ভাবনা সংকেতিত হইলেও ঐতিহাসিক যুগের পূর্বে গদ্যে কোন সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই।

সাহিত্যিক গদ্যের প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় ভারতীয় গল্পসাহিত্যে। পালিভাষায় গ্রথিত 'জাতকত্থবন্ননা'য় সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য লইয়াই গদ্য ব্যবহৃত হইয়াছে। অশোকের অনুশাসনগুলিতে বিভিন্ন প্রাকৃতে গদ্যের নিদর্শন রহিয়াছে। কিন্তু সংস্কৃতে রচিত এ হেন কোন গদ্যসাহিত্যের নিদর্শন খ্রীষ্টপূর্ব যুগে পাওয়া যায় নাই। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে কথাকার রূপে 'যাবক্রীতিক', 'বাসবদত্তিক' প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু সে-সকল গদ্যে না পদ্যে রচিত, তাহা বলা অসম্ভব। সংস্কৃতে রচিত নাটকগুলির মধ্যে কিছু কিছু গদ্য ব্যবহৃত হইয়াছে ; উহা সংলাপাত্মক। কথাসাহিত্যের গদ্যই সংস্কৃত সাহিত্যিক গদ্যের প্রথম রূপ।

॥ কথাসাহিত্য ॥

সংস্কৃত আলংকারিকগণ গদ্যরচনাকে প্রধান দুইটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন ঃ আখ্যায়িকা ও কথা। ভামহের মতে 'গদ্যেন যুক্তোদাত্তার্থা সোচ্ছ্বাসাখ্যায়িকা মতা' অর্থাৎ

'আখ্যায়িকা' গদ্যে রচিত হইবে, উচ্ছ্বাসে (অধ্যায় বিশেষ) বিভক্ত হইবে ; উহার মাঝে মাঝে বক্ত্র বা অপরবক্ত্র ছন্দে রচিত শ্লোক থাকিবে ; নায়কদ্বারা স্ব-চেষ্টিত বৃত্ত বর্ণিত হইবে এবং উহাতে কন্যাহরণ, যুদ্ধ, বিপ্রলম্ভাদির বর্ণনা থাকিবে। আর 'কথা'—এই সকল নিয়মের বহির্ভূত ; উহাতে বক্ত্র-অপরবক্ত্রাদি ছন্দে রচিত শ্লোক থাকে না, উহা উচ্ছ্বাসেও বিভক্ত হয় না ; উহাতে কাহিনীর বক্তা নায়ক নহেন, অন্য কেহ। আচার্য অভিনবগুপ্তও আখ্যায়িকা ও কথার এই ভেদ স্বীকার করিয়াছেন ['আখ্যায়িকোচ্ছ্বাসাদিনা বক্ত্রাপরবক্ত্রাদিনা চ যুক্তা। কথা তদ্বিরহিতা।'[১]]

কিন্তু আচার্য দণ্ডী আখ্যায়িকা ও কথার এহেন ভেদ স্বীকার করেন নাই ; তিনি বলেন, আখ্যায়িকার লক্ষণ কথাতেও আছে। কথা ও আখ্যায়িকা একই জাতীয় শুধু দুইটি সংজ্ঞাদ্বারা চিহ্নিত মাত্র ['কথাখ্যায়িকেত্যেকা জাতিঃ সংজ্ঞাদ্বয়াঙ্কিতা'—কাব্যাদর্শ ১. ২৮]। পরবর্তীকালে আখ্যায়িকা ও কথার পার্থক্য দেখানো হইয়াছে ভামহোক্ত 'বৃত্ত' (Tradition) ও 'স্বগুণাবিষ্কৃত' (Fancy)—পদ দুইটিকে ভিত্তি করিয়া ; অর্থাৎ আখ্যায়িকায় খানিকটা ইতিহাস থাকে, আর কথায় থাকে কল্পিত কাহিনী। কিন্তু এহেন ভেদের কথা প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রে স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করা হয় নাই।

কাহিনী-প্রধান গদ্য রচনাকে স্থূলভাবে বলা যায় 'কথাসাহিত্য'। এই কথা-সাহিত্যের দুইটি রূপ—(ক) লোককথা ও (খ) কথাকাব্য। প্রথমটি লোকপ্রচলিত উপকথাজাতীয় কথা—সরল, অকৃত্রিম, অনলংকৃত ; আর অপরটি কৃত্রিম আলংকারিক রীতিতে রচিত শিল্পিত কথা। দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই শিল্পসঙ্গত রূপ।

লোককথা

লোককথা সুপ্রাচীন কাল হইতে লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে। কথায়-বার্তায়, প্রবাদে-প্রবচনে এই 'কথা' বহুল ব্যবহৃত। এগুলি একযুগে রচিত হয় নাই, উহাদের রচয়িতাও একজন নহেন। পরবর্তীকালে এই সকল কাহিনী সংগৃহীত হইয়া কোন ব্যক্তিবিশেষের নামে প্রচারিত হইয়াছে। লোককথায় নৈর্ব্যক্তিকতার চিহ্ন অতি স্পষ্ট। সর্বোপরি এই সকল রচনায় আছে একটি সরল, অকৃত্রিম, অনলঙ্কৃত ভঙ্গির প্রকাশ। কিন্তু ভঙ্গি সরল হইলেও উহাতে লোকচরিত্র-জ্ঞানের অভাব নাই।

বিচিত্র কথাই লোককথার প্রাণ। কতকগুলি কথার লক্ষ্য স্পষ্টতঃ শিক্ষাদান। শিশুশিক্ষা বা লোকশিক্ষার জন্যই কাহিনীগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। আবার কতকগুলি কথা আছে, যেগুলি স্পষ্টতঃ আনন্দ বিতবণ ও অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট।

আচার্য Keith কাহিনীগুলির এই পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া লোককথাকে দুই শ্রেণীতে

---

১. লোচনটীকা—ধ্বন্যালোক ৩. ৭.

ভাগ করিয়াছেন : Fable এবং Tale[১] : Fable-এর আবেদন নীতিশিক্ষার দিক হইতে, আর Tale-এর আবেদন জীবনকথার দিক হইতে। কিন্তু লোককথায় এই দুইটি উপাদান এমনভাবে মিশ্রিত হইয়া আছে যে, উহাদিগকে ঠিক স্বতন্ত্র করিয়া দেখিবার উপায় নাই। তথাপি আলোচনার সুবিধার জন্য লোককথাকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হইল—(i) হিতকথা, (ii) রম্যকথা।

(i) হিতকথা

হিতকথা প্রধানতঃ নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্যেই রচিত। উহাদের আবেদন ব্যবহারিক। জীবনে প্রয়োজন অর্থ ও কাম, জীবন-পরিচালনার জন্য প্রয়োজন কতকগুলি নীতি। হিতকথায় এই নীতির গুরুত্ব। হিন্দুর অর্থনীতি, রাজনীতি ও কামনীতি মন্থন করিয়া উহাদের সারাংশ মনোজ্ঞ উপাখ্যানের মাধ্যমে সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে। মনু, বৃহস্পতি, শুক্র, ব্যাস, চাণক্য ও বাৎস্যায়নপ্রোক্ত বহু উক্তি উহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। শিশুশিক্ষার জন্যই যে এই হিতকথাগুলি সঙ্কলিত হইয়াছিল, কথারম্ভে তাহার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু এই হিতকথা শুধু বাল-বোধিনী নয়, উহা বৃদ্ধেরও শিক্ষা-দর্পণ। জীবনের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র চরিত্রের প্রাণী আসিয়া ইহাতে ভিড় করিয়াছে।

হিতকথাগুলির কাহিনী দুই শ্রেণীর : প্রাণী-কাহিনী ও মানবকাহিনী। প্রাণী-কাহিনী বা পশুপক্ষীর কাহিনীগুলি কৌতুকপ্রদ। এই সকল কাহিনীর নায়ক-নায়িকা —সিংহ, হস্তী, উষ্ট্র, বৃষভ, গর্দভ, বানর, শৃগাল, শশক, ছাগল, কুকুর, মার্জার, মূষিক, সর্প, মৎস্য, কুলীর, মশক, মৎকুণ প্রভৃতি পশু এবং হংস, সারস, কারণ্ডব, বক, কাক, শুক, কপোত, চক্রবাক, ময়ূর, গৃধ্র, চটক, টিট্টিভ প্রভৃতি পক্ষী। উহাদের মানবজীবনসুলভ আচার-আচরণ ও কথাবার্তা। উহাদেরও রাজা আছে, মন্ত্রী আছে, দূত আছে, আছে প্রভু-ভৃত্যসম্পর্ক, শত্রুতা, মিত্রতা, ধূর্ততা। দাম্পত্যে, বাৎসল্যে, সখ্যে প্রাণী-জগৎ মানব জগতের মতই সুখে-দুঃখে, হাসি-কান্নায় উদ্বেল। বস্তুতঃ হিতকথার জীবজন্তু মানুষেরই প্রতীক। মানবজীবনের কথাই রূপক ছলে ইহাতে বর্ণনা করা হইয়াছে। কোন কোন প্রাণী কোন কোন বিশিষ্ট মানবচরিত্রের প্রতীক, যেমন, সিংহ মদোৎকটদৃপ্ত, হস্তী মদোদ্ধত, শৃগাল-বায়স-বক ধূর্ত, সর্প কুটিল, মূষিক চতুর, গর্দভ মূর্খ।

মানব কাহিনীগুলির পাত্র-পাত্রী—রাজা, মন্ত্রী. ব্রাহ্মণ, নাপিত, বণিক, কুম্ভকার, পরিব্রাজক, পুংশ্চলী ও সাধারণ মানুষ।

কাহিনীগুলির আর এক আকর্ষণ—নীতিশ্লোক। সংসারের উচ্চাবচ পথে চলিতে চলিতে মানুষ যে অভিজ্ঞতা ও সত্য দর্শন অর্জন করিয়াছে, তাহার নির্যাস

---

১. Hist. of Sans. Lit.—Keith.

নীতিশ্লোক। হিতকথা নীতিশ্লোকের রত্নাগার ; উহার উপাখ্যানগুলিও নীতি-শ্লোকের দৃষ্টান্ত মাত্র।

হিতকথাগুলির ভিতর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দুইটি গ্রন্থ—পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ।

॥ পঞ্চতন্ত্র ॥

পালিভাষায় রচিত 'জাতকত্থবণ্ণনা' এবং পৈশাচীপ্রাকৃতে রচিত অধুনা লুপ্ত গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'কে বাদ দিলে সংস্কৃতে রচিত প্রথম কথাসাহিত্য 'পঞ্চতন্ত্র'। 'পঞ্চতন্ত্র' বহুখ্যাত গ্রন্থ। বিভিন্ন ভাষায় ইহার কত যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা কঠিন। পণ্ডিতপ্রবর জোহান্‌স্‌ হার্ট্‌ল্‌ এই গ্রন্থ সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন এবং 'তন্ত্রাখ্যায়িকা' নামক ইহার এক কাশ্মীরী সংস্করণকে ভিত্তি করিয়া তিনি প্রমাণ করিয়াছেন, পঞ্চতন্ত্রের' কথা খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতে প্রচলিত। কিন্তু আচার্য Keith 'পঞ্চতন্ত্রে' লাতিন 'denarius' শব্দ হইতে আগত 'দীনার' শব্দটির প্রয়োগ দেখিয়া ইহাকে খ্রীষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতকের পূর্বের বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিয়াছেন। পঞ্চতন্ত্রের রচয়িতা 'বিষ্ণু-শর্মা'কে কৌটিল্য চাণক্য বিষ্ণুগুপ্ত বলিয়া মনে করিলে, উহাকে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেরও পূর্বে স্থাপন করিতে হয়।

অবশ্য পঞ্চতন্ত্র চাণক্যের পরবর্তীকালের রচনা, কারণ, ইহার মঙ্গলাচরণে চাণক্যের বন্দনা আছে এবং চাণক্যমতে পারদর্শী বানরের উল্লেখ আছে [অপরীক্ষিত-কারক. ৯ম কথা]। পঞ্চতন্ত্র খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকের রচনা বলিয়া অনুমিত হয়।

পঞ্চতন্ত্র-কথার সূচনায় আছে—গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ ও গ্রন্থকারের নাম। 'অস্তি দাক্ষিণাত্যে জনপদে মহিলারোপ্যং নাম নগরম্‌।' এই নগরে 'সকলশাস্ত্রকল্পদ্রুমঃ,' 'সকলকলাপারংগতঃ' অমর শক্তি নামে এক রাজা ছিলেন। এই রাজার তিন পুত্র। পুত্রগণ মূর্খ—'পরমদুর্মেধসঃ'। রাজার দুঃখের অবধি নাই। কারণ মূর্খ পুত্র চির-দুঃখের হেতু। অতএব রাজা মন্ত্রীদের আহ্বান করিয়া মন্ত্রণা করিতে বসিলেন। মন্ত্রিগণ কহিলেন, 'ছাত্রসংসদিলব্ধকীর্তিঃ' সকলশাস্ত্রে অভিজ্ঞ বিষ্ণুশর্মাকে অনুরোধ করা হউক, তিনি নিশ্চয় ইহাদিগকে জ্ঞানদান করিতে পারিবেন। রাজা বিষ্ণুশর্মাকে আহ্বান করিয়া প্রচুর ভূমিদানের প্রলোভন দেখাইয়া মূর্খ পুত্রদিগকে প্রবোধিত করিতে অনুরোধ করিলেন, বলিলেন, 'অহং ত্বাং শাসনশতকেন যোজয়িষ্যামি'। বিষ্ণুশর্মা নির্লোভ ব্রাহ্মণ্যদর্পে উত্তর করিলেন, 'দেব শ্রূয়তাং মে তথ্যবচনম্‌। নাহং বিদ্যাবিক্রয়ং শাসনশতেনাপি করোমি। পুনরেতাং স্তব পুত্রান্‌ মাসষট্‌কেন যদি নীতিশাস্ত্রজ্ঞান্ন করোমি ততঃ স্বনামত্যাগং করোমি।' অনন্তর বিষ্ণুশর্মা অনন্ত শব্দ-শাস্ত্র মন্থন করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সংক্ষেপে এই পঞ্চতন্ত্র রচনা করিলেন ঃ

সকলার্থ শাস্ত্রসারং জগতি সমালোক্য বিষ্ণুশর্মেদম্‌।
তন্ত্রৈঃ পঞ্চভিরেতচ্চকার সুমনোহরং কাব্যম্‌ ॥

সেইদিন হইতে এই পঞ্চতন্ত্র 'বালবোধনার্থম্' ভূতলে প্রবর্তিত হইয়াছে।

'পঞ্চতন্ত্র' পাঁচটি তন্ত্রের (বিষয়ের) সমষ্টি—মিত্রভেদ, মিত্রসম্প্রাপ্তি, কাকোলূকীয়, লব্ধ প্রণাশ ও অপরীক্ষিতকারক। প্রথম তন্ত্রের প্রধান গল্প করটক-দমনক নামা দুই ধূর্ত শৃগালের প্ররোচনায় সঞ্জীবক নামা বলিবর্দ ও পিঙ্গলক নামা সিংহের মিত্রত্বের অবসান। ইহাই বিখ্যাত করটক-দমনক কথা। আরবী-ফারসী প্রভৃতি ভাষায় এই কথার বিবিধ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, এই কাহিনী মূলতঃ ভারতীয়।

কথার ভিতর কথার অবতারণা কথাসাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ। পঞ্চতন্ত্রের কথাগুলি ইহার ব্যতিক্রম নয়। করটক-দমনক কথাটিও অপর একটি কথার অংশ। এই তন্ত্রে প্রসঙ্গতঃ প্রাণী-কাহিনীরূপে কীলকোৎপাটক বানর কথা; শৃগাল-দুন্দুভীর কাহিনী, কাক-কৃষ্ণসর্প-কনকসূত্র কথা; বক-কুলীর কাহিনী; নীলবর্ণ শৃগালের গল্প; টিট্টিভদম্পতীর কাহিনী; অনাগতবিধাতা, যদ্‌ভবিষ্য ও প্রত্যুৎপন্ন মতি মৎস্যত্রয়ের কাহিনী এবং হস্তী-চটকের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। মানবকাহিনীর মধ্যে আছে—পুরনায়ক দন্তিল ও সম্মার্জক গোরম্ভের কাহিনী [পুরনায়ক দন্তিল সম্মার্জক গোরম্ভের অপমান করিয়া রাজার বিরাগভাজন হইয়াছিলেন এবং পুনরায় গোরম্ভের সম্মান প্রদর্শন করায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন]; পরিব্রাজক দেবশর্মার কাহিনী; কৌলিক ও রথকারের কাহিনী [কৌলিক ও রথকার দুই বন্ধু। একদা এক 'যাত্রামহোৎসবে' এক রাজকন্যাকে দেখিয়া কৌলিক মদনাক্লিষ্ট হয়। বন্ধু রথকারের কৌশলে বাসুদেব মূর্তি ধারণ করিয়া কৌলিক রাজকন্যার সহিত গোপনে মিলিত হয়; এই কথা রাজা-রাণীর কানে উঠে। রাজকন্যার মুখ হইতে তাঁহারা জানিতে পারেন, স্বয়ং বাসুদেব রাজকন্যাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করিয়াছেন। শুনিয়া রাজা বলেন, আমার জামাতা যদি স্বয়ং নারায়ণ; আমি শত্রুকর্তৃক নিগৃহীত হই কেন? কৌলিক তাহা শুনিয়া বাসুদেব মূর্তিতে বীরের মত যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। স্বয়ং ভগবান বাসুদেব তাহার সহায় হওয়ায় যুদ্ধে জয় হয় এবং রাজাও বিহিতবিধানে কন্যাকে কৌলিকের হস্তে সমর্পণ করেন। এই গল্পে রাধা যে বাসুদেবের পত্নী, তাহার উল্লেখ আছে[১]]; ধর্মবুদ্ধি-পাপবুদ্ধির কথা; জীর্ণধন বণিকের কাহিনী এবং চোর বিপ্রের কাহিনী।

দ্বিতীয় তন্ত্র 'মিত্রসম্প্রাপ্তি'। ইহার প্রধান গল্প কাক-কূর্ম-মৃগ-মূষিকের কাহিনী। কিভাবে উহাদের মিত্রতা জন্মিয়াছিল, তাহাই মিত্রসম্প্রাপ্তির বিষয়। ইহাতেও প্রসঙ্গতঃ নানা কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মানব কাহিনীরূপে উল্লেখযোগ্য সাগরদত্ত বণিকপুত্রের কথা [প্রাপ্তব্য অর্থ মানুষ অবশ্যই লাভ করে, ইহাই এই কাহিনীর প্রতিপাদ্য বিষয়] এবং সোমিলক নামা কৌলিকের কাহিনী [কাহিনীটিতে অদৃষ্টবাদের জয় ঘোষিত হইয়াছে]

---

১. 'পরং কিন্তু রাধা নাম মে ভার্যা গোপকুল-প্রসূতা প্রথমা আসীৎ'

তৃতীয় তন্ত্র 'কাকোলূকীয়ম্'—কাক ও উলূকের কাহিনী পূর্বশত্রু মিত্রবৎ আচরণ করিলেও তাহাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়--গল্পটি এই নীতিবাক্যের দৃষ্টান্ত। ইহাতে প্রাণী-কাহিনীর মধ্যে আছে চতুর্দন্ত মহাগজ ও শশকের কাহিনী [জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব দেখাইয়া শশক কর্তৃক চন্দ্র-হ্রদ হইতে হস্তীযূথের বিতাড়ন], শশ-কপিঞ্জলের কথা, [শশক ও চটক কপিঞ্জল নিজেদের বিবাদ মিটাইতে গিয়া বিড়াল তপস্বী কর্তৃক নিহত হয়। বিড়ালের মুখে এই ধর্মকথা অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ ঃ 'অসারোহয়ং সংসারঃ। ...অহিংসৈব ধর্মমার্গঃ।'] এবং সামান্য পিপীলিকা কর্তৃক সর্প নিহত হওয়ার কাহিনী। মানব কাহিনীগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণ-ছাগল-ধূর্তের কাহিনী [ধূর্তগণ কর্তৃক ব্রাহ্মণ ছাগল হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল], হরিদত্ত ব্রাহ্মণের কথা [হরিদত্ত ব্রাহ্মণ সর্পকে ক্ষেত্রপালক দেবতা মনে করিয়া প্রত্যহ দুগ্ধ প্রদান করিত এবং বিনিময়ে একটি করিয়া 'দীনার' লাভ করিত। লোভবশতঃ বেশি সুবর্ণ লাভের আশায় সর্পকে বিনাশ করিতে গিয়া সে সর্প দংশনে প্রাণত্যাগ করে। এই কাহিনীতে 'দীনার' শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়], দ্রোণ নামক ব্রাহ্মণের কাহিনী [শত্রুরাও অনেক সময় হিতের কারণ হয়, গল্পটিতে এই দৃষ্টান্ত আছে ; চোর ও ব্রহ্মরাক্ষসের বিবাদের ফলে ব্রাহ্মণের গো-সম্পদ রক্ষা পাইয়াছিল], দেবশক্তি রাজার পুত্র ও বলিরাজার কন্যাদ্বয়ের কাহিনী [দেবশক্তি রাজার পুত্র বল্মীকোদরী রোগে আক্রান্ত হইয়া বিদেশে এক দেবালয় আশ্রয় করেন। সেই দেশের রাজকন্যাদ্বয় প্রত্যহ পিতাকে প্রণাম করিয়া একজন বলিতেন, বিজয়স্ব মহারাজ', অপরজন বলিতেন, 'বিহিতং ভুঙ্‌ক্ষ মহারাজ।' রাজা দ্বিতীয়ার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বিসর্জন দেন এবং মন্ত্রীরা সেই রাজকন্যাকে উদরী রোগাক্রান্ত রাজপুত্রের হস্তে সমর্পণ করেন। দৈবযোগে দুইটি সর্পের মধ্যে ঝগড়া হওয়ায় বিতণ্ডাছলে যে সত্য উদ্ঘাটিত হয়, তাহার ফলে রাজপুত্র রোগের ঔষধও প্রাপ্ত হন এবং প্রচুর সুবর্ণও লাভ করেন], যাজ্ঞবল্ক্য ও মূষিকার কাহিনী [যাজ্ঞবল্ক্য এক মূষিককন্যাকে মানুষের মত রূপ দিয়া পালন করেন এবং কন্যা বড় হইলে তাহাকে সূর্য, মেঘ, বায়ু, পর্বত প্রভৃতির হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু মূষিকা নানাছলে ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া মূষিককে বরণ করিতে অভিলাষী হয়], যজ্ঞদত্ত ব্রাহ্মণের কথা [পুংশ্চলী স্ত্রী-চরিত্রের দৃষ্টান্ত]।

চতুর্থ তন্ত্র 'লব্ধপ্রণাশম্' ঃ বানর-মকরের আখ্যান। মকর স্ত্রীর প্ররোচনায় বানরের সখ্য হইতে বঞ্চিত হয়—ইহাই প্রধান কাহিনী। প্রসঙ্গতঃ ইহাতে বিবৃত হইয়াছে—গঙ্গদত্ত মণ্ডূকের কাহিনী, লম্বকর্ণ গর্দভের কাহিনী [এই কাহিনীতে স্ত্রীসঙ্গকামনার বিষময় ফল প্রদর্শিত হইয়াছে], সিংহশিশু ও শৃগালের কথা [একটি শৃগালশিশু সিংহশাবকদের সহিত পালিত হইয়াছিল, কিন্তু সিংহশাবক সিংহ, শৃগাল শৃগাল—এই সত্যটিই এখানে উদ্ঘাটিত হইয়াছে], ব্যাঘ্রচর্মাচ্ছাদিত গর্দভের কাহিনী [মুখদোষে মানুষ বিনষ্ট হয়, ইহাই উপদেশ] ঘণ্টা-উষ্ট্রের কাহিনী ও মহাচতুরক শৃগালের কাহিনী [সাম-দাম-দণ্ড-ভেদ নীতিদ্বারা অভীষ্ট লাভের উপায়]।

মানব-কাহিনীরূপে এই তন্ত্রে আছে কুলাল যুধিষ্ঠিরের কাহিনী, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী

ও পঙ্গুর কথা [এক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর জন্য নিজের আয়ুর অর্ধ প্রদান করিয়া স্ত্রীর জীবন রক্ষা করে, কিন্তু অবিশ্বাসিনী স্ত্রী এক পঙ্গুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সেই ব্রাহ্মণকে ত্যাগ করে ঃ স্ত্রীজাতি অবিশ্বাস্য—ইহাই এই নীতিকথার প্রতিপাদ্য], নন্দ-বররুচির আখ্যান [রাজা নন্দ স্ত্রীর মনস্তুষ্টির জন্য হ্রেষারব করিতে বাধ্য হন, আর সচিব বররুচি স্ত্রীর জন্য মস্তক মুণ্ডন করিতে বাধ্য হন। স্ত্রীর জন্য মানুষ কি না করে], হালিক-পত্নীর কাহিনী [এক বৃদ্ধ হালিকের পত্নী কামোন্মত্ত হইয়া ধূর্ত-কর্তৃক প্রতারিত হয়]

পঞ্চম তন্ত্র 'অপরীক্ষিতকারক' ; ভালভাবে না দেখিয়া, না জানিয়া, না পবীক্ষা করিয়া কিছু করা সঙ্গত নয়—ইহাই এই তন্ত্রের উপদেশ। ইহার প্রধান কাহিনী শ্রেষ্ঠী-নাপিত-ক্ষপণক কথা [এক শ্রেষ্ঠী ধনহীন হইয়া স্বপ্ন দেখে যে পিতৃপুরুষা-র্জিত পদ্মনিধি ক্ষপণকের বেশে তাহার গৃহে আসিবেন, শ্রেষ্ঠী তাহাকে লগুড়াঘাত করিলে ক্ষপণক সুবর্ণময় হইয়া উঠিবে। পরদিন শ্রেষ্ঠী তাহার গৃহে ক্ষপণককে আসিতে দেখিয়া লগুড়াঘাত কবে এবং স্বপ্নদৃষ্ট বাক্য সফল হয়। সেই সময় এক নাপিত তথায় উপস্থিত ছিল। সে ভাবিল, ক্ষপণককে লগুড়াঘাত করিলে সুবর্ণ পাওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে ক্ষপণক-বিহারে গিয়া সে নগ্ন সন্ন্যাসীদের স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রহার করিতে থাকে, ফলে সে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়া শূলদণ্ডে দণ্ডিত হয। গল্পটিতে জৈন ভিক্ষুদের চিত্র লক্ষণীয়]। প্রসঙ্গত ইহাতে আছে ব্রাহ্মণ-নকুল-কৃষ্ণসর্প কথা ; সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যোগী ভৈরবানন্দ কর্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত চারিজন ব্রাহ্মণকুমারেব কথা [কুমার চতুষ্টয় ধনার্থী হইয়া যোগী ভৈরবা-নন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া বলে, 'কথয়তামস্মাকং বিবরপ্রবেশ-শাকিনীসাধন-শ্মশান-সেবন-মহামাংসবিক্রয় সাধকবর্তিপ্রভৃতীনামেকতমমিতি'। ভৈরবানন্দ তাহাদিগকে বিদ্যাদান করিয়া হিমালয় প্রদেশে গমন করিতে বলেন। সেখানে তাহারা প্রথমে তাম্রময়ী ভূমি পায়। একজন কুমার তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া সেইখানেই থাকিয়া যায়, অপর তিনজন আরও লোভে সম্মুখে অগ্রসর হয়। এইভাবে তাহারা ক্রমে রৌপ্যময় ভূমি ও সুবর্ণভূমি প্রাপ্ত হয় এবং দুইজন তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া রৌপ্য ও সুবর্ণ-ভূমিতে অবস্থান করে। চতুর্থকুমার অতিলোভ বশতঃ আরও সম্মুখে অগ্রসব হয় এবং সিদ্ধিমার্গচ্যুত ও পিপাসাকাতর হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে 'রুধিরাপ্লুতঃ ভ্রমচ্চ-ক্রমস্তক' এক ব্যক্তিকে দেখিতে পায়। ব্যক্তিটি সেই চক্রদ্বারা ব্রাহ্মণকুমারের মস্তকে আঘাত করায় সে প্রচণ্ড বেদনা অনুভব করিতে থাকে এবং পাপ হইতে নিস্তারের উপায় জিজ্ঞাসা করে। উত্তরে সে বলে, অপর কেহ আসিয়া যদি এইরূপে তাহার সহিত আলাপ করে এবং সে যদি তাহার মস্তকে আঘাত করিতে পারে, তবে এই বেদনার অবসান হইবে ; ব্রাহ্মণকুমার প্রশ্ন করে, সে কতকাল এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল। তখন 'বীণা বৎসরাজ' ধরণীর অধীশ্বর ; সে নাকি রামরাজত্বকাল হইতে দারিদ্র্যোপহত হইয়া এইরূপ ভ্রমণ করিতেছে। ইহা ধনদ কুবেরপ্রদত্ত শাস্তি। 'মস্তকধৃতচক্র' ব্রাহ্মণকুমার এইভাবে অতিলোভের প্রায়শ্চিত্ত করিতে থাকে। ওদিকে

সুবর্ণসিদ্ধি বন্ধুর খোঁজে আসিয়া তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করে। চক্রধর সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলে], অপরীক্ষিতকারকের অপর গল্পগুলি এই সুবর্ণসিদ্ধি ও চক্রধরের কথোপকথনছলে বর্ণিত। ইহাদের ভিতর আছে সিংহকারক ব্রাহ্মণপুত্রদের কথা [বিদ্যা হইতে বুদ্ধি শ্রেয়ঃ—এই উপদেশ], অপর ব্রাহ্মণ চতুষ্টয়ের কথা [ইহার প্রতিপাদ্য—লোকাচার-বর্জিত শাস্ত্রবিদ্যা নিষ্ফল ও উপহাসাস্পদ], মন্থরক নামা কৌলিকের কাহিনী [স্ত্রী-বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া সে দেবতার নিকট দুই মস্তক ও চারিহস্ত প্রার্থনা করে, ফলে রাক্ষসবোধে 'দ্বিশিরা চতুর্বাহু' লোকজন কর্তৃক বিনষ্ট হয়], সোমশর্মা ব্রাহ্মণের কাহিনী [শক্তুভাণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া অসম্ভব কল্পনার শোচনীয় পরিণাম], চন্দ্রভূপতি ও বানরের কাহিনী, রত্নবতী রাজকন্যার কাহিনী, ত্রিস্তনী রাজকন্যার কথা [অন্যায় দ্বারাও অনেক সময় কার্যসিদ্ধি হয়], একোদর পৃথগ্‌গ্রীব ভারণ্ডের কাহিনী ও ব্রহ্মদত্ত ব্রাহ্মণ ও সর্প-কর্কটের কাহিনী। অপরীক্ষিতকারকের কাহিনীগুলিতে যক্ষ-রাক্ষসের প্রসঙ্গ ও অলৌকিক আশ্চর্য কাহিনীর প্রভাব বেশি।

পঞ্চতন্ত্র ভারতীয় কথাসাহিত্যের ব্রাহ্মণ্য সংকলন। এই কথাগুলির বহু কথা জাতক, হিতোপদেশ, তুতিনামা ও ঈশপের গল্পেও স্থান পাইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীগুলিতে মানবধর্মশাস্ত্র (স্মৃতি), অর্থশাস্ত্র, জ্যোতিষ, পুরাণ, প্রভৃতির সুস্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। কতকগুলি কাহিনীতে যোগ ও তন্ত্রাচারের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। স্ত্রী-চরিত্রের প্রতি পঞ্চতন্ত্রকারের জাত-ক্রোধ, ইহা নীতিবাদী ব্রাহ্মণ্যের প্রভাব। পঞ্চতন্ত্র হইতে প্রায় দুইহাজার বৎসর পূর্বেকার ভারতবর্ষের সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চতন্ত্রকে 'সুমনোহরং কাব্যম্' বলা হইয়াছে। ইহার কাব্যত্ব মানবচরিত্রের বিশ্লেষণে, বর্ণনার প্রাঞ্জলতায় এবং কাহিনী বৈচিত্র্যে। প্রচারের উদ্দেশ্য থাকায় কোনস্থলে রসনিষ্পত্তি ক্ষুণ্ণ হইলেও গল্পের আবেদন ক্ষুণ্ণ হয় নাই। অনেকগুলি গল্পে সরস কৌতুকহাস্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

॥ হিতোপদেশ ॥

হিত-কথার আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ 'হিতোপদেশ'। সংকলয়িতার নাম নারায়ণ। ইনি বঙ্গদেশের লোক। Keith সাহেব এই সংকলনকে চতুর্দশ শতকের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী বলিয়া মনে করেন।

হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্র কথাগ্রন্থের বঙ্গদেশীয় সংস্করণ। ইহারও রচয়িতা বিষ্ণুশর্মা। এখানেও 'কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে'। পঞ্চতন্ত্রের কথা-স্থান দাক্ষিণাত্য ['অস্তি দাক্ষিণাত্যে মহিলারোপ্যং নাম নগরম্'], হিতোপদেশের কথা-স্থান পাটলিপুত্র ['অস্তি ভাগীরথীতীরে পাটলিপুত্র নামধেয় নগরম্']। পঞ্চতন্ত্রের রাজা অমরশক্তি, হিতোপদেশের দুর্মেধা পুত্রগণের পিতা রাজা সুদর্শন। পঞ্চতন্ত্রের বহু কথা হিতোপদেশের কথা। তবে পার্থক্যও কিছু আছে। হিতোপদেশ

চারিখণ্ডে বিভক্ত ঃ মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ ও সন্ধি। পঞ্চতন্ত্রের দ্বিতীয় তন্ত্র হিতোপদেশে প্রথম স্থান পাইয়াছে, আর প্রথম তন্ত্র দ্বিতীয়ে ঃ হিতোপদেশের 'বিগ্রহখণ্ডের' সহিত পঞ্চতন্ত্রের 'লব্ধপ্রণাশ'-এর মিল আছে।

পঞ্চতন্ত্রের সহিত হিতোপদেশের মিল থাকিলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে।[১] বন্ধুবর ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'হিতোপদেশের সাহিত্যিক মূল্য পঞ্চতন্ত্রের চাইতে অনেক কম, এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যেহ চতুষ্পাঠীর ছাপ অঙ্কিত।'[২] মন্তব্যটি সত্য। হিতোপদেশে গল্পভাগ হইতে নীতিশ্লোকের বাহুল্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কিন্তু তাই বলিয়া হিতোপদেশের গল্প-বৈচিত্র্য কম নয়। স্ত্রী-চরিত্রের বুদ্ধিমত্তা ও কামকুটিলতা এখানেও প্রদর্শিত হইয়াছে ঃ এখানে চন্দনদাসবণিক ও তাহার তরুণী ভার্যা লীলাবতীর আখ্যান, রাজপুত ও বণিক বধূর কথা [মিত্রলাভ], গোপ-গোপবধূ-দণ্ডনায়ক ও তৎপুত্রের কথা, কন্দর্পকেতু পরিব্রাজকের কাহিনী [ইনি সিংহলরাজ জীমূতকেতুর পুত্র। কোন পোত-বণিক তাঁহার নিকট বলে যে, 'অত্র সমুদ্রমধ্যে চতুর্দশ্যামাবির্ভূতা কল্পতরুতলে রত্নাবলী কিরণকর্বুরপর্যঙ্কে স্থিতা সর্বালঙ্কার ভূষিতা লক্ষ্মীরিব বীণাং বাদয়ন্তী কন্যা কাচিদ্ দৃশ্যতে ইতি'।[৩] রাজ-পুত্র তাহা শুনিয়া সমুদ্রে গিয়া সেই রূপ দর্শন করেন এবং রমণীর রূপাকৃষ্ট হইয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দেন। সমুদ্রমধ্যে তিনি কামিনীর সহিত মিলিত হন, কিন্তু নিষেধ সত্ত্বেও এক বিদ্যাধরীর চিত্রপট স্পর্শ করিয়া সেখান হইতে নির্বাসিত হন।—সুহৃদ্ভেদ], বণিক-বণিকবধূ ও ভৃত্যের কথা [সন্ধি] প্রভৃতি কথাগুলি নূতন। "সন্ধি" প্রস্তাবে সুন্দ-উপসুন্দের কাহিনী এবং বিগ্রহ-প্রস্তাবে বীরবরের উপাখ্যান নূতন যোজনা।

হিতোপদেশ গ্রন্থের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে প্রতিটি কথারম্ভে ও কথাশেষে রাজপুত্রদের সহিত বিষ্ণুশর্মার উক্তি-প্রত্যুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে। এক একটি কথা শুনিয়া রাজপুত্রগণ চমৎকৃত হইতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। হিতোপদেশে মগধ, বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চলের উল্লেখ রহিয়াছে ; ইহাতে বঙ্গদেশে প্রচলিত রূপকথার উপাদান ইতস্ততঃ ছড়ানো।

---

১. হিতোপদেশকার স্বীকার করিয়াছেন,

মিত্রলাভঃ সুহৃদ্ভেদো বিগ্রহ সন্ধিরেব চ।
পঞ্চতন্ত্রাৎ তথান্যস্মাদ্ প্রস্থানাদাকৃষ্য লিখ্যতে ।। [অবতরণিকা]

২. সাহিত্যে ছোটগল্প—ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

৩. কাহিনীটিতে 'সমুদ্রকন্যা'র সহিত বাংলা মঙ্গলকাব্যের 'কমলেকামিনী'র সাদৃশ্য আছে।

(ii) রম্যকথা

পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশের গল্পগুলিতে কতকগুলি প্রেম ও বীরত্বের কাহিনী আছে। এই কাহিনীগুলি ঠিক হিতকথা নয়, বাল-বোধনও উহাদের লক্ষ্য বলিয়া মনে হয় না। পঞ্চতন্ত্রের কৌলিক-রথকার কাহিনী [মিত্রভেদ], বলিরাজার কন্যা-স্বয় ও দেবশক্তি রাজার পুত্রের কথা [কাকোলুকীয়], নন্দ-বররুচি সংবাদ [লব্ধ-প্রণাশ] এবং অপরীক্ষিতকারকতন্ত্রের অধিকাংশ গল্প, বিশেষতঃ স্বর্ণসিদ্ধি ও চক্রধরের কাহিনীগুলি এবং হিতোপদেশের বীরবলের উপাখ্যান [বিগ্রহ] ও কন্দর্পকেতু পরিব্রাজকের কাহিনী [সুহৃদ্‌ভেদ] প্রভৃতি কথার লক্ষ্য প্রধানতঃ লোকরঞ্জন। অবশ্য উহাতেও যে নীতি না আছে, তাহা নয়—তবে নীতি প্রচারের উদ্দেশ্য একান্তই গৌণ। এগুলিকে বলা যায় রম্যকথা।

এই ধরনের রম্যকথার আদি উৎস খুব সম্ভব গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'। বৃহৎকথা আজ লুপ্ত। উহার কিছু কাহিনী ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী' এবং সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। সেই সকল কাহিনী হইতে মানবজীবনের বহুবিচিত্র আশা-কামনার রমণীয় কথার পরিচয় পাওয়া যায়।

গদ্যসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও কথার সংকলন-হিসাবে ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথা-মঞ্জরী' ও সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর'-এর প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখযোগ্য। উভয় গ্রন্থই পদ্যে রচিত ; ক্ষেমেন্দ্রের রচনা সংক্ষিপ্ত, উহাতে প্রায় ৭৫০০ শ্লোক আছে। সোম-দেবের 'কথাসরিৎসাগর' সুবৃহৎ। প্রায় ২২০০০ শ্লোকে নিবন্ধ এই গ্রন্থ ভারতীয় কথাসাহিত্যের এক বিপুল সংকলন। উহাতে গুণাঢ্যের গল্পগুলি তো আছেই, উপরন্তু আছে জাতক, অবদানশতক প্রভৃতির অনেকগুলি কাহিনী। কথাসরিৎসাগর সাগরের মতই বিশাল, সাগরের মতই লম্ভ ও তরঙ্গখচিত। বিষয়বিন্যাসেও সংক-লকের শৃংখলাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

কথাসরিৎসাগর আঠারটি লম্ভকে বিভক্ত : প্রত্যেকটি লম্ভকের আবার কতকগুলি করিয়া 'তরঙ্গ'। যেন গল্পের উপর গল্পের ঢেউ, অসংখ্য বীচিমালা। ১ম লম্ভকে (কথাপীঠ) গুণাঢ্যের কাহিনী, দ্বিতীয়ে (কথামুখ) উদয়ন-কথা, তৃতীয়ে উদয়ন-পদ্মাবতী কাহিনী, চতুর্থে নরবাহনদত্তের জন্ম। নরবাহনদত্তই প্রধান নায়ক। পঞ্চম হইতে অষ্টাদশ লম্ভক পর্যন্ত এই নরবাহনদত্তের বিচিত্র অভিযান ও বিভিন্ন পত্নী-লাভের কাহিনী। ইহারই মধ্যে আসিয়াছে জাতকের কথা, [অষ্টম লম্ভক], বেতাল-পঞ্চবিংশতির আখ্যান [দ্বাদশ লম্ভক], রাজা বিক্রমাদিত্যের কাহিনী [অষ্টাদশ লম্ভক]। কথাসরিৎসাগর ভারতীয় রম্যকথার রত্নসাগর।

ভারতীয় কথাসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ 'বেতালপঞ্চবিংশতি'। ইহার রচয়িতা শিবদাস। Keith সাহেব ইহাকে দ্বাদশ শতাব্দীর বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বেতালপঞ্চবিংশতির গল্পগুলি প্রাচীন। রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট এই কাহিনীগুলি বিবৃত হইয়াছিল। ইহাতে মোট ২৫টি কাহিনী আছে—প্রারম্ভে 'উপক্রমণিকা' ও গল্পশেষে একটি 'উপসংহার'। রাজা বিক্রমাদিত্যকে নিহত করিবার

জন্য শান্তশীল নামে এক যোগী ঘোর ষড়যন্ত্র করে। রাজাকে হেমগর্ভ শ্রীফল উপহার দিয়া সে রাজার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া ভাদ্র কৃষ্ণ চতুর্দশীর মহানিশায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলে। রাজা উপস্থিত হইলে যোগী তাঁহাকে দূরবর্তী এক শ্মশানে শিরীষ-বৃক্ষে লম্বমান একটি শবকে লইয়া আসিতে নির্দেশ দেয়। রাজা নির্ভীকচিত্তে শ্মশানে গিয়া শবদেহ দেখিতে পান এবং তাহাকে লইয়া আসিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এক বেতাল ওই শবদেহ আশ্রয় করিয়াছিল। রাজা বৃক্ষশাখা হইতে শবের রজ্জু কর্তন করিলে শব মাটিতে পড়ে এবং রোদন করিতে থাকে। রাজা তাহাকে প্রশ্ন করিলে পুনর্বার শবদেহ বৃক্ষে লম্বিত হয়। বারবার এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইতে থাকিলে রাজা নিজ উত্তরীয়বস্ত্রে বন্ধ করিয়া শবটিকে যোগীর নিকট লইয়া চলেন। পথে শবদেহাশ্রিত বেতাল রাজাকে সৎকথান্বিত কাহিনী বলিবার প্রস্তাব করে এবং শর্ত হয়, প্রত্যেক কাহিনীর পরে বেতাল রাজাকে প্রশ্ন করিবে, রাজা যদি প্রকৃত উত্তর দেন, তবে বেতাল পূর্ববৎ ফিরিয়া যাইবে—যদি জানিয়াও উত্তর না দেন তবে রাজার বক্ষ বিদীর্ণ হইবে। রাজা অগত্যা স্বীকৃত হইয়া পথ চলিতে লাগিলেন এবং বেতালও উপাখ্যান বলিতে লাগিল। বেতাল ২৫টি গল্প বিবৃত করিয়াছিল বলিয়া গ্রন্থের নাম হইয়াছে বেতাল-পঞ্চবিংশতি। প্রতিটি গল্পের শেষে বেতাল প্রশ্ন করিলে রাজা সঠিক উত্তর প্রদান করিতেন, তাহাতে বেতাল ফিরিয়া যাইত। কিন্তু শেষ গল্পের শেষে বেতাল যে প্রশ্ন করিল রাজা তাহার উত্তর দিতে পারিলেন না। বেতাল তুষ্ট হইয়া তখন বলিল, যোগী তাঁহাকে নিহত করিবার জন্য চক্রান্ত করিয়াছে। অতএব শব লইয়া উপস্থিত হইলে যোগী যখন তাঁহাকে প্রণাম করিতে বলিবে, তখন রাজা যেন যোগীকে বলেন, তিনি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানেন না, অতএব যোগী যেন তাঁহাকে এই প্রণাম-কৌশল শিখাইয়া দেয়। যোগী প্রণত হইলে, রাজা যেন অস্ত্রাঘাতে তাহার প্রাণসংহার করেন। রাজা বেতালের কথা অনুসারে যোগীর প্রাণবধ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের বরে এই বৃত্তান্ত ধরাতলে প্রসিদ্ধ হইল এবং রাজাও অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

বেতালপঞ্চবিংশতির কাহিনীগুলি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। চব্বিশ সংখ্যক কাহিনী পর্যন্ত প্রতিটি কাহিনীর অন্তে এইরূপ বিবৃতি দেখা যায়ঃ 'নৃপতি তাবদিতি বাদিনি বেতালঃ শিংসপাবৃক্ষে পুনর্ললাগ।' এবং কাহিনীর প্রারম্ভে 'ততো বেতালঃ কথামপরাং কথয়তি।' বেতালপঞ্চবিংশতির কাহিনী-মূল্য অসাধারণ। এখানে মানুষের সাধুতা, বিনয়, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি গুণের যেমন পরিচয় আছে, তেমনই পরিচয় আছে মানুষের অসাধুতা, লাম্পট্য ও প্রবঞ্চনার। বেতালপঞ্চবিংশতির অনেকগুলি গল্পে তন্ত্রাচারের প্রভাব আছে; Keith সাহেব ইহাকে 'Distinctly a product of the Tantras' বলিয়া মনে করেন। প্রায় প্রত্যেকটি গল্পই রোমাঞ্চকর। প্রকাশভঙ্গিতে বাক্চাতুর্যও লক্ষণীয়।

'দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা' এইরূপ আর একটি কথাগ্রন্থ। কবি কালিদাস ইহার

রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি; কিন্তু ইহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। এখানে বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন লইয়া বত্রিশটি কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। মহারাজ বিক্রমাদিত্য দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে একটি সিংহাসন লাভ করেন। এই সিংহাসন বত্রিশটি পুতুল দ্বারা সজ্জিত। শালিবাহন কর্তৃক বিক্রমাদিত্য যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন এবং বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন কালক্রমে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া যায়। ধারারাজ্যের নরপতি ভোজ এই সিংহাসন আবিষ্কার করিয়া উহাতে আরোহণ করিতে উদ্যত হইলে বত্রিশটি পুতুলের প্রত্যেকে রাজাকে বিক্রমাদিত্যের সারল্য, সাহস ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে এক একটি কাহিনী বিবৃত করিয়া রাজাকে বলে—এই সিংহাসনে বসিবার অনুরূপ যোগ্যতা না থাকিলে সিংহাসনে বসা অনুচিত—তাহাতে দারুণ অমঙ্গল ঘটিবে। বিক্রমাদিত্য অশেষ গুণের আধার ছিলেন, তাই এই সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিয়াছিলেন। রাজা ভোজ নিজগুণ বিচারপূর্বক সেই সিংহাসনে বসিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছিলেন। বত্রিশটি পুতুল-কথিত বত্রিশটি কাহিনী 'দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা'র বর্ণনীয় বিষয়। কথাগুলি রসোচ্ছল এবং উপন্যাসের মতই হৃদয়গ্রাহী। এই গ্রন্থে যে সুভাষিতাবলী আছে, তাহাদের অধিকাংশই পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ হইতে গৃহীত। মহাভারত, মনু, কৌটিল্য ও কামন্দকী শাস্ত্রের প্রচুর শ্লোক ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

চিন্তামণিভট্ট-প্রণীত 'শুকসপ্ততি', শুকপাখীর মুখে বর্ণিত ৭০টি গল্পের সমষ্টি। দেবদাস নামক এক ব্যক্তি বিদেশ গমন কালে পত্নীর নিকট একটি শুকপাখী রাখিয়া যান। দেবদাসের অনুপস্থিতিতে শুক গৃহস্বামিনীকে ৭০ রাত্রিতে ৭০টি গল্প বলেন। ফলে গৃহকর্ত্রীর প্রতিরাত্রিতেই বহির্গমনে বাধা পড়ে। ইতিমধ্যে দেবদাস গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। শুকের গল্প শুনিয়াই দেবদাস পত্নীর চরিত্রের শুচিতা রক্ষিত হয়।

গল্পসাহিত্য হিসাবে 'ভোজ প্রবন্ধে'র নামও উল্লেখযোগ্য।

॥ গদ্যকাব্য ॥

পঞ্চতন্ত্রাদি কথাসাহিত্যের সরল, অনাড়ম্বর কথাগুলি ঠিক কোন্ সময়ে সালঙ্কার গদ্যাত্মক কথাকাব্যে রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা বলা দুষ্কর; তবে গদ্যে নিবন্ধ কথাকাব্যের উৎস যে নিরলংকার কথাসাহিত্য, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

প্রচলিত লোককথায় (Popular tales) জীবজন্তুমূলক কাহিনী ও মানব কাহিনী পাশাপাশি ছিল। পঞ্চতন্ত্রে বা হিতোপদেশে এই দুই প্রকার কাহিনীই আছে। কিন্তু, পরবর্তী কথাসাহিত্যে দেখা যায়, ক্রমশঃ জীবমূলক কাহিনীর স্থানে মানব-কাহিনীগুলি প্রধান হইয়া উঠিতেছে। বেতালপঞ্চবিংশতি বা দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকায় মানব জীবনের কাহিনীই প্রধান। মানব কাহিনীগুলিতে জীবনের নানা বৃত্তির স্ফুরণই দেখা যায়—প্রেম, সাধুতা, শৌর্য; শঠতা, ধূর্ততা ও চৌর্য। ইহাদের

মধ্যে প্রেম কাহিনীগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিকৃত লালসার প্রতীক। কয়েকটি গল্পে অবশ্য সতীধর্মের আদর্শের কথাও আছে। কথাকাব্যের সচেতন শিল্পীবৃন্দ কথাসাহিত্যের এই প্রেম ও বীর্যের কাহিনীগুলিকে সুসংস্কৃত করিয়া অপূর্ব কাব্য-শোভায় ভূষিত করিয়া তুলিয়াছেন।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগ কিংবা সপ্তম শতক হইতে দণ্ডী, সুবন্ধু ও বাণের রচনায় এই ধরনের কথাকাব্য বা গদ্যকাব্যের একটি সুষ্ঠু পরিণত রূপ লক্ষ্য করা যায়। দণ্ডী, সুবন্ধু ও বাণ—তিনজনেই সুকবি, সুপণ্ডিত ও সুদক্ষ শিল্পী। রচনার চাতুর্য তাঁহাদের কথাকাব্যের অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ; নিরাভরণ প্রচলিত কথা তাঁহাদের প্রতিভাস্পর্শে সালঙ্কারা ও বর্ণাঢ্য হইয়া উঠিয়াছে—যেন বনলতাকে তাঁহারা উদ্যানলতায় পরিণত করিয়াছেন, অনাদৃত কুসুমকে তাঁহারা রাজকণ্ঠের মণি-মাণিক্য খচিত রত্নমালার সমান করিযা তুলিয়াছেন। প্রকাশ-প্রযত্ন গদ্যকাব্যের অন্যতম গৌরব।

গদ্যকাব্যের অপর আকর্ষণ ইহার কাহিনী। বীরকথা, যুদ্ধকথা, প্রেমকথা, চোর-কথা—যেন কথার বিচিত্র মেলা। সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় প্রেম ও বীর্যের কাহিনী। প্রেমকথা বাৎস্যায়নের সূত্রশাসিত হইলেও উহাদের গৌরব অল্প নয়। তৃতীয়তঃ বর্ণনার ঐশ্বর্য। এই বর্ণনার বাহুল্যে কাহিনীব গতি ব্যাহত হইলেও এ যেন মন্থর-গতি মেঘের জলস্তম্ভ রচনার মত; মেঘ চলিতেছে, কোথাও আবার থামিয়া বিচিত্র জলস্তম্ভ সৃষ্টি করিতেছে, আবার মৃদুমন্দগমনে চলিতেছে। মেঘের এই থামা ও চলা—দুইই উপভোগ্য। বাণভট্টের বাক্যে বলা যায়, 'কথা জনস্যাভিনবা বধূরিব।'

গদ্যকাব্যের সংখ্যা খুব বেশি নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে কালের বুকে উজ্জ্বল মহিমায় বিরাজ করিতেছেন তিনজন শক্তিমান কবি—দণ্ডী, সুবন্ধু ও বাণভট্ট।

॥ দণ্ডী ॥

আচার্য দণ্ডী কোন্ সময়ে কোন্ দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অমীমাংসিত। দণ্ডীর দুইখানি গ্রন্থ—'কাব্যাদর্শ' (অলঙ্কার বিষয়ক) ও 'দশমকুমারচরিত' (গদ্যকাব্য)। দশমকুমারচরিতের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক প্রসঙ্গ হইতে অনুমিত হয়, দণ্ডী শ্রীহর্ষের পূর্ববর্তী; কাব্যাদর্শ হইতে অনুমিত হয়, ভামহের (সপ্তম শতক?) পূর্ববর্তী। আচার্য Keith বলেন, 'not later than say, 643 A. D.'। কাব্যাদর্শ ও দশকুমারচরিত একই দণ্ডীর রচনা কিনা, তাহা লইয়াও মতভেদ আছে, কারণ, কাব্যাদর্শের কাব্যাদর্শ দশকুমারচরিতে অনুসরণ করা হয় নাই। Keith সাহেব মনে করেন, দুই দণ্ডীই এক ব্যক্তি; দশকুমারচরিত তাঁহার প্রথম বয়সের যৌবনরসে উচ্ছল দিনের রচনা, কাব্যাদর্শ পরিণত বয়সের। কিন্তু দশকুমারেও পরিপক্ক বুদ্ধি ও স্থির প্রজ্ঞার চিহ্ন অল্প নয। কবির জীবনী সম্পর্কে জনশ্রুতি এই যে, তিনি কাঞ্চীনগরের অধিবাসী; শৈশবেই পিতৃ-মাতৃ বিয়োগ হয়। শত্রুকর্তৃক রাজ্য আক্রান্ত

হইলে তিনি বিদেশে গমন করেন এবং রাজ্য পুনরায় উম্ধারপ্রাপ্ত হইলে তিনি রাজ-সভায় উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হন। দণ্ডী যে একজন প্রথম শ্রেণীর কবি, 'দণ্ডিণঃ পদলালিত্যম্ [লোকশ্রুতি], 'দণ্ডি-প্রবন্ধাশ্চ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাঃ' [হারাবলী] প্রভৃতি বাক্যই তাহার প্রমাণ ; অপর প্রমাণ তাঁহার গদ্যকাব্য—দশকুমারচরিত।

'দশকুমারচরিত' দশজন কুমারের অভিজ্ঞতা লব্ধ কাহিনীর বিবরণ। ইহা পূর্ব ও উত্তর—এই দুই পীঠিকায় বিভক্ত। পূর্ব পীঠিকায় পাঁচটি উচ্ছ্বাস ; অবন্তী-সুন্দরী পরিণয় লইয়া ইহা সমাপ্ত। উত্তর পীঠিকায় আটটি উচ্ছ্বাস ; বিশ্রুতের কাহিনী অসমাপ্ত। অনেকেই মনে করেন, দণ্ডী কাব্য সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই, এমন কি যে অংশ পাওয়া যাইতেছে, তাহারও সবটুকু দণ্ডীর রচনা নয়, উত্তর পীঠিকার প্রথমার্ধ মাত্র দণ্ডীর রচনা। দশকুমারচরিতের বিশিষ্ট রচনাচাতুর্যেরও স্বাক্ষর এই চারিটি উচ্ছ্বাস।

কাহিনীর কাঠামোটি এইরূপ ঃ মগধরাজ 'রাজহংস' মালবরাজ 'মানসার' কর্তৃক পরাজিত হইয়া মহিষী বসুমতী সহ বিন্ধ্যপর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেইখানেই রাজপুত্র রাজবাহন জন্মগ্রহণ করেন। ঘটনাক্রমে মগধরাজের উচ্চপদস্থ মন্ত্রী-সেনা-পতিদের নয়জন পুত্র সেখানে আনীত হয়। তাহাদের নাম পুষ্পোদ্ভব, সোমদত্ত, অপহারবর্মা, উপহারবর্মা, অর্থপাল, প্রমতি, মিত্রগুপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত ও বিশ্রুত। রাজবাহন ও বন্ধুগণ একই সঙ্গে লালিত-পালিত ও শিক্ষিত হন। তাঁহাদের অসাধারণ পাণ্ডিত্য—ষড়ঙ্গ বেদ, কাব্য, নাটক, ইতিহাস, ধর্মশাস্ত্র, তর্ক-মীমাংসা, কৌটিল্য ও কামন্দকীয়, যুদ্ধবিদ্যা, মণি-মন্ত্র-ওষধিবিদ্যা, ইন্দ্রজাল, চৌর্য—সবই তাঁহাদের নখদর্পণে। এই শিক্ষাপটুত্ব লইয়া তাঁহারা বিজয়যাত্রায় বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে 'মাতঙ্গ' নামা এক বিপ্রবেশী কিরাতের পরামর্শে রাজবাহন অন্যত্র চলিয়া যাওয়ায় বন্ধুগণের সহিত বিচ্ছেদ ঘটে। ঘটনাক্রমে রাজবাহন অবন্তীনগরে উপনীত হন এবং রাজকন্যা অবন্তীসুন্দরীকে দেখিয়া মোহিত হন এবং পূর্ব জন্মের স্মৃতি স্মরণ হওয়ায় বুঝিতে পারেন, 'নূনমেষা পূর্বজন্মনি মে জায়া যজ্ঞবতী', অবন্তীসুন্দরীরও জাতি-স্মরত্ব জন্মে, তিনিও বুঝিতে পারেন, 'নূনময়ং মৎপ্রাণবল্লভঃ'। ঐন্দ্রজালিক বিদ্যেশ্বরের বুদ্ধিকৌশলে রাজবাহনের সহিত অবন্তীসুন্দরীর মিলন হয়। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে রাজবাহন বন্দী হন, তাঁহার পদে 'রজতশৃংখল'। অবন্তীরাজ চণ্ডবর্মা তাঁহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখেন। কিন্তু অচিরেই তিনি শৃংখলমুক্ত হন। অপহার-বর্মার শৌর্যে ও কৌশলে চণ্ডবর্মা নিহত হন। অপর সকল বন্ধুও আসিয়া মিলিত হয়। রাজবাহনের নির্দেশে বন্ধুগণ একে একে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করিতে থাকে। নয়জন বন্ধুর কাহিনী এবং রাজবাহন-অবন্তীসুন্দরী কথা লইয়া মোট দশটি অদ্ভুত শৌর্য-বীর্য মণ্ডিত রোমাঞ্চকর অত্যাশ্চর্য প্রেম ও বীরত্বের কাহিনীই 'দশকুমারচরিত।'

দশকুমারচরিতের কাহিনীগুলি জীবনরসে উচ্ছল। প্রতিটি উচ্ছ্বাসে আশ্চর্য চমক, আশ্চর্য উন্মাদনা। চৌর্যে, লাম্পট্যে, ব্যভিচারে ও তঞ্চকতায় সর্বাপেক্ষা চমক

প্রদ উত্তরপীঠিকার দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস—অপহারবর্মচরিত। এ গ্রন্থে নীতির আদর্শ প্রখর নয়, যেন-তেন প্রকারণে পৌরুষ সহায়ে অভীষ্ট অর্জন করাই যেন জীবনের লক্ষ্য। এখানে কৌটিল্য ও বার্হস্পত্য নীতি এবং কামন্দকী শাস্ত্রের দ্বার চির-উন্মুক্ত। মণি-মন্ত্র-ওষধির প্রভাব, তন্ত্রাচারের ব্যভিচার, ঐন্দ্রজালিক মায়াপ্রপঞ্চ—সব মিলিয়া ইহা এক বিস্ময়কর রূপকথার রাজ্য। এখানে কূটবুদ্ধি, অসীম সাহস ও পুরুষকারের জয়জয়কার। প্রায় প্রত্যেকটি কাহিনীই প্রেম-বিলসিত, কিন্তু এই প্রেম স্থূল দেহলালসাকে অতিক্রম করিয়া পবিত্র-সুন্দর হইয়া উঠিতে পারে নাই। নায়ক-নায়িকার দেহরূপের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এবং কামশাস্ত্রোক্ত উদ্দাম সম্ভোগ-বিলাস এই গ্রন্থের একটি বিরাট অংশ জুড়িয়া আছে। তথাপি 'দশকুমারচরিতে'র কাব্য-মূল্য অসাধারণ। সুসমৃদ্ধ ভাষার পৌরুষ-দীপ্তি এবং বর্ণনার সহজ ললিতভঙ্গি যে-কোন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বন্ধুবর ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "দশকুমারচরিতে'র নীতিগত বিচ্যুতিই তাকে সাহিত্যগতভাবে সত্যতর করে তুলেছে।" [সাহিত্যে ছোটগল্প]

॥ সুবন্ধু ॥

সুবন্ধুর গদ্যকাব্য 'বাসবদত্তা'। কবি শক্তিমান লেখক। বাক্‌পতির গৌড়বহো, বামনের কাব্যালঙ্কারে সুবন্ধুর নাম উল্লেখিত হইয়াছে। ভবভূতির মালতী-মাধব নাটকে পরিব্রাজিকা কামন্দকীর মুখে সঞ্জয়-বাসবদত্তার প্রেমকাহিনীর উল্লেখ আছে এবং একটি শ্লোকে বাসবদত্তাকাব্যের উদ্ধৃতিও দৃষ্ট হয়। ইহা দ্বারা মনে হয়, কবি সপ্তম শতাব্দের প্রথমদিকে বর্তমান ছিলেন। সুবন্ধুর জীবন-প্রসঙ্গ অজ্ঞাত।

'বাসবদত্তা' উপন্যাস-জাতীয় একটি অখণ্ড কাহিনী। কন্দর্পকেতু নামক এক রাজকুমার স্বপ্নে এক কন্যার রূপ দেখিয়া উন্মাদের মত হইয়া যান। বন্ধু মকরন্দ রাজপুত্রসহ কন্যার উদ্দেশ্যে বহির্গত হইয়া বিন্ধ্যাটবীতে উপস্থিত হন। সেখানে এক শুক-সারিকার কথোপকথন হইতে জানিতে পারেন, কুসুমপুরের রাজকন্যা বাসবদত্তা স্বপ্নে এক রাজকুমারকে দেখিয়া এতই উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছেন যে তিনি স্বয়ম্বরাহূত সকল রাজপুত্রকে পরিহার করিয়া স্বপ্নদৃষ্ট কুমারের অনুসন্ধানের নিমিত্ত সখী তমালিকাকে প্রেরণ করিয়াছেন। শুনিয়া মকরন্দ ও কন্দর্পকেতু কুসুমপুরে উপনীত হন। রাজকন্যা বাসবদত্তার সহিত কন্দর্পকেতুর গোপন সাক্ষাৎ হয় এবং গান্ধর্ব বিধানে মিলিত হইয়া তাঁহারা সম্ভোগশৃঙ্গারে মত্ত হন। এদিকে রাজা বাসবদত্তার বিবাহের উদ্যোগ করিতে থাকেন। সংবাদ পাইয়া কন্দর্পকেতু প্রিয়া বাসবদত্তাকে লইয়া পলায়ন করেন। পথিমধ্যে একটি আশ্রমে পুষ্পচয়নকালে বাসবদত্তা দুই কিরাতের দৃষ্টিপথে পতিত হন। স্ত্রীঘটিত দ্বন্দ্বে কিরাতদ্বয় পরস্পর অস্ত্রযুদ্ধ করিয়া নিহত হয়। ইহাতে আশ্রমের ঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া মনে করেন, বাসবদত্তাই আশ্রম-ভঙ্গের কারণ ['ত্বৎকৃতে মমায়মাশ্রমো ভগ্ন'] এবং অভিশাপ প্রদান করেন, 'শিলাময়ী

পুত্রিকা ভব'। বাসবদত্তা আর্তনাদ করিয়া উঠেন। ঋষি তখন বলেন, প্রেমিকের স্পর্শে প্রস্তরীভূতা বাসবদত্তা পুনরায় জীবন লাভ করিবে। বাসবদত্তাকে হারাইয়া কন্দর্পকেতু পাগলের মত তাহার অনুসন্ধান করিতে থাকেন। প্রিয়া-বিরহে প্রেমিকের তখন উন্মত্তদশা। এই অবস্থায় দৈববাণী দ্বারা প্রেরিত হইয়া কন্দর্পকেতু ঋষির আশ্রমে শিলাময়ী বাসবদত্তাকে দেখিয়া আলিঙ্গন করেন। সঙ্গে সঙ্গে শিলীভূতা মূর্তি জীবন্ত হইয়া উঠে ['সা স্পৃষ্ট মাত্রেব শিলাভাবমুৎসৃজ্য বাসবদত্তা স্বরূপং প্রপেদে'] এবং বিরহান্তে নায়ক-নায়িকা মিলিত হইয়া 'অমৃতার্ণবে' মগ্ন হন।

কথাকার রূপে সুবন্ধুর প্রতিষ্ঠা সন্দেহের অতীত। বাসবদত্তার কাহিনী রূপ-কথার মতই অলৌকিক-অদ্ভুত ঘটনায় পরিপূর্ণ। স্বপ্নে প্রেমিক-প্রেমিকার রূপানু-রাগ, শুক-সারীর সংলাপে ভবিষ্যৎ উদ্ঘাটন, মন্ত্রপ্রভাবে মানুষের শিলায় পরিণত হওয়া ও প্রেমের স্পর্শে প্রস্তরে জীবনের আবির্ভাব—প্রভৃতি রূপকথার মতই কৌতূ-হলোদ্দীপক। অলংকরণের ঐশ্বর্যে ও কল্পনার রঙে 'বাসবদত্তা' বাসব-ধনুর মতই রূপময়। কিন্তু বহুস্থলেই রচনা কৃত্রিমতায় পূর্ণ। শ্লেষের আতিশয্য, দীর্ঘবর্ণনার বাহুল্য, দীর্ঘ সমাসের 'অক্ষর ডম্বর' রচনাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাহা ছাড়া. নায়ক-নায়িকার প্রত্যক্ষ সম্ভোগ-শৃঙ্গারের বর্ণনা সেই যুগের বিকৃত-রুচির পরিচয় বহন করে। বাসবদত্তায় প্রেমের চিত্র স্থানে স্থানে সূক্ষ্ম ও সুন্দর, কিন্তু অনেকস্থলেই উহা স্থূল কামন্দকীয় নীতির নাগপাশে আবদ্ধ হওয়ায় রুচির পক্ষে পীড়াদায়ক।

॥ বাণভট্ট ॥

দণ্ডী ও বসুবন্ধুর তুলনায় বাণ 'জ্ঞাত পরিচয়'। তিনি দুইখানি গদ্যকাব্য প্রণয়ন করেন ঃ হর্ষচরিত ও কাদম্বরী। হর্ষচরিতের প্রারম্ভে বাণ কতিপয় শ্লোকে আত্মকথা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ব্যাৎস্যায়ন বংশ সম্ভব ব্রাহ্মণ, তাঁহার পিতার নাম চিত্রভানু, মাতার নাম রাজদেবী, পুত্রের নাম ভূষণভট্ট বা পুলিন্দ। যৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্বেই বাণের মাতৃ-পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। কুসঙ্গে পড়িয়া বাণ গৃহত্যাগ করেন এবং দেশভ্রমণ করিয়া বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এই বালকই উত্তরকালে রাজা শ্রীহর্ষের সভাপণ্ডিতের পদ অলংকৃত করেন। বাণের আত্মপরিচয় হইতে তৎপূর্ববর্তী আরও অনেক কবির নাম ও তাঁহাদের রচনা-বৈশিষ্ট্যের কথা জানা যায়।

বাণ হর্ষবর্ধন শীলাদিত্যেরও সভাকবি ['শ্রীহর্ষস্যাভবৎ সভ্যঃ'—শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি]। হর্ষবর্ধন ৬১০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। বাণও এই সময়ের কবি।

বাণের দুইখানি কাব্যই অসমাপ্ত। হর্ষচরিত মহারাজ হর্ষবর্ধনের কাহিনী। কিন্তু ইহাতে হর্ষবর্ধনের সমগ্র জীবনের কাহিনী বিবৃত হয় নাই। হূণ-হরিণ-

কেশরী, প্রভাকরবর্ধন স্থানীশ্বরের প্রতাপশীল রাজা ছিলেন। তাঁহার অপত্যত্রয়—রাজ্যবর্ধন, হর্ষবর্ধন ও রাজ্যশ্রী। পুত্র রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধন শস্ত্র-শাস্ত্রে নিপুণ, রাজ্যশ্রী গীতাদিকলায় পারদর্শিনী। রাজ্যশ্রীকে মৌখরী বংশের রাজপুত্র গ্রহবর্মার হস্তে সম্প্রদান করা হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী মালবরাজকর্তৃক গ্রহবর্মা নিহত হন এবং রাজ্যশ্রী লৌহশৃংখলে আবদ্ধ হইয়া ['কালায়সনিগড়চুম্বিতচরণা'] কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। রাজ্যবর্ধন কুপিত হইয়া মালবরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া গৌড়াধিপ শশাংকের হস্তে নিহত হন। 'স্বযুথভ্রষ্ট বন্যকরী'র মত হর্ষ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মালবরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। পথে সংবাদ পান, রাজ্যশ্রী বৈরিপরিভবভয়ে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। হর্ষ তাহার সন্ধানে তৎপর হইয়া বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করেন। সেখানে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর মুখে শ্রবণ করেন, 'একটি শোকাবেশ বিবশা' বালিকা অগ্নিপ্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। হর্ষ উদ্বিগ্নচিত্তে অগ্রসর হইলেন, দেখিলেন, ভগ্নী রাজ্যশ্রী অগ্নিপ্রবেশে উদ্যত। এই অবস্থায় ভ্রাতা-ভগ্নীর মিলন হইল। এইখানেই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি।

হর্ষচরিত ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত হইলেও ইতিহাস নয়। ইহা হইতে তৎকালীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায় বটে, তথাপি ইহা প্রধানতঃ কাব্য। কবিকল্পনার প্রসারও কম নয়। ইতিহাসের ভাষায় যে ঋজুতা, প্রকাশে যে সারল্য প্রয়োজন, হর্ষচরিতে তাহা নাই। সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ ও অলংকরণের বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া ইহার যে আস্বাদ, তাহা কাব্যরসের আস্বাদ। পণ্ডিত, মনস্তত্ত্ববিদ, অর্থশাস্ত্র নিপুণ, বাগ্‌বিদগ্ধ বাণের ভূমিকা রাজ-সভাকবির মতই তিনি হর্ষবর্ধন-পিতা পুষ্পভূতির পরিচয় দিতেছেন ঃ

> তত্র চ সাক্ষাৎ সহস্রাক্ষ ইব গুরুর্বচসি বিশালো মনসি জনকস্তপসি
> অর্জুনো যশসি ভীষ্মো ধনুষি শত্রুঘ্নঃসমরে দক্ষঃ প্রজাকর্মণি রাজা
> পুষ্পভূতিরিতি নামা বভূব।

—সেখানে কাব্যে বৃহস্পতি, তপস্যায় জনক, যশে অর্জুন, ধনুর্বিদ্যায় ভীষ্ম, সমরে শত্রুঘ্ন, প্রজাপালনে দক্ষ সদৃশ সাক্ষাৎ ইন্দ্রের মত বিশালমনা রাজা ছিলেন—তাঁহার নাম পুষ্পভূতি। হর্ষচরিতের সর্বত্রই এইরূপ বাগ্‌বৈদগ্ধ্য।

বাণের শ্রেষ্ঠ কাব্য 'কাদম্বরী। ইহা পূর্বভাগ ও উত্তরভাগ—এই দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগ বাণের রচনা, দ্বিতীয় ভাগ বাণপুত্র ভূষণভট্ট বা পুলিন্দের রচনা। পিতার অসমাপ্ত গ্রন্থকে পুত্র সমাপ্ত করিয়াছেন। কাদম্বরী কথাজাতীয় গদ্য-কাব্য ; তাই ইহাতে কথার মধ্যে কথার অবতারণা করা হইয়াছে। প্রথম কথা আরম্ভ হইয়াছে রাজা শূদ্রকের ও শুক বৈশম্পায়নের কাহিনী লইয়া। একদিন রাজা শূদ্রক সিংহাসনে সমাসীন, এমন সময় এক 'মাতঙ্গকুমারী' তাঁহার জন্য একটি শুকপাখী উপঢৌকন লইয়া আসে। এই শুক 'পুরাণেতিহাসকথালাপ-নিপুণঃ'—নাম বৈশম্পায়ন। শুক নিজকাহিনী বিবৃত করিতে গিয়া কিভাবে তাহার জন্ম হইয়াছিল, কিভাবে শবরসৈন্যের হাতে তাহার পিতা নিহত হইয়াছিল, কিভাবে দৈববশতঃ সে

ঋষি জাবালীর আশ্রমে নীত হইয়াছিল তাহার বর্ণনা করিল ঃ তারপর জাবালীর মুখ হইতে সে নিজের যে পূর্ব কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিল তাহার বর্ণনা আরম্ভ করিল। এইখানেই দ্বিতীয় কাহিনীর সূত্রপাত। ইহাই কাদম্বরী কাব্যগ্রন্থের মুখ্য কাহিনী—অর্থাৎ চন্দ্রাপীড়-বৈশম্পায়ন-মহাশ্বেতা-কাদম্বরীর কাহিনী। চন্দ্রাপীড় উজ্জয়িনীর রাজপুত্র, বৈশম্পায়ন তাহার বন্ধু—অমাত্য শুকনাসের পুত্র। উভয়েই একই সঙ্গে বিদ্যাভ্যাস করেন। বিদ্যার্জনের পর চন্দ্রাপীড় 'ইন্দ্রায়ুধ' নামক অশ্বে আরোহণ করিয়া বন্ধুসহ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় 'পত্রলেখা' নাম্নী সুন্দরী লাবণ্যময়ী কুলুতেশ্বরদুহিতা চন্দ্রাপীড়ের 'তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী' রূপে নিযুক্ত হন। অতঃপর চন্দ্রাপীড় যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া বন্ধু বৈশম্পায়ন ও পত্রলেখা সহ বিরাট কটক লইয়া দিগ্বিজয়ে যাত্রা করেন। একদিন এক কিন্নরমিথুনকে অনুসরণ করিতে গিয়া চন্দ্রাপীড় স্বজনভ্রষ্ট হইয়া ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীর মণিদর্পণের মত ['মণিদর্পণমিব ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যাঃ...'] স্বচ্ছ অচ্ছোদসরোবরে আসিয়া উপস্থিত হন। সরোবরের উত্তর তীরে বীণাতন্ত্রী ঝঙ্কার মিশ্রিত ললিত সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তিনি অগ্রসর হন। সম্মুখে অপূর্ব সিদ্ধায়তন। বিস্মিত চন্দ্রাপীড় মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরে শূলপাণিদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। চন্দ্রাপীড় সাশ্চর্যে দেখিলেন, সেই মূর্তির সম্মুখে পাশুপতব্রতধারিণী অপূর্ব সুন্দরী সর্বশুক্লা অষ্টাদশী এক কন্যা। ইনিই মহাশ্বেতা। মহাশ্বেতা তাঁহার নিজ জীবনের করুণ কাহিনী বর্ণনা করিলেন, এ কাহিনী যেন শাখানদীর শাখা—কিন্তু গল্পের দিক হইতে অনবদ্য, রূপকথার মত স্বপ্নময়। মহাশ্বেতা হংস নামক গন্ধর্ব ও গৌরীনাম্নী অপ্সরার কন্যা। একদা তিনি অচ্ছোদ-সরোবরে স্নান করিতে আসিয়া সবন্ধু এক মুনিকুমারকে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হন। মুনিকুমারের নাম পুণ্ডরীক; বন্ধুর নাম কপিঞ্জল। পুণ্ডরীকও মহাশ্বেতাকে দেখিয়া যুগপৎ শৃঙ্গারের অনুভাবে আবিষ্ট হন। রাগ গভীর অনুরাগে পরিণত হয়। পুণ্ডরীক মহাশ্বেতাকে লাভ করিবার জন্য উন্মত্ত। কপিঞ্জলের মুখে সংবাদ পাইয়া মহাশ্বেতা অভিসারিকার বেশে পুণ্ডরীকের সহিত মিলিত হইতে গিয়া দেখেন, মহা-শ্বেতা-বিরহে পুণ্ডরীক প্রাণত্যাগ করিয়াছে, আর তাঁহাকে লইয়া কপিঞ্জল করুণস্বরে বিলাপ করিতেছেন। দেখিয়া মহাশ্বেতা ধৈর্যহারা হইলেন। প্রিয়তমের বিচ্ছেদে প্রাণ-ত্যাগ করার সংকল্প করিতেই চন্দ্রমণ্ডল হইতে একটি দিব্যজ্যোতি নামিয়া আসিল। দিব্যদেহী পুণ্ডরীকের দেহ আকর্ষণ করিয়া চন্দ্রমণ্ডলের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন 'বৎসে মহাশ্বেতে! ন পরিত্যাজ্যাস্ত্বয়া প্রাণাঃ, পুনরপি তবানেন সহ ভবিষ্যতি সমাগমঃ'। জ্যোতি চন্দ্রমণ্ডলে বিলীন হইয়া গেল। কপিঞ্জলও তাঁহাকে অনুসরণ করিতে গিয়া নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে মিলাইয়া গেলেন। সেইদিন হইতে মহাশ্বেতা নিয়মব্রতে প্রিয়তমের প্রতীক্ষা করিতেছেন। মহাশ্বেতার সহিত পরিচয় হইতে আর একটি কাহিনীর সূত্রপাত হইল—চন্দ্রাপীড়-কাদম্বরীর প্রণয় কাহিনী। মহাশ্বেতার সখী কাদম্বরী, তিনি গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ ও অপ্সরা মদিরার কন্যা। মহাশ্বেতা চন্দ্রাপীড়কে লইয়া সখীর নিকট গেলেন। চন্দ্রাপীড়-কাদম্বরীর সাক্ষাৎ

ঘটিল। প্রথম দর্শনেই জন্মান্তরীণ রাগ যেন উভয়ের হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিল। কাদম্বরীকে দেখিয়া চন্দ্রাপীড় চন্দ্রোদয়ে জলধির মত উল্লসিত হইলেন, কাদম্বরীও চন্দ্রাপীড়ের রূপলাবণ্য দেখিয়া আর চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না। কাদম্বরীর আতিথ্যে এই প্রণয় গভীরতর হইল। কিন্তু উভয়কে প্রণয় নিবেদন করিবার পূর্বেই চন্দ্রাপীড়কে স্বীয় স্কন্ধাবারে ফিরিয়া আসিতে হইল। তিনি পত্রলেখাকে কাদম্বরীর হৃদয় জানিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। ইতিমধ্যে উজ্জয়িনী হইতে বার্তা আসায় চন্দ্রাপীড়কে উজ্জয়িনীতে ফিরিতে হইল। স্কন্ধাবার রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত হইল বৈশম্পায়নের উপর।

উজ্জয়িনীতে ফিরিয়াও চন্দ্রাপীড়ের স্বস্তি নাই। এমন সময় পত্রলেখা ফিরিয়া আসিলেন এবং চন্দ্রাপীড়ের প্রতি কাদম্বরীর সুগভীর প্রণয়ের কথা প্রকাশ করিলেন। কাদম্বরীর প্রেম 'বৈশ্যালাপ' নয়, প্রগল্ভ নয়, বন্ধকীর ধৃষ্টতাও নয় ['বন্ধকী-ধার্ষ্ট্যম্']; মরণ বরণ করিয়া যদি প্রেমের প্রকাশ সম্ভব হয়, তাহাও এ প্রেম করিতে পারে ['জ্ঞাস্যসি মরণেন প্রীতিম্']। এইখানেই পূর্বভাগ সমাপ্ত। এই পর্যন্তই বাণভট্টের রচনা।

উত্তরভাগ বাণপুত্র পুলিন্দের রচনা। উত্তরভাগের রচনাংশ দুর্বল হইলেও কথার আকর্ষণ কম নয়। চন্দ্রাপীড় কাদম্বরীর প্রণয়বার্তা শ্রবণে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, এমন সময় সংবাদ আসিল বৈশম্পায়ন-রক্ষিত স্কান্ধাবার উজ্জয়িনীতে ফিরিয়া আসিতেছে। চন্দ্রাপীড় ব্যস্ত হইয়া বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু শুনিলেন, বৈশম্পায়ন অচ্ছোদসরোবরে গিয়া উন্মনা হইয়াছেন। তাঁহাকে কোনক্রমেই প্রত্যাবৃত করা যাইতেছে না। চন্দ্রাপীড় অচ্ছোদসরোবরে গিয়া যে সংবাদ পাইলেন, তাহা মর্মান্তিক। বৈশম্পায়ন মহাশ্বেতাকে দেখিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হন এবং তাঁহাকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে, মহাশ্বেতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তির্যকযোনিতে জন্মগ্রহণের অভিশাপ দিতেই বৈশম্পায়নের মৃত্যু ঘটে। চন্দ্রাপীড় এই সংবাদ শ্রবণে মুহূর্তে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল। কাদম্বরী চন্দ্রাপীড়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া এই বিষম ব্যাপার দর্শনে মর্মভেদী বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনিও প্রিয়তমের সহিত প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময় পূর্ববৎ আকাশবাণী কাদম্বরীকে প্রাণত্যাগে নিষেধ করিয়া কহিল, চন্দ্রাপীড়ের দেহ রক্ষা কর, পুনরায় ইহাতে যোগিশরীরের ন্যায় জীবাত্মা সংযোজিত হইবে। পত্রলেখাও এতক্ষণ মূর্চ্ছিত ছিলেন, এখন চন্দ্রাপীড়ের দেহোদ্ভূত জ্যোতিস্পর্শে চেতনা পাইয়া ইন্দ্রায়ুধকে লইয়া আচ্ছোদসলিলে ঝাঁপ দিলেন। সহসা সলিল হইতে কপিঞ্জলের আবির্ভাব হইল। তিনি পুণ্ডরীকের অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করাইলেন। পুণ্ডরীকের দেহ চন্দ্রলোকে আছে। চন্দ্রমার শাপে তিনি মর্ত্যজন্ম গ্রহণ করিয়াছেন—তিনিই বৈশম্পায়ন। আর পুণ্ডরীকের শাপে চন্দ্রমাও মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—তিনি চন্দ্রাপীড়। কিন্তু চন্দ্রাপীড় ও বৈশম্পায়ন পুনরায় কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে সংবাদ জানেন মহর্ষি শ্বেতকেতু। কপিঞ্জল সেই সংবাদ জানিবার জন্য মহর্ষির

আশ্রমের দিকে যাত্রা করিলেন। সকলে ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ইহার পর কাহিনীর পরিণাম ও উপসংহার। মহর্ষি জাবালীর মুখে আত্মবিবরণ শ্রবণ করিয়া শুকের পূর্বস্মৃতি মনে পড়িল, শুক বৈশম্পায়নই শুকনাসপুত্র বৈশম্পায়ন বা পুণ্ডরীক। সে জাবালীর নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিল, কিন্তু জাবালী তাহাকে মুক্তি দিলেন না। ক্রমে শুক এক দিব্য চণ্ডালকন্যার আশ্রয়ে আসিল। চণ্ডালকন্যা তাহাকে রাজা শূদ্রকের নিকট লইয়া আসিয়াছে। চণ্ডালকন্যার কথা হইতে জানা গেল, রাজা শূদ্রকই স্বয়ং চন্দ্রমার অবতার চন্দ্রাপীড়। এই বৃত্তান্ত উদ্ঘাটিত হইতেই শূদ্রক ও শুক দেহত্যাগ করিলেন। অচ্ছোদসরোবরতীরে চন্দ্রাপীড়ের মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হইল, পুণ্ডরীকও চন্দ্রলোক হইতে স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হইলেন। কাদম্বরী-চন্দ্রাপীড়, মহাশ্বেতা-পুণ্ডরীকের মিলনমহোৎসবে কথার উপসংহার। উপসংহারে পত্রলেখার কথা এইটুকু বলা হইয়াছে যে, পত্রলেখা চন্দ্রপ্রিয়া রোহিণী; মর্ত্যজন্মে চন্দ্রমা চন্দ্রাপীড়ের পরিচর্যার নিমিত্ত তিনি ভূতলে পত্রলেখারূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

'কাদম্বরী' নিঃসন্দেহে একখানি শ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতি। সমগ্র সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যে ইহাকে অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দণ্ডী ও সুবন্ধুর রচনাচাতুর্য বাণভট্টে এক মহিমময় পরিণতি লাভ করিয়াছে। এ যুগের প্রায় সকল গদ্যরচনাই সমাস-সমৃদ্ধ, শ্লেষ-যমক-উপমায় অলংকৃত ও বর্ণনাড়ম্বরে পূর্ণ। এই আলংকারিক রীতির সৌন্দর্য অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু ইহার অপর দিকটিও স্বীকার করিতে হয়। সমাসবদ্ধ পদের বহরে কাব্য যখন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা সুদীর্ঘ হইয়া উঠে, উপমার মালা যখন অযথা বিশাল আকার ধারণ করে, গল্পের কৌতূহল চরিতার্থ না করিয়া বর্ণনা যখন গুরু-গম্ভীর চালে চলিতে থাকে, তখন তাহা দুর্বহ হইয়া উঠে। বাণভট্টেও এ সকল ত্রুটি রহিয়াছে। কাদম্বরীর কথারম্ভে শুকেব উক্তিতে প্রত্যূষ-প্রভাতের বর্ণনায়—'একদা তু প্রাভাতসন্ধ্যারাগলোহিতে গগনতলে গগনকমলিনী মধুরক্তপক্ষসংপুটে বৃদ্ধ হংস ইব' বাক্যটি প্রায় সত্তর পদ লইয়া গঠিত ঃ তাহার মধ্যে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদও অনেক-গুলি। এইরূপ বাক্যের বহর কত যে আছে, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু ইহারই মধ্যে আবার আছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যের সৌন্দর্য ['Short senteneсs, like oases in the desert of words'—Keith] ঃ এই সংহত বাক্যগুলি প্রৌঢ়োক্তির মতই গাঢ়বন্ধ ও মনোহর—যেমন, চন্দ্রাপীড়ের প্রতি শুকনাস-বাক্য, কিংবা মহাশ্বেতার প্রতি চন্দ্রা-পীড়ের এই সান্ত্বনা-বাক্য ঃ

অচিন্ত্যো হি মহাত্মনাং প্রভাবঃ। বহুপ্রকারাশ্চ সংসারবৃত্তয়ঃ চিত্রং চ দৈবম্। আশ্চর্যাতিশয়যুক্তাশ্চ তপঃসিদ্ধয়ঃ। অনেকবিধাশ্চ কর্মণাং শক্তয়ঃ।

আলংকারিক গুণ ও দোষ উভয়ই বাণভট্টে বর্তমান।

বাণভট্টের অন্যতম শক্তি চিত্রাংকন-দক্ষতা। রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরী গ্রন্থকে একটি 'চিত্রশালা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উক্তিটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। একদিকে অর্থা-লংকারের প্রয়োগে কতকগুলি ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমনই আবার শব্দের রঙে-

রেখায় চিত্রগুলি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। যেমন মাতঙ্গক নামা শবরের এই সংক্ষেপিত চিত্রটি—

মধ্যে চ তস্যাতিমহতঃশবরসৈন্যস্য প্রথমে বয়সি বর্তমানম্ আয়তললাটম্ অতিতুঙ্গ-ঘোরঘোণম্......অচিরপ্রহতগজকপোল-গৃহীতেন সপ্তচ্ছদপরিমলবাহিনা কৃষ্ণাগুরু-পঙ্কেনেব···সুরভিণামদেন কৃতাঙ্গরাগম্...আজানুলম্বিনা ভুজযুগলেনোপশোভিতম্···বিন্ধ্যশিলাতলবিশালেন বক্ষঃস্থলেনোদ্ভাসমানম্ অবিরতশ্রমাভ্যাসাদ্ উল্লিখিতো-দরম্...লাক্ষালোহিতকৌশেয় পরিধানম্...ভীষণমপিমহাসত্ত্বতয়া গম্ভীরমিবোপলক্ষ-মানম্ অনভিভবনীয়াকৃতিং মাতঙ্গকনামানং শবরসেনাপতিমপশ্যম্।

ঋতুবর্ণনায় কিংবা প্রভাত, সন্ধ্যা, রাত্রির বর্ণনায় অলঙ্কারাঢ্য চিত্রের সংখ্যা অসংখ্য এই সকল ছবির প্রাচুর্য ও বর্ণনার দৈর্ঘ্য বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়, সামঞ্জস্যবোধের অভাব মনকে পীড়িত করে।

সংস্কৃত কাব্য-নাটকে নরনারীর প্রেমবর্ণনা একটি বিশিষ্ট বিষয়। পঞ্চশরের লীলা এখানে বহুধা পঞ্চীকৃত। দেহরূপের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, প্রোদ্দাম কামনা-বাসনার স্থূল চিত্র ও কামন্দকী নীতির প্রয়োগ-বাহুল্য সূক্ষ্ম রুচিবোধের পীড়া-দায়ক। Peterson সাহেব সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যকে এই দোষে দুষ্ট বলিয়াছেন। এখানে প্রেম দেহানুগ লালসার রূপায়ণ, সম্ভোগ-শৃঙ্গার নগ্নতার প্রতিরূপ। নাটকে অবশ্য সম্ভোগ-শৃঙ্গারের দৃশ্য উদ্ঘাটনের সুযোগ ছিল না, কিন্তু কাব্য এদিক হইতে নিরঙ্কুশ। রঘুবংশে অগ্নিবর্ণের প্রমত্ত বিহার ও কুমারসম্ভবে দেবতার শৃঙ্গার বর্ণনায় কালিদাস সকল সংকোচকে অতিক্রান্ত করিয়াছেন। গদ্যকাব্যেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। দণ্ডী ও সুবন্ধুর রচনায় কামকলাবিলাসের চরম প্রদর্শিত হইয়াছে। এইদিক হইতে বাণভট্টের শৃঙ্গারবর্ণনা অদ্ভুত সংযমের পরিচয় বহন করে। কাদম্বরী অপূর্ব প্রেমকাব্য। নায়ক-নায়িকার রূপবর্ণনায় কবি পূর্বসূরীদের অনুকরণ করিলেও—পূর্বরাগ, অনুরাগ, প্রেমের গভীর ও সূক্ষ্ম ভাবের বর্ণনায় বাণভট্ট তির্যক কামনাকে প্রশ্রয় দেন নাই। প্রেমের সূক্ষ্ম সৌকুমার্যে কাদম্বরী কমনীয়; এখানে প্রেমের সৌরভ মনকে মুগ্ধ করে। মহাশ্বেতার প্রেম-তপস্যা ও কাদম্বরীর একনিষ্ঠতা—আদর্শ প্রেমের দৃষ্টান্ত। কাদম্বরীতে প্রেমের শিব-সুন্দর মূর্তিখানি নীতি-শাসিত ও সংযমের মহিমায় সমুজ্জ্বল; এখানে প্রেম দেহাশ্রয়ী হইয়াও দেহাতিরিক্ত, মিলনের সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা অতীন্দ্রিয় প্রণয়-গৌরবে মহিমান্বিত এবং করুণ বিপ্রলম্ভের ক্রন্দনগুলি সুসূক্ষ্ম প্রেমচেতনায় মর্মস্পর্শী। প্রণয় এখানে জন্মান্তর ফলপ্রত্যাশী বলিয়াই আরও শুচি-সুন্দর।

'কাদম্বরী' কাব্যের চরিত্রগুলিও মহিমোজ্জ্বল। চন্দ্রাপীড়, বৈশম্পায়ন, মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী—প্রধান চরিত্র। কর্তব্যে, বন্ধু-বাৎসল্যে, প্রেমের দৃঢ়তায়, হৃদয়ের কোমলতায়—সর্বোপরি নীতি ও ত্যাগের আদর্শে প্রত্যেকটি চরিত্র আদর্শস্থানীয়। রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের 'পত্রলেখা'কে 'কাব্যের উপেক্ষিতা' বলিয়াছেন। পত্রলেখা যুবরাজ চন্দ্রাপীড়ের 'তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী,' স্বর্গ হইতে স্বয়মাগত চন্দ্রাপ্রিয়া

মোহিণী ; তিনি চন্দ্রাপীড়ের সহচরী, প্রেম-ব্যাপারের দূতী। চরিত্রটি গোণ। কাব্যে যতটুকু তাঁহার যোগ্য স্থান, ততটুকু অর্পিত হইয়াছে। বাণভট্ট তাঁহাকে উপেক্ষা করেন নাই—স্বল্পপরিসরে এমনভাবে তাঁহাকে দেখাইয়াছেন, যাহাতে পত্রলেখার স্মৃতি যে-কোন পাঠকমনে রেখাপাত করে। অভিচার-ক্রিয়ারত দ্রাবিড় দেশীয় যতির চিত্রটিও উপভোগ্য। কেহ কেহ এই চরিত্রের আচার-আচরণে বর্ণনার আতিশয্য লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু চরিত্রটি তৎকালীন ব্যভিচারী শাক্তের একটি নিখুঁত চিত্র। বাণভট্টের কৃতিত্ব বর্ণনার আভিজাত্যে, তাঁহার ত্রুটি সেই আভিজাত্যের আতিশয্যে। সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও কাদম্বরী পাঠ করিয়া স্বীকার করিতে হয়, কাদম্বরী কাব্যের আস্বাদ সুরার মতই মোহকর :

'কাদম্বরীরসাজ্ঞানামাহারোঽপি ন রোচতে।
কাদম্বরীরসাজ্ঞানামাহারোঽপি ন রোচতে ॥'

৭. চম্পূকাব্য

কাব্যের একটি প্রকারভেদ 'চম্পূ'। অলংকার শাস্ত্রে গদ্য-পদ্যময়ী রচনাকেই 'চম্পূ' বলা হইয়াছে।[১] কিন্তু ইহার দ্বারা চম্পূকাব্যের স্বরূপ নির্ণয় করা অসম্ভব। কথাসাহিত্যে গদ্যবন্ধের সহিত প্রচুর পদ্য বা শ্লোকের সমাবেশ করা হইয়াছে—উহাকে চম্পূ বলা হয় না। কথাসাহিত্যে শ্লোক আসিয়াছে নীতিশ্লোকের দৃষ্টান্তরূপে, কিংবা একটি আখ্যানের সংকেতশ্লোকরূপে। চম্পূতে পদ্যের গুরুত্ব অন্যদিকে। এখানে পদ্য আখ্যানেরও বাহন ; গদ্যের সহিত পদ্য অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশ্রিত। কেহ কেহ মনে করেন, গদ্য রচনার একঘেয়েমি ও গতানুগতিকতা ভঙ্গ করার জন্যই গদ্যরচনায় পদ্যের প্রয়োগ করিয়া চম্পূকাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে। 'চম্পূ' নামটি প্রাচীন। কিন্তু সার্থক চম্পূকাব্য পাওয়া যাইতেছে দশম খৃষ্টাব্দ হইতে।

'নলচম্পূ' বা 'দময়ন্তীকথা'ই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন [দশম শতাব্দী]। ইহার প্রণেতা নেমাদিত্যের পুত্র সিংহাদিত্য বা ত্রিবিক্রম। পিতা নেমাদিত্য রাজসভার কবি ছিলেন। একদিন একজন আগন্তুক কবি নেমাদিত্যের অনুপস্থিতিতে স্পর্ধা প্রকাশ করায়, পুত্র সিংহাদিত্য 'নলচম্পূ' রচনা করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিরস্ত করেন। ইহা সাত উচ্ছ্বাসে রচিত একটি অসমাপ্ত কাব্য। ইহার গদ্যাংশ বাণভট্টের রচনার মত ভারাক্রান্ত। সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ, যমক-শ্লেষের প্রাচুর্য ও অনুপ্রাসের প্রয়োগ-বাহুল্য রচনার স্বাচ্ছন্দ্যকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। কবি মনে করিতেন, যে কাব্য অন্যের হৃদয়ে লগ্ন হইয়া মস্তক বিঘূর্ণিত না করে, তাহা কাব্যই নয়।[২] কাব্য রচনা

---

১. 'গদ্যপদ্যময়ী কাপি চম্পূরিত্যভিধীয়তে' [কাব্যাদর্শ. ১.৩১.—দণ্ডী]
'গদ্যপদ্যময়ং কাব্যং চম্পূরিত্যভিধীয়তে' [সাহিত্যদর্পণ. ৬—বিশ্বনাথ].

২. কিং কবেস্তস্য কাব্যেন কিং কাণ্ডেণ ধনুষ্মতা।
পরস্য হৃদয়ে লগ্না ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ ॥ [নলচম্পূ]

সম্পর্কে এই অদ্ভুত ধারণাই দুরূহ, কৃত্রিম প্রাণহীন কাব্য সৃষ্টির মূল। অবশ্য নল-চম্পূর রচনায় বাণভট্টের রচনা-দার্ঢ্য নাই, যেমন নলের সহিত রাজহংসের সাক্ষাৎকারের এই অংশটি ঃ

[অভিনব যৌবনে আরূঢ় কীর্তিধ্বজ নল বনবিহারে আসিয়া একটি হংসরাজকে দেখিয়া হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন ; হংস ধৃত হইয়া স্বস্তি উচ্চারণ করায় রাজা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভাবিলেন, নিশ্চয় এই বিহঙ্গ কামচারী। এমন সময় দূর হইতে রাজহংসী রাজাকে কহিল 'মুচ্যতাং মে প্রিয় মিতি']

নাতিচিরাদেব তে কমপি উপকারং করিষ্যামীতি স হংসমপি তমবাদীৎ। সপদি অন্তরিক্ষমণ্ডলাৎ মনোহারিণী বাগশ্রূয়ত—

রাজন্ রাজীব পত্রাক্ষ ক্ষিপ্রং হংসো বিমুচ্যতাম্।
ভবিষ্যত্যেব তে দূতে দময়ন্ত্যাঃ প্রলোভনে ॥

জৈন কবি সোমদেবরচিত 'যশস্তিলক' আর একটি বিখ্যাত চম্পূকাব্য [৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ]। কাব্যখানি প্রচারমূলক। জৈনধর্মের সার প্রচার করাই উহার উদ্দেশ্য। উহাও সাতটি আশ্বাসে বিভক্ত। যৌধেয়রাজ মারিদত্তের কাহিনী অবলম্বনে ইহাতে রাজার পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত, এ জন্মের জয়-যশ ও রাণীদের ষড়যন্ত্রে তাঁহার অধঃপতন, রাণীকর্তৃক বিষপ্রয়োগে রাজার মৃত্যু, পুনর্জন্ম ও জৈনধর্ম গ্রহণ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। কাব্যে বাণভট্টের উল্লেখ আছে। সোমদেবের রচনা বাণের সমকক্ষ নয়।

ভোজরাজ কর্তৃক রচিত 'চম্পূরামায়ণ' আর একখানি বিখ্যাত কাব্য। ইনি ভোজরাজ ধারাধিপ ভোজ কিনা, সে বিষয়ে সংশয় আছে। কাব্যখানি রামায়ণকাহিনী অবলম্বনে রচিত। সম্পূর্ণ অংশ ভোজের রচনা নয়। শেষাংশ লক্ষ্মণ নামা কোন কবির। অনুপ্রাস-যমকের শব্দঝঙ্কারে পূর্ণ রচনারীতিও গতানুগতিক। বাংলাদেশের রামায়ণকথকতার সহিত উহার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। যেমন বালিবধের পর শোকার্তা তারার এই অবস্থা ও বিলাপের অংশটি ঃ

অথ বিদিতবৃত্তান্তা সন্ততাশ্রুনিষ্যন্দকলুষিততরতারা তারা নগরান্নির্গত্য...... ময়ূখমালিনং বালিন মালিঙ্গ্য স্বাঙ্কোত্তংসিততদুত্তমাঙ্গা রঘুনাথমিত্থমকথয়ৎ—

কারুণ্যং নিরবধি যত্তব প্রসিদ্ধং
শীতাংশোঃ সহজমিবার্তিহারি শৈত্যম্
তৎসর্বং মনুকুলনাথ রম্যকীর্তে
মৎপাপাৎ কথয় কথয় কথং ত্বয়া নিরস্তম্ ॥

৮. ঐতিহাসিক কাব্য বা চরিত-সাহিত্য

ভারতবর্ষের ইতিহাস নাই—ইহাই পাশ্চাত্য বিবুধগণের সিদ্ধান্ত। একথা অবশ্য সত্য যে ভারতবাসী পরকালের উপর যে পরিমাণ গুরুত্ব দিয়াছেন, ইহকালের উপর তেমন দেন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা যে জীবনপলাতক ছিলেন, এমন

কথাও বলা চলে না। নীতিনিপুণ ভারতবাসী ইহকালকে অস্বীকার করেন নাই। তাঁহাদেরও ইতিহাস ছিল এবং সে ইতিহাসকে রক্ষা করিতেও তাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন বংশ ও বংশানুচরিত বর্ণনার ভিতর দিয়া। পুরাণের বংশবর্ণনা বিস্মৃতপ্রায় রাজ-বংশাবলীর তালিকা, বংশানুচরিত মহাপুরুষ-চরিত্রের জীবন-স্বপ্নের কাহিনী। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'সকল খেতের আবাদ এক নহে ইহা জানিয়া যে ব্যক্তি যথাস্থানে উপযুক্ত শস্যের প্রত্যাশা করে সেই প্রাজ্ঞ।' [ভারতবর্ষের ইতিহাস]। ভারতবর্ষের ইতিহাসকেও খুঁজিতে হইবে এই দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে।

অবশ্য একথা ঠিক, ইতিহাস বলিতে পাশ্চাত্ত্য মতে আমরা যাহা বুঝি, সে ধরনের ইতিহাস রচনার চেষ্টা প্রাচীন কালে এদেশে হয় নাই। সন-তারিখ মিলাইয়া, রাজার পর রাজার বংশতালিকা রচনা করিয়া, তাহাদের জয়পরাজয়ের কাহিনী বর্ণনা করিয়া যে ইতিহাস, সে ইতিহাস ভারতবর্ষে নাই। ভারতবর্ষ অন্তররাজ্যের প্রতি যতটা দৃষ্টি দিয়াছে, বহিঃ রাজ্যের প্রতি ততটা দৃষ্টি দেয় নাই। এইজন্য ভারতবর্ষের ইতিহাস অনেকটা কাব্যের আকারে গ্রথিত হইয়াছে। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত সেই ধরনের ইতিহাস। ইহাদের কাব্যাংশ ও অলৌকিকতাকে পরিহার করিলে, উহা হইতে ইতিহাসের অনেক উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে।

পুরাণে, রামায়ণে ও মহাভারতে যেমন এক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাস সংরক্ষণের চেষ্টা করা হইয়াছে, তেমনই আর এক ভাবে ইতিহাস সংরক্ষণের চেষ্টা করা হইয়াছে বিভিন্ন রাজগণ প্রদত্ত শিলালিপিতে, তাম্রশাসনে বা দানপত্রে। এই প্রচেষ্টারই পরিণত রূপ সংস্কৃত ঐতিহাসিক কাব্য বা চরিত-সাহিত্য।

ইতিহাস রচনার মূল প্রেরণা বিখ্যাত কোন 'বৃত্ত' বা ঘটনা, কিংবা বিশ্রুত কোন চরিত্র। মহাভারত ভারতযুদ্ধের ইতিহাস, রামায়ণ রাম-চরিতের ইতিহাস। সংস্কৃতে যে ঐতিহাসিক কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহারও প্রকার এই ধরনের। একজন মনীষী বলিয়াছেন,'To study men is more necessarry to study book'—ঐতিহাসিক কাব্য রচনায় সংস্কৃতকবিগণ এই নীতিদ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন। তাঁহাদের ঐতিহাসিক রচনার নায়ক বিশ্রুত কোন লোকচরিত্র। ঐতিহাসিক কাব্য প্রকারান্তরে চরিত-সাহিত্য। এই চরিত্রের শৌর্য, বীর্য, মহত্ত্ব, ধর্মকর্মের পরিপ্রেক্ষিতে আসিয়াছে সত্যকারের ইতিহাস। কি সংস্কৃত চরিত-সাহিত্যে, কি বাংলা চরিত-সাহিত্যে আমরা এই সত্যেরই পরিচয় পাই।

সংস্কৃতে রচিত কাব্যময় শিলালেখ, স্তম্ভলিপি ও তাম্রশাসনাদির কথা ছাড়িয়া দিলে প্রথম ঐতিহাসিক কাব্য বাণভট্ট-রচিত হর্ষচরিত [খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্য ভাগ]। হর্ষচরিত একখানি কাব্য। হর্ষের ভগ্নী-স্নেহ এই কাব্য-কথার প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। গদ্যকাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এই কাব্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে তৎকালীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ও সমাজের চিত্র পাওয়া যায়। রাজায় রাজায় যুদ্ধ-বিগ্রহে তখন ভারত শতধা বিচ্ছিন্ন, সমাজে হিন্দুধর্মের পাশাপাশি তখন লোককল্যাণকর বৌদ্ধধর্মও বহুপ্রসারিত। ইতিহাসের এই সংবাদগুলি কোন-

ক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। তবে বর্ণনার চাতুর্য, রচনার সুসমৃদ্ধ লিপিকুশলতা ও রসসৃষ্টির চেষ্টা ইহার ঐতিহাসিক সূত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। বাণভট্ট ঐতিহাসিক নন, কবি; ঐতিহাসিক মনোভাব এখানে কবিত্বের দাস। হর্ষচরিতের প্রারম্ভে পদ্যে প্রদত্ত আত্মপরিচয় অত্যন্ত মূল্যবান। ইহা হইতে বাণ-পূর্ব সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ে অনেক তথ্য জানা যায়।

ঐতিহাসিক কাব্যরূপে আর দুইখানি কাব্য উল্লেখযোগ্য—সাহসাংক-চরিত এবং নবসাহসাংক-চরিত। প্রথম কাব্যখানির প্রণেতা বিখ্যাত কোষকার মহেশ্বর। এই গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। অন্যান্য প্রসঙ্গ হইতে জানা যায়, ইহা কান্যকুব্জাধিপতি সাহসাংক নৃপতির জীবন লইয়া রচিত।

নবসাহসাংক-চরিতের প্রণেতা পদ্মগুপ্ত। ইনি রাজা মুঞ্জের সভাকবি। মুঞ্জেরই অপর নাম 'নবসাহসাংক'। কাব্যখানি একাদশ শতকের রচনা। নবসাহসাংক আঠার সর্গে বিভক্ত। ইহাতে নাগরাজ কন্যা শশিপ্রভার প্রতি সিন্ধুরাজের প্রণয় এবং নাগলোক জয় করিয়া শশিপ্রভার পাণিগ্রহণের বৃত্তান্ত প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। কল্পনার সমৃদ্ধিতে ইতিহাসের সত্য এখানে আচ্ছন্ন। কাহিনীটিও কল্পনাশ্রয়ী।

কাশ্মীরী কবি বিহ্লণের বিক্রমাংকদেব-চরিতও একখানি বিখ্যাত ঐতিহাসিক কাব্য [খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক]। ইনিই সম্ভবতঃ চৌরপঞ্চাশিকার বিখ্যাত কবি বিহ্লণ। বিক্রমাংকদেব-চরিত কাব্য অষ্টাদশ সর্গে রচিত। শেষ সর্গে কবি আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই সর্গ হইতে কাশ্মীরের ভূ-প্রকৃতি, হ্রদ ও নদীর বিবরণ পাওয়া যায়। কবির মতে কাশ্মীর ভূ-স্বর্গ, কাশ্মীরের কাব্যও 'জগতাং বল্লভ দুর্লভশ্চ'। কাশ্মীরী ললনাদের অঙ্গভঙ্গি দ্বারা—

রম্ভা স্তম্ভং ভজতি লভতে চিত্রলেখা ন রেখাম্।
নূনং নাট্যে ভবতি চ চিরং নোর্বশী গর্বশীলা ॥

—রম্ভা স্তম্ভিত হন, চিত্রলেখার রেখা অন্তর্হিত হয়, উর্বশীর গর্বও খর্ব হইয়া যায়।

জৈন হেমচন্দ্রের 'কুমারপালচরিত' আর একখানি ঐতিহাসিক কাব্য। ইহার ২৮টি সর্গের মধ্যে প্রথম কুড়িটি সংস্কৃতে এবং শেষ আটটি সর্গ প্রাকৃতে রচিত। এই জন্য ইহাকে 'দ্ব্যাশ্রয় কাব্য' বলা হয়। রাজা কুমারপাল ছিলেন সূরী হেমচন্দ্রের শিষ্য এবং তাঁহার হৃদয় ছিল জিনধর্মের রসাবেশে উল্লসিত। কুমারপালচরিত হইতে জৈনধর্ম সম্পর্কে বহু কথা জানা যায়।

ঐতিহাসিক কাব্যমালার মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কহ্লণের 'রাজতরঙ্গিণী'। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি লইয়াই এই গ্রন্থ রচিত। কহ্লণ যত্ন সহকারে নীলমত পুরাণ, ক্ষোদিত লিপি, কুলপঞ্জী ও লোকশ্রুতি হইতে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি কাশ্মীর-রাজ জয়সিংহের রাজত্বকালে অকলুদণ্ডের উৎসাহে দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত হয়। ইহা কাশ্মীরী রাজাবলীর ইতিহাস। এই ইতিহাস বিশেষ কোন রাজার আনুকূল্যে রচিত না হওয়ায় কহ্লণের নিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধি ও সত্যানু-

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ইহাতে ক্ষুণ্ণ হয় না। কিন্তু কহ্লণ কল্পনাকে পরিহার করিতে পারেন নাই ; সত্য যেখানে বিস্মৃত, কল্পনাই সেখানে একমাত্র আশ্রয়। ইহার ফলে কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনার অংশে কাল্পনিক ও অলৌকিক ঘটনাও স্থান লাভ করিয়াছে। তথাপি এই কাব্য হইতে কাশ্মীরের সামগ্রিক ইতিহাসের চিত্র পাওয়া যায়। কহ্লণ কাশ্মীরের অন্তর্বিপ্লব, ষড়যন্ত্র, হত্যা-হানাহানির কথাও যেমন বর্ণনা করিয়াছেন, তেমনই ঔদার্য, দানধর্ম, সদ্‌গুণে ভূষিত রাজাদের কাহিনীও বিবৃত করিয়াছেন। রাজতরঙ্গিণী কেবল ইতিহাস নয়, ইহা একখানি শ্রেষ্ঠ কবি-কৃতি। ইহা শান্তরস-প্রধান কাব্য। ইতিহাসের প্রমত্ত কোলাহল বর্ণনা করিতে করিতে কবি যেন উহার নিষ্ফলতার প্রতিই অঙ্গুলি সংকেত করিয়াছেন।

॥ সংস্কৃত সাহিত্য ও বাংলা ॥

১. বাংলাদেশে সংস্কৃত রসসাহিত্যের চর্চা

নাটক, মহাকাব্য, গদ্যকাব্য, কথাসাহিত্য ও কোষকাব্যে সমৃদ্ধ সংস্কৃত রসসাহিত্য অশেষ বৈচিত্র্য মণ্ডিত। গুপ্তযুগ হইতে সেন আমল পর্যন্ত বাংলা দেশে এই রস-সাহিত্যের চর্চা হইয়াছে। অঞ্চলভেদে সাহিত্য রচনার কতকগুলি রীতি প্রচলিত ছিল। গৌড় অঞ্চলে প্রচলিত রীতির নাম 'গৌড়ী'। এই রীতি সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। আচার্য দণ্ডী বলেন, গৌড়ীরীতি অনুপ্রাসবহুল [কাব্যাদর্শ. ১.৪৪], অর্থ ও অলংকারের আড়ম্বরে পূর্ণ ['অর্থালংকারডম্বরৌ' ১.৫০], ইহাতে সমতা ও মাধুর্যের অভাব ['ইতীদং নাদৃতং গৌড়ৈঃ'-১.৫৪]। সাহিত্যদর্পণকারের মতে গৌড়ীরীতি ওজঃ প্রকাশক, ডম্বরার্থ প্রতিপাদক ও সমাস বহুল।[১]

গুপ্ত, পাল ও সেন আমলে যে সকল তাম্রশাসন, শিলালেখ বা স্তম্ভলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও বাঙালীর সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার পরিচয় অতি স্পষ্ট। গরুড়স্তম্ভে উৎকীর্ণ ভট্ট গুরবমিশ্রের প্রশস্তি, ভুবনেশ্বরে অনন্ত বাসুদেবের মন্দির-গাত্রে খোদিত সক্তাক্ষরে (সুললিত ভাষায়) ভট্ট ভবদেবের কুলপ্রশস্তিফলক, রাজসাহী জেলার দেওপাড়া গ্রামে প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবের মন্দিরপ্রাচীরে উৎকীর্ণ উমা-পতিধরকৃত প্রশস্তি সুউচ্চ কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। উপমায়, উৎপ্রেক্ষায়, শব্দের কারুকার্যে ও ভাষার গাম্ভীর্যে এগুলি যথারীতি কাব্য ঃ যেমন বাচস্পতিকৃত ভট্ট ভবদেবের জলাশয় প্রতিষ্ঠার এই বর্ণনা ঃ

যেনাকারি জলাশয়ঃ পরিসর স্নাতাভিজাতাঙ্গনা।
বক্তাম্ভোজ প্রতিবিম্বমুগ্ধ মধুপী শূন্যাব্জিনী কাননঃ ॥

---

১. ওজঃ প্রকাশকৈর্বর্ণৈর্বন্ধঃ আড়ম্বরঃ পুনঃ।
সমাস বহুলা গৌড়ী...... [সাহিত্যদর্পণ. ৯ম]

—জলাশয়ের পরিসর জলে প্রতিবিম্বিত অভিজাত অঙ্গনাগণের মুখকমলে মুগ্ধ হওয়ায় পদ্মবন মধুপ শূন্য হইয়া গিয়াছে।

তাম্রশাসনগুলিতে নিবন্ধ প্রশস্তিগুলিও কবিত্বপূর্ণ। ধর্মপালদেবের তাম্রশাসনে বলা হইয়াছে, গোপালদেবের যশোরাশি ছিল পৌর্ণমাস রজনীর জ্যোৎস্না অপেক্ষা স্বচ্ছ ধবল[১]; নারায়ণপালের ইন্দীবরশ্যাম অসির বর্ণ ছিল পীতলোহিত [নারায়ণ পালদেবের তাম্রশাসন]; বল্লালসেন ছিলেন 'সংগ্রামাশ্রিত জঙ্গমাকৃতিঃ' [লক্ষ্মন সেনের অধিকাংশ তাম্রশাসনের উক্তি]। এই সকল রচনা হইতে মোটামুটি-ভাবে বাঙালীর রচনা-স্বাতন্ত্র্যের সহিত বাঙালীর ধর্ম, সমাজ ও রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল তাম্রশাসন বা স্তম্ভলিপির মধ্যেই বাঙালীর কবিপ্রতিভা সীমাবন্ধ থাকে নাই, বহুবিচিত্র রসসাহিত্য রচনাতেও তাঁহারা কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

নাট্য-নিবন্ধের দিক হইতে ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার', মুরারি মিশ্রের 'অনর্ঘ রাঘব', ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিক' ও শ্রীকৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেকে, এই সকল নাটক বাঙালীর রচনা কি না, এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু রচনাগুলির ভিতর গৌড়াঞ্চলের বিশিষ্টতার চিহ্ন অতি স্পষ্ট। বেণীসংহার নাটকের রৌদ্ররসাশ্রিত বীররস বাংলার চিরপরিচিত যাত্রার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়; বিশ্বামিত্র-হরিশ্চন্দ্র কাহিনী লইয়া রচিত চণ্ডকৌশিক নাটকের নান্দী শ্লোকে মহীপালের নাম উল্লিখিত হইয়াছে; জগন্নাথদেবের যাত্রা উৎসব উপলক্ষে রচিত অনর্ঘ রাঘব নাটকেও বাঙালীহস্তের চিহ্ন বর্তমান; প্রবোধ চন্দ্রোদয় রূপক নাটকটিতে রাঢ়ের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে স্পষ্ট মন্তব্য রহিয়াছে। এই সকল নাটকে শৃঙ্গাররসপ্রধান সংস্কৃত নাটকের বন্ধন-মুক্তির একটা প্রয়াস লক্ষিত হয়। এই বৈশিষ্ট্য নাটক-রচনায় বাঙালীর নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার পরিচয় বহন করে।

মহাকাব্যের দিক হইতে শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিত' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাব্য খানির দোষ-ত্রুটি নিশ্চয়ই আছে। আলংকারিক রীতির বহ্বাড়ম্বরে ও রচনার কৃত্রিমতার অবক্ষয়যুগের স্বাক্ষর বর্তমান। তাই বলিয়া উহাকে অ-বাঙাল বলিবার পশ্চাতে যুক্তি বিশেষ নাই। রচনায় গৌড়ী রীতির প্রয়োগ, বিবিধ প্রসঙ্গে বাঙালী-জীবনের বিশিষ্ট আচার-ব্যবহারের উল্লেখ [যেমন, দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে উলু-উলুধ্বনি—'উচ্চৈরুলুলুধ্বনিরুচ্চার', এয়োতি-চিহ্নরূপে সধবা রমণীর শাঁখা-সিন্দুর ও অলক্ত (অঙ্ঘ্রি-লাক্ষা) ধারণ, পিঠালিগোলায় আলপনা অংকন এবং ভোজসভায় মাছ-ভাতের আয়োজন—'অতস্ত্বয়া সাধিতমন্নমীনম্' এবং অর্ধচন্দ্রের মত শাঁখারীর করাতের বর্ণনা—'শঙ্খচ্ছেৎকর পত্রতামিহ বহন্নস্তং গতার্ধো বিধুঃ'] দ্বারা নৈষধ-

১. যস্যানুক্রিয়তে সনাতন যশোরাশির্দিশামাশয়ে।
শ্বেতিম্না যদি পৌর্ণমাসী রজনী জ্যোৎস্নাতিভারশ্রিয়া॥

চরিত যে বাঙালীর রচনা, তাহা প্রমাণিত হয়। কালিদাসোত্তর মহাকাব্যগুলির ভিতর নৈষধ একখানি সর্বজন-স্বীকৃত মহাকাব্য।

ঐতিহাসিক কাব্য রচনায় উল্লেখযোগ্য সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচরিত''। দ্ব্যর্থ শ্লোকের সাহায্যে ইহাতে রঘুকুলতিলক রাম ও পালকুলতিলক রামপালের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে তৎকালীন বরেন্দ্র-বঙ্গ ও কৈবর্ত-বিদ্রোহের নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়।

খণ্ডকাব্যে উল্লেখযোগ্য কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' ও ধোয়ী কবির 'পবন দূত'। কোষকাব্য রচনায় ও সংকলনে বাঙালী-প্রতিভার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত গোবর্ধন আচার্যের 'আর্যা সপ্তশতী', বিদ্যাকরের 'সুভাষিত রত্নকোশ' ও শ্রীধর দাসের 'সদুক্তি কর্ণামৃত'।

—এইভাবে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে সংস্কৃত রসসাহিত্যের রচনা-বৈচিত্র্যের প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।

২. প্রাচীন বাংলায় রসসাহিত্য শাখার অভাব ও তাহার কারণ

বিস্ময়ের বিষয়, কি প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে, কি মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্যে এই বহুবিচিত্র রসসাহিত্য শাখার সন্ধান পাওয়া যায় না। অথচ বাংলা কাব্য হইতে দৃষ্টান্ত লইয়া দেখানো যায়, বাঙালী কবি কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, রূপরাম, ভারতচন্দ্র ছিলেন সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। প্রাচীন বাংলার চতুষ্পাঠিতেও সংস্কৃত রসসাহিত্যের চর্চা অব্যাহত ছিল। বৃন্দবনদাস নবদ্বীপসম্পত্তির বর্ণনায় তৎকালীন সংস্কৃতচর্চার চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের গঙ্গাস্তবের দোষবিচার করিতে গিয়া গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু 'ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস' এর উল্লেখ করিয়াছেন [চৈ. চ, আদি ১৬]। কবিকঙ্কণ গ্রন্থারম্ভে দিগ্বন্দনায় বলিয়াছেন, 'জয়দেব বিদ্যাপতি বন্দো কালিদাস'; শুধু তাই নয়, শ্রীমন্তের বিদ্যাশিক্ষা প্রসঙ্গে তিনি সমগ্র রসসাহিত্যের একটি তালিকা দিয়াছেন।[১] রূপরামও নিজে 'জুমর-অমর' ভেদ করিয়া (জুমর-নন্দীর টীকা ও অমরকোষ) রঘুরাম ভট্টাচার্যের নিকট—

'মাঘ রঘু নৈষধ পড়িল হরষিত।
পিঙ্গল পড়িতে বড় মনে পাইল প্রীত॥

---

১. পড়িল কখন দণ্ডী করিতে কবিত্ব খণ্ডী
নানা ছন্দ পড়িল পিঙ্গল।
করি দৃঢ় অনুরাগ পড়িল ভারবি মাঘ
বন্ধুজনে বাড়ে কুতূহল॥
জৈমিনী ভারতামৃত তবে পড়ে মেঘদূত
নৈষধ কুমারসম্ভব।
দিবানিশি নাহি জানি পড়ে রঘু শেবতমুনি
রাঘব পাণ্ডবী জয়দেব॥

তাহা হইলে বাংলায় সংস্কৃত রসসাহিত্যের ধারা প্রবাহিত না হইবার কারণ কি ? মনে হয়, এই কারণগুলি গুরুতর ঃ

১. মধ্যযুগে বাংলাদেশ ছিল মুসলমান শাসনের অধীন। মুসলমান সম্রাটগণ আরবী-ফারসী ব্যতীত অন্যান্য ভাষার ধর্মবিরহিত কাব্য বা গীতাদির আস্বাদনকে গুনাহ (পাপ) বলিয়া মনে করিতেন। প্রয়োজনের তাগিদে হিন্দুর ধর্মসাহিত্য 'ভাষায়' শ্রবণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেও, হিন্দুর রসসাহিত্য শ্রবণে তাঁহাদের উৎসাহ ছিল না। রাজার আনুকূল্যেই সাহিত্যের স্ফূর্তি। রাজা যেখানে বিমুখ, সাহিত্যের প্রকাশও সেখানে অনাদরে স্তব্ধ।

২. সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত সংস্কৃত জানা পণ্ডিতগণের আনুকূল্যে ও দেশীয় হিন্দু ভূস্বামীদের পোষকতায় রসসাহিত্য সৃষ্টির পথেও প্রবল অন্তরায় ছিল। মুসলমান আক্রমণে এদেশের ধর্ম সংস্কৃতির উপর ভয়ঙ্কর আঘাত নামিয়া আসায় পণ্ডিত ও হিন্দু ভুঁইয়াগণ নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষায় মনোযোগী হইয়াছিলেন। জাতিকে বিজাতীয়করণের সর্বনাশা চেষ্টা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সমগ্র প্রয়াস ধর্মসংরক্ষণে নিযুক্ত। সে অবস্থায় রসসাহিত্য সৃষ্টির কথা উঠিতে পারে না !

৩. সর্বপ্রথম যাঁহারা বাংলা ভাষায় কাব্য রচনায় অগ্রণী হইয়াছিলেন, তাঁহারা হয় বৌদ্ধ, নয় নিম্নবর্ণের হিন্দু। উভয়েই লৌকিক সংস্কারের বাহক, ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের প্রতি বীতরাগ। এই জন্যই ভাষায় কাব্যরচনার গোড়ার দিকে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে লৌকিক ধর্ম, লৌকিক দেবতা ও লৌকিক ভাব। সংস্কৃত রসসাহিত্য এরূপ অবস্থায় প্রকাশের কোন পথই খুঁজিয়া পায় নাই। উপরন্তু আঘাতে-পীড়নে মানুষ ধর্মের দুয়ারেই ধর্না দেয়। কাজেই সেই বিপর্যয়ের যুগে বাংলা সাহিত্য রসকেন্দ্রিক না হইয়া হইয়াছে ধর্মকেন্দ্রিক।

৪. সংস্কৃত রসসাহিত্যের প্রধান উপজীব্য আদিরস। সে রস যেমন একদিকে দেহানুগ কামনা-বাসনার রঙে অনুরঞ্জিত, তেমনই সূক্ষ্ম সৌকুমার্যেও অধিবাসিত। বাংলার বৈষ্ণব কবিতা বহুলপরিমাণে এই রসকে আত্মসাৎ করিয়া লওয়ায় সংস্কৃত রসসাহিত্যের উপযোগিতা ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাসের

অব্যাহত বুদ্ধিগতি পড়ে দুই সপ্তশতী
পড়ে মুদ্রা মুরারি মালতী।
হিতউপদেশ কথা পড়িল বাসবদত্তা
কামন্দকী দীপিকা ভাস্বতী।
কাব্য প্রকাশ পড়ি অভ্যাস করিল বড়ি
রত্নাবলী সাহিত্যদর্পণে।
দিবানিশি নাহি জানে পড়ে সাধু সাবধানে
প্রসন্ন রাঘব রামগুণে ।। [কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ২য় খণ্ড]

শৃঙ্গারবর্ণনায় সংস্কৃত শৃঙ্গার বর্ণাঢ্য রেখায় চিত্রিত, উপরন্তু মহাপ্রভু চৈতন্যের প্রভাবে বৈষ্ণব পদাবলী প্রেমের যে সূক্ষ্মতা ও সুকুমার সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সংস্কৃত রসসাহিত্যের হৃদয়স্পর্শী প্রেমের সকল স্বাদ বর্তমান থাকায় এই 'উন্নত উজ্জ্বল রস' সংস্কৃত আদিরসাত্মক সাহিত্যের আবেদনকে ম্লান করিয়া দিয়াছিল।

৫. সংস্কৃত নাটকের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল বাংলার 'নাটগীত' 'পাঁচালি' ও 'কীর্তন'। নাটকের অভিনয়ে প্রয়োজন যে ব্যয়বহুল মঞ্চ-সমাবেশ ও সাজসজ্জা নাটযাত্রায় তাহার প্রয়োজন ছিল না। স্বল্প ব্যয়ে যেখানে একই প্রকার আনন্দ উপভোগ করা যায়, সেখানে ব্যয়বাহুল্য যে অনাদৃত হইবেই, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? এইরূপে সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের আকর্ষণও বাংলাদেশে স্তিমিত হইয়া গিয়াছিল। উপরন্তু মুসলমান সম্রাটেরাও ছিলেন নাট্যাভিনয়ের বিরোধী।

৬. সংস্কৃত কাহিনীর স্বাদ তৃপ্ত করিয়াছিল বাংলার কাহিনীকাব্য। কথা-সাহিত্যে, বিশেষতঃ কথার শিল্পিত রূপে কথার যে আকর্ষণ ছিল, তাহার অনেক-খানি পূর্ণ করিয়াছে বাংলার মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যে আছে কথার ভিতর কথা, কল্পনার কল্পলোক, অলৌকিকতার স্পর্শ, অভিযান ও প্রেমের বিচিত্র কাহিনী [লাউ-সেনের গল্প বা বিদ্যাসুন্দরপালা]। ইহাদ্বারা সংস্কৃত কথাসাহিত্যের আস্বাদ প্রচুর পরিমাণেই লাভ করা যাইত।

—এই সকল কারণেই সংস্কৃত রসসাহিত্যের বহুবিচিত্র কাব্যশাখার প্রয়োজনীয়তা বাংলাদেশে তেমন অনুভূত হয় নাই এবং রসসাহিত্য সৃষ্টও হয় নাই।

৩. বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত রসসাহিত্যের অন্তর্গূঢ় প্রভাব

(i) প্রাচীন যুগ

রসসাহিত্যের বহু বিচিত্র শাখা না থাকিলেও প্রাচীন বাংলা কাব্যে বিভিন্ন দিক হইতে সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তর্গূঢ় প্রভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের পট-ভূমিকা রচনা করিয়াছে প্রধানতঃ দুইটি সংস্কৃতি : লৌকিক সংস্কৃতি ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি। লৌকিক সংস্কৃতির মূল—দেশজ লোক-সংস্কার, মহাযান বৌদ্ধ সংস্কার ও জৈন সংস্কার। আদৌ বাংলাদেশে ছিল দেশজ লোক-সংস্কার ও জৈন সংস্কার। ক্রমে বৌদ্ধ-সংস্কার উহাদের উপর জয়লাভ করে। গুপ্তযুগ হইতে এই সংস্কারের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে গৌড়বঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার প্রবিষ্ট হয়। তাহার পর কয়েক শতক ধরিয়া চলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংস্কৃতি-সমন্বয়ের চেষ্টা। পালআমলে মহাযান তন্ত্রাচার মাথা চাড়া দিয়া দাঁড়াইলেও, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে ইহা পরাজিত করিতে পারে নাই। বরং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সহিত উহাকে সন্ধি করিতে হইয়াছে। হিন্দু-বৌদ্ধ সমন্বয় এই যুগের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সমন্বয় হইলেও সমাজের উচ্চ মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারকগণ। তাহার ফলে এদেশে মনু-শাসিত সমাজ-বিধি ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির জয়জয়কার। সেনরাজাদের আমলে এই জয়গৌরব

দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কার অন্যান্য সকল সংস্কারের উপর বিজয়ীর মহিমায় বিরাজ করিতে থাকে। আর অবহেলিত লৌকিক সংস্কার নিম্ন শ্রেণীকে আশ্রয় করে।

ঠিক এই সময় হইতেই বা ইহার কিছু পূর্ব হইতে নবজাত বাংলাভাষায় সাহিত্য রচনার প্রেরণা জাগ্রত হয়। ভাষায় সাহিত্য রচনা করিতে প্রথমে অগ্রসর হন মহাযান বৌদ্ধগণ ও সমাজের অবহেলিত জনগণ। উচ্চশিক্ষিত সংস্কৃত পণ্ডিতগণ তখনও সংস্কৃত চর্চা লইয়া ব্যস্ত। এই সময়ে চর্যাগানগুলি রচিত হয়। হিন্দু-বৌদ্ধ সমন্বয়ের ফলে শৈব নাথ যোগীদের মধ্যেও চর্যাগানের অনুরূপ সাধনসঙ্গীত রচিত হয় এবং নিম্নস্তরে অধিষ্ঠিত জনগণ বৌদ্ধ ও নাথ সিদ্ধাচার্যগণের অলৌকিক জীবন কাহিনী লইয়া মুখে মুখে কাব্য রচনা করিতে থাকেন। লৌকিক দেবতা (ধর্ম, মনসা, চণ্ডী) প্রভৃতির মহিমা-বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনাও এই সময় ছিল বলিয়া মনে হয়।

মুসলমানবিজয়ের ফলে বাঙালী সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি হইল। বৌদ্ধগণ নেপাল-তিব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং লোক-সংস্কারের সহিত পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের নূতন করিয়া সন্ধি স্থাপিত হইল। ক্রমে সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও ভাষায় সাহিত্য রচনা করিতে অগ্রসর হইলেন। মুসলমান সম্রাটগণ হিন্দু শাস্ত্র-পুরাণ শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ করায় সংস্কৃত পণ্ডিতগণ অনুবাদ-সাহিত্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেন এবং লৌকিক বাংলা সাহিত্য রচনাতেও তাঁহারা অগ্রসর হন। এই-ভাবে ভাষাসাহিত্যে ক্রমে ক্রমে সংস্কৃতের প্রভাব বিস্তৃত হইতে থাকে।

প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস বস্তুতঃ লৌকিক ধর্ম-কর্ম ও কাহিনীর পৌরা-ণিক ব্রাহ্মণ্যরূপে রূপান্তরিত হইবার ইতিহাস; লৌকিক সংস্কারের উপর ক্রমবর্ধ-মান হিন্দুব্রাহ্মণ্যের ভৃগুপদচিহ্ন ইহাতে অতি স্পষ্টরেখায় মুদ্রিত।

এই সূত্রে বাংলাসাহিত্য ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত রস-সাহিত্যের ভাব ও আঙ্গিক দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। তৎসম শব্দের প্রয়োগপ্রাচুর্যে, অলংকরণ-রীতিতে, নর-নারীর রূপ ও প্রেম বর্ণনায়, প্রৌঢ়োক্তি-নির্মাণে, নীতিশ্লোকের দৃষ্টান্ত-প্রয়োগে এবং কাব্যের দোষগুণ বিচারে অলংকারশাস্ত্রের পদ্ধতি অনুসরণে ও রসপ্রস্থানের স্বীকৃতিতে বাংলা সাহিত্যের উপর সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব সহজ লক্ষ্য।

মঙ্গলকাব্যের কোন কোন কাহিনী-কল্পনায়, বিশেষতঃ সমুদ্রযাত্রার কাহিনীতে সিংহলের পথে কমলে-কামিনী কল্পনা-প্রসঙ্গে সিংহলী এই সংস্কৃত জনশ্রুতির— 'কমলে কমলোৎপত্তি শ্রূয়তে ন চ দৃশ্যতে' প্রভাব আছে মনে হয়। হিতোপদেশের সুহৃদ্ভেদ প্রকরণে পরিব্রাজক কন্দর্পকেতুর কাহিনীতেও এইরূপ একটি গল্প সন্নি-বেশিত হইয়াছে: এক দিন এক পোতবণিক সিংহল রাজকুমার কন্দর্পকেতুকে জানান যে,

অত্র সমুদ্রমধ্যে চতুর্দশ্যামাবির্ভূতা কল্পতরুতলে রত্নাবলী-কিরণ-কর্বুর-পর্যঙ্কে স্থিতা সর্বালঙ্কার ভূষিতা লক্ষ্মীরিব বীণাং বাদয়ন্তী কন্যা কাচিদ্ দৃশ্যতে ইতি।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধনপতি উপাখ্যানে 'কমলে কামিনী'র বর্ণনাও অনেকটা এইরূপ। পার্থক্য এই যে কথাসাহিত্যে কন্যা বীণাবাদনরতা, মঙ্গলকাব্যে এই কন্যা গজগ্রাসিনী।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের (বিশেষতঃ কবিকঙ্কণ-চন্ডীতে) পশুগণের গোহারি অংশে পশুগণের মুখে যে কাতরোক্তি সন্নিবেশিত হইয়াছে, সংস্কৃত কথা সাহিত্যের প্রাণি-কাহিনীর সহিত তাহার সাদৃশ্য সহজ লক্ষ্য ; যেন সেই জন্তু-জগতের আর একটি দ্বিতীয় আলেখ্য—তেমনই সিংহ রাজা, অন্য পশু প্রজা—তেমনই পশুগণের স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা সম্পর্ক—তেমনই সুখ-দুঃখবোধ ও হাহাকার-ক্রন্দন।

তাহা ছাড়া, কোন নায়কের বিবাহ-বর্ণনায় কুলনারীগণের বর দেখিবার জন্য যে ঔৎসুক্য ['ত্যক্তান্যকার্যাণি বিচেষ্টিতানি'] সংস্কৃত কাব্যাদিতে অশ্বঘোষে কিংবা কালিদাসে বর্ণিত হইয়াছে, মঙ্গলকাব্যের নায়কের বিবাহ-বর্ণনায় কুলকামিনীগণের সেই একই চিত্র পাওয়া যায় [তবে বাংলা কাব্যে নারীগণের পতিনিন্দা অংশটুকু নূতন]।

॥ প্রাচীন বাংলা কাব্যের প্রকৃতি-বর্ণনায় সংস্কৃতরীতি ॥

সংস্কৃতসাহিত্যে ঋতুপর্যায়ের অসংখ্য বর্ণনা আছে। এই বর্ণনার দুইটি দিক ঃ (এক) প্রত্যেকটি ঋতুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বহিরঙ্গ চিত্র, (দুই) মানবমনের উপর এই ঋতু-প্রকৃতির প্রভাব। অধিকাংশ স্থলে সংস্কৃত সাহিত্যে ঋতু বর্ণিত হইয়াছে শৃঙ্গার রসের উদ্দীপন বিভাব রূপে ঃ কোথায়ও প্রকৃতির প্রসবশ্রী নিজেরাই পাত্র-পাত্রী ও নায়ক-নায়িকা ঃ ভ্রমর কুসুম-দয়িত, লতা তরুপ্রিয়া, কলাপী মেঘের প্রণয়িণী। সমগ্র প্রকৃতি যেন শৃঙ্গার-চেষ্টার জীবন্ত আলেখ্য। প্রকৃতি-জগতের এই শৃঙ্গার-চেষ্টা মানব-হৃদয়ের শৃঙ্গারভাব জাগ্রত করে ঃ কোথাও সম্ভোগের আকূতি, কোথাও বা বিপ্রলম্ভের করুণ ক্রন্দন। এইজন্য সংস্কৃত সাহিত্যের প্রকৃতি-বর্ণনা নিছক বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনায় পর্যবসিত হয় নাই ; মানুষের হৃদয়ভাবের সহিত উহার নিবিড় যোগাযোগ থাকায় উহাতে ব্যক্তি-মনের স্পর্শ লাগিয়াছে। তথাপি সংস্কৃতসাহিত্যের ঋতুবর্ণনায় ঋতুর বস্তুগত আবেদন প্রধান। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড সূর্যাতপ, বর্ষায় অম্বরে 'নবাম্বুদ' ও তাহার 'মর্দল মণ্ডল ধ্বনি', শরতের শুভ্র 'জ্যোৎস্নাভিন্ন' শারদ গগন, হেমন্তের 'শস্যরম্য' ক্ষেত্র, শীতের মহাহিম—'প্রকটয়নঙ্গেষু কম্পং' এবং বসন্তের 'পরিমলভৃতো বাতাঃ'—এক একটি ঋতুর চিত্রকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলে।

প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে ঋতু-বর্ণনায় এই বস্তুনিষ্ঠ চিত্রেরই সমাদর। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কবিগণ প্রকৃতির বহিরঙ্গ রূপটির দিকেই চোখ মেলিয়া তাকাইয়াছেন। কবির চোখে সর্বাগ্রে ধরা পড়িয়াছে বসন্ত ও বর্ষার রূপ। চর্যার সাধন-সঙ্গীতে একটি পংক্তিতে পাই বসন্তের এই অপরূপ বর্ণনা,

নানা তরুবর মোউলিল রে
গঅণত লাগেলী ডালী [২৮ নং চর্যা]

—ওরে নানা তরুবর মুকুলিত হইল ; ডাল গগন স্পর্শ করিল।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে পাই প্রবল ঝড়-জলের এই চিত্র ঃ

মেঘে কৈল অন্ধকার মেঘে কৈল অন্ধকার।
চিনিতে না পারি ভাই তনু আপনার॥
ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ ডাকে দুড় দুড়॥
নিমেষেকে জোড়ে মেঘ গগন মণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল॥

বাদল-বর্ষণের এইরূপ বহু বর্ণনা বাংলা কাব্যে পাওয়া যায়। যেমন কৃষ্ণমঙ্গলে,

নীল কুঞ্চিত কেশ উদয় আকাশে।
অবকেত ব্রহ্ম যেন সগুণে প্রকাশে॥
বায়ুবেগে প্রকাশিত সতড়িত ঘন।
বরিষে জীবন যেন সকরুণ জন॥ [মাধবাচার্য]

কিংবা ধর্মমঙ্গল কাব্যের এই বাদল-বর্ণনা ঃ

কাকপারা মেঘ এসে উড়িল গগনে।
হুড় হুড় ডাকে মেঘ উত্তর পবনে॥
বড় বড় শিলে পড়ে বিদারিয়ে চাল।
ভাদ্রপদ মাসেতে যেমন পড়ে তাল॥ [রামদাস আদক]

অথবা অন্নদামঙ্গল-মানসিংহ পালার এই ঝড়-বৃষ্টির বর্ণনা ঃ

ঘন ঘন ঘন গাজে।
শিলা পড়ে তড় তড় ঝড় বহে ঝড় ঝড়
হড় মড় কড়মড় বাজে॥
দশদিক অন্ধকার করিল মেঘগণ
দুনো হয়ে বহে ঊনপঞ্চাশ পবন॥
ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝনী বিদ্যুৎ চকমকি।
হুড়মড়ি মেঘের ভেকের মকমকি॥ [ভারতচন্দ্র]

প্রাচীন বাংলাকাব্যে এ-হেন প্রকৃতি-বর্ণনা নিতান্তই গতানুগতিক। মনে হয়, এসকল স্থলে কবিগণ পৌরাণিক প্রকৃতি-বর্ণনার ঢংটিই অনুসরণ করিয়াছেন। বস্তু-চিত্রে নূতনত্ব কিছু নাই, যাহা কিছু নূতনত্ব তাহা উপমা-উৎপ্রেক্ষা-অনুপ্রাসের ঘটায়। কবির দৃষ্টিভঙ্গি ভেদে অলংকারের আক্ষিপ্ত বস্তুগুলি পৃথক।

কিন্তু প্রকৃতি-বর্ণনায় সংস্কৃত কাব্য-রীতির প্রভাবও বাংলাসাহিত্যে বিস্তৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ 'বারমাস্যা' বর্ণনায়। বাংলা কাব্যের বারমাস্যায় একদিকে যেমন অতি সংক্ষেপে পাওয়া যায় বাংলার ঋতু-পর্যায়ের নিখুঁত ছবি, তেমনই অন্য-দিকে পাওয়া যায়, মানব-জীবনের উপর উহাদের প্রভাবের সংবাদ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকৃতি বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের উদ্বোধক। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ফুল্লরার বারমাস্যায়

জীবনের দারিদ্র্য-দুঃখের সুর গভীর হইয়া বাজিয়াছে, কিন্তু সুশীলার বারমাস্যায় ভাবী বিরহের আশংকা—প্রত্যেকটি মাস-বর্ণনার শেষে 'বিনোদ মন্দিরে থাক না চলিহ রায়' উক্তিটির ধ্বনি অতি করুণ। দ্বিজ মাধবে শুনি, মলয় বসন্তে বিরহিণী খুল্লনার হাহাকার,

আর দূর দেশে দুবা না পাঠাব পিউ।
বিরহ-পয়োধি মধ্যে যদি রহে জীউ ॥
মলয়জ সমীরণ কোকিলার নাদে।
কুসুম-সৌরভ অলি গগনহু চাঁদে ॥
কেবা বোলে এহারে জগতে সুখময়ে।
না জানি কি ভাল মন্দ বিপদ সময়ে ॥ [মঙ্গলচণ্ডীর গীত]

কিংবা বসন্তের আবির্ভাবে কবিকঙ্কণের খুল্লনার এই চিত্ত-বিক্রিয়া ঃ

মন্দ মন্দ প্রভঞ্জনে পড়য়ে কুসুম বনে
পাতিলেন অঞ্চল খুল্লনা।
হইয়া কামের দাস প্রভু আসিবেন বাস
ভেবে করে কামের অর্চনা ॥
কোকিল পঞ্চম গায় অলি মকরন্দ খায়
মন্দ মন্দ সুগন্ধি পবনে।
তরুডালে শারীশুকে আলিঙ্গন মুখে মুখে
দেখি রামা আকুল মদনে ॥

শৃঙ্গার রসের উদ্দীপন বিভাবরূপে প্রকৃতির এই বর্ণনা সংস্কৃতসাহিত্যের প্রকৃতি-বর্ণনার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

॥ সংস্কৃত প্রেমকবিতা ও বৈষ্ণব পদাবলী ॥

সংস্কৃত প্রেমকবিতার সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী বাংলার বৈষ্ণব পদাবলী। সংস্কৃত কাব্যে প্রেমের একটা বিবর্তন ধারা আছে। আমরা দেখিয়াছি, লৌকিক জগতের প্রেম ক্রমে ক্রমে দেবলোকের দিকে যাত্রা করিয়া দেব-শৃঙ্গার বর্ণনার অঘ্য-উপকরণে পরিণত হইয়াছিল। প্রেমের অনুভাব, সঞ্চারীভাব, প্রেমের সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভ, নায়িকার অষ্টাবস্থা—সবই তেমনই ছিল, শুধু পরিবর্তিত হইয়াছিল শৃঙ্গাররসের বিভাব। উঁহারা আর লোকজগতের নায়ক-নায়িকা নহেন, হয় হর-পার্বতী, নয় বিষ্ণু-লক্ষ্মী কিংবা রাধাকৃষ্ণ। বিষ্ণু-লক্ষ্মীর প্রেম সংস্কৃত সাহিত্যেও তেমন ধর্মশাবল্যে চিত্রিত হয় নাই, উহার স্থান অধিকার করিয়াছে রাধাকৃষ্ণের প্রেম। পাশাপাশি ছিল হর-পার্বতীর শৃঙ্গার।

দ্বাদশ শতকে বাংলাদেশে রচিত সংস্কৃত কাব্যে ও সংকলিত কাব্য গ্রন্থে প্রেমের এই দেবায়ত রূপটি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম হইতেই বাংলাকাব্য ধর্মকেন্দ্রিক হওয়ায়, লৌকিক প্রেম এখানে প্রধান হইয়া উঠিতে পারে নাই। মঙ্গল-

কাব্যাদিতে নায়ক-নায়িকার দাম্পত্য সুখ-দুঃখ-কলহ এত প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে যে, প্রেমের অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি সেখানে প্রকাশিত হইবার সুযোগ লাভ করে নাই ; সর্বোপরি দেব-মাহাত্ম্যের দৌরাত্ম্যে মানব-জীবনের স্বাভাবিক মনোবিকাশের ছন্দ চাপা পড়িয়া গিয়াছে। মনসাদেবীর ক্রুদ্ধ নিশ্বাসে চাঁদোর নাখরা বাগানের মত বেহুলার কমনীয় প্রেমকান্তি শুষ্ক হইয়াছে, ধর্মমঙ্গলের প্রচণ্ড যুদ্ধোদ্যমের মধ্যে কানাড়া কিংবা কলিঙ্গা কাহারও প্রেমপ্রকাশের সুযোগ ঘটে নাই ; চণ্ডীমঙ্গলেও ফুল্লরার প্রেম ফুটি ফুটি করিয়াও ফুটিতে পারে নাই।

প্রাচীন বাংলাকাব্যে প্রেমকবিতার আকারে মুখ্যতঃ আসিয়াছে দেব-শৃঙ্গারের বর্ণনা। উহার মধ্যেও আবার হর-পার্বতীর শৃঙ্গারের ধারা দারিদ্র্য-পীড়নে ও দাম্পত্যকলহে প্রায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। তথাপি ডোমনীর বেশে পার্বতীর কাম-মোহিত মহাদেবকে ছলনা, কিংবা পাল্টা জবাব হিসাবে কুশলীর বেশে বা শাঁখারীর বেশে পার্বতীর নিকট হরের রতি প্রার্থনার ভিতর কিছুটা প্রেমরঙ্গরস জমিয়া উঠিয়াছে।[১] কিন্তু এই ধরনের প্রেম-রঙ্গে ঘরোয়া রস যেমন জমিয়াছে, প্রেমরস তেমন জমে নাই। তরল হাস্য-কৌতুকে রঙ্গ থাকিতে পারে, প্রেমের গভীরতা থাকে না ; হৃদয়ের যে নিবিড়তম অনুভূতির স্পর্শে সত্যকারের প্রেমকবিতা সৃষ্টি হয়—তাহাও এই ধরনের লঘুচিত্রে প্রকট হইতে পারে না। কাজেই দেব-শৃঙ্গারের চিত্র হিসাবে বাংলা কাব্যে হর-পার্বতী চিত্র সার্থক হয় নাই ; সংস্কৃত প্রেম-কবিতার বিচিত্র রসও উহাতে প্রবাহিত হয় নাই।

সংস্কৃত দেবায়ত প্রেমকবিতার অব্যবহিত সার্থক উত্তরাধিকারী বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী। প্রেমের কবিতা লৌকিক ভাবের অধিবাসনে জয়দেবে আসিয়া রাধাকৃষ্ণের লীলা-বর্ণনায় যে-রূপে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই রূপেরই যথাযথ প্রকাশ ও বিকাশ দেখা যায় বাংলা বৈষ্ণব কবিতায়। বাংলার বৈষ্ণব পদের গঙ্গোত্রী জয়দেব। আকারে-প্রকারে, হাবে-ভাবে, ঝঙ্কারে-অলঙ্কারে, রসের প্রকাশে ও আস্বাদনের লক্ষ্যে বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী জয়দেব গোস্বামীর 'মধুরকোমলকান্ত পদাবলী'র প্রতিরূপ। এমন কি, জয়দেব-ব্যবহৃত 'পদাবলী' শব্দটির রূঢ়ার্থও ইহাতে পরিগৃহীত।

এই জয়দেব সংস্কৃত প্রেমকবিদের অন্যতম উত্তরসূরী। জয়দেবের রাধা যুগ-যুগান্তের ভারতীয় কবিদের মানস-নায়িকার প্রতিরূপ, তাঁহার রাধাপ্রেম যুগ-যুগান্ত-বাহিত প্রেম-প্রবাহের একটি তুঙ্গশীর্ষ চলোর্মি। বাংলার বৈষ্ণবকবিতা এই রাধা ও রাধাপ্রেমের নিকট ঋণী। শুধু জয়দেবের নয়, প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের প্রেমের যাবতীয় ভাব বৈষ্ণবকবিতায় সঞ্চারিত হইয়াছে। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় বলেন, 'পূর্ববর্তী কালের সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে লিখিত ভারতীয় সকল প্রেম কবিতা-গুলির সহিত আমরা পরবর্তীকালের রাধাপ্রেমের অসংখ্য কবিতার যদি তুলনা করি

১. দ্রষ্টব্য—'বিপ্রদাসের মনসা বিজয়' [বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন] এবং বাংলা শিবায়ন কাব্য।

তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিব, ভারতীয় সাধারণ কাব্যধারা এবং কবিরীতি ও কবি-প্রসিদ্ধিকেই বৈষ্ণব কবিগণ জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।" [শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ]। ডঃ দাশগুপ্ত ভূরি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত পূর্ববর্তী প্রেম কবিতাবলীর এই সাদৃশ্যের কারণ—(১) সংস্কৃত ও বাংলার বৈষ্ণব কবিগণ নাট্যশাস্ত্র ও কামসূত্রের নিকট সমভাবে ঋণী এবং (২) বৈষ্ণব কবিতা পূর্ববর্তী প্রেমকবিতারই একটি বিবর্তিত দেবায়ত রূপ।

চৈতন্যপূর্ব বৈষ্ণবপদের কবিরূপে বিদ্যাপতি[১] ও বড়ু চণ্ডীদাসের নাম উল্লেখ-যোগ্য। বিদ্যাপতি সংস্কৃতজ্ঞ রসিক পণ্ডিত। তাঁহার রচনায় সংস্কৃত বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের স্পষ্ট স্বাক্ষর বর্তমান। অলঙ্কার প্রয়োগে, চিত্রকল্প যোজনায় এবং প্রৌঢ়োক্তি নির্মাণে তিনি সংস্কৃত কবিদের সগোত্র। সংস্কৃত আলঙ্কারিক রীতির প্রভাব তো আছেই, উপরন্তু প্রেমের অনুভাব-সঞ্চারাদির বিষয়েও তিনি সংস্কৃত কবিবর্গের নিকট ঋণী। কালিদাসের ভাষাভঙ্গীর সঙ্গে বিদ্যাপতির মিল লক্ষণীয়। অমরুশতকের 'দীর্ঘা বন্দনমালিকা বিরচিতা দৃষ্টৈব নেন্দীবরৈঃ' কবিতার সহিত বিদ্যাপতির 'পিয়া যব আওব ই মঝু গেহে' বিরহপদের সাদৃশ্য আছে। বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় 'দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীন। বাড়ল নিতম্ব মাঝ ভেল খীন ॥' সংস্কৃত কবির 'গতে বাল্যে চেতঃ কুসুমধনুষা সায়কহতং' পদটির সহিত বিনিময় করা যায়। পূর্বরাগ, অনুরাগ, সম্ভোগ ও বিরহের বর্ণনায় বিদ্যাপতির সহিত পূর্ববর্তী সংস্কৃত কবিদের প্রচুর মিল দেখানো যাইতে পারে। এই মিল অনুপম রূপনির্মাণকৌশলের দিক হইতে তো বটেই, ভাবের দিক হইতেও। মনে ও মেজাজে বিদ্যাপতি সংস্কৃত কবিরই প্রতীক। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে, মৈথিল পণ্ডিত জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের 'বর্ণরত্নাকর' গ্রন্থখানির নায়িকা বর্ণনার প্রভাব বিদ্যাপতিতে সর্বাধিক।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-প্রণেতা বড়ু চণ্ডীদাসও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। তাঁহার গ্রন্থে সন্নি-বেশিত সংস্কৃত শ্লোকগুলি যদি বড়ু চণ্ডীদাসের নিজস্ব রচনা হয়, তবে তাঁহাকে অবশ্যই রসজ্ঞ সংস্কৃত পণ্ডিত বলিতে হইবে। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণ লীলা-কাহিনী প্রধানতঃ অপৌরাণিক। বহুকাল পূর্ব হইতে বাংলাদেশে রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ে যে লৌকিক কাহিনী প্রচলিত ছিল, বড়ু চণ্ডীদাস তাহারই অঙ্গে সংস্কৃত প্রেমকবিতার আহার্য যোজনা করিয়াছেন। জয়দেবের স্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে কতকগুলি পদে ঃ

১. তরুদল চালএ পবনে।
কাহ্ন আইসে হেন তাক মানে ॥ [রাধাবিরহ]

---

১. বিদ্যাপতি যদিও মৈথিল কবি, তথাপি তিনি বাঙালীর অন্তরঙ্গ প্রিয় কবি রূপে স্বীকৃত হইয়াছেন।

[তুলনীয় ঃ 'পত্রেহপি সঞ্চারিণি, প্রাপ্তং ত্বাং পরিশঙ্কতে,—জয়দেব]

২. তনের উপরে হারে।
আল
মানএ যেহেন ভারে।
আতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতে না পারে ।। [রাধাবিরহ]

[তুলনীয় ঃ 'স্তন বিনিহিতমপি হারমুদারম্' ইত্যাদি ঐ. ৪]

৩. নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে।
গরল সমান মানে মলয় পবনে ।। [রাধাবিরহ]

[তুলনীয় ঃ 'নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্' ইত্যাদি ঐ. ৪]

৪. যদি কিছু বোল বোলসি তবে
দশনরুচি তোহ্মারে।
হরে দুরুবার ভয় আন্ধকার
সুন্দরি রাধা আহ্মারে ।। [বৃন্দাবন খণ্ড]

[তুলনীয় ঃ 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী' ইত্যাদি ঐ. ১০]

শুধু জয়দেব নয়, বড়ুর রচনায় অন্যান্য সংস্কৃত কবির ছায়াও লক্ষণীয়। যথা,

১. কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ের হরিব্রজ্যার অন্তর্গত একটি শ্লোকে [৩৪নং] দেখা যায়, সখী বলিতেছেন, আমি সারা রাত্রি সেই ধূর্তকে অন্বেষণ করিয়াছি, তাহাকে ভাণ্ডীর বনে দেখি নাই, কালিন্দীকুলেও দেখি নাই, বেতসকুঞ্জেও নয় ['ময়ান্বিষ্টো ধূর্তং স সখি নিখিলামেব রজনীম্···ন দৃষ্টো ভাণ্ডীরে তটভুবি ন গোবর্ধনগিরে' ইত্যাদি] এই কবিতাটির সহিত মিল রহিয়াছে বড়াইর কৃষ্ণান্বেষণের

যমুনা [ত না] পাঞা গোপালে।
পুন গেলী বকুলের তলে ।।
তথা না পাইঞা গদাধরে।
চাহিলেক গাছের উপরে ।।
চাহিঞা না পায়িল বনমালী। [রাধাবিরহ]

২. কৃষ্ণকীর্তনের রাধা-বিরহে মদনতাপিতা রাধা কৃষ্ণের ঔদাসীন্য দেখিয়া তাঁহাকে অনুযোগ করিতেছেন,

নানা রতি সমে মোর হরিআঁ পরাণ।
বিকলী করিআঁ মোক তোহ্মে বুলহ কাহ্ন ।।
আহ্মাক পরাণে মাইলে কি লাভ তোহ্মার ।।

ঠিক এই ভাবেরই সোল্লুণ্ঠ বাণী শুনি অমরুশতকে অনুতপ্তা নায়িকার উক্তিতে ঃ

অজ্ঞানেন পরাঙ্মুখীং পরিভবাদাশ্লিষ্য মাং দুঃখিতাং
কিং লব্ধং শঠ ! দুর্ণয়েন নয়তা সৌভাগ্যমেতাং দশাম্। [অমরু. ১৭]

শুধু তাই নয়, বড়ু চণ্ডীদাসের প্রকৃতি-বর্ণনাও সংস্কৃত রীতিসিদ্ধ। এখানেও প্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে শৃঙ্গারের উদ্দীপন বিভাব রূপে। রাধার চতুর্মাস্যার আষাঢ়,

শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন এই চারি মাস বিরহিণী রাধার অন্তরে সম্ভোগ-বিরহের ক্রন্দন জাগাইয়া তুলিতেছে ঃ

কেমনে বঞ্চিবোঁ রে বরিষা চারি মাস ।।
এ ভর যৌবনে কাহ্ন করিলে নিরাস ।। [রাধাবিরহ]

এ যেন শৃঙ্গার-শতকের কবি ভর্তৃহরির সেই ধ্বনি, 'কথং যাস্যন্ত্যেতে বিরহ-দিবসাঃ সংভৃতরসাঃ' ।

চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীতেও সংস্কৃত প্রেমমূলক কবিতার প্রভাব অল্প নয় । চণ্ডীদাস প্রেমেরই কবি । প্রেমের অতি সূক্ষ্ম, সুকুমার ভাবগুলি তাঁহার কবিতার প্রাণবস্তু । সংস্কৃত সাহিত্যে শৃঙ্গারের বর্ণনায় স্থূল সম্ভোগ-শৃঙ্গার বা মানের ভাব অধিক পরিস্ফুট । চণ্ডীদাসের কবিতায় স্থূলতা অপেক্ষা সূক্ষ্মতার সমাদর । প্রেমের পেলব অনুভাব ও অতি মধুর মনোভাব বর্ণনায় চণ্ডীদাস অদ্বিতীয় । সংস্কৃত কবিতায় যেখানে সূক্ষ্মতার প্রকাশ, সেইখানেই চণ্ডীদাসের সহিত তাহার মিল । অমরুশতকের পূর্বরাগময়ী নায়িকার প্রতি সখীর 'অলস বলিতৈঃ প্রেমার্দ্রৈর্মুহুর্মুহু-কুলীকৃতৈঃ' উক্তির সহিত চণ্ডীদাসের এই সখী-প্রশ্নটির বিনিময় করা চলে ঃ

এ সখি সুন্দরী কহ কহ মোয় ।
কাহে লাগি তুয়া অঙ্গ অবশ হোয় ।।
অধর কাঁপয়ে তুয়া ছল ছল আঁখি ।
কাঁপিয়ে উঠয়ে তনু কণ্টক দেখি ।।
মৌন করিয়া তুমি কিবা ভাব মনে ।
এক দিঠ করি রহ কিসের কারণে ।।

চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগের পদ 'যত নিবারিতে চাই নিবার না যায় গো'—অমরুর 'ভ্রূভঙ্গে রচিতেঽপি' শ্লোকের ভাবের সহিত মিলিয়া যায় ; এমন কি প্রেম-বৈচিত্ত্যের পদ—'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'—সমালিঙ্গিত মিলন-মুহূর্তে তীব্র বিরহ-বেদনা বোধের ভাবটির সহিত কালিদাসের ঋতুসংহারের এই পংক্তিটির ভাবসাদৃশ্য আছে ঃ 'সমীপবর্তিষ্বধুনা প্রিয়েষু সমুৎসুকা এব ভবন্তি নার্যঃ' [ঋতু. ৬. ৮]।

চৈতন্য-পূর্ব বৈষ্ণব প্রেমকবিতা প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণীয় ঃ এই কবিতা বিশেষ ভাবে সংস্কৃত রসশাস্ত্র ও অলংকার শাস্ত্রের নিয়মানুসারী । ভরত-বাৎস্যায়ন প্রেমের অনুভাব, সঞ্চারিভাব, নায়িকাঅবস্থা ও সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভ বর্ণনার যে আদর্শ স্থির করিয়া দিয়াছেন, চৈতন্য-পূর্ব বৈষ্ণব পদকর্তা সেই আদর্শকেই অনুসরণ করিয়াছেন ; উহাতে প্রেমের স্থূল সম্ভোগাসক্তি সুরপঞ্চমে ধ্বনিত হইয়াছে । ধর্মবোধের দোহাই থাকা সত্ত্বেও উহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কামনার স্তরকে অতিক্রম করিয়া যথাযথ অন্তর্মুখী হইতে পারে নাই । কিন্তু প্রেমের এই ইন্দ্রিয়ব্যাকুলতাকে স্তব্ধ করিয়া দিয়া রাধা-প্রেমের সুদিব্য, পবিত্র, শুদ্ধ, নির্মল আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন প্রেমাবতারী শ্রীচৈতন্য । কামে ও প্রেমে সুস্পষ্ট পার্থক্য তিনিই নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন ঃ

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥ [চৈ. চ. আদি. ৪]

কাম নিজ সম্ভোগলালসায় পর্যবসিত, উহা রাজোগুণের বৃত্তি—নিঃস্বার্থ প্রেমের বৃত্তি নয়। প্রেমের দুঃসহ অনল-দহন-সহন ক্ষমতা, প্রেমের কঠিন ত্যাগ, প্রেমের অকুতোভয় দুর্জয় সাহসিকতা ও তাহার গভীরতা কামে নাই ঃ 'কাম অন্ধ তমঃ প্রেম নির্মল ভাস্বর।' প্রেমের এই তাৎপর্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, নিজের জীবন দিয়া দৃঢ় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। দগ্ধহেম সন্নিভ এই প্রেমের মহিমা স্থাপন করিয়া তিনি ইষ্টগোষ্ঠী প্রসঙ্গে ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

গানমধ্যে কোন্ গান জীবের নিজধর্ম।
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে গীতের মর্ম ॥ [চৈ. চ. মধ্য. ৮]

তাই চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিতায় প্রেমের আকার, প্রকার ও পদ্ধতি সংস্কৃত প্রেমকবিতা হইতে একটা স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। 'আনন্দ-চিন্ময়-রস প্রেমের আখ্যান'—প্রেমের এ অভিধা চৈতন্যদেবের ; এই প্রেমের পরকাষ্ঠা 'মহাভাব'—এ মহাভাবও চৈতন্যদেবের আবিষ্কার ; ইহার আস্বাদনে যে অনির্বচনীয় 'লৌল্য' তাহারও প্রতিষ্ঠা চৈতন্যদেবে। ভরতমুনি এ রসের সন্ধান জানিতেন না।[১] এই রস লইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে নব রসশাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। রূপগোস্বামীকৃত 'উজ্জ্বল-নীলমণি' ও 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' সেই রসশাস্ত্রের আকর গ্রন্থ। প্রাচীন প্রেমশাস্ত্রের যাহা কিছু সূক্ষ্ম, সুকুমার, সুন্দর, রুচির ও মধুর তাহা সকলই এ শাস্ত্র স্বীকার করিয়া লইয়া প্রেমের অনন্ত বৈচিত্র্য, অনন্ত মাধুর্য ও অনুপম সৌন্দর্যকে নবরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। রসরাজ 'অখিলরসামৃতমূর্তি', 'সাক্ষাৎ মন্মথ-মথন', 'মূর্তিমান শৃঙ্গার' শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেমের বিষয় বিভাব। মহাভাবময়ী 'প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত' রাধারাণী এই প্রেমের আশ্রয় বিভাব। এই আশ্রয় বিভাবের হাব-ভাব-হেলা, শোভা-কান্তি-দীপ্তি মাধুর্য, প্রগল্ভতা-ঔদার্য-ধৈর্য, লীলা-বিলাস-বিচ্ছিত্তি-বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত-মোট্টায়িত-কুট্টমিত-বিব্বোক-ললিত-বিকৃত প্রভৃতি ভূষণ যেন অনন্ত সাগরে অনন্তকোটি ঊর্মি। তাহা গণনা করা দুঃসাধ্য। অনুভাবগুলিও দুরবগাহ। চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব প্রেমকবিতা এই প্রেমশাস্ত্রের অধীন। ইহাতে স্বারসিক প্রেমের যে অনন্ত প্রকার অবস্থাভেদ কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা পূর্ববর্তী রসশাস্ত্রে ও প্রেমকবিতায় অনুপস্থিত। চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম প্রেমের নূতন শাস্ত্র প্রণয়নে যে প্রেরণা দিয়াছে, পরবর্তী বৈষ্ণব কবিগণ ছন্দে ছন্দে সেই প্রেরণায় নবপ্রেমার রসভাষ্য রচনা করিয়াছেন। প্রাকৃত প্রেমের সকল সৌরভই ইহাতে আছে, উপরন্তু আছে ইহার নিজস্ব অনির্বচনীয় লাবণ্য—মহাভাবের 'সুদ্দীপ্ত' প্রকাশ, 'কিলকিঞ্চিতা'দি 'ভাবশাবল্য', উদ্দাম 'প্রেমকৌটিল্য', মোহনাখ্য মহাভাবের উদ্ঘূর্ণা

---

১. দোঁহার যে সমরস ভরতমুনি মানে।
আমার ব্রজের রস সেহ নাহি জানে ॥ [চৈ. চ. আদি. ৪]

ও জল্প ('ভ্রমময় চেষ্টা আর প্রলাপময় বাদ') এবং 'সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদন' মহাভাব। প্রত্যক্ষদর্শী ভক্ত এই প্রেমসম্পর্কে শুধু এই কথাই বলেন,

কি কব প্রেমের কথা কহিতে ডরাই।
এমন আশ্চর্য ভাব কভু দেখি নাই॥ [গোবিন্দদাসের কড়চা]

কাজেই সেই প্রেমকবিতার সহিত পূর্ববর্তী প্রেমকবিতার কোথাও কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও প্রকৃতিতে তাহা একেবারেই স্বতন্ত্র। উহার ক্ষেত্রও স্বতন্ত্র।

॥ রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ও সংস্কৃত কাব্য ॥

বাংলা প্রেমকবিতার বিবর্তনেতিহাসে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। সমগ্র প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে কতিপয় বৈষ্ণব পদকর্তা ব্যতীত ভারতচন্দ্রই একমাত্র কবি, বিষয়নির্বাচনে, রসালাপে, প্রেম ও সৌন্দর্যচেতনায় এবং বাগ্‌বৈদগ্ধ্যমণ্ডিত প্রকাশভঙ্গিতে যিনি সংস্কৃত পূর্বসূরীদের যথার্থ উত্তরসাধক। প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় সংস্কৃত রসসাহিত্যের যে তরঙ্গধ্বনি উত্থিত হইয়া প্রায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, যাহার একটিমাত্র ধারা-তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছিল অন্যপ্রকারে বাংলার বৈষ্ণব কবিতার খাতে, সেই রস-ধ্বনি যেন কয়েকযুগ অতিক্রম করিয়া আবার ঝঙ্কৃত হইল কবি ভারতচন্দ্রের কণ্ঠে। চৌষট্টিকলাভিজ্ঞ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি বিদগ্ধ ভারতচন্দ্র। তিনি প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি—যেন বিক্রমাদিত্যসম কৃষ্ণচন্দ্রের সভার কবিরত্ন দ্বিতীয় কালিদাস, কিংবা শ্রীহর্ষের সভা-সভ্য দ্বিতীয় বাণভট্ট কিংবা দ্বিতীয় কোন অমরু বা দণ্ডী।

ভারতচন্দ্রের বহুখ্যাত কাব্য 'অন্নদামঙ্গল'; এই কাব্যের আখ্যানভাগের মধ্যমণি 'বিদ্যাসুন্দর' পালা। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী ভারতচন্দ্রের নিজের আবিষ্কার নয়। শ্রদ্ধেয় আচার্য সুকুমার সেন মনে করেন, ইহা 'উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রচলিত লৌকিক প্রণয়কাহিনী'[1]—বাংলাকাব্যে ইহাকে আমদানী করিয়াছেন মুসলমান সুফী সাধক। কিন্তু সংস্কৃত পুরাণে [পদ্ম-উত্তরে মাধব-চন্দ্রকলার উপাখ্যান, হরিবংশে ঊষা-অনিরুদ্ধের কাহিনী], কথাসাহিত্যে [পঞ্চতন্ত্রের রথকার-কৌলিকের কাহিনী], গদ্যকাব্যে [সুবন্ধুর বাসবদত্তা] এবং বিহ্লণের 'চৌরপঞ্চাশিকা'য় অনুরূপ উপাখ্যানের বীজ রহিয়াছে। সংস্কৃত রস-সাহিত্য চর্চার সূত্রেই উহা বাংলাদেশে প্রচলিত হইতে পারে। তাহাছাড়া এই প্রণয়-কাহিনীর সহিত শক্তি-সাধনার যোগাযোগ থাকায় বাংলার শাক্ত মঙ্গলকাব্যে [কালিকামঙ্গলে বা অন্নদামঙ্গলে] এই কাহিনী শক্তি-সাধনার প্রসঙ্গেই যুক্ত হইয়াছে। 'বিদ্যা' শব্দটিও দ্ব্যর্থক [দ্রষ্টব্য—চৌরপঞ্চাশিকার 'অদ্যাপি তাং' শ্লোকগুলি] শক্তি-সাধনার সূত্রেই বিদ্যাসুন্দর কাহিনী সংস্কৃত কাব্যের কোন উৎস হইতে বাংলাকাব্যে গৃহীত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের ঋণও সংস্কৃত কবিদের নিকট, মুসলমানী ঋণ কষ্টকল্পনা।

---

১. বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)—ডঃ সুকুমার সেন

শুধু কাহিনী বিষয়ে নয়, এই কাহিনীর প্রেমচিত্রাঙ্কনেও ভারতচন্দ্র হুবহু সংস্কৃত কবিদের অনুসরণ করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রেমে ও কামে অতি সূক্ষ্ম কোন পার্থক্য নাই ; গভীর, সান্দ্র, একনিষ্ঠ, দাম্পত্যে পর্যবসিত কামই প্রেম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সে প্রেমে গান্ধর্বমিলন সমর্থিত। উদ্দাম সম্ভোগ-কামনা সে প্রেমের ধ্রুবপদ। তাহাতে নায়ক-নায়িকা মদন-রতির দ্বিতীয় প্রতিরূপ—তাহাদের রূপ, গুণ, নেপথ্যবিধান রতির পরিপোষক। সেখানে সুন্দর নায়ক বা সুন্দরী নায়িকা প্রথম দর্শনেই পঞ্চশরসন্ধানে আহত হয় ; পঞ্চশরের আঘাতে প্রথম হইতেই মত্ততা, দগ্ধতা, শুষ্কতা—প্রথম হইতেই কম্প-স্বেদ-পুলক-অশ্রু-মোহের প্রবাহ।

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রকৃতিও রতিবিলাসের রঙ্গক্ষেত্র ; এখানে সূর্যে ও পদ্মিনীতে প্রণয়, চন্দ্রে ও কুমুদিনীতে প্রণয়, লতায় ও বৃক্ষে প্রণয়, প্রণয় মধুপে ও কুসুমে। ঋতু-পর্যায় এখানে আবির্ভূত হয় হৃদয়ের সম্ভোগ-উৎকণ্ঠাকে উদ্বোধিত করিয়া।

বিলাস-বিহারের বর্ণনাতেও সংস্কৃত-সাহিত্য বাধাবন্ধহীন। সেখানে আচার্য বাৎস্যায়ন ও গোনর্দ তাঁহাদের অকৃপণ উদারতা লইয়া কামশাস্ত্রের বিধি হস্তে দণ্ডায়মান ; সম্ভোগের সেখানে অসংখ্য প্রকারভেদ—'ব্যানত', 'করিপদ', 'হরিবিক্রম', 'ধেনুক'-সংজ্ঞক অশেষ বিলাস-প্রকার চাতুর্য ; ইহার উপর নায়িকার 'পুরুষায়িত' অর্থাৎ বিপরীত রতি। কামকলাবিলাস বর্ণনায় সংস্কৃত কাব্য দ্বিতীয়রহিত। রুচিহীনতা বা উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্ন এখানে অবান্তর—কারণ, এ কাম 'ধর্মাবিরুদ্ধ কাম', অতএব সমর্থিত ও স্বীকৃত।

বাংলাকাব্যে ভারতচন্দ্র এই সংস্কৃত প্রেমের সচেতন শিল্পী। বিদ্যা-সুন্দরের প্রণয়, রাগ, মিলনোৎসুক্য, গান্ধর্ব বিধানে বিবাহ, বিচিত্র বিলাস-সম্ভোগ সংস্কৃত বর্ণনার প্রতিরূপ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইতেছে ঃ

১. বিদ্যার রূপ-বর্ণনায় ভারতচন্দ্রের উক্তি ঃ

> ভ্রমর ঝংকার শিখে কঙ্কণ ঝঙ্কারে।
> পড়ায় পঞ্চমস্বর ভাষে কোকিলারে ।।

অনুরূপ উক্তি পাই কালিদাসে উমার রূপ বর্ণনায় এবং ভর্তৃহরির শৃঙ্গার-শতকে।

> এতাশ্চলদ্বলয় সংহতি মেখলোত্থ-
> ঝঙ্কারনূপুর রবাহৃতা রাজহংস্যঃ।

২. ভারতচন্দ্র একটি পংক্তিতে পঞ্চশরাহত বিদ্যার চিত্রটি অংকন করিয়াছেন ঃ

> শিহরিল কলেবর তনু কাঁপে থরথর
> হিয়া হৈল জরজর আঁখি ছলছল।

ইহারই অনুরূপ চিত্র পাই হরিবংশে উষা-অনিরুদ্ধ কাহিনীতে এবং 'সূক্তিমুক্তাবলী'তে উদ্ধৃত একটি মুক্তকে ঃ

> শ্বাসেষু প্রথিমা মুখং করতলে গণ্ডস্থলে পাণ্ডিমা
> মুদ্রা বাচি বিলোচনেঽশ্রু পটলং দেহে চ দাহোদয়ঃ।

[কম্প, প্রদাহ, অশ্রু প্রভৃতি মদনশরাহত ব্যক্তির প্রসিদ্ধ অনুভাব]

৩. বিহার-বর্ণনায় বিদ্যার সলাজ বাধা-নিষেধ প্রচলিত কামশাস্ত্র ও উদ্ভট শ্লোকের প্রতিধ্বনি মাত্র। এখানে উদ্ভট শ্লোকাবলীর দুই একটি পংক্তি উদ্ধৃত হইল ঃ

(i) কৃতং মৌনং প্রশ্নে মুখমপহৃতং চুম্বন-বিধৌ
পরীরম্ভারম্ভে নহি নহি নহীতি প্রলপিতম্।

(ii) অহং নবীনা রতিকেলিহীনা
পতিঃ প্রবীরঃ সুরতৈকধীরঃ।

এইরূপ সাদৃশ্যসূচক বহু শ্লোক ভারতচন্দ্রের কাব্য হইতে উদ্ধৃত হইতে পারে। প্রেমের উদ্দীপন-বিভাব প্রকৃতির বর্ণনাতেও রায়গুণাকর সংস্কৃত কবির অনুকারী। বিদ্যার 'বারমাস্যায়' কবি বাংলা কাব্যের প্রচলিত রীতি অনুসারে বার-মাসের বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনায় প্রকৃতি-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে কামার্ত হৃদয়ের কাম-কল্পনা ঃ

(i) নিদাঘে বাতাস দিব কামে জাগাইয়া।

(ii) ভাদ্রে—জলের ঝরঝরি বায়ুর খরখরি।
শুনিব দুজনে শুয়ে গলাগলি করি ।।

(iii) অতি বড় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার।
শীতের বিহিত হিত করিবে বিহার ।।

(iv) মধুর সময় বড় চৈত্র মধুমাস।
জানাইব নানা মত মদন বিলাস ।।

ভারতচন্দ্র প্রেমবর্ণনায় যে সংস্কৃত কামশাস্ত্র বা রসশাস্ত্রেরই অনুগামী, কবিকৃত 'রসমঞ্জরী'র দৃষ্টান্তবাক্যে তাহা আরও সুস্পষ্ট।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের এই কাম-প্রাগল্‌ভ্য নিন্দার বিষয়ীভূত হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন 'অন্নদামঙ্গল নির্দোষ কাব্য নহে। ব্যক্ত অশ্লীলতা তাহার মহদ্ দোষ।' [রাখালদাস]। কেহ কেহ এই অশ্লীলতাকে অবক্ষয় যুগের সাধারণ লক্ষণ বলিয়া ভারতচন্দ্রকে নিন্দামুক্ত করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, বিকৃতরুচি যুগের প্রভাব যাহাই থাকুক, ভারতচন্দ্র প্রধানতঃ বাৎস্যায়ন-দণ্ডী-শাসিত সংস্কৃত কবির দায়ভাগী ; ভাবে, ভঙ্গিতে রুচিতে তাঁহার কাব্য সংস্কৃত আদিরসাত্মক রচনার প্রতিনিধি। তাঁহার কাব্যের গুণ বা দোষের আকর প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য। আদিরসাত্মক বলিয়া সংস্কৃত কাব্য যদি নিন্দনীয় না হয়, ভারতচন্দ্রও নিন্দনীয় নহেন। তবে একথা সত্য যে, ভারতচন্দ্রের রচনায় সংস্কৃত প্রেমকবিতার গভীর ভাবগাম্ভীর্যের অভাব আছে ঃ প্রেম-বর্ণনায় ভারতচন্দ্র তরল ও চটুল।

এই প্রসঙ্গে বাংলা প্রেমকবিতায় কবি ভারতচন্দ্রের একটি দান অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বহুদিন হইতে প্রেমের জগৎ লোক-জগৎ হইতে সরিয়া গিয়া দেব-লোক আশ্রয় করিয়াছিল। লৌকিক প্রেমের কবিতা ছিল একান্তই দুর্লভ। বাংলা মঙ্গলকাব্যে মর্ত্য প্রেমের ছবি ফুটিবার অবকাশ থাকিলেও ভাল ফুটে নাই। দেব

মহিমার হিরন্ময়দ্যুতিদ্বারা লৌকিক প্রেমের মাধুর্যের দিকটি আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। খুল্লনা-ধনপতির প্রেমে সপত্নী-কলহের দিকটি এত আড়ম্বরপূর্ণ যে, তাহাতে প্রণয়-জনিত দুঃখের পটভূমিকায় প্রেমের সৌকুমার্য বা মাধুর্য বিকশিত হইতে পারে নাই। বরং পল্লীগীতিকায় বা সাহিত্যে প্রেমের মধুরতম চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা অভিজাত সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না। মোটের উপর প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে লৌকিক প্রণয়ের মধুর চিত্র সুলভ নয়।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রে প্রেম ধর্মের নির্মোক ত্যাগ করিয়া আবার লোকজগতের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক বাংলা প্রেমকবিতায় লৌকিক জগতের হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার যে মধুর আস্বাদ পাওয়া যায়, ভারতচন্দ্র তাহার পথিকৃৎ। বিদ্যা-সুন্দরের প্রেম মানব-মানবীর প্রেম। সংস্কৃত সাহিত্য রীতির অনুগত হওয়ায় উহাতে কামনার উদ্দামতা প্রকট হইলেও মানব-মানবীর প্রেমজনিত চিরকালীন সঙ্গলাভের কামনা—পূর্বরাগ, মিলন-চেষ্টা, মিলনের আনন্দ ও বিরহ-বেদনার আস্বাদ উহাতে দুর্লভ নয়। নায়িকার উদ্দেশ্যে নায়কের পুষ্পময় কামমূর্তি রচনা ও চিত্র-কাব্যে শ্লোক রচনা এবং পত্রে প্রেমভাবের বিনিময়ের চেষ্টাগুলি সত্যই সুন্দর এবং উহা মানব-প্রেমলীলার অঙ্গ। প্রায় প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের পূর্বে অবশ্য রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার অনুরূপ কোন বিষ্ণুপদী গান যোজনা করা হইয়াছে, যেমন,

(i) ওহে বিনোদ রায় ধীরে ধীরে যাও হে।
(ii) একি অপরূপ রূপ তরুতলে।
হেন মনে সাধ করে তুলি পরি গলে॥
(iii) নবনাগরী নাগর-মোহিনী।
রূপ নিরূপম সোহিনী।

কিন্তু এই সকল বিষ্ণুপদেও লৌকিক ভাবের স্পর্শই অধিক। পরবর্তীকালে নিধুর টপ্পা লোকজীবনের যে প্রণয়-মধুর পথে অগ্রসর হইয়াছে, ভারতচন্দ্র তাহার পথপ্রদর্শক। ভারতচন্দ্র লোকজীবনের প্রেমকে দেবভূমি হইতে পুনরায় মর্ত্যভূমে আনয়ন করিয়াছেনঃ লোকপ্রেম ও দেবশৃঙ্গারের যুক্ত বেণীকে তিনিই মুক্ত করিয়াছেন। সংস্কৃত ও প্রাকৃত লৌকিক প্রণয়েব ঝঙ্কারগুলির সহিত উহার প্রচুর সাদৃশ্য রহিয়াছে।

বিষয়-চয়নের দিক হইতে তো বটেই, অলংকারাঢ্য প্রকাশভঙ্গির দিক হইতেও ভারতচন্দ্র সংস্কৃতপন্থী। রস-প্রস্থানের আচার্যদের মতই তিনিও বলেন, 'কাব্যরস লয়ে'। কিন্তু রসসৃষ্টিতে অভিনিবিষ্টমনা হইলেও ভারতচন্দ্রের প্রধান গৌরব লিপি-কুশলতায় অর্থাৎ রূপনির্মাণের নৈপুণ্যে। বিদ্যা-সুন্দরের কবি তাঁহার কাব্যে বিদ্যা (পাণ্ডিত্য) ও সুন্দর (অলংকার-শোভা)—এই দুইয়ের সার্থক মিলন ঘটাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলিয়াছেন, 'রাজসভার কবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজ-মণিমালার মত, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনই কারুকার্য।' এই ঔজ্জ্বল্য ও কারু-কার্য সংস্কৃত কাব্যের ভাণ্ডার হইতে সমাহৃত। অনুপ্রাসে-যমকে-শ্লেষে, উপমা-রূপক-

উৎপ্রেক্ষা-অতিশয়োক্তিতে এবং বাক্-প্রৌঢ়ির সৃষ্টিতে ভারতচন্দ্রের সুসমৃদ্ধ রচনা অলঙ্কারসিদ্ধ সংস্কৃত কাব্যের কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দেয়। আমরা একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিতেছি।

সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে 'চিত্র' নামে একটি শব্দালঙ্কার আছে। উহাতে যথাবিধি লিপি-সন্নিবেশ দ্বারা বর্ণগত চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করা হয় এবং তাহাতে লিপি-চাতুর্যে পদ্ম, খড়্গ, মুরজ প্রভৃতির চিত্র ফুটিয়া উঠে। ভারতচন্দ্র সুন্দরের একটি লিপিতে এই 'চিত্র' সৃষ্টি করিয়াছেন ঃ

চিত্রকাব্যে এক শ্লোক লিখি কেয়া পাতে।
নিজ পরিচয় দিয়া থুইল তাহাতে।
বসুধা বসুনা লোকে বন্দতে মন্দজাতিজম্।
করভোরু রতিপ্রজ্ঞে দ্বিতীয়ে পঞ্চমেহপ্যহম্ ॥

[সংকেতিত অক্ষর 'সু', 'ন্দ', 'র'—অর্থাৎ সুন্দর]। বিদ্যার উত্তর ঃ

চিত্রকাব্যে সুন্দর নাম দেখি।
বিদ্যা বিদ্যা নামে চিত্রকাব্য দিলা লেখি ॥
সবিতা পদ্যাম্বুজানাং ভুবি তে নাদ্যাপি সমঃ।
দিবি দেবাদ্যা বদন্তি দ্বিতীয়ে পঞ্চমেহপ্যহম্ ॥
[সংকেতিত অক্ষর 'বি' ও 'দ্যা'—অর্থাৎ বিদ্যা]

অলংকার-সৃষ্টিতে ভারতচন্দ্র যে—অলংকারশাস্ত্রর অনুগামী, আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন সেই অলংকারের গুণও দেখাইয়াছেন, দোষও দেখাইয়াছেন ঃ 'ভারতচন্দ্র প্রকৃত কবিপ্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অলংকারশাস্ত্র তাঁহার মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছিল।' এই ত্রুটি সংস্কৃত কবি ভারবি, মাঘ, দণ্ডী, বাণভট্টেও রহিয়াছে। কিন্তু অলংকার-সৃষ্টিতে একটি দিক হইতে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত কবিবর্গ হইতে স্বতন্ত্র—তাহা রায়গুণাকরের ধ্বন্যাত্মক শব্দ-মন্ত্র। সংস্কৃত সাহিত্যের শব্দ-ঝংকারে ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ অতি অল্প, ভারতচন্দ্রের শব্দমন্ত্র সেখানে ধ্বন্যাত্মক ও অনুকারাত্মক শব্দসর্বস্ব। ইহাদ্বারা যে কত বিচিত্র ভাবের দ্যোতনা হইতে পারে, ভারতচন্দ্র তাহা দেখাইয়াছেন। বিশেষতঃ রৌদ্র, বীর ও ভয়ানক রস-সৃষ্টিতে এই শব্দমন্ত্র অদ্ভুত যাদু সৃষ্টি করিয়াছে ঃ যেমন তাণ্ডব-প্রমত্ত রুদ্রের শিরে গঙ্গার এই বর্ণনাটি ঃ

লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা ॥

সংস্কৃত রস-সাহিত্যের সহিত ভারতচন্দ্রের অন্তরঙ্গ যোগাযোগের অন্য পরিচয়, বাংলাভাষায় সংস্কৃত ছন্দের প্রবর্তন। বাংলা-উচ্চারণে অক্ষরের হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ না থাকায় সংস্কৃতের বৃত্তছন্দ বাংলায় অনুবাদ করা অতি শক্ত। ভারতচন্দ্র সেই বাধা তুচ্ছ করিয়া ভুজঙ্গপ্রয়াত, তূণক প্রভৃতি ছন্দ বাংলায় প্রয়োগ করিয়াছেন। যেমন

১. অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দেরে সতীরে ॥

ভুজঙ্গ প্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতীদে সতীদে সতীদে সতীদে ॥
[ভুজঙ্গপ্রয়াত দ্বাদশাক্ষরা বৃত্তি ঃ অক্ষরগুলি লঘু-গুরু-গুরু ক্রমে চতুরাবৃত্ত]
২. মৈল দক্ষ ভূতযক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে।
ভারতের তূণকের ছন্দোবন্ধ বাড়িছে।
[তূণক পঞ্চদশাক্ষরা বৃত্তি ঃ অক্ষরক্রম গুরু-লঘু-গুরু লঘু-গুরু-লঘু গুরু-লঘু-গুরু লঘু-গুরু-লঘু গুরু-লঘু-গুরু]

দৃষ্টিগ্রাহ্য লঘু-গুরু অক্ষরবিন্যাসে সংস্কৃতের অনুকরণে এহেন ছন্দ রচিত হইলেও বাঙ্গালীর উচ্চারণে ইহার বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয় না। কিন্তু এখানে ভারতচন্দ্রের বিচার সেদিক হইতে নয়, কাব্যপ্রণয়নে তিনি যে সংস্কৃত কবিদেরই প্রতিনিধি, তাহাই দ্রষ্টব্য।

॥ সংস্কৃত স্তোত্র কবিতা ও বাংলার প্রার্থনা-সঙ্গীত ॥

সংস্কৃত স্তোত্রকবিতার সহিত প্রাচীন বাংলার প্রার্থনা-সঙ্গীতগুলির অনেকাংশে মিল লক্ষিত হয়। বাংলা কাহিনীকাব্যের সূচনায় দেব-দেবীর বন্দনামূলক বহু স্তোত্র যোজিত হইয়াছে ঃ কোন-কোন স্থলে পৌরাণিক স্তুতির সহিত তাহাদের সাদৃশ্য লক্ষিত হইলেও অন্তরঙ্গ আবেগের সুরটি সংস্কৃত স্তোত্র কবিতাবলীর সগোত্র।

সংস্কৃত ধর্মমূলক কবিতাবলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য দুইটি—(এক) জীবনের নশ্বরতার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সংসারাসক্ত মনকে নির্বেদযুক্ত করা ঃ (দুই) নিজের দীনতা প্রকাশ করিয়া দেবতার চরণে শরণ গ্রহণ করা। নিরাসক্তি ও প্রপত্তি, ভোগবিরক্তি ও শরণাগতি—এই দুই আকূতির ত্রিবেণী সংস্কৃত-ধর্মমূলক কবিতা।

সংস্কৃত ধর্মমূলক কবিতার এই সুর সুপ্রাচীন কাল হইতেই বাংলার অধ্যাত্ম সঙ্গীতগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিয়াছে। এমন কি বৌদ্ধ চর্যাগানগুলিতেও ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের মোহকর পরিণামের ইঙ্গিত ধ্বনিত হইয়াছে। চর্যাপদাবলীর উৎস অবশ্য বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ ভক্তিমূলক রচনা। বৌদ্ধ ধর্মেও আসক্তি, কাম ও মোহকে ধর্মচর্চার প্রবল প্রতিবন্ধক রূপে গণ্য করা হইত। ভারতীয় সাধনায় এ দিক হইতে একটা ঐক্য রহিয়াছে। বৌদ্ধ গানের,

১. কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল ॥ [১নং চর্যা]
২. মণ তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা।
আসা বহল পাত ফলবাহা ॥
বরগুরু বঅণে কুঠারে ছিজঅ।
কাহ্ন ভণই তরু পুণ ন উইজঅ ॥ [৪৫নং চর্যা]

এই সকল উক্তি ভারতীয় ধর্ম সাধনায় চিত্তদমনের সাধারণ নির্দেশেরই প্রতিধ্বনি। সংস্কৃত কবিতাতেও চিত্তদমনের উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। বাংলার

বৈষ্ণব প্রার্থনার পদেও, বিশেষতঃ 'মনঃশিক্ষা'র পদাবলীতেও এই ধ্বনি। বন্ধন বা মুক্তি চিত্ত বা মনেরই। মনই ইন্দ্রিয় তাড়নায় চঞ্চল হয়, বিষয় গ্রহণ করে, আশার মোহময় আকর্ষণে বিভ্রান্ত হয় এবং কামনা-কান্তায় আসক্ত হয়। অতি প্রবল আকর্ষণ কাম ও কাঞ্চনের; অতি প্রবল আকর্ষণ আশা-তৃষ্ণারূপিণী মায়াবিনীর। সংস্কৃত কবি তৃষ্ণার এই নব-নবায়মানা প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ঃ

বলিভির্মুখমাক্রান্তং পলিতৈরঙ্কিতং শিরাঃ।
গাত্রাণি শিথিলায়ন্তে তৃষ্ণৈকা তরুণায়তে ।। [বৈরাগ্য-শতক]

শঙ্করাচার্যেরও ওই একই কথা ঃ কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ুঃ।

এই আশা-কামনার দুর্বার গতিকে রোধ করিতে হইবে। সংস্কৃত কবিগণ তাই একদিকে অঙ্গুলিসংকেত করিয়াছেন ধন-জন-জীবনের নশ্বরতার প্রতি, অপর-দিকে অংকন করিয়াছেন মৃত্যুর অতি করাল বিভীষিকা। এই 'মোহ-মুদ্গর'কেই উদ্যত দেখিতে পাই বাংলার প্রার্থনা-সঙ্গীতে।

বিদ্যাপতির প্রার্থনার পদে এই নির্বেদের সুর ঃ

আধজনম হাম নিঁদে গমায়লুঁ
জরাশিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী রসরঙ্গে মাতলুঁ
তোহে ভজব কোন বেলা[১]

নরোত্তম দাসঠাকুরের আত্মানুশোচনা আরও করুণ,

হরি হরি! বিফলে জনম গোঞাইনু।
মনুষ্য জনম পাইয়া রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু।

কিংবা রাধামোহন ঠাকুরের এই কাতরোক্তি ঃ

শ্রীগুরু বৈষ্ণব তোমার চরণ
স্মরণ না কৈনু আমি।
বিষয় বিষম বিষ ভাল মানি
খাইছু হইয়া কামী ।।

এ সকল স্থলে ভক্ত মুমুক্ষু। জীবকে মোক্ষের পথে টানিয়া আনা শক্ত। তাহার জন্য প্রয়োজন 'মনঃশিক্ষা' বা 'মনোদীক্ষা'। এই পদগুলির সহিত মোহ-মুদ্গরের বা বৈরাগ্য-শতকের সাদৃশ্য বেশি। যেমন প্রেমানন্দ ভণিতায় 'মনঃশিক্ষা'র এই পদ ঃ

---

১. তুলনীয় ঃ আয়ুর্বর্ষ শতং নৃণাং পরিমিতং রাত্রৌতদর্ধং গতং
তস্যার্ধস্য পরস্য চার্ধমপরং বালত্ব-বৃদ্ধত্বয়োঃ।
শেষং ব্যাধিবিয়োগ দুঃখসহিতং সেবাদিভি নীয়তে
জীবে বারি তরঙ্গ চঞ্চলতরে সৌখ্যং কুতঃ প্রাণিনাম্ ।। [বৈরাগ্য-শতক]

ওরে মন ! কি রসে হইলা ভোর ।
কি বলিয়া এলি সেথা কি কায বা কর হেথা
তিলেক চেতন নাহি তোর ॥
পুত্রদারা সম্পদ জীবন যৌবন মদ
যে কর সে সকলি অসার ।
জলবিম্ব কতক্ষণ তেমনি জানিহ মন
ত্রিভুবনে কৃষ্ণ মাত্র সার ॥

বৈষ্ণব কবিতার প্রার্থনার পদগুলিতেও ভক্তের অতি তীব্র পাপবোধ, আত্মগ্লানি, দীনতা এবং অতি বিগলিত ভক্তি ও শরণাগতির সুর ধ্বনিত হইয়াছে। আবেগের উচ্ছ্বাসে ও আর্দ্রতায় ভক্ত আত্মহারা। আত্মবিলুপ্ত ভক্ত নরোত্তম দাসঠাকুরের তো কথাই নাই, তিনি বলেন, 'চুলে ধরি কর মোরে পার', 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে', 'শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ কৃপা করি রাখ নিজপদে', এমন কি আত্মসচেতন শিল্পী বিদ্যাপতিও এক্ষেত্রে আবেগে আত্মলুপ্ত ঃ

ভণই বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু ।
তুয়া পদ পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥

সংস্কৃত ভক্তিমূলক কবিতায় ঠিক এ ধরনের আবেগ-উচ্ছলতা নাই। সেখানে শরণাগতি বহুল পরিমাণে অপ্রমত্ত ও সংযত।

বাংলার শাক্ত সঙ্গীতে ভক্তের আকুতি বা মনোদীক্ষার গানগুলির সঙ্গে সংস্কৃত ভক্তিমূলক কবিতাবলীর সাদৃশ্য অধিক। মনোদীক্ষার পদে আক্রমণ আরও তীব্র, অনুযোগ আরও কঠিন। এখানে বিবেক ও মনের বুঝা-পড়া ; গুরু-শিষ্যের জবানিতে বিধৃত হওয়ায় উহাতে কাব্য-সৌন্দর্যও প্রস্ফুট। এ যেন শুধু তত্ত্ব-উপদেশ নয়, নীরস শিক্ষা-দীক্ষার কথা নয়—উহা অনেকটা 'কান্তাসম্মিত উপদেশের' অনুরূপ ; অথচ মোহ-মুদ্গরের আঘাতটিও কঠিন। যেমন, রামপ্রসাদের এই গানটি

সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না ।
ভাল পেয়েছ ভবে কাল-বিছানা ॥
এই যে সুখের নিশি, জেনেছ কি ভোর হবে না ?
তোমার কোলেতে কামনা কান্তা, তারে ছেড়ে পাশ ফের না ।
খেয়েছ বিষয়-মদ, সে মদের কি ঘোর ঘোচে না ?
আছ দিবা-নিশি মাতাল হয়ে ভ্রমেও কালী বল্‌না ।

কিংবা রামপ্রসাদেরই এই পদটি,

মন হারালে কাজের গোড়া ॥
দিবানিশি ভাবছ বসি, কোথায় পাবে টাকার তোড়া ॥

চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র, শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া।
তুই কাচমূল্যে কাঞ্চন বিকালি, ছিছি মন তোর কপাল পোড়া॥
প্রসাদ বলে, মনরে তুমি পাঁচ সাওয়ারের তুর্কী ঘোড়া।
সেই পাঁচের আছে পাঁচা পাঁচি, তোমায় করবে তোলাপাড়া॥

শান্ত ভক্তের আকূতিও বিশিষ্ট। শরণাগতিই উঁহার ব্যঞ্জিত ধ্বনি, কিন্তু সেই ধ্বনি অনুযোগ, অভিযোগ, অপভাষ, বেদনা, নৈরাশ্য ও আবেদনের রঙে অনুরঞ্জিত—যেন শুভ্র স্ফটিক-মালায় রঙীন সূত্রের প্রতিবিম্ব, অথবা প্রপত্তিরূপ মহা-সাগরে বিচিত্র সঞ্চারী ভাবের বীচিমালা। যেমন,

(i) মা অমায় ঘুরাবে কত,
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত?
কুপুত্র অনেক হয় মা কুমাতা নয় কখন তো।
রামপ্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত॥

[ইহার সহিত তুলনীয় শঙ্করাচার্যের 'দেব্যপরাধক্ষমাপণ' স্তোত্রের 'কুপুত্রো জায়তে ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি।']

(ii) ওমা, হর গো তারা মনের দুঃখ
আর তো দুঃখ সহে না।...
জন্ম-মৃত্যু যে যন্ত্রণা, মাগো, যে জন্মে নাই সে জানে না।
তুই কি জানিবি সে যন্ত্রণা, জন্মিলে না মরিলে না॥
রামপ্রসাদে এই ভণে, দ্বন্দ্ব হবে মায়ের সনে।
তবু রব মায়ের চরণে, আর তো ভবে জন্মিব না॥

[এই গানটির সহিত তুলনীয় 'সৎপদ্যরত্নাবলী'র অন্তর্গত এই শ্লোকটি—
ত্বং নিগ্রহং যদ্যপি পামরেঽস্মিন্
তথাপি তন্নাম সদা ব্রবীমি।
মাত্রাপরাধেন নিরাকৃতোঽপি
মামেতি শব্দং স শিশুঃ করোতি॥]

(ii) আধুনিক যুগ

॥ অনুবাদ সাহিত্য ॥

॥ গদ্যানুবাদ ॥ নব্যযুগ নানাদিক হইতেই নব জাগরণের যুগ। এই যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে আসিয়া বাঙালী যেমন ইউরোপীয় ভাবধারায় পুষ্ট হইয়াছে, নূতন চিন্তাজগতে প্রবেশ করিয়াছে—তেমনিই স্বদেশের লুপ্তপ্রায় ঐশ্বর্যকে আবিষ্কার করিয়া নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে তাহাকে গ্রহণ করিয়াছে।

এই নবজাগৃতির একটি দিক পুরাতন সংস্কৃত সাহিত্যের বাংলা অনুবাদ।

সংস্কৃত গ্রন্থাদির গদ্য অনুবাদ একটি বিশেষ লক্ষ্যে অনূদিত হইতে থাকে ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের প্রচেষ্টায়। নব্য বাংলার সম্মুখে এইখানেই প্রথম সংস্কৃতের স্বারোদ্ঘাটন হয়। হিতোপদেশের অনুবাদ করেন গোলকনাথ শর্মা এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার। এই মৃত্যুঞ্জয় 'বত্রিশসিংহাসন' নামে 'দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা'ও অনুবাদ করেন। এই কলেজ হইতেই সংস্কৃত চরিত-কাব্যের [হর্ষ-চরিত, নব সাহসাংক-চরিত প্রভৃতি] অনুরূপ রাজার চরিত্র রচনা করেন রামরাম বসু [প্রতাপাদিত্য চরিত] এবং রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ['মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম']। রচনায় সংস্কৃত চরিত-কাব্যের ভাষা-সম্পদ্ বা রচনার দার্ঢ্য না থাকিলেও সংস্কৃত কাব্য-রূপানুকরণের দিক হইতে এই মানস প্রবণতা লক্ষণীয়। যেমন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজাবলী'।'[১] কলির প্রারম্ভ হইতে 'কোম্পানি বাহাদুরের অধিকার' প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বিখ্যাত রাজাদের ইতিহাস এই গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়। এই রাজতরঙ্গ প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ঐতিহাসিক কাব্য কহ্লণের রাজতরঙ্গিণীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়; তেমনই ঐতিহাসিক অনুবৃত্তির সহিত কিংবদন্তী ও জনশ্রুতির সমাবেশ। সংস্কৃত কাব্য রচনার ঢংয়ে গ্রন্থারম্ভে এই মঙ্গলাচরণ ঃ

ব্রহ্মপ্রভৃতি কীট পর্যন্ত জীবলোকের ও ঐ জীবলোকেদেব ভূতলাদি সত্যলোক পর্যন্ত উর্ধ্বতন সপ্তলোক, অতলাদি পাতাল পর্যন্ত অধস্তন সপ্তলোকরূপ নিবাস-স্থানের এবং অমৃত, যব, ব্রীহি, তৃণাদি তাবদ্ভোগ্য বস্তু সকলের ও স্ব স্ব কর্মানুসারে স্বর্গ, নরক, বন্ধ, মোক্ষ, ব্যবস্থা ও কল্প, মন্বন্তর যুগাদিরূপে কালবিভাগের কর্তা পরমেশ্বর সকলের মঙ্গল করুন। [রাজাবলী]

গ্রন্থশেষে এই পরিচয় ঃ 'কোম্পানি বাহাদুরের অধিকাররূপ বৃক্ষের আলবালস্থে নিরূপিত পাঠশালার পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় শর্মা কতৃক গৌড়ীয় ভাষাতে রচিত রাজতরঙ্গ নামে গ্রন্থ সমাপ্ত হইল।'

নব্য বাংলায় সংস্কৃত সাহিত্যের বাংলাম্বাদ প্রদানে পথিকৃৎ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতবর্গ। তাঁহাদের রচনায় সংস্কৃত রচনার দীপ্তি ও মাধুর্য ছিল না, সে আলঙ্কারিক রীতি বা ভাষার কারুকার্য একান্তই দুর্লভ ছিল—তথাপি তাঁহাদের দান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। কারণ, বাংলায় সংস্কৃত রসসাহিত্যের খাত খননে তাঁহারাই অগ্রণী।

অনুবাদের এই প্রচেষ্টা সার্থকতা লাভ করিয়াছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে। বিদ্যাসাগর কেবল সংস্কৃত সাহিত্যের বিষয়ানুবাদ করেন নাই, সংস্কৃতের রচনা-রীতিকেও অনুবাদ করিয়াছেন। ভাষার সেই দীপ্ত ঐশ্বর্য, ল'লত পদের সেই সুমধুর ঝঙ্কার, বাক্যালঙ্কারের মোহিনী বিলাস—সংস্কৃত-রচনার যাবতীয় বিশিষ্টতা বিদ্যা-সাগরের অনুবাদে বিধৃত হইয়াছে। সংস্কৃত রস-সাহিত্যের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কৃতিকে তিনি বাংলা গদ্যে রূপান্তরিত করিয়াছেন। বেতাল পঞ্চবিংশ ত তো আছেই, তদুপরি

১. শ্রীনুটবিহারী রায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত সংস্করণ।

আছে কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের অনুবাদ 'শকুন্তলা', ভবভূতির 'উত্তররামচরিত'-এর আংশিক অনুবাদ 'সীতার বনবাস'। সংস্কৃত নাট্যরূপকে বিদ্যাসাগর রক্ষা করেন নাই—বিদ্যাসাগরের অনুবাদ স্বচ্ছন্দ গদ্যানুবাদ, তবে অঙ্কানুসারেই তিনি পরিচ্ছেদ বিভাগ করিয়াছেন, যেমন, প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্ক ইত্যাদি। বিদ্যাসাগরের অনুবাদ ঠিক আক্ষরিক না হইলেও মূলানুগ, যেমন, শকুন্তলার প্রথম অঙ্কের 'অধরঃ কিশলয় রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ' শ্লোকটি বিদ্যাসাগরে হইয়াছে,

শকুন্তলার অধরে নবপল্লবশোভার আবির্ভাব; বাহুযুগল কোমল বিটপশোভা ধারণ করিয়াছে; নবযৌবনবিকশিত কুসুমরাশির ন্যায় সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

কালিদাসের রচনা স্বভাবতই সুমধুর, শব্দের দুরূহতা কালিদাসে নাই। বিদ্যাসাগরের অনুবাদও সুললিত ও দুরূহ শব্দবর্জিত। অন্ততঃ শকুন্তলার অনুবাদ সম্পর্কে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ভবভূতির অনুবাদে বিদ্যাসাগর আবার ভবভূতির ভারাক্রান্ত রচনা-রীতিকে অনুসরণ করিয়াছেন। তুলনায় ভবভূতির রচনা কালিদাস হইতে সমাস-বহুল ও দুরূহশব্দে পূর্ণ। বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাসে'র অনুবাদও শকুন্তলার তুলনায় কঠিনতর। ইহার কারণ, মূলের রচনাভঙ্গির তারতম্য। যেমন, ভবভূতির এই অংশটিব অনুবাদ ঃ

অয়মবিরলানোকহনিবহনিরন্তর স্নিগ্ধনীল পরিসরারণ্যপরিণদ্ধ গোদাবরীমুখ কন্দরঃ সন্ততমভিষ্যন্দমান মেঘমেদুরিত নীলিমা জনস্থানমধ্যগো গিরিঃ প্রস্রবণো নাম [উত্তরচ. ১ম অঙ্ক].

—এই সেই জনস্থানবর্তী প্রস্রবণ গিরি, এই গিরির শিখরদেশে আকাশ পথে সতত সঞ্চরমান জলধর পটল সংযোগ নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত, অধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সততস্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে। [সীতার বনবাস. ১ম পরিচ্ছেদ]

বিদ্যাসাগরের অনুবাদের প্রধান কৃতিত্ব এই যে, সংস্কৃত কবিদের অলংকার-প্রিয়তাকে তিনি বাংলা গদ্য রচনায় সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর সম্পর্কে প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছেন, 'বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী', এই প্রশস্তির মূল, বিদ্যাসাগর কর্তৃক গদ্যরচনায় আলঙ্কারিক রীতির প্রবর্তন। শিল্পী শুধু প্রকাশ করেন না, সুন্দর করিয়া প্রকাশ করেন। সংস্কৃত কবিগণ এ বিষয়ে অদ্বিতীয়। বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগর সেই অতুলনীয় প্রকাশ-নৈপুণ্যের সরণি-কার।

বিদ্যাসাগরের আর একটি কীর্তি বাংলাভাষায় 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' রচনা। ইহা দ্বারা তিনি রসসাহিত্যের সহিত সাধারণের পরিচয়ের পথটি সুগম করিয়া দিয়াছেন। শুধু তাই নয়, সংস্কৃত সাহিত্য লইয়া পরবর্তী কালে যে রস-সমালোচনার সূত্রপাত হইয়াছিল, বিদ্যাসাগরই সর্ব প্রথম তাহার ভূমিকা প্রস্তুত করেন। বাঙালী চিত্তে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবের গভীরতাও

ইহা দ্বারা সূচিত হয়। ধীরে ধীরে এই সাহিত্য অন্তরঙ্গরূপে শিক্ষিত চিত্তকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে এবং স্বী-করণের পথে বাঙালীর মানসলোকে প্রতিষ্ঠিত নব নব সৃষ্টির সম্ভাবনাকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে।

বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক কালে অনুবাদক হিসাবে তারাশংকর তর্করত্নের নাম উল্লেখযোগ্য। বাণভট্টের বহুখ্যাত 'কাদম্বরী' গদ্যকাব্যখানিকে তিনি বাংলাগদ্যে রূপান্তরিত করেন। রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি 'বিজ্ঞাপনে' স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, 'সংস্কৃত ভাষায় কাদম্বরী নামে যে মনোহর গদ্য গ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিত হইল। ইহা ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। গল্পটিমাত্র অবিকল পরিগৃহীত হইয়াছে। বর্ণনার অনেক অংশ পরিত্যাগ করা হইয়াছে।'

অনুবাদ-কর্তার এই আত্ম-স্বীকৃতির মধ্যেই অনুবাদের প্রকৃতি উদ্ঘাটিত হইয়াছে। বাণভট্টের রচনা বর্ণনাবহুল, দীর্ঘবাক্যবিলসিত, সমাস-সমৃদ্ধ, বিচিত্র অলংকারে বিভূষিত এবং বাগ-বৈদগ্ধ্য-মণ্ডিত ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহজ সরল বাক্যও আছে—তাহা হিত-মনোহারী ও সরল—কিন্তু তাহাতেও অলংকার-চাতুর্য ও প্রকাশের বিশিষ্টতা বিদ্যমান। তারাশংকরের অনুবাদে এই 'ভঙ্গি-ভণিতি' যথাযথ অনুসৃত হয় নাই। কিন্তু বাণভট্টের গল্পরসকে তিনি ক্ষুণ্ন করেন নাই ; যে সকল অংশ বিষয়-বৈচিত্র্যে ও রস-বৈচিত্র্যে বিশিষ্ট, সেগুলিকে তিনি সহজ-সরল ভঙ্গীতে, সমাস-বর্জিত ভাষায়, অজটিল বাক্যবন্ধে নিজস্ব রীতিতে পরিবেশন করিয়াছেন। সংক্ষেপিত হইলেও কাদম্বরী কাব্যের মূল রস বা সৌন্দর্য পরিবেশনে তারাশংকরের অনুবাদ অসার্থক হয় নাই। যেমন,

[চন্দ্রাপীড় মহাশ্বেতার আশ্রমে আসিয়াছেন। মহাশ্বেতাও সান্ধ্য-উপাসনার পর শিলাতলে উপবেশন করিয়াছেন ; চন্দ্রাপীড়ের কৌতূহল, তিনি তাপসীর পরিচয় জানেন। তাই প্রশ্ন করিলেন,]

ভগবতি! ত্বৎপ্রসাদপ্রাপ্তিপ্রোৎসাহিতেন কুতূহলেনাকুলীক্রিয়মাণো মানুষতাসুলভো লঘিমা বলাদনিচ্ছন্তমপি মাং প্রশ্নকর্মণি নিয়োজয়তি। জনয়তি হি প্রভুপ্রসাদলবোঽপি প্রাগল্‌ভ্যমধীরপ্রকৃতেঃ। স্বল্পাপ্যেকদেশাবস্থান কালকলাপরিচয়মুৎপাদয়তি। তদ্ যদি নাতিখেদকরমিব ততঃ কথনেনাত্মানমনুগ্রাহ্যমিচ্ছামি। অতি মহৎ খলু ভবদ্দর্শনাৎ প্রভৃতি মে কৌতুকমস্মিন্ বিষয়ে। কতরস্মরুতামৃষিণাং গন্ধর্বাণাং গুহ্যকানামপ্সরসাং বা কুলমনুগৃহীতং ভগবতা জন্মনা। কিমর্থং বাস্মিন্ কুসুম-সুকুমারে নবে বয়সি ব্রত গ্রহণম্। [বাণভট্ট]

অনুবাদ : ভগবতি মানুষদিগের প্রকৃতি অতি চঞ্চল, প্রভুর কিঞ্চিৎ প্রসন্নতা দেখিলেই অমনি অধীর ও গর্ব্বিত হইয়া উঠে। অপনার অনুগ্রহ ও প্রসন্নতা দর্শনে উৎসাহিত হইয়া আমার অন্তঃকরণ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষ করিতেছে। যদি আপনার ক্লেশ না হয়, তাহা হইলে আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন দ্বারা আমার কৌতুকাক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন। কি দেবতাদিগের কুল, কি মহর্ষিদিগের কুল, কি গন্ধর্ব-

দিগের কুল, কি অপ্সরাদিগের কুল, আপনি জন্ম পরিগ্রহ দ্বারা কোন্ কুল উজ্জ্বল করিয়াছেন ? কি নিমিত্ত কুসুমসুকুমার নবীন বয়সে আয়াসসাধ্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। [তারাশঙ্কর তর্করত্ন]

সংস্কৃত কাব্য-নাটকাদির এই ধরনের গদ্যানুবাদ অনেকগুলি পাওয়া যায়। এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত গোষ্ঠী। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য 'কুমার-সম্ভব' কাব্যের সাত সর্গ অনুবাদ করেন। সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক গিরিশ-চন্দ্র বিদ্যারত্ন দণ্ডী রচিত 'দশকুমারচরিতে'র গদ্যানুবাদ করেন। গদ্যানুবাদ হিসাবে চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণের 'রঘুবংশ' (ইহার অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল), হরিনাথ ন্যায়রত্নের 'মুদ্রারাক্ষস' প্রভৃতি গ্রন্থেরও নাম করা যাইতে পারে।

নব্যযুগে বাঙালীর মনে সংস্কৃত রসসাহিত্যের প্রতি যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, তাহার প্রকাশ প্রথমে দেখা যায় গদ্যে। ইহা দ্বারা বাংলাগদ্য রচনারীতি একটি সৌষ্ঠব-মণ্ডিত সাহিত্যিক রূপ লাভ করে। অবশ্য পণ্ডিতী রচনায় সমাসবাহুল্য, কার্কশ্য ও দুরূহতা ছিল, অনেকের রচনা দুর্বোধ্য সংস্কৃতশব্দে ভারাক্রান্ত হওয়ায় নীরস হইয়া উঠিয়াছিল। উহা দ্বারা বাংলাগদ্য যে স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতি হারাইয়া ফেলিতেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র ও শিবনাথ শাস্ত্রী তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তৎ-সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে, এই সংস্কৃত রচনা-রীতিই বিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রে একটি স্থির সৌন্দর্য লাভ করিয়াছিল। বীরবল প্রমথ চৌধুরীর রচনা ক্রিয়াপদে চলিতরূপ অনুসরণ করিলেও উহার গাঢ়বন্ধ তৎসমশব্দবিলসিত ভঙ্গি সংস্কৃত ভঙ্গিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনাও সংস্কৃত-রীতির-উপর প্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃত আলঙ্কারিক রীতিই বাংলাগদ্যের নির্ভূষণ অঙ্গে ভূষণ যোজনা করিয়া তাহাকে সাহিত্যের আসরে বিশিষ্ট স্থান দান করিয়াছে।

॥ পদ্যানুবাদ ॥ স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের তাগিদে বাংলাগদ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদের যে প্রেরণা জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা শুধু প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। শিল্প প্রেরণাবশেও বিশুদ্ধ রসসাহিত্য অনূদিত হইয়াছিল। গদ্যে নয়, পদ্যে।

হিতোপদেশাদি নীতি কবিতার অনুবাদ পাওয়া যাইতেছে অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিক হইতে। এই অনুবাদ পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের অপেক্ষা করে নাই। কবি জগন্নাথ সেন ধলভূমের রাজা অনন্তধবলের অনুজ্ঞায় হিতোপদেশের অনুবাদ করেন। অনুবাদে সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। হিতোপদেশের আর একখানি অনুবাদ পাওয়া যাইতেছে রঙ্গপুর হইতে।[১] কবির নাম হায়াৎ মামুদ, গ্রন্থখানির নাম 'চিত্ত উত্থান' বা 'সর্বভেদ'। এই অনুবাদের মূল সংস্কৃত হিতোপদেশ নয়, হিতোপদেশের একখানি ফারসী অনুবাদ। কবি বলিতেছেন, 'ফারসী আছিলো আমি

১. দ্রষ্টব্য রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (সপ্তদশভাগ ১—৪ সংখ্যা)

করিলাঙ বাংলা।' অনুবাদ স্বচ্ছন্দ ও প্রাঞ্জল। 'যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে' শ্লোকটির অনুবাদঃ

অর্ধপিঠা ছাড়ি যে গোটার লাগি ধায়।
কাহাকো না পায় শেষে উভয়ই হারায়॥

কিংবা 'পয়ঃপানভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্ধনম্' শ্লোকটির এই অনুবাদঃ

উচিত বচন মোর মন্দ লাগে তাকে।
দুগ্ধ বিষ হৈল যেন পড়ি সর্পমুখে॥

বেতাল পঞ্চবিংশতি এবং দ্বাত্রিংশপুত্তলিকার পদ্য অনুবাদও পাওয়া যাইতেছে।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমদিকে সংস্কৃত পারমার্থিক কবিতা ও হিতকথাদির প্রতিধ্বনি শুনা যায় গুপ্ত কবির কবিতায়। ঈশ্বর গুপ্তের পারমার্থিক ও নীতি কবিতাগুলি কোন বিশেষ সংস্কৃতশ্লোকের অনুবাদ নয়, উহা স্বাধীন রচনা। তথাপি উহাতে যে সংস্কৃত কবিতাবলীর প্রভাব পড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। গুপ্ত কবির উপর সংস্কৃত কবিতার প্রভাব বিষয়ে আলোচনা পরে করা হইবে। এ ক্ষেত্রে বক্তব্য এই যে, নব্য যুগের কবিতার আসরে সংস্কৃত কাব্যের সুর ও স্বাদ পরিবেশনে ঈশ্বর গুপ্তের দান অল্প নয়।

এই প্রসঙ্গে গুপ্ত কবির 'বোধেন্দুবিকাশ' গ্রন্থখানির নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা শ্রীকৃষ্ণমিশ্র প্রণীত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকেব পদ্যানুবাদ। পাত্র পাত্রীর উক্তিগুলি কবিতাকারে সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হইয়াছিল। কবিতাগুলি মূলের আক্ষরিক অনুবাদ নয়। অহংকার, দম্ভ, লোভ, প্রভৃতি বৃত্তিব বিশিষ্টতাগুলি একত্র করিয়া যেন এক একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কবিতা। তবে মূলের ধ্বনি একেবারে অলভ্য নয়, যেমন, মূলের 'অহঙ্কারে'র এই উক্তি—

অরে ক:ইহ বাসবঃ কথয় কোঽত্র পদ্মোদ্ভবো
বদ প্রভব ভূময়ো জগতি কা ঋষীণামপি।
অর্বোহি তপসোবলং মম পুরন্দরাণাং শতং
শতঞ্চ পরমেষ্ঠিনাং পততু বা মুনীনাং শতম্॥ [২য় অঙ্ক]

ঈশ্বর গুপ্তে হইয়াছে,

কোথা সুররাজ কোথা তার বাজ
গোঁপে যদি দিই চাড়া।
সহিত অমর করি যোড়কর
এখনি হইবে খাড়া॥
অসাধ্য আমার কিছু নাহি আর
সকলি করিতে পারি।

সংস্কৃত ভাবকে আত্মসাৎ করিয়া নিজস্ব ভঙ্গিতে প্রকাশ করার দৃষ্টান্ত ঈশ্বর গুপ্তেই প্রথম লক্ষ্য করা যায়। ঈশ্বর গুপ্তে সংস্কৃতের প্রভাব পড়িয়াছে অনেকটা স্বকী-করণের পথে। এইখানেই ভাবাত্মীকরণের সূচনা।

কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের প্রথম বাংলা পদ্যানুবাদ করেন হরিমোহন কর্মকার। তাহার পরে উল্লেখযোগ্য, কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ। সংস্কৃত ভাষায় রঙ্গলালের অধিকার ছিল। সংস্কৃত রস-সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগও ছিল। কুমারসম্ভব কাব্যের সপ্তম সর্গ পর্যন্ত তিনি অনুবাদ করেন। অনুবাদ মূলানুসারী। সর্গস্থ প্রত্যেকটি শ্লোক ধরিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে। যেমন কুমারসম্ভবের প্রথম শ্লোক 'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ'—এর এই অনুবাদ ঃ

উত্তরেতে আছে দেবাত্মক দেবধাম,
অচলের অধিরাজ হিমালয় নাম।
পূর্বাপর ভাগ যার পয়োনিধি গত
রহিয়াছে মেদিনীর মানদণ্ড মত ॥ [১. ১]

অনুবাদে রঙ্গলাল কেবল সাধারণ পয়ার ছন্দ অবলম্বন করেন নাই। দ্বিতীয় সর্গ লঘু ত্রিপদীতে এবং চতুর্থ ও ষষ্ঠ সর্গ দীর্ঘ ত্রিপদীতে রচিত হইয়াছে। দীর্ঘায়ত দীর্ঘ ত্রিপদীতে রতিবিলাপের অংশ নিঃসন্দেহে করুণ-মধুর। যেমন রতি-বিলাপের 'কৃতবানসি বিপ্রিয়ং ন মে প্রতিকূলং ন চ তে ময়া কৃতম্' শ্লোকটির এই অনুবাদ ঃ

আমার অপ্রিয় কভু কর নাই তুমি প্রভু
আমিও তা করিনি কখন।
তবে কেন অকারণ কাঁদাইছ এতক্ষণ
রতিরে না দেহ দরশন। [৪. ৫]

রঙ্গলালের সংস্কৃত কাব্যপ্রিয়তার আর এক দৃষ্টান্ত নীতি-শ্লোকাবলীর অনুবাদ। এই অনুবাদ একদিনে, একবারে করা হয় নাই। 'পুরাতন নীতির কবি কুল-রচিত কবিতা-কলাপ' যাহা যখন নয়নপথে পতিত হইয়াছে, কবি তাহার মর্মানুবাদ করিয়াছেন। এই অনূদিত কবিতা-সংকলনের নাম 'নীতি কুসুমাঞ্জলি'। ইহাতে দুই 'অঞ্জলি'তে (সর্গে) দুইশত দুইটি (১০৩+৯৯) মুক্তকের অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রথমেই বররুচি-কৃত 'সংসার বিষবৃক্ষস্য দ্বে এব রসবৎ ফলে' কবিতাটির অনুবাদ ঃ

ভয়াবহ ভবতরু বটে বিষময়।
কিন্তু তাহে আছে সুধাসম ফলদ্বয় ॥
তার এক কাব্যামৃত-রস-আস্বাদন।
অন্যতর সদালাপ সহিত সজ্জন ॥

রঙ্গলাল সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ মাত্র করেন নাই, গুপ্ত কবির মত স্বী-করণের পথে সংস্কৃত ভাবকে আত্মসাৎ করিয়াছেন।

কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের অনুবাদ করেন রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬০)। সাধারণ পয়ারে পূর্বমেঘ ও দীর্ঘ ত্রিপদীতে উত্তরমেঘের এই

অনুবাদ সুললিত ও রসমধুর। প্যারীমোহন সেনগুপ্তের 'কুমারসম্ভব'-এর অনুবাদও উল্লেখযোগ্য।

এই সময়ে রচিত কাব্যগুলির ভিতর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'বাসবদত্তা' গদ্যকব্যের স্বচ্ছন্দ মুক্তানুবাদ ; মধ্যে মধ্যে স্বকীয় যোজনাও আছে [যেমন, বাসবদত্তার বিন্ধ্যবাসিনীদেবী দর্শন, ক-কারাদি অক্ষর ক্রমে যোগমায়ার স্তব, কামিনী বিরহে কন্দর্পকেতুর বারমাস্যা ইত্যাদি]। রচনাভঙ্গিতে ভারতচন্দ্রের অনুকরণ লক্ষণীয়। তথাপি এই কাব্যে কবির সংস্কৃতানুকরণপ্রিয়তা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোথাও কোথাও মূলের আস্বাদও অলভ্য নয়। যেমন কামিনীর অদর্শনে কন্দর্পকেতুর বিবহোন্মত্ত অবস্থা ও বিলাপ ঃ

ঘুম ভাঙ্গি গেল সচেতন হৈল
উঠিল রাজার সুত।
প্রিয়া না দেখিয়া উঠে চমকিয়া
মানিলেক অদ্ভুত ॥
চারিদিকে চায় দেখিতে না পায়
মাথে হাত দিয়া পড়ে।
কান্দে একি হল প্রেয়সী যে গেল
প্রাণ কেন রহে ধড়ে ॥
ক্ষণেক উঠিয়ে কহে প্রাণপ্রিয়ে
বিদরিছে হিয়ে মোর।
ছল কবে ফেনে দেখা দেও মেনে
হেরি বিধুমুখ তোর ॥

[তুলনীয় মূল ঃ 'কন্দর্পকেতুঃ প্রবুদ্ধঃ প্রিয়য়া বিনাকৃতং লতাগৃহমবলোক্যোত্থায় চ তত ইতো দত্তদৃষ্টিঃ ক্ষণং বিটপিষু ক্ষণং লতান্তবেষু...ভ্রমন্ননবরত বিরহানলদহ্যমানহৃদয়ো বিললাপ। হা প্রিয়ে বাসবদত্তে দেহি মে দর্শনম্। কৃতং পরিহাসেন অন্তর্হিতাসি']

॥ **অনূদিত নাটক** ॥ সংস্কৃত কাব্যাদির এই অনুবাদের ভিতর দিয়া সংস্কৃত কাব্যের পরিচিতি শিক্ষিত মহলে বিশেষ করিয়া ছাত্রমহলে প্রসারিত হইয়াছে। এই পরিচিতি জনসাধারণের ভিতর প্রসার করিয়া দিয়াছে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ। আদৌ পাঠ্যের উদ্দেশ্যে রচিত হইলেও, পরে অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই সংস্কৃত নাটকের ভাবানুবাদ আরম্ভ হয়। ঈশ্বর গুপ্তের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের বাংলা অনুবাদ আদৌ নীতি-কবিতার ধরনেই রচিত হইয়াছিল। পরে উহা নাটকের আকারে প্রকাশিত হয়।

নাট্যকারের সংস্কৃত নাটকের প্রথম সার্থক অনুবাদক রামনারায়ণ তর্করত্ন। রামনারায়ণের পূর্বেও দুইখানি অনুবাদের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু নাটক রচনায় সে যুগে সর্বাধিক খ্যাতির অধিকারী ছিলেন রামনারায়ণ বা নাটুকে নারাণ। সংস্কৃত নাটকের রূপ-রস তিনিই প্রথমে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। বেণীসংহার, রত্নাবলী,

অভিজ্ঞান শকুন্তলা ও মালতীমাধব—রামনারায়ণের এই চারিখানি অনুবাদ। অনুবাদে কিছু কিছু পরিবর্তন ও গীতাদির নূতন সংযোজন থাকিলেও রামনারায়ণ মূলকে বিকৃত করেন নাই। অভিনয়-সাফল্যের দিক হইতেও নাটকগুলি সুনাম অর্জন করিয়াছিল। তখনকার দিনের সখের নাট্যশালায়, কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী সভার নাটমঞ্চে, পাথুরিয়াঘাটায় বা জোড়াসাঁকোতে কিংবা বেলগাছিয়ার বাগান-বাড়ীতে এই সকল নাটক পরম সমাদরে অভিনীত হইয়াছে।

কালীপ্রসন্ন সিংহও বিক্রমোর্বশী ও মালতীমাধব নাটক অনুবাদ করেন এবং তাঁহার গৃহের রঙ্গমঞ্চে তাহা অভিনীত হয়। এই অনুবাদগুলি ভাল হয় নাই।

ঠাকুর পরিবার হইতে কতকগুলি নাটক অনূদিত হয়। শৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মালবিকাগ্নিমিত্র, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিক্রমোর্বশী এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত নাটকাবলীর অনুবাদে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বজন সমাদৃত প্রায় সবগুলি নাটকেরই অনুবাদ তিনি করিয়াছেন। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশী ও অভিজ্ঞান শকুন্তলা ; ভবভূতির উত্তরচরিত, মালতীমাধব ও মহাবীরচরিত ; শ্রীহর্ষের রত্নাবলী ও নাগানন্দ ; শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক ; বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস ; ক্ষেমীশ্বরের চণ্ডকৌশিক ; ভট্ট-নারায়ণের বেণীসংহার ; কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় ; রাজশেখরের বিদ্ধশালভঞ্জিকা, প্রিয়দর্শিকা ও কর্পূরমঞ্জরী এবং কাঞ্চনাচার্যের ধনঞ্জয়বিজয়—সংস্কৃতসাহিত্যের এই নাটক রত্নরাজির বঙ্গানুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। এই অনুবাদগুলি বঙ্গসাহিত্যের গৌরব ঃ এক গৌরব সংস্কৃত নাটকাবলীর বাংলা স্বাদে, অপর গৌরব মূলের যথাযথ অনুবাদে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সর্বথা মূলানুসারী : অনুবাদকের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ।

এই সকল অনুবাদ কেবল তৎকালীন অভিজাত সম্প্রদায় বা ইংরাজশিক্ষিত ইঙ্গ-বঙ্গ সম্প্রদায়ের প্রমোদ-সম্ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করে নাই, সংস্কৃত নাটকের বিষয়, ভাব ও আঙ্গিকের সহিত তাঁহাদিগকে পরিচয় করাইয়া দিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন রসসৃষ্টির প্রেরণাও জাগ্রত করিয়াছে।

॥ অনুবাদ-ব্যতিরিক্ত রচনায় সংস্কৃত প্রভাব ॥

সংস্কৃত কাব্য ও নাটকাদির অনুবাদ নিঃসন্দেহে বাঙালীর সংস্কৃত-প্রিয়তার পরিচয় বহন করে। এই অনুবাদ দ্বারা বাংলা সাহিত্য পরিপুষ্ট হইয়াছে, ইহাই বাঙালী সমাজকে সংস্কৃত কাব্যের আঙ্গিক ও রস-বস্তুর সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছে এবং বাহিরের অনুকরণ ক্রমে ক্রমে রস-চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় নব্য-যুগের সাহিত্যকে রূপে-রসে সমৃদ্ধ করিয়া নব নব সৃষ্টির সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। বাংলাসাহিত্যে সংস্কৃতের গূঢ় প্রভাব এইখানেই। এ যেন রূপা-নুরাগের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ ভাব-সম্মেলনের দিকে যাত্রা।

আমাদের একটি প্রচলিত ধারণা, আধুনিক বাংলা কাব্য, নাটক ও কথাসাহিত্য

সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় প্রভাবের ফল। সন্দেহ নাই, পাশ্চাত্ত্য প্রভাব এদেশের স্বাধীন দৃষ্টিকে অবারিত করিয়া দিয়াছে, পাশ্চাত্ত্য কাব্য-নাটকের আঙ্গিকে ও ভাবে নব্য বাংলায় নব নব সাহিত্য রচিত হইয়াছে। কিন্তু একটু ধীরভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার স্পর্শ আমাদিগকে আত্মমুখীও করিয়া তুলিয়াছে—প্রথমে নিজেকে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিবার চেষ্টায় (ঈশ্বর গুপ্তের রচনাবলী বা অনুবাদ সাহিত্যাদির প্রকাশ তাহার প্রমাণ), পরে পাশ্চাত্ত্য-প্রভাবযুক্ত বিচার-বুদ্ধি লইয়া নিজেদের ঐশ্বর্য সংরক্ষণ ও বিকীরণে এবং সর্বশেষে প্রাচীন ভাবগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া নব্য যুগের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করার প্রবণতায়। শেষের পর্যায়টিই গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্যায়ে সংস্কৃত কাব্য-নাটকের প্রভাব মর্মমূলে প্রসারিত হইয়াছে এবং তাহার সহিত নব্য-মানসের একটি অন্তরঙ্গ ভাবসাযুজ্য ঘটায় নবনব ভাবতরঙ্গের লীলা সম্ভব হইয়াছে।

এই ভাব-সাযুজ্যের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে, কতিপয় প্রতিভাবান কবি যুগের প্রথমদিক হইতেই স্বী-করণের ভিতর সংস্কৃত বিষয়কে নিজের করিয়া লইয়া নূতন ধরনেব সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্রতী হইয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের রস ও প্রকাশভঙ্গি, সংস্কৃত রসসাহিত্যের বিষয়-বৈচিত্র্য ও প্রবণতা তাঁহাদের রচনায় এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, তাহাদিগকে যেন আর পৃথক করিয়া চিনিবার উপায় নাই। বাহিরের দিক হইতে মনে হইতেছে,—বিষয় ও ভাববস্তু, প্রকাশভঙ্গি ও রীতি বুঝি পাশ্চাত্ত্য, কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে বিচার করিলে দেখা যাইবে, সেগুলি সংস্কৃতসাহিত্যের নবরূপায়ণ; বাহিরের রূপসজ্জা হয়তো নূতন, কিন্তু অন্তরের ভাবফল্গু প্রাচীন।

ক. নবীন কবিতা ও সংস্কৃত কাব্য

প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে নব্য-বাংলার কাব্য ও কবিতা। কবিবর ঈশ্বর গুপ্তই এই কবিদলের পুরোধা। প্রাচীন বাংলা কাব্যের ভাব ও ভঙ্গীর গণ্ডীমুক্ত হইয়া তিনিই প্রথম কাব্যের আধুনিকতার রঙ প্রতিফলিত করেন। গুপ্ত কবির পারমার্থিক কবিতা, নীতিকবিতা, প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা, প্রেম কবিতা এবং সর্বোপরি ব্যঙ্গাত্মক কবিতার সহিত প্রাচীন বাংলার কাব্যের তেমন মিল নাই। ইহা যেন নব্যযুগের এক নূতন সৃষ্টি। কিন্তু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতাবলীর সহিত উহাদের ভাবসাদৃশ্য রহিয়াছে। গুপ্ত কবির রঙ্গ-শ্লেষ আধুনিক, কিন্তু ভাব পুরাতন।

অবশ্য গুপ্ত কবি যে পারমার্থিক ও নীতি কবিতাবলী রচনা করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন কোন সংস্কৃত কবিতার আক্ষরিক অনুবাদ নয়; কিন্তু ভাবানুষঙ্গে উহা সংস্কৃত কবিতার প্রতিধ্বনি। ভর্তৃহরি-শংকরাচার্যের বৈরাগ্যভাবকে আত্মসাৎ করিয়া তিনি 'সংসার-জাঁতা', 'সংসার-সমুদ্র', 'সংসার-কানন', 'সংসার-সাজঘর' রচনা করিয়াছেন। 'পলিত কুন্তলজাল গলিত দশন, লুলিত গাত্রের মাংস স্খলিত বচন ॥'

[মায়া]—শঙ্করাচার্যের 'অঙ্গংগলিতং পলিতং মুণ্ডং' পংক্তি স্মরণ করাইয়া দেয় ; 'মালতী-মুকুলে ভাতি গুঞ্জন্ মত্তো মধুব্রতঃ' এর ধ্বনি,

নব নব তরু চারু পূর্ণ ফুল-ফলে।
মন-মধুকর গুঞ্জে প্রতি দলে দলে ॥ [সংসার-কানন]

গুপ্ত কবির নীতি কবিতাগুলিও প্রাচীন নীতি-শ্লোকের সুরে বাঁধা। 'গুণী', 'জ্ঞানী', 'সাধু', 'রূপ ও গুণ', 'পৃথিবী-শিক্ষা', 'অজাগর-শিক্ষা', 'ভ্রমর-শিক্ষা' প্রভৃতি নীতিকবিতা পুরাতনী নীতিকথার নবীন সংকলন। ভর্তৃহরি বলিতেছেন,

দানং ভোগো নাশস্তিস্রো গতয়ো ভবন্তি বিত্তস্য।
যো ন দদাতি ন ভুঙ্‌ক্তে তস্য তৃতীয়া গতির্ভবতি। [নীতিশতক]

সেখানে গুপ্ত কবি বলেন,

নিজে আর যাচকেরে করিয়া বঞ্চন।
সঞ্চয় কর না ঘরে কোনরূপ ধন ॥
শরীর পতন করি করিয়া সঞ্চিত।
কৃপণ আপন ধনে আপনি বঞ্চিত ॥ [মধুমক্ষিকা-শিক্ষা]

প্রাচীন 'ভ্রমরাষ্টক' কবিতার একটি শ্লোকে দেখি, একটি ভ্রমর লোভবশতঃ পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমণ করিল, তাহাতেও তাহার লোভের শান্তি হইল না ; তখন সে অধিক লোভে একটি পদ্মের উপর গিয়া উপবেশন করিল। কিন্তু সহসা দিবাবসান হওয়ায় পদ্ম মুদ্রিত হইয়া গেল এবং সেই সঙ্গে মধুকরও পদ্মমধ্যে বন্ধ হইয়া কুসুমরজেঃ অন্ধ হইয়া ('অন্ধভূতঃ কুসুমরজসা') ক্রন্দন করিতে লাগিল। এই দৃষ্টান্তে কবির শিক্ষা,

বন্ধস্তত্র নিশাকরেণ বিধিনা ক্রন্দতাসৌ মূঢ়ধীঃ।
সন্তোষেণ বিনা পরাভবপদং প্রাপ্নোতি মূঢ়োজনঃ ॥

গুপ্ত কবি তাঁহার 'ভ্রমর-শিক্ষা' কবিতায় ঠিক এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন ঃ

পড়ে লোভে ফাঁদে কেবা নাহি কাঁদে
লাগিয়া মায়ার ধন্দ।
পদ্মের ভিতর বন্ধ মধুকর
কেতকী রেণুতে অন্ধ ॥

এইরূপ বহু উদাহরণ দ্বারা প্রাচীন কবিতাবলীর সহিত গুপ্ত কবির ভাব-সাদৃশ্য দেখানো যাইতে পারে। তথাপি গুপ্ত কবি স্বতন্ত্র। প্রাচীন কবিতার ভাব অবলম্বন করিয়া তিনি নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন।

গুপ্ত কবির প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতাবলী সম্পর্কেও এই উক্তি প্রযোজ্য। প্রকৃতির বস্তুচিত্রাংকনে কবি প্রাচীন কবির অনুপন্থী। 'গ্রীষ্মকরে বিশ্বনাশ দৃশ্য ভয়ংকর,' 'শাখীপরে আঁখি মুদে আছে পাখী সব'—প্রভৃতি পংক্তি 'মার্তণ্ডচণ্ডতাপেস্তপতি বসুমতীং পত্রিণঃ কুঞ্জসংস্থাঃ'র প্রতিলিপি। কালিদাস বলেন, এই ভয়ঙ্কর দাবদাহে 'ফণী ময়ূরস্য তলে নিষীদতি' গুপ্ত কবি বলেন, 'ময়ূরভুজঙ্গে নাই দ্বন্দ্ব

পরস্পর।' তেমনই সিংহ ও হস্তি, সর্প ও ভেক সকলেই আজ 'সুহৃদ ইব সমেতা দ্বন্দ্বভাবং বিহায়' ; গুপ্ত কবি বলেন, 'ছেড়েছে খলতা রোগ যত সব খল।'

গুপ্ত কবি কবি কালিদাসের মত বর্ষাকে রাজার মত রণসাজে সজ্জিত করিয়াছেনঃ

নীরদ দ্বিরদবর আরোহিয়া তদুপর
ঋতুবর বরষার জাঁক।
গুড়ু গুড়ু গুম্ গুম্ গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্
বাজিতেছে রণ জয়ঢাক ॥

কালিদাসের শরদ্বর্ণনায় 'মহী......শুক্লীকৃতা' ; গুপ্ত কবিও বলেন, 'কপূরে পূরিল বিশ্ব, সেইমত হয় দৃশ্য, সিতপক্ষ শারদনিশায়।' শীত ঋতুর বর্ণনা বা বসন্ত ঋতুর বর্ণনাতেও সংস্কৃত ঋতু-বর্ণনার সাদৃশ্য সহজলক্ষ্য।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, সংস্কৃত কবিতায় ঋতুপর্যায় যেমন কামের উদ্দীপন বিভাব, গুপ্ত কবির রচনায় তাহার প্রভাব সামান্য মাত্র। গুপ্ত কবির বস্তু-দৃষ্টি আরও সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ন। ঋতুর আবর্তনে বাঙালীর ঘরের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-উৎসবের পালা তিনি দেখিয়াছেন ; দেখিয়াছেন গ্রীষ্মে 'মাঠ আছে কাঠ হয়ে ফুটি-ফাঠা মাটি', বর্ষায় 'রান্নাঘরে কান্নাহাটি ভিজে কাঠ ভিজে মাটি, কোন মতে নাহি জ্বলে চুলো,' শরতে 'পূজার গোল' আর শীতে 'ধনীর শরীরে শাল, গরীবের পক্ষে শাল'......গরীবেরা তখন 'বেণের পুটুলি হ'য়ে, শুয়ে থাকে শীত সয়ে, উম্ বিনা ঘুম্ নাহি হয়।' প্রেমের কবিতাতে প্রাচীন কবিতার ছাঁচ থাকিলেও গুপ্ত কবি স্বতন্ত্র।

ঈশ্বর গুপ্ত হইতেই সংস্কৃত কাব্য-কবিতার ভাবের স্বী-করণ শুরু হইয়াছে। কবিবর রঙ্গলালের কাব্যেও এই প্রভাব লক্ষণীয়।

নব্যবাংলার কাব্য-সাহিত্যে ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব নিঃসন্দেহে অতি স্পষ্ট। রূপে রসে তাহাদের চোখ ধাঁধাঁনো ঔজ্জ্বল্য। আপাত দৃষ্টিতে সেই ঔজ্জ্বল্যই মনকে আকৃষ্ট করে, মনে হয় উহার সবটাই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের দান। দেশীয় সমালোচকের পাশ্চাত্ত্যমুখী আলোচনায় এদেশীয় কাব্যে সেই পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের দিকটাই উদ্ঘাটিত হইয়াছে। কিন্তু উহার পশ্চাতে যে প্রাচ্যের ফল্গু প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে, তাহা বিচার করা হয় নাই।

রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'কর্মদেবী', 'শূরসুন্দরী' ও 'কাঞ্চী কাবেরী' নূতন যুগের নূতন খণ্ডকাব্য। সবগুলিই প্রেম ও বীরত্বের কাহিনী। ইংরাজিতে এরূপ কাব্যকে বলা হয় 'রোম্যান্স'। নব্যবাংলার এই রোম্যান্স ইংরাজি কাব্যের অনুকৃতি। রঙ্গলালও তাহারই অনুকরণ করিয়াছেন।

কিন্তু এই ধরনের রোম্যান্স একদিন সংস্কৃত সাহিত্যেও প্রচলিত ছিল। দণ্ডী, সুবন্ধু, বাণভট্টের গদ্যকাব্যে কিংবা কথা-সরিৎসাগর-ধৃত গুণাঢ্যের অপূর্ব কথাকাব্যে প্রেম ও বীর্যের চিত্তরঞ্জিনী কাহিনীর অভাব নাই। রঙ্গলালের কাব্যে তাহাদের প্রভাব অল্প নয়। রঙ্গলালের কবি-মানস গঠনে একদিকে ছিল প্রাচীন পন্থী গুপ্ত কবির

প্রভাব, অপরদিকে ছিল সংস্কৃত কাব্যের প্রভাব। তিনি কালিদাসের কুমারসম্ভব অনুবাদ করিয়াছিলেন, বররুচি-ভর্তৃহরি-ভবভূতির এবং অন্যান্য কবির যে সূক্তি-রত্নাবলী জনসাধারণের ভিতর প্রচলিত, তাহাদের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। এই সকল দিক হইতে কবি-চিত্তে যে পটভূমিকা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহারই উপর রঙ্গলাল নবীন কাব্যের আলেখ্য অংকন করিয়াছেন। সে আলেখ্যে সংস্কৃত কাব্যের রঙ অতিশয় স্পষ্ট। কি প্রকৃতি-বর্ণনায়, কি প্রেম-চিত্রে, কি ভাষায়, কি অলংকরণে এই প্রভাব লক্ষণীয়।

রঙ্গলালের শ্রেষ্ঠ কাব্য 'পদ্মিনী উপাখ্যান'; ইহার ভূমিকায় কাব্য কি এবং কাব্য-রচনার উদ্দেশ্য কি, তাহা বুঝাইতে গিয়া কবি সাহিত্য-দর্পণকারের প্রসিদ্ধ উক্তিটি উদ্ধার করিয়াছেন, 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'। রঙ্গলালেরও কাব্যরচনার লক্ষ্য 'রসোদ্দীপন'। শুধু রসোদ্দীপন নয়, হৃদয়-স্বাস্থ্যের সুস্থতা-বিধান, অর্থাৎ 'শিবেতর-ক্ষতয়ে'। রস-সৃষ্টিতে অভিনিবিষ্টমনা হইয়া ভাষায় ভূষণ যোগ করার পদ্ধতিটিও প্রাচীন। কবি বলেন, 'যথা কবিতায় রস-ভূষণ প্রদান' [কর্মদেবী. ৪র্থ সর্গ]। বাগ্‌বন্ধে রঙ্গলাল সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রেরই অনুগত।

নর-নারীর রূপবর্ণনায় সংস্কৃত কাব্যের রূপবর্ণনার প্রভাব অতি স্পষ্ট। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে 'পদ্মিনী' নারীর আকৃতি ও প্রকৃতি এইরূপ

ভবতি কমলনেত্রা নাসিকা ক্ষুদ্ররন্ধ্রা
অবিরল কুচ যুগ্ম দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী।
মৃদুবচন সুশীলা নৃত্যগীতানুরক্তা
সকলতনু সুবেশা পদ্মিনী পদ্মগন্ধা॥ [রতিমঞ্জরী]

রঙ্গলালের পদ্মিনীর রূপবর্ণনাতেও এই পদ্মিনী নারীর প্রতিভাস ঃ

সর্বসুলক্ষণবতী ধরাধামে যে যুবতী
লোকে বলে পদ্মিনী তাহারে।
সেই নাম নাম যার সেরূপ প্রকৃতি তার
কতগুণ কে কহিতে পারে ?

এই পদ্মিনীর 'অবিরত সুশীলতা' ['মৃদুবচন সুশীলা'], এবং 'পদ্মিনীর পদ্মনেত্র' ['ভবতি কমল নেত্রা']—প্রভৃতি উক্তিও সংস্কৃত পদ্মিনী-লক্ষণের অনুরূপ।

পদ্মিনীর রূপবর্ণনা প্রসঙ্গেই কবি 'কোন্ মূঢ় চিত্রকরে পদ্মদেহ চিত্র করে' এই বিখ্যাত অতিশয়োক্তিটি প্রয়োগ করিয়াছেন। সন্দেহ নাই এই পংক্তিগুলির সহিত শেক্ষপীয়রের 'To gild refined gold' পংক্তির মিল আছে ঃ কিন্তু মনে হয়, কবি বিদেশীয় আদর্শ অপেক্ষা এক্ষেত্রে দেশীয় সূক্তিকেই অবলম্বন করিয়াছেন। 'কি কাজ সিন্দুরে মাজি, গজমুক্তা ফলরাজি মাজিলে কি হয় সমুজ্জ্বল ?'—এই উক্তির বেশি সাদৃশ্য রহিয়াছে সংস্কৃত এই সূক্তিটির সহিত ঃ

স্বভাবসুন্দরং বস্তু ন সংস্কারমপেক্ষতে।
মুক্তারত্নস্য শাণাশ্মঘর্ষণং নোপযুজ্যতে॥ [দৃষ্টান্তশতক]

'কর্মদেবী'র কাহিনী রাজপুত ইতিহাস হইতে সংগৃহীত হইলেও, চুরি করিয়া নায়কের নায়িকা-কুঞ্জে প্রবেশ ও প্রেমের আদান-প্রদানের ভিতর 'চৌর'-কাব্যের প্রভাব অতি স্পষ্ট। সাধুর সহিত কর্মদেবীর বিবাহপ্রসঙ্গে বরকন্যার 'চাহনী-চাহনা' কুমার-সম্ভব কাব্যের 'হ্রীযন্ত্রণাং তৎক্ষণমন্বভুবনন্যোন্যলোলানি বিলোচনানি' পংক্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সাধুর সহিত কন্যাকে প্রেরণ করিবার কালে ঔরিষ্টপতির এই উক্তি :

নিখিল কল্যাণভূমি গুণের নিলয় তুমি
জানি আমি তুমি অতি জ্ঞানী......
আর কিছু ভিক্ষা নাই তবস্থানে এই চাই
যথা যত্নে রাখিবা ইহারে।

দুষ্যন্তের প্রতি কণ্বমুনির সন্দেশের 'ত্বমর্হতাং প্রাগ্রহরঃস্মৃতোহসি' এবং 'সামান্য প্রতিপত্তি পূর্বকমিয়ং দারেষু দৃশ্যা' প্রভৃতি বাক্যের প্রতিধ্বনি।

রঙ্গলালের কাব্য নবীন কবিতার প্রতীক হইলেও উহাতে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের সংস্কার নানাভাবে ছড়ানো রহিয়াছে। 'মা গুণে শ্রুতিং দেহি দাসীর বচনে', 'রণং দেহি রণং দেহি মোহিল কুমার' [কর্মদেবী] প্রভৃতি উক্তি সংস্কৃতই। তাঁহার কাব্যের দেবদেবীস্তোত্রগুলির—কর্মদেবীকাব্যের 'কুলদেবীস্তব' [ভব-চিত্ত-অলি-পদ্মিনি। ভকত হৃদয়-সদ্মিনি!' ইত্যাদি], পদ্মিনী উপাখ্যানের দিবাকর-স্তোত্র ['জয় সুরপতি ভাস্কর! সমুদয় সুখ-পুষ্কর!' ইত্যাদি] সংস্কৃত স্তোত্রকবিতারই প্রতিরূপ। মাঝে মাঝে জয়দেবের ঝঙ্কার অতি স্পষ্ট।

খ. নব্য বাংলার মহাকাব্যে সংস্কৃত মহাকাব্যের প্রভাব : মধুসূদনের কাব্যে সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা

নব্য বাংলার মহাকাব্য ইংরাজি Epic of art-এর প্রতিরূপ—ইহাই প্রচলিত সিদ্ধান্ত। এই সকল মহাকাব্যের বিচারে পাশ্চাত্ত্য মতানুসারে—মহাকাব্য কাহাকে বলে, মহাকাব্যের লক্ষণ কি এবং সেই সকল লক্ষণ বাংলা মহাকাব্যে কতখানি প্রতিফলিত হইয়াছে—তাহাই বিচারিত হয়। কিন্তু নব্য বাংলার মহাকাব্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব যাহাই থাকুক উহাদের আঙ্গিকে, সর্গবন্ধে, সর্গের নামকরণে, বর্ণনা-লিপিতে ও অলংকরণে প্রাচ্যদেশীয় মহাকাব্যের প্রভাব অল্প নয়। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে মহাকাব্যের যে সকল লক্ষণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, কালিদাস-ভারবি-ভাট্টি-মাঘ-শ্রীহর্ষ যে ধরনে মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, বাংলা মহাকাব্য রচনায় তাহাদের প্রভাব গূঢ়সঞ্চারী।

নব মহাকাব্য রচনায় মধুসূদন শুধু পথিকৃৎ নন, অবিসংবাদিতরূপে শ্রেষ্ঠ। মধুসূদনের পরে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু মধুসূদনের প্রভাব ও প্রতিভাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারেন নাই। মধুসূদন নাটক রচনা সম্পর্কে পুনঃ পুনঃ সগর্ব উক্তি করিয়াছেন, 'I shall not allow myself bound down by the dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya Darpan.'—

শুধু নাটক রচনায় নয়, মহাকাব্য রচনাতেও মধুসূদনের আদর্শ ছিল ইউরোপীয় মহাকাব্য। কিন্তু মুখে যাহাই বলুন, শ্রীমধুসূদন মহাকাব্য রচনায় দেশীয় রীতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। বিশ্বনাথের মতে, (i) 'সর্গবন্ধো মহাকাব্য...... নাতিস্বল্পা নাতিদীর্ঘাঃ সর্গা অষ্টাধিক ইহ'—মেঘনাদবধ কাব্যও সর্গে বিভক্ত এবং ইহাতে আটটির অধিক অর্থাৎ নয়টি সর্গ আছে, (ii) 'নামাস্য সর্গোপাদেয় কথয়া সর্গনাম তু' (সর্গে বর্ণিত উপাদেয় কথা অনুসারে সর্গের নামকরণ হইবে); মেঘনাদবধের সর্গনামগুলিরও এই উক্তি অনুসারে 'ইতি শ্রীমেঘনাদবধকাব্যে অভিষেকো নাম প্রথমঃ সর্গঃ', 'অস্ত্রলাভো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ', 'সমাগমো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ' প্রভৃতি নামকরণ করা হইয়াছে, (iii) 'শৃঙ্গার-বীর-শান্তানামেকোঽঙ্গী রস ইষ্যতে'; মেঘনাদবধকাব্যে অঙ্গীরস 'বীর', অন্যান্য রস উহার অনুগত, (iv) সর্বোপরি অলংকার শাস্ত্রমতে মহাকাব্যে থাকিবে রজনী, প্রদোষ, সন্ধ্যা, প্রভাত, বন, সাগর, সম্ভোগ, বিরহ ও যুদ্ধাদির বর্ণনা; মেঘনাদবধকাব্যের অন্যতম গৌরব এই বর্ণনা। দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে 'অস্তে গেলা দিনমণি; আইলা গোধূলি একটি রতন ভালে' —এই সন্ধ্যার বর্ণনা, তৃতীয় সর্গে 'তিমির যামিনী'র বর্ণনা, মেঘনাদ-প্রমীলার সম্ভোগ, প্রমীলা বা সীতার বিরহ-বর্ণনা, চতুর্থ সর্গে দণ্ডাকারণ্য-সম্পদ্ বর্ণনা এবং প্রধানতঃ সমগ্র কাব্যে যুদ্ধের ভয়াবহ বর্ণনায় মধুসূদন প্রাচ্য অলংকারশাস্ত্রের নির্দেশকে অমান্য করেন নাই।

বর্ণনাতেও সংস্কৃত আলংকারিক রীতির অনুকরণ লক্ষণীয়। সংস্কৃত মহাকাব্যের প্রায় প্রতিটি শ্লোকে পাণ্ডিত্য ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের পরিচয় পাওয়া যায়; শব্দনির্বাচনে, ভাবানুযায়ী যথার্থ শব্দের সন্নিবেশে এবং অলংকার প্রয়োগ-নৈপুণ্যে মধুর কাব্যেও সংস্কৃত কাব্যের প্রসব-শ্রী। মধুসূদনের প্রিয় কবি ছিলেন কালিদাস; কালিদাসের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্বের কথা ('Partiality for Kalidas') একটি পত্রে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ভাবাহরণে ও উপমাসৃষ্টিতে কালিদাসের প্রভাব মধুসূদনে তো আছেই, ভবভূতি ও অন্যান্য কবির প্রভাবও ছিল।

(i) মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গের শেষে মধুসূদন বন্দিগণের বন্দনায় শোকাবেশে মুক্তকেশী লংকার যে চিত্র অংকন করিয়াছেন এবং রাবণের কণ্ঠে যে বিষাদঘন হাহাকার ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহার সহিত ভবভূতির মহাবীরচরিতের সপ্তম অংকে চিত্রিত 'শোকাকুল লংকা'র সাদৃশ্য আছে; বীরচরিতের লংকার হাহাকার ধ্বনি রাবণের হাহাকারের অনুরূপ। (ii) দ্বিতীয় সর্গে রামচন্দ্রের শিবিরে দৈব অস্ত্র সহ চিত্ররথের আবির্ভাব বর্ণনাপ্রসঙ্গে দৈব অস্ত্রে দিব্য বিভার বর্ণনা, মহাবীরচরিতের প্রথম অংকে বিশ্বামিত্রের নির্দেশে রাম-লক্ষ্মণের সম্মুখে আবির্ভূত দিব্য অস্ত্র সমাগমের বর্ণনার মিল দেখা যায়। (iii) চতুর্থ সর্গে পঞ্চবটীবনের বর্ণনায় ভবভূতির উত্তর-রামচরিতের নিশ্চিত প্রভাব বিদ্যমান; বিশেষতঃ বনপ্রকৃতির সহিত 'বনোৎকণ্ঠা' মৈথিলীর একাত্মতায়। পঞ্চবটীর 'গোদাবরীতট,' 'লতাগৃহ,' 'বৈখানসাশ্রিত তরূণি 'তপোবনানি', 'করকমলবিতীর্ণৈরম্বুনীবারশষ্পৈস্তরুশকুনিকুরঙ্গান্ মৈথিলী যান-

পুষ্যং', 'তস্মিন পর্বতে লক্ষ্মণেন প্রতিবিহিতসপর্য্যাস্বস্থয়োস্তান্যহানি' প্রভৃতির প্রতিধ্বনি মেঘনদবধ কাব্যে আছে। শুধু তাই নয়, পঞ্চবটীর অরণ্যসম্পদ বর্ণনায় মেঘনাদবধ কাব্যে নৈষধের 'পদলালিত্য'ও লক্ষণীয়।

(iv) কবি, কবিতা ও রসসৃষ্টি সম্পর্কে মধুসূদনের ধারণার পরিচয় রহিয়াছে চতুর্দশপদী কবিতাবলীর কয়েকটি কবিতায়। উহাতে রস-সৃষ্টিই যে কাব্যরচনার লক্ষ্য, মধুসূদন তাহা স্বীকার করিয়াছেন ঃ তাঁহার মতে, তিনিই কবি 'আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ যার আজ্ঞা মানে' [কবি]; 'কবিতা' কবিতায় কাব্য-সৃষ্টি সম্পর্কে কবির অভিমত,

দয়া করি নরে,
কবি-মুখ-ব্রহ্মলোক উরি অবতার
বাণীরূপে বীণাপাণি এ নব নগরে।

ইহা যেন ভবভূতির কথারই প্রতিধ্বনি ঃ 'আবির্ভূত শব্দব্রহ্ম' অথবা 'প্রবুদ্ধোঽসি বাগাত্মনি ব্রহ্মণি'। [উ. চ. ২য় অংক]

(v) মধুসূদন বিশ্বাস করেন, এ জগতে যশস্বী কবিই অমর

যশের মন্দির ওই ওথা যাঁর গতি,
অশক্ত আপনি যম ছুঁইতে রে তাঁরে। [যশের মন্দির]

এই উক্তি কবি ভর্তৃহরির 'জয়ন্তি তে সুকৃতিনো রসসিদ্ধাঃ কবীশ্বরাঃ। যেষাং নাস্তি যশঃকায়ে জরামরণজং ভয়ম্'-এর প্রতিধ্বনি।

(vi) উপরন্তু অলংকারশাস্ত্রে শৃঙ্গারাদি রসের বিভাব-অনুভাব-বর্ণ প্রভৃতির বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। মধুসূদন নিজের মত করিয়া সেই সকল বর্ণনার ছায়া লইয়া 'করুণ রস', 'শৃঙ্গার রস', 'বীররস' ও 'রৌদ্ররস'-এর মূর্তি অঙ্কন করিয়াছেন।

অলংকারশাস্ত্রমতে মন্মথোদ্রেককারী শৃঙ্গের অর্থাৎ অভিলাষ-চিন্তাদি হইতে দশমদশা মৃত্যুর আবির্ভাবহেতু রসকে শৃঙ্গাররস বলা হয় ঃ

শৃঙ্গং হি মন্মথোদ্ভেদস্তদাগমনহেতুকঃ।
উত্তম প্রকৃতি প্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার ইষ্যতে ॥ [সাহিত্যদর্পণ. ৩য়]

মধুসূদনের শৃঙ্গাররস ঃ

জ্বালাইছে হিয়া বৃন্দে ; ফুলধনুঃ ধরি
হানিতেছে চারিদিকে বাণ রাশি রাশি
কি দেব, কি নর, উভে জরজর করি।
কামদেব অবতার রসকুলে আসি
শৃঙ্গার রসের নাম।

অলংকারশাস্ত্রমতে 'রৌদ্রঃ ক্রোধ স্থায়িভাবো রক্তো রুদ্রাধিদৈবতঃ'; মুষ্টি-প্রহারাদি উহার উদ্দীপন, ভ্রূবিভঙ্গ-তর্জন উহার অনুভাব, উগ্রতা উহার সঞ্চারী; মধুসূদন এই রৌদ্ররসের মূর্তি আঁকিয়াছেন এইভাবে ঃ

ক্ষুধার্ত কেশরী যেন নাদিছে ভীষণে
প্রলয়ের মেঘ যেন গর্জিছে গগনে...
উথলে অদূরে সিন্ধু যেন ক্রোধভরে···
রৌদ্র নামে রস রৌদ্র অতি...
বড়ই কর্কশ ভাষী নিষ্ঠুর দুর্মতি
সতত বিবাদে মত্ত পুড়ি রোষানলে।

তেমনই 'করুণ রস'। অলংকার শাস্ত্রমতে করুণের স্থায়ী ভাব শোক ; উহার অনুভাব বৈবর্ণ্য, উচ্ছ্বাস, ক্রন্দন—উহার সঞ্চারী প্রধানতঃ বিষাদ। মধুসূদন অশ্রুমুখী বিষণ্ণা নারীরূপে এই রসের মূর্তি অঙ্কন করিয়াছেন ঃ

সুন্দর নদের তীরে হেরিনু সুন্দরী
বামারে মলিন মুখী...
সে বিরলে বসি
মৃদে কাঁদে সুবদনা ; বারে বারে বারি
গলে অশ্রুবিন্দু···
করুণা বামার নাম রসকুলে রাণী।

'Tremendous literary rebel' মাইকেল ; প্রাচীন সংস্কারকে ভাঙ্গিয়া তিনি বাংলাকাব্যে প্রতীচীর নব ভাব বিকীর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের আবরণ অপসারণ করিলে দেখা যাইবে, তাহাতে বহিয়া চলিয়াছে ভারতীয় ভাবেরই ভাব-ফল্গু। এইখানেই মাইকেল শ্রীমধুসূদন।

গ. নব্য বাংলার গীতিকবিতায় সংস্কৃত কবিতার ভাববিম্ব ঃ বিহারীলাল ও সংস্কৃত কাব্য।

নব্য বাংলার নবীন গীতিকবিতাতেও সংস্কৃত ভাবের প্রতিবিম্ব লক্ষণীয়। নূতন গীতিকবিতার প্রথম কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকেই নূতন কবিতা-নিকুঞ্জে 'ভোরের পাখী' বলিয়াছেন। বিহারীলালের সংস্কৃত শিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ়। তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া মুগ্ধবোধ ও সংস্কৃত কাব্য চর্চা করেন। রসময় লাহা বলেন, 'কবিগুরু বাল্মীকির রামায়ণ, মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির গ্রন্থাবলী তাঁহার বড় প্রিয় ছিল।' বিহারীলালের কাব্যে সংস্কৃতপ্রিয়তার লক্ষণ সুপরিস্ফুট। অনেকগুলি কাব্যের সর্গারম্ভে কবি ভাবানুষঙ্গে সংস্কৃত কাব্য-কবিতার শ্লোক বা শ্লোকাংশের উদ্ধৃতি দিয়াছেন। 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে আছে কালিদাসের 'গুণা গুণানুবন্ধিত্বাত্তস্য সপ্রসবা ইব', তৃতীয় সর্গে 'গৃহিণীসচিবঃ সখীমিথঃ' শ্লোক,[১] চতুর্থে 'সমানাঃ

১. এই সর্গের এই দুইটি চরণ লক্ষণীয় ঃ
একদিন প্রাতে বসি শয্যার উপরি।
'অভিজ্ঞান শকুন্তল' অধ্যয়ন করি। [বন্ধুবিয়োগ. ৩]

স্বর্যাতাঃ সপদি সুহৃদো জীবিতসমাঃ'। 'প্রেম প্রবাহিনী' কাব্যের তৃতীয় সর্গে ভর্তৃ-হরির 'যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা'' চতুর্থে শীহনুণের 'ধান্যানাং গিরিকন্দ-রোদরভুবি' ইত্যাদি এবং পঞ্চমে ভর্তৃহরির 'বালে লীলামুকুলিতময়ী সুন্দরা দৃষ্টি-পাতাঃ' শ্লোক। 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের প্রথম সর্গে ভবভূতির 'গাত্রেষু চন্দনরসো দৃশি শারদেন্দুরানন্দ এব হৃদয়ে', দ্বিতীয়ে 'ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মৃতবর্তির্নয়নয়োঃ', তৃতীয়ে কালিদাসের 'ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ', চতুর্থে ভারবির 'ভবাদৃশেষু প্রমদাজনোদিতং,' ষষ্ঠে ভবভূতির 'শ্রিতানি চন্দনভ্রান্ত্যা দুর্বিপাকং বিষদ্রুমম্', সপ্তমে উক্ত কবির 'আতপ্ত জীবিতমনঃ পরিতপর্ণো মে', অষ্টমে রত্নাবলীর 'দুল্লহজণঅণুরাও লজ্জা গুরুঈ পরব্বসো অপ্পা, পিঅসহি বিসমং পেম্মং মরণং সরণং ণ বরিঅমেক্কম্' [দুর্লভজনের প্রতি অনুরাগ, অপরদিকে গুরুতর লজ্জা—আত্মাও পরবশ; হে প্রিয়সখি, এরূপ জনে প্রণয় অনুপযুক্ত, এখানে মরণই একমাত্র শরণ]; নবমে ভবভূতির 'ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং, ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে'; দশমে কালিদাসের 'কুদো দাণিং মে দুরারোহিণী আসা' [প্রত্যাখ্যাত শকুন্তলা-বাক্য]। 'নিসর্গসন্দর্শন' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে কালিদাসের 'বিক্ষোরিবাস্যানব ধারণীয়মীদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা', চতুর্থে উক্ত কবির 'ব্যাপ্য স্থিতং রোদসি'—শ্লোকাংশ। এই উদ্ধৃতিগুলি হইতে বিহারীলালের উপর সংস্কৃতভাবের প্রভাব-গুরুত্ব অনুমান করা সম্ভব।

বিহারীলালের কবিতার দুইটি প্রধান বিষয়ঃ প্রেম ও প্রকৃতি। এই দুই বিষয়েই বিহারীলাল অনেকাংশে সংস্কৃত কবিতার নিকট ঋণী।

অবশ্য এই ঋণবিচারে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। সংস্কৃত কবিতা যেখানে ভঙ্গি-প্রধান, বিহারীলালের কবিতা সেখানে অনুভূতি-সর্বস্ব। সংস্কৃত কবিতার দীপ্তি বিহারীলালে নাই; বিহারীলালে আছে স্নিগ্ধ মাধুর্য, আছে অনু-ভূতির নিবিড়তা।

বাংলা কাব্যে বিহারীলালের প্রেম-চেতনা অনন্যসাধারণ। পরকীয়া তত্ত্বটুকু বাদে উহার সহিত চিরকালের সহজিয়া ও বাউলিয়া প্রেমের সাদৃশ্য আছে। প্রেমের গভীরতা, তন্ময়তা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবচিত্রণে তিনি চণ্ডীদাস ও সাঁই প্রেমিকদের সগোত্র। লোকজীবনের প্রেমে যে গাঢ় ও গূঢ়ভাবের প্রকাশ দেখা যায়, বিহারীলালে সেই সুরগুলিই তীব্র অনুভূতির স্পর্শে ঝঙ্কারমুখর হইয়া উঠিয়াছে। সংস্কৃত প্রেম কবিতার সহিত বিহারীলালের মিল সেইখানেই, যেখানে প্রেমের সূক্ষ্মতা ও কমনীয়তা, যেখানে প্রেম তন্ময় ও গভীর। বিপ্রলম্ভাত্মক প্রেমকবিতার মধ্যেই প্রেমের মাধুর্য ও লাবণ্য। বিহারীলালও প্রধানতঃ বিপ্রলম্ভের কবি। সংস্কৃত কবিতার উদ্ধৃতি দিয়াই সারদামঙ্গলের নামানুশ্লোকে তিনি বলিয়াছেন,-

সঙ্গম বিরহ বিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গমে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥

ভর্তৃহরির শৃঙ্গার-শতকের কতকগুলি ভাবের সহিত বিহারীলালের মিল

রহিয়াছে। ভর্তৃহরি প্রেমের দুর্বার শক্তিকে স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, 'কন্দর্প-দর্পদলনে বিরলা মনুষ্যাঃ'—ইহা কৃতী পুরুষেরও ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেয়। বিহারীলালও বলেন,

জ্বলিলে যৌবন বনে প্রেমের অনল,
দহে যেন তপোবন ব্যেপে ঘোর দাবানল ;
দূরে যায় ধৈর্য-স্থৈর্য
উৎসাহ গাম্ভীর্য বীর্য
সুবোধ সুধীর জনেও নিতান্ত করে বিকল। [সঙ্গীত শতক]

ভর্তৃহরির 'যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা' শ্লোক কবি উদ্ধৃত করিয়াছেন 'প্রেম প্রবাহিনী'র তৃতীয় সর্গে। হৃদয়ের একান্ত কামনা যে কখনও কখনও ব্যর্থ হয়, মানুষ প্রেমের প্রতিদান পায় না, এ নির্মম সত্য কবি অনুভব করিয়াছেন। 'অনুরাগতাপে প্রেমসোহাগে গলিয়া' যে হৃদয় ঢালিয়া দেয়, তাহাকেও কোন নায়িকা ঘৃণা করে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, কবি ভর্তৃহরি বৈরাগ্যের যে তির্যক দৃষ্টিতে রমণীর রমণীয় রূপ ও প্রেমকে দেখিয়াছেন, বিহারীলালে সে বৈরাগ্য ও তির্যক দৃষ্টি নাই। বিহারীলালের দৃষ্টিতে নারী চিরদিন, 'প্রেমের প্রতিমা, স্নেহের সাগর, করুণানির্ঝর, দয়ার নদী।' [বঙ্গসুন্দরী]

প্রেম-কল্পনায় বিহারীলালের সর্বাপেক্ষা অধিক সাদৃশ্য ভবভূতির সহিত। প্রেমের সূক্ষ্মতা ও গভীরতা প্রদর্শনে ভবভূতি সুদক্ষ শিল্পী। প্রেমের বিভাবখানিও ভবভূতিতে স্বতন্ত্র। অধিকাংশ সংস্কৃত প্রেমকবিতায় প্রেমের প্রধান আলম্বন-বিভাব যে নায়িকা, তাহার বহিঃসৌন্দর্য বর্ণনায় কবিগণ সমগ্র অলংকার উজাড় করিয়া দিয়াছেন। নায়িকার আনন, নয়ন, অধর, কপোল, কেশ, জঘন, নিতম্ব ও চরণের বন্দনায় সংস্কৃত কবিগণের লেখনী চির প্রগল্ভ। ভবভূতি সেখানে বহিরঙ্গ রূপের দিকে গুরুত্ব না দিয়া দেখিয়াছেন, নায়িকার অন্তর-সৌন্দর্য। ভবভূতির প্রেমের আলম্বন-বিভাব লাবণ্যের কমকান্তি, মানস-সৌন্দর্যের অচপল আলেখ্য—'ইয়ং লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্তির্নয়নয়োঃ' ; তাহার বচন 'ম্লানস্য জীবকুসুমস্য বিকাশনানি, সন্তর্পনানি সকলেন্দ্রিয়মোহনানি...কর্ণামৃতাণি মনসশ্চ রসায়নানি', তাহার স্পর্শ 'আতপ্ত জীবনমনপরিতর্পণো সঞ্জীবনৌষধিরসঃ', তাহার হৃদয় 'প্রেম্ণা দ্রবীভূতম্'। বিহারীলালেরও প্রেমের আশ্রয়বিভাব এই অন্তর-লাবণ্যের সার, মাধুর্যের আকর ঃ

নয়ন অমৃতবাশি প্রেয়সী আমার !
জীবন জুড়ান ধন হৃদি ফুলহার। [সারদামঙ্গলের উপহার গীতি]

তিনি 'মূর্তিমধুরিমা', 'সঞ্জীবনী লতা', 'লাবণ্য বালা', 'মায়ার মোহিনী মেয়ে স্বপন-সুন্দরী'। বিহারীলালের সৌন্দর্য বর্ণনায় অলংকার আছে, কিন্তু সে অলংকার সৌন্দর্যের কমনীয় স্নিগ্ধতারই দ্যোতক। তাঁহার নায়িকা 'ষোড়শী রূপসী বালা পূর্ণিমা যামিনী', তাঁহার 'কান্তি শান্তিময় তনু অপরূপ ইন্দ্রধনু', তাঁহার 'নয়ন-কিরণ যেন পীযূষ লহরী'। সর্বোপরি কবির নায়িকা 'করুণা রাণী'।

সৌন্দর্যের সহিত করুণার এই মণিকাঞ্চন যোগ সংস্কৃত সাহিত্যে দুর্লভ। একমাত্র ভবভূতির 'সীতা' এই করুণার একটি অসহজলভ্য প্রতিকৃতি—দয়া, প্রেম, স্নেহ, বাৎসল্য ও করুণরসের যুক্তবেণী—'করুণস্য মূর্তিরথবা শরীরিণী বিরহব্যথা'।

কেবল প্রেমের বিভাব-বর্ণনায় নয়, প্রেমের অনুভাব ও বৈচিত্র্য প্রদর্শনেও ভবভূতিতে অতি সূক্ষ্ম কতকগুলি ঝংকার উঠিয়াছে। বিহারীলালের কাব্যে তাহার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। 'ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং' প্রভৃতি শ্লোকের প্রতিধ্বনি বিহারীলালের সমগ্র কাব্যেই ছড়াইয়া আছে। এই সুরেই কবি বলেন ঃ

প্রিয়ে ! তুমি মম অমূল্য রতন !
যুগযুগান্তের তপের ফল ;
তব প্রেম-স্নেহ অমিয়-সেবন
দিয়েছে জীবনে অমর বল। [বঙ্গসুন্দরী. ৯ সর্গ]

ভবভূতি 'অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্বাস্ববস্থাসু যৎ' বলিয়া যে 'ভদ্রপ্রেম'-এর কল্পনা করিয়াছেন, বিহারীলাল সেই প্রেমের উপাসক ; এই প্রেম যে পুণ্যবান্ সুজনেই লাভ করিয়া থাকে, এবিষয়েও ভবভূতির সহিত কবি একমত ঃ

জনমে না মনে ইন্দ্রিয় বিকার
পরম উদার প্রেমের ভাব ;
নাহি রোগ শোক জরা কদাকার,
পুণ্যবানে করে এ নারী লাভ। [বঙ্গসুন্দরী. ৩ সর্গ]

ঘ. বাংলা নাটকে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব

বাংলা নাটক ইউরোপীয় নাট্যাদর্শে গঠিত—এ সিদ্ধান্ত একদেশদর্শী। এই নাটক ত্রিস্রোতার মত তিনটি ধারার সমষ্টি। ইহার সূচনা সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ লইয়া এবং আদৌ উহার আদর্শ ছিল সংস্কৃত নাটক। ক্রমে ক্রমে সে নাটক ইউরোপীয় নাটকের আদর্শে সংস্কৃতের প্রভাবমুক্ত হইয়াছে এবং যাত্রার ঢঙকে আত্মসাৎ করিয়া নবকলেবরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু ইউরোপীয় নাট্যকলার প্রভাব বিস্তৃত হইলেও বাংলা নাটক সংস্কৃত প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারে নাই, বিশেষতঃ বাংলা পৌরাণিক নাটক।

বাংলা নাটকের দ্বিমুখী গতি ঃ সহরেব নাট্যশালায় ও গ্রামে যাত্রার আসরে। সহরের নাটমঞ্চে অভিনীত নাটকে পাশ্চাত্ত্য নাটকের প্রভাব নিঃসন্দেহে গুরুতর। কিন্তু গুরুতর হইলেও প্রথম দিকের বাংলা নাটকে নান্দী ছিল, প্রস্তাবনা ছিল, বিদূষক ও কঞ্চুকী চরিত্র ছিল। এমন কি নাট্যবস্তুতেও সংস্কৃত নাটকের প্রেমবিলাস ও কাব্যময় সংলাপের অভাব ছিল না। বাংলার প্রথম মৌলিক নাটক জি. সি. গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' ও তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন'। 'কীর্তিবিলাসে' নান্দী আছে, নান্দ্যন্তে সূত্রধারকৃত প্রস্তাবনাও আছে। নাটকের বিষয়বস্তুতে ইংরাজী নাটকের জটিলতা প্রবর্তিত হইলেও গদ্য-পদ্য মিশ্রিত সংলাপ ও প্রেমের উপমা

প্রয়োগে সূর্য-কমলিনী-ভ্রমরের প্রসঙ্গ সংস্কৃত নাটকের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 'ভদ্রার্জুন' নাটকে নান্দী-প্রস্তাবনা নাই, অঙ্গে দৃশ্যবিভাগও ইংরাজী নাটকের অনুকরণ। তথাপি ইহার পয়ারে রচিত সংলাপ শ্লোকাকৃতি সংস্কৃত নাট্য সংলাপেরই অনুরূপ। সংস্কৃত নাটকের কাব্যাস্বাদও ইহাতে দুর্লভ নয়।

প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন। তিনি সংস্কৃতদক্ষ পণ্ডিত। তখনকার দিনে তৎকৃত সংস্কৃত নাটকের অনুবাদগুলি ছিল মঞ্চের অভিনেয় নাটক। অনুবাদ ছাড়া রামনারায়ণ কয়েকখানি মৌলিক নাটক রচনা করেন। তন্মধ্যে অতি বিখ্যাত—সমাজচিত্র হিসাবে 'কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক' এবং পৌরাণিক নাটক হিসাবে 'ধর্মবিজয়' নাটক। মৌলিক নাটক রচনাতেও তর্করত্ন মহাশয় সংস্কৃত নাট্যরীতিকেই অনুসরণ করিয়াছেন। 'কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকে' নান্দী ও প্রস্তাবনা আছে, কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোকের পদ্যানুবাদও আছে। উপরন্তু আছে মৃচ্ছকটিক নাটকের শ-কার চরিত্রের অনুরূপ অভব্যচন্দ্রের চরিত্র। সংস্কৃত নাটকের ভাব ও চরিত্র ক্রমে ক্রমে লেখক-মানসে কিরূপে নব নব মূর্তি পরিগ্রহ করিতেছিল, কিরূপে প্রাচীন ভাব নব নব ভাবোদ্বোধনে সহায়তা করিতেছিল, রামনারায়ণের এই নাটক তাহার নজির। এই আদর্শ স্ফুটতর হইয়াছে রামনারায়ণের মৌলিক পৌরাণিক নাটকে--বিশেষতঃ 'ধর্মবিজয়' নাটকে। 'ধর্মবিজয়' মৌলিক নাটক হইলেও উহার মূল ক্ষেমীশ্বর বিরচিত সংস্কৃত 'চণ্ডকৌশিক' নাটক। ইহা সংস্কৃত নাটকের বাংলা মানস-রূপান্তরের একটি বিশিষ্ট প্রতীক। বাংলা নাটকে সংস্কৃত নাটকের গূঢ় প্রভাবের সূচনাও এই-খানে। সংস্কৃত নাটকের ভাব লেখক-হৃদয়ের বকযন্ত্রে পরিস্রুত হইয়া বাংলা নাটকে কিভাবে নূতন রূপে, নূতন আঙ্গিকে, নূতন আধারে প্রবাহিত হইয়াছে, এই নাটক তাহার একটি দৃষ্টান্ত।

রামনারায়ণে যে আত্মীকরণের সূচনা, মধুসূদনে তাহার বিকাশ। রাঢ়-বঙ্গের 'অলীক কুনাট্য রঙ্গ'কে পরিশুদ্ধ কবিবার অভিপ্রায়ে মধুসূদন নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হন। প্রথম হইতেই তাঁহার লক্ষ্য ছিল সংস্কৃত নাট্য-রীতির শৃঙ্খল ভঙ্গ করা। গৌরদাস বসাককে লিখিত একটি পত্রে তিনি বলিতেছেন, 'It is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit.'

কিন্তু সংস্কৃত-বন্ধের প্রতি অবজ্ঞার ভাব থাকিলেও তিনি সংস্কৃত প্রভাব বর্জন করিতে পারেন নাই। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের অনুকরণে তিনি নাটককে বলিয়াছেন 'দর্শনকাব্য' [কৃষ্ণকুমারীর উৎসর্গপত্র]। বঙ্গীয় নাটকের দুর্দিন দেখিয়া তিনি শ্রদ্ধাভরে কালিদাস-ভবভূতির নামই স্মরণ করিয়াছেন ঃ

কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস কোথা তব কালিদাস
কোথা ভবভূতি মহোদয়,
অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়েবঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়। [শর্মিষ্ঠার প্রস্তাবনা]

নাটক প্রণয়ন করিতে গিয়াও তিনি কালিদাস-ভবভূতিকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। মধুসূদনের প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'। এ নাটকে নান্দী নাই, সূত্রধার ও নটীর ভূমিকাও বর্জিত হইয়াছে; কিন্তু নাট্যবৃত্ত রচনায়, ঘটনার বিন্যাসে, চরিত্র সৃষ্টিতে কালিদাস ও অন্যান্য সংস্কৃত নাটকের অমোঘ প্রভাব। উদর-রসিক বিদূষক চরিত্রটি অবিকল সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের প্রতিরূপ। প্রেম-সংঘটনের ব্যাপারেও সংস্কৃত নাটকের কৌশল। কালিদাসের প্রভাব তো আছেই, উপরন্তু আছে শ্রীহর্ষের রত্নাবলীর প্রভাব। রাজান্তঃপুরের উদ্যানে শর্মিষ্ঠার কাতরোক্তি—'তা তোমারই বা দোষ কি?' সাগরিকার শোকার্তি 'অহবা কো তুই দোসো'-এর প্রতিধ্বনি। শর্মিষ্ঠা ও দেবযানী যথাক্রমে সাগরিকা ও বাসবদত্তারই প্রতিরূপ। শর্মিষ্ঠা সাগরিকার মত মুগ্ধা ও সরলা, দেবযানী বাসবদত্তার মত কোপনা। শর্মিষ্ঠার সখী দেবিকার ভূমিকাও রত্নাবলী-সখী সুসঙ্গতার অনুরূপ। মোটের উপর শর্মিষ্ঠা নাটকের স্বাদ সংস্কৃত প্রণয়দ্বন্দ্বমূলক নাটকের স্বাদ হইতে অভিন্ন। অলংকারাঢ্য পোষাকী সংলাপ যোজনাতেও ইহা সংস্কৃত নাটকের প্রতিরূপ। এই নাটকে কয়েকটি গান আছে; তন্মধ্যে দ্বিতীয় অঙ্কের এই গানটিতে জয়দেবের 'বিহরতি হরিরিতি সরস বসন্তে' গীতের প্রতিধ্বনি লক্ষণীয়ঃ

> উদয় হইল সখী, সরস বসন্ত।
> মোদিত দশদিশ পুষ্পগণে
> আর বহিছে সমীর সুশান্ত ॥

উপসংহারে শুক্রাচার্যের এই আশীর্বাণী—'হে রাজন্, এখন আশীর্বাদ করি যে তোমরা সকলে দীর্ঘজীবী হয়ে এইরূপ পরমসুখে কালযাপন কর'—সংস্কৃত নাটকের ভরতবাক্যের অনুরূপ। 'শর্মিষ্ঠা'য় সংস্কৃতের বন্ধন অল্প নয়।

মধুসূদনের দ্বিতীয় নাটক 'পদ্মাবতী' সম্পর্কেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য। পদ্মাবতীর সূচনায় গ্রীক পুরাণকাহিনীর ছায়া আছে সত্য, কিন্তু উহাতে সুবন্ধুর বাসবদত্তা কাহিনীর ছায়াও অস্পষ্ট নয়। ইহারও নির্মাণ-শৈলীতে সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসৃত হইয়াছে। কঞ্চুকী, বিদূষক প্রভৃতি চরিত্র সংস্কৃত নাটকেরই গতানুগতিক চরিত্র। চিত্রপট দর্শনে অনুরাগ সঞ্চারের ব্যাপারে রত্নাবলী নাটকের প্রভাব আছে। কিন্তু কাহিনীসংগঠনে, দৃশ্যপরিকল্পনায় ও উক্তিসাদৃশ্যে কালিদাসের প্রভাবই সমধিক।

মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী'। এই নাটকে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব অতি স্পষ্ট। এই সময়কার একটি পত্রে রাজনারায়ণ বসুকে তিনি জানাইয়াছিলেন, 'If I should live to write other dramas, you may rest assured I shall not allow myself to be bound by the dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya Darpan. I shall look to the great dramatists of Europe for models.' 'কৃষ্ণকুমারী' এই প্রতিজ্ঞার ফল। ইহাতে মাইকেল প্রাচ্য হর্ষান্ত নাটকের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া পাশ্চাত্ত্য বিষাদান্ত নাটকের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, এবং নানাদিক হইতে সংস্কৃত নাট্যবন্ধের প্রভাবমুক্ত হইয়াছেন।

তথাপি একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, শ্রীমধুসূদন সংস্কৃত নাটকের বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই। দত্তমহাশয়ের অবচেতন মনে প্রাচ্য আদর্শ যে স্থির রেখায় মুদ্রিত হইয়াছিল, ইউরোপীয় কলা-কৌশল্য দ্বারা তাহা নূতন আকারে আকারিত হইয়াছে মাত্র। পাষাণরেখা মুছে না, মুছেও নাই। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে তিনি কালিদাসের 'আপরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্'—এই উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। ইহাদ্বারা লেখকের মানসলোকে কি ভাবতরঙ্গ খেলিতেছিল, তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়। এই নাটকে কয়েকটি চরিত্রে স্পষ্টতঃ সংস্কৃত কয়েকটি নাট্যচরিত্রের ছায়া আছে। তপস্বিনী 'কপালকুণ্ডলা' নামটি ভবভূতির মালতীমাধব নাটক হইতে সংগৃহীত। চরিত্রটি অবশ্য ভবভূতির জিঘাংসাপরায়ণা কপালকুণ্ডলার অনুরূপ নয়, কিন্তু উহাতে প্রসৃত হইয়াছে ওই নাটকেরই অপর একটি তাপসী চরিত্র 'সৌদামিনী'র স্নিগ্ধ করুণাপূর্ণ ছায়া। 'মদনিকা' নাম গৃহীত হইয়াছে মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনাসখী মদনিকার নামসাদৃশ্যে ; চরিত্রগত বিশিষ্টতাও অনেকটা মদনিকার অনুরূপ। কৃষ্ণকুমারী নাটকের 'বিলাসবতী' মৃচ্ছকটিকের বারাঙ্গনা বসন্তসেনার মতই সাধারণ পণ্যাঙ্গনার ন্যায় অর্থলুব্ধা নয়, অনুরাগিণী। ধনদাসের শাঠ্য ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা মৃচ্ছকটিকের শ-কারকে স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহাছাড়া, চিত্রফলক দর্শনে অনুরাগের উন্মেষ এবং কৃষ্ণকুমারীর স্বপ্নপ্রসঙ্গে 'আকাশে কোমল বাদ্য' প্রভৃতিতে সংস্কৃত নাটকের কয়েকটি প্রথাবদ্ধ পদ্ধতির প্রভাব বিদ্যমান। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, মধুসূদন এই নাটকে স্বীকরণের পথে কতকগুলি সংস্কৃত ভাবকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন। 'চাণক্য-শ্লোকে'র প্রভাব দেখা যায় বলেন্দ্রসিংহের এই উক্তিতে—'দূত মহাশয়, আপনি যে দেখছি, স্বয়ং চাণক্য-অবতার' [তৃতীয়াংক, ১ম গর্ভাংক]। পঞ্চতন্ত্রে আছে,

রাজানমেব সংশ্রিত্য বিদ্বান্ যাতি পরাং গতিম্।
বিনা মলয়মন্যত্র চন্দনং ন প্ররোহতি ॥ [মিত্রভেদ]

ধনদাস যেন ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছে, 'গ্রহদল রবিদের সেবা করে তাঁর প্রসাদেই তেজঃ লাভ করেন ; আমরাও রাজ-অনুচর ; তা আমরা যদি রাজপুজায় অর্থলাভ না করি, তবে আর কিসে করব ?' [প্রথমাংক, ২য় গর্ভাংক]। এই প্রসঙ্গে ধনদাস আরও বলিতেছে, 'একালে কি নিতান্ত সরল হলে কাজ চলে ? কখন বা লোকের মিথ্যাগুণ গাইতে হয়, কখন বা অহেতু দোষারোপ কত্তো হয় ; কারো বা দুটো অসত্য কথায় মনঃ রাখতে হয়, আর কারু কারু মধ্যে বা বিবাদ বাধিয়ে দিতে হয়।' এই উক্তি হিতোপদেশের 'নৃপ-নীতির' ঝংকার ঃ

সত্যাঽনৃতা চ পরুষা প্রিয়বাদিনী চ
হিংস্রা দয়ালুরপি চাঽর্থপরা বদান্যা।
নিত্যব্যয়া প্রচুররত্ন ধনাগমা চ
বারাঙ্গনেব নৃপনীতিরনেকরূপা ॥ [সুহৃদ্ভেদ]

মধুসূদনের শেষ নাটক 'মায়াকানন'ও সংস্কৃত প্রভাবযুক্ত। ইহার সংলাপে

সংস্কৃত শব্দের ভার, কাহিনীতে সংস্কৃত রম্যকথার প্রভাব। 'ইন্দুমতী' ও তৎসখী 'সুনন্দা'র নাম কালিদাস হইতে গৃহীত। তপস্বিনী 'অরুন্ধতী' সংস্কৃত নাটকের লোক-কল্যাণী তাপসী চরিত্রের প্রতিরূপ। মন্ত্রী 'চাণক্য'—নাম মুদ্রারাক্ষস নাটকের, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি ভাস বা শ্রীহর্ষের উদয়ন-কথার মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের ; এমন কি চাণক্যের এই উক্তির সহিত—'গান্ধারপতি এখন বর্ষীয়ান।...ইন্দুমতী তাঁর একমাত্র কন্যা। এঁর সহিত আমাদের মহারাজের বিবাহ হলে, কালে সিন্ধুপতি ভারতের সম্রাটপদ লাভ করবেন' [মায়া. ৩ অংক, ১ম গর্ভাংক] রত্নাবলীর যৌগন্ধরায়ণের 'যোঽস্যাঃ পাণিগ্রহণং করিষ্যতি স সার্বভৌমো রাজা ভবিষ্যতি' [৪র্থ অংক] সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহা ছাড়া এই নাটকের দ্বিতীয় অংকের তৃতীয় গর্ভাংকে ঢুলী ও বিজ্ঞাপনী-হস্ত মধুদাসের দৃশ্য ও মধুদাসের উক্তি—'(ঢুলীর প্রতি) বাজা বেটা, জোর করে বাজা'—সংস্কৃত নাটকের রাজঘোষকের অবিকল প্রতিলিপি।

মধুসূদনে সংস্কৃত নাট্যকলার বন্ধন কোন দিক হইতেই অল্প নয়। স্বীকরণের পথে ভাব গ্রহণের দৃষ্টান্তও প্রচুর। পুরাতন এযুগে এই পদ্ধতিতেই নব রূপায়ণ লাভ করিয়াছে। মধুসূদনোত্তর বাংলা নাটকে সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের এই রূপান্তরের ভিতরেই সংস্কৃতের গূঢ় প্রভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। দীনবন্ধুর নাটকেও একটি দিক হইতে এই নিগূঢ় প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ কথা বলেন সাধু সংস্কৃতে এবং নিম্নস্তরের পাত্রগণ কথা বলে চলিত প্রাকৃতে। বাংলা নাটকের নাটকীয় সংলাপে এই ভেদরেখাকে সুস্পষ্ট করিয়াছেন দীনবন্ধু মিত্র। দীনবন্ধুর নাটকে নিম্নস্তরের লোকদের মুখে গ্রাম্য কথ্য ভাষার সংকলন এবং শিক্ষিত লোকের মুখে সাধু ভাষার সংযোজন সংস্কৃত নাট্য সংলাপেরই অনুবর্তন। এই রীতির আর একটি প্রাগ্রসর অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায় পরবর্তীকালের নাটকে ও যাত্রায় আরণ্য কিরাত বা ব্যাধের মুখে, কিংবা চণ্ডালাদির ভাষণে আধভাঙ্গা হিন্দী ও বাংলার মিশ্রণে নির্মিত একটি কৃত্রিম ভাষার প্রয়োগেঃ যেমন, অমৃতলাল বসুর 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের শ্মশান-চণ্ডালের এই অতি বিখ্যাত সংলাপটি—'হামার হরিয়া রাজারে, হামার হরিয়া রাজা !' ইহা প্রাকৃত সংলাপেরই নব্য রূপ।

মধুসূদনের নাটকে সংস্কৃত ভাব ও নাট্যরীতির প্রভাব থাকিলেও, তিনিই বাংলা নাটকে ইউরোপীয় নাটকের প্রাণধর্ম সঞ্চার করিয়াছেন। শৃংখলমুক্তির এই চেষ্টায় বাংলা নাটকে ক্রমে ইউরোপীয় নাট্যাদর্শই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। মধুসূদনোত্তর বাংলা নাটক এলিজাবেথীয় নাটকের অনুবর্তী। কাহিনীর অভিনবত্বে, ঘটনার বৈচিত্র্যে ও জটিলতায়, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আবর্তে চরিত্র-প্রস্ফুটনে এবং নাটকীয় চমৎকারিত্ব সৃষ্টিতে এই যুগের নাটক শেক্সপীয়রের নাট্যাদর্শেরই প্রতিরূপ। সহরের নাট্যশালায় অভিনীত গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে পাশ্চাত্ত্য নাট্যরীতির এই অনুবর্তন লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু সহরের নাট্যশালায় অভিনীত এই নাটকগুলিতেও দুটি শাখায় সংস্কৃত নাটকের প্রভাব পড়িয়াছেঃ একটিতে প্রভাব নিতান্ত ক্ষীণ, আর একটির প্রভাব

কিঞ্চিৎ গুরুতর। একটি বাংলার ঐতিহাসিক নাটক, অপরটি পৌরাণিক নাটক। সংস্কৃতে সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটক একটি—বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস। নাটকটির বিষয় ইতিহাসের চাণক্য-রাক্ষস সংবাদ। ঐতিহাসিক পরিবেশ, তৎকালীন রাজনীতির কলা-কৌশল, ঘটনার গতি ও সংযমদৃঢ়তা নাটকখানিকে সত্যকারের ঐতিহাসিক মর্যাদা দান করিয়াছে। বাংলার ঐতিহাসিক নাটক প্রথম হইতেই [মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী] কল্পনার রঙে অনুরঞ্জিত। ঐতিহাসিক নাটকের সংযম বাংলা নাটকে রক্ষিত হয় নাই। উপরন্তু ঐতিহাসিক নাটক অবলম্বনে স্বাদেশিকতার অভীপ্সা মিটাইতে গিয়া বাঙালী নাট্যকারগণ যুগ-চেতনাকে এতটা মুখ্য করিয়া তুলিয়াছেন যে, ইতিহাসের সত্য তাহাতে একান্ত লঘু হইয়া গিয়াছে। তথাপি মুদ্রারাক্ষস নাটকের 'চাণক্য' নাম ও চরিত্র কয়েকটি নাটকে কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মধুসূদনের 'মায়াকানন' নাটকের মন্ত্রীর নাম চাণক্য, যদিও কৌটিল্য চাণক্যের কুটিলতার বিন্দুমাত্রও তাঁহাতে নাই। কৌটিল্য চাণক্যের একটু অস্পষ্ট ভূমিকা পাওয়া যাইতেছে উমেশচন্দ্র গুপ্তের 'বীরবালা' নাটকে। নাটকের বিষয় চন্দ্রগুপ্তের সহিত শিলবক্ষের (সেলুকাসের) যুদ্ধ ও শিলবক্ষকন্যার সহিত চন্দ্রগুপ্তের পরিণয়। চাণক্যের ভূমিকা এখানে গৌণ হইলেও, ঐতিহাসিক চাণক্যের বুদ্ধিমত্তার কিঞ্চিৎ আভাস ইহাতে আছে। এই কৌটিল্য চাণক্যের আর একটি ভূমিকা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বহুবিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটক 'চন্দ্রগুপ্তে'র চাণক্য। মুদ্রারাক্ষসের চাণক্যের মতই তিনি কূট, কৌশলী ও বিচক্ষণ ; পার্থক্য এই, মুদ্রার চাণক্যে দূরদর্শিতা আছে, স্বপ্নালুতা বা অধীরতা নাই—দ্বিজেন্দ্রলালের চাণক্যে আছে কবির স্বপ্ন, আর ব্যক্তিগত জীবনের একটি অতি করুণ কোমলতা।

বাংলা পৌরাণিক নাটকের প্রকৃতি সংস্কৃত নাটক হইতে স্বতন্ত্র, উহার রস-পরিণামও স্বতন্ত্র। সংস্কৃত নাটকের বিষয়বস্তু কোন কোন ক্ষেত্রে পুরাণাশ্রিত হইলেও উহার রসপরিণাম প্রধানতঃ মিলনান্ত শৃঙ্গার ; ভক্তিভাবের কথা উহাতে নাই। বাংলা পৌরাণিক নাটকের মুখ্যরস শমভাবাশ্রিত ভক্তিরস। এই রস বাংলা নাটকে প্রথম সঞ্চারিত করেন মনোমোহন বসু। বাংলার চিরপ্রচলিত নাটগীত, কীর্তন, পাঁচালি ও কথকতার প্রভাবও ইহাতে বিস্তৃত হয়। এইভাবে নাট্যরসে, গীতরসে ও অধ্যাত্মরসে বাংলা পৌরাণিক নাটকের এক স্বতন্ত্র চেহারা। কিন্তু পৌরাণিক নাটকের এই অভিনব সংগঠনে সংস্কৃত একটি নাটকের প্রভাবকে কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না, তাহা আর্য ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিক' নাটক। সংস্কৃত নাটকগুলির ভিতর এই একটি মাত্র নাটক, যাহাতে পুরাণের কাহিনী ও বিশ্বাস—ধর্ম ও অধর্মের দ্বন্দ্বে অধর্মের পরাজয়, মানব-ভাগ্যের সহিত দৈবলীলার যোগ, অপূর্ব অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ও সত্যধর্মের অপরাজেয় মাহাত্ম্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। বিঘ্নরাজ কেমন করিয়া কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন, পাপপুরুষ কেমন করিয়া দুষ্কৃতিকারীকে অভিভূত করে, ধর্ম কেমন করিয়া অধার্মিক মানুষের সহায়তা করেন—তাহার চমৎকার চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। 'চণ্ডকৌশিক'

নাটকে দৈববলের অপরাজেয় মহিমা। মনোমোহন বসু পৌরাণিক নাটকের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া এই নাটকটি দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। মনোমোহনের বহুখ্যাত পৌরাণিক নাটক 'হরিশ্চন্দ্র'। ইহার মূল উৎস 'চণ্ডকৌশিক'। এই নাটকের ঘটনা লইয়া ইহার পর রচিত হইয়াছে রামনারায়ণের মৌলিক পৌরাণিক নাটক 'ধর্মবিজয়'। বাংলা পৌরাণিক নাটকে 'চণ্ডকৌশিক' নাটকের আবেদন কোনদিনই ম্লান হইয়া যায় নাই। অনেকেই এই বিষয় লইয়া নাটক রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য রসরাজ অমৃতলাল বসুর 'হরিশ্চন্দ্র'।

বিষয়বস্তুর দিক হইতে উত্তররামচরিত নাটকখানির প্রভাবও অল্প নয়। গিরিশচন্দ্রের 'সীতার বনবাস' ও ডি. এল. রায়ের 'সীতা' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই সকল নাটকে সংস্কৃত নাটকের যে ছায়া পড়িয়াছে, তাহা নিতান্ত বস্তু-প্রতিবস্তুভাবের ছায়া। এগুলি অনুকরণ নয়, স্বীকরণ। সহরের নাটমঞ্চে স্বীকরণের পথেই সংস্কৃত নাটকের ভাব, আঙ্গিক ও ভাষা বাঙালীর ভক্তিভাবের সহিত সঙ্গত হইয়া আত্মগোপন করিয়া আছে। গিরিশচন্দ্রের 'সীতার বনবাস' বস্তুতঃ মৌলিক নাটক; ডি. এল. রায়ের 'সীতা'ও তাই। তবে বনশ্রীর বর্ণনায় উভয় নাটকেই কোথাও কোথাও ভবভূতির ধ্বনি আছে। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে বিদূষক, কঞ্চুকী প্রভৃতি চরিত্র সংস্কৃত নাটকের প্রচলিত চরিত্রগুলির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

এই তো গেল সহরের নাটমঞ্চের কথা। সংস্কৃত নাটকের প্রভাব আর এক খাতে প্রবাহিত হইয়াছে বাংলার গীতাভিনয়ে বা নূতন যাত্রায়। মনোমোহন বসুই যাত্রার উপযোগী করিয়া যাত্রানাট্য রচনার আদর্শ স্থাপন করেন। তাঁহার 'সতীনাটক' 'কুপিত কৌশিক' (হরিশ্চন্দ্র) নাটক যাত্রার দলেও অভিনীত হইয়াছিল। নাটকীয় ঢংয়ে লেখা যাত্রাকে খোলা আসরে অভিনয় করাব ব্যাপারে উমেশচন্দ্র মিত্রও ছিলেন অগ্রণী। তাঁহার 'সীতার বনবাস' (বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাসের নাট্যরূপ) শখের যাত্রায় অভিনীত হয়। এই সূত্রে সংস্কৃত নাটকের বিষয়, ভাব, সুদীর্ঘ কাব্যময় ভাষণ এবং বিদূষকাদি চরিত্র বাংলা যাত্রাতেও স্থান লাভ করে। বাংলা যাত্রার অন্যতম বিশিষ্টতা অলৌকিক আশ্চর্য ঘটনার সমাবেশ, যুদ্ধের ঘনঘটা এবং বীররসের নামে রৌদ্ররসের প্রাচুর্য। ইহাদের ভিতর সংস্কৃত নাটকেব প্রভাব আবিষ্কার করা দুরূহ নয়। বাংলা যাত্রার স্বগতোক্তি ও সুদীর্ঘ বর্ণনাবহুল সংলাপ সংস্কৃত নাটকের বর্ণনাত্মক সংলাপকে স্মরণ করাইয়া দেয়। বীররসের নামে রৌদ্ররসের বিস্তারে ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার নাটকের প্রভাব আছে। যাত্রার ভাঁড়ামিতে সংস্কৃত উদরসর্বস্ব বটু বিদূষকের ভূমিকা তুচ্ছ নয়। অধিকাংশ যাত্রার পরিণাম হর্ষান্ত অর্থাৎ ভক্তিরসাত্মক শান্তি; ইহাও সংস্কৃত মিলনান্ত নাট্যাদর্শের প্রভাব। তাহা ছাড়া কয়েকটি পালার বিষয়ও সংস্কৃত নাটকের বিষয়। যথা উপরিউক্ত 'সীতার বনবাস' বা 'হরিশ্চন্দ্র' পালা। কিন্তু এই পালাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূল নাটকের ছায়ার ছায়া। নাটকে যে সাদৃশ্য বস্তু-প্রতিবস্তুভাবের, যাত্রায় তাহা বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবাত্মক। উদাহরণ স্বরূপ অমৃতলাল বসুর 'হরিশ্চন্দ্র' নাটক ও ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের 'শ্মশানে

মিলন' (হরিশ্চন্দ্র) যাত্রাপালার উল্লেখ করা যাইতে পারে। অমৃতলালের হরিশ্চন্দ্রে কতিপয় নূতন বিষয় সংযোজিত হইলেও মূলের বিষয়, চরিত্র ও রসের স্বাদ অলভ্য নয়, কিন্তু ফণিভূষণের 'শ্মশান মিলন' মূল হইতে বহুদূরে অপসারিত।

৬. বাংলার গল্প-উপন্যাস ও সংস্কৃত কথাসাহিত্য

ঊনবিংশ শতাব্দী বাঙালীর নব জাগরণের যুগ। ইংরাজি সাহিত্যের মাধ্যমে এই যুগে বিশ্বসাহিত্যের সহিত যোগাযোগ ঘটায় নানাদিক হইতে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এই সমৃদ্ধির একদিক বাংলার নূতন কথাসাহিত্য, বিশেষতঃ গল্প ও উপন্যাস। এই গল্প-উপন্যাস নূতন—ইহার বিষয়বস্তু নূতন, ইহার আঙ্গিক নূতন। কিন্তু এই নবন্যাসের যুগেও বাংলা কথাসাহিত্য সম্পূর্ণরূপে প্রাচীন কথা-সাহিত্যের সহিত যোগসূত্র হারাইয়া ফেলে নাই, বরং প্রাচীন সংস্কারের সূত্র ধরিয়াই উহা নূতনত্বের পথে অগ্রসর হইয়াছে।

এই নূতন যাত্রায় প্রাচীন সাহিত্যের সহিত যোগাযোগ রক্ষিত হইয়াছে কয়েকটি দিক হইতে : (১) সংস্কৃত কথাসাহিত্যের অনুবাদে, (২) প্রাচীন কথাসাহিত্যের অনুকরণে নূতন সাহিত্য সৃষ্টিতে এবং (৩) নূতন গল্প-উপন্যাস রচনায় ভাবানুষঙ্গে সংস্কৃত রসসাহিত্যের স্মরণে ও স্বীকরণে।

নব্য যুগের কথাসাহিত্যকে দুইভাগে ভাগ করা যায় ; ইহার এক ভাগে পড়ে শিশুসাহিত্য, আর এক ভাগে পড়ে বর্ষীয়ান্ পাঠকের উপযোগী গল্প-উপন্যাস।

॥ শিশুসাহিত্য ॥

বহু প্রাচীনকাল হইতে বাংলায় যে শিশুসাহিত্য প্রচলিত আছে, তাহা উপকথা, নীতিকথা ও রূপকথা নামে পরিচিত। এই ধরনের কথাসাহিত্য একটি বিশেষ দেশের বিশিষ্ট জলবায়ু, জাতীয় চরিত্র ও আশা-কামনার কথা লইয়াই গড়িয়া উঠে। বালক ও কিশোর দেশের ভাবী প্রতিনিধি। একটি দেশের শিশুসাহিত্যে সেই প্রতিনিধিত্বের ভিত্তি গড়িয়া দেওয়া হয়। শিশুর মনোরঞ্জন ছলে শিক্ষার বীজও বপন করা হয়। বাংলার শিশুসাহিত্যের প্রকৃতি বিশ্ব শিশুসাহিত্যের এই সাধারণ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র নয়।

বাংলায় যে বিচিত্র শিশুসাহিত্য প্রচলিত ছিল, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তাহার নিদর্শন রক্ষিত হয় নাই। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে দুরন্ত শিশু শ্রীমন্তকে সান্ত্বনা দিবার জন্য খুল্লনা একটি ছড়া কাটিয়াছেন,

আয় আয়রে বাছা আয়।
কি লাগিয়া কান্দে বাছা কি ধন চায় ॥
আনিব তুলিয়া গগন ফুল।
একৈক ফুলের লক্ষৈক মূল ॥

সে ফুলে গাঁথিয়া পরাব হার।
সোনার বাছা কেঁদনা আর॥
রথ গজ ঘোড়া যৌতুক দিয়া।
রাজার দুহিতা করাব বিয়া॥

এই ছড়ায় বাংলা রূপকথা ও শিশুসাহিত্যের প্রকৃতি আভাসিত হইয়াছে। এই ধরনের রূপকথার সংকলন করিয়াছেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার তাঁহার 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' ও 'ঠাকুমার ঝুলি'তে। মধুমালা, কাঞ্চনমালা প্রভৃতির কাহিনী বহুবিখ্যাত। এই সকল কাহিনীতে রাজপুত্রদের দুঃসাহসিক অভিযান, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ন্যাসীর অনুগ্রহ লাভ প্রভৃতি অলৌকিক, স্বপ্নরঙীন, চমৎকার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। রাক্ষস-খোক্কসের কাহিনীও ইহাদের সহিত জড়িত। এই রূপকথাগুলির সহিত সংস্কৃত কথাসাহিত্যের একটি ক্ষীণ যোগাযোগ আছে। পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বেতালপঞ্চবিংশতি, কথাসরিৎসাগর; সুবন্ধুর বাসবদত্তা, বাণভট্টের কাদম্বরী, দণ্ডীর দশকুমারচরিত ও শুকসপ্ততির বহু গল্পে রাজপুত্রদের প্রেম ও বীরত্বের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বাংলার রূপকথার রাজপুত্র-রাজকন্যার মিলন-কাহিনীর সহিত হিতোপদেশের সাগরকন্যা রত্নমঞ্জরী ও সিংহলরাজপুত্র কন্দর্পকেতুর কাহিনীর [সুহৃদ্ভেদ] স্পষ্ট যোগাযোগ লক্ষিত হয়। কতকগুলি গল্পে রাজপুত্র ও রাজকন্যার পাষাণে পরিণত হওয়ার কথা পাওয়া যায়ঃ মনে হয়, এই পাষাণে পরিণত হওয়ার বিষয়টি গৃহীত হইয়াছে সুবন্ধুর বাসবদত্তা ও শুকসপ্ততির গল্পাবলী হইতে। রাক্ষসের প্রসঙ্গ পাওয়া যাইতেছে পঞ্চতন্ত্রের অপরীক্ষিতকারক-এর কয়েকটি গল্পে। সংস্কৃত কথাসাহিত্যের শুকপক্ষীর প্রসঙ্গ পাওয়া যায় কাঞ্চনমালার গল্পে। কয়েকটি বিষয়ে বাংলা রূপকথা একটু স্বতন্ত্রঃ সংস্কৃত কথায় আশ্চর্য-অলৌকিক কথার সমাবেশ থাকিলেও মাটির পৃথিবীর সহিত ইহাদের রক্তমাংসের যোগ বিচ্ছিন্ন নয়—বাংলা রূপকথার কাহিনী যেন কল্পলোকের রঙীন স্বপ্ন। মেঘলোক আর পাতালপুরী, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, পক্ষীরাজ ঘোড়া সব মিলিয়া ইহা একটি স্বপ্নিল মায়ালোক সৃষ্টি করে। নারীর প্রেমচিত্রাঙ্কনে সংস্কৃত কথাসাহিত্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তির্যক কামনার দিকটিই উদ্ঘাটিত হইয়াছেঃ বাংলা রূপকথায় পাই সতীনারীর ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়-কোমল মাধুর্যের সংবাদ। এদিক হইতে বাংলা রূপকথার নারীপ্রেম বাণভট্টের মহাশ্বেতা ও কাদম্বরীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। স্বপ্নে দর্শন করিয়া নায়ক-নায়িকার প্রণয়োন্মেষের সহিত [মধুমালার কাহিনী] সুবন্ধুর বাসবদত্তা-কন্দর্পকেতু কাহিনীর সাদৃশ্য আছে। বাংলা রূপকথার গঠনশৈলীও সংস্কৃত পদ্য-গদ্যময় চম্পূকাব্যের অনুরূপ।

বাংলাদেশে শিশুশিক্ষার একটি অঙ্গ ছিল, হিতোপদেশের পঠন-পাঠন। কবিকঙ্কণের শ্রীমন্তও হিতোপদেশের কথা পাঠ করিয়াছে। এই হিতোপদেশের প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায় বাংলায় প্রচলিত উপকথাগুলির মধ্যে: বাংলার শিয়ালপণ্ডিত সংস্কৃত শিশুসাহিত্যের ধূর্ত শৃগাল হইতে অভিন্ন। এখানেও সিংহ পশুগণের

রাজা। সংস্কৃত কথাসাহিত্যে সিংহ ও ব্যাঘ্র অনেক সময় ইতর প্রাণীর হস্তে জব্দ হইয়াছেন ; বাংলা উপকথায় বাঘ জব্দ ভোম্বলদাস নামক এক কাল্পনিক জীবের কাছে ঃ

সিংহীর মামা ভোম্বলদাস,
বাঘ মেরেছে গণ্ডা দশ।

সংস্কৃত কথাসাহিত্যে ক্ষুদ্র জন্তু বা পাখীর তীক্ষ্ন বুদ্ধির অনেক গল্প পাওয়া যায়। 'পশ্য সিংহো মদোন্মত্তঃ শশকেন নিপাতিতঃ', 'কাক্যা কনকসূত্রেণ কৃষ্ণসর্পো নিপাতিতঃ' [হিত. সুহৃদ্ভেদ] ; বাংলায় অনুরূপ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে ক্ষুদ্র চড়ুই পাখী ; কৌশলে সে লোভী কাককে শুধু নিরস্ত করে নাই, তাহার চঞ্চুপুট দগ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। ক্ষুদ্র টুনটুনি পাখীর কৌশলে সাতরাণীর নাক কাটা গিয়াছে।

ইহা ছাড়া ব্রাহ্মণের বোকামি, তাঁতির নির্বুদ্ধিতা, নাপিতের ধূর্ততা এবং মন্ত্র প্রভাবে অলৌকিক সিদ্ধি অর্জন প্রভৃতির সহিত সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের কতকগুলি কাহিনীর সাদৃশ্য আছে। বাংলার রসকথা ব্রাহ্মণ ও সোনার কাঁকণের গল্পের সহিত পঞ্চতন্ত্রের মন্থরক কৌলিক কাহিনীর মিল দেখা যায়। [পঞ্চতন্ত্র. অপরীক্ষিতকারক]। হিতোপদেশের নীতিশ্লোকের স্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে শিশুশিক্ষার জন্য রচিত নীতিমূলক কবিতাবলীর ভিতর। বাংলার নীতি কবিতা সংস্কৃত চাণক্য শ্লোক, নীতি শ্লোক, দৃষ্টান্তশতক প্রভৃতির নির্যাস লইয়া রচিত। ঈশ্বরগুপ্তের নীতিকবিতা, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সদ্ভাবশতক, রজনীকান্ত সেনের নীতি কবিতাবলী, এমন কি রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

নব্যযুগে নূতন করিয়া সংস্কৃত কথাসাহিত্য অনূদিত হয় ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার হিতোপদেশ ও দ্বাত্রিংশপুত্তলিকার অনুবাদ করেন। গোলোকনাথ শর্মাও হিতোপদেশের অনুবাদ করেন। স্কুল বুক সোসাইটি হইতেও বহু গ্রন্থ অনূদিত হয়। কিন্তু এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব সংস্কৃত কলেজ গোষ্ঠীর। এই কলেজ গোষ্ঠীর ভিতর অগ্রগণ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি বেতাল পঞ্চবিংশতির অনুবাদ করেন। আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের 'বৃহৎকথা'র অনুবাদও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এইভাবে অনুবাদের মাধ্যমে সংস্কৃত কথাসাহিত্যের স্বাদ নূতন করিয়া বিস্তার লাভ করে এবং মৌলিক ভাবে যাঁহারা শিশুসাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হন, সংস্কৃত মূল ও অনুবাদ তাঁহাদিগের কল্পনাকে উদ্বোধিত করে।

নব্যযুগে মৌলিক শিশুসাহিত্য রচনায় যাঁহারা হস্তক্ষেপ করেন, তাঁহাদের সকলেরই সংস্কৃত বনিয়াদ পাকা। বিদ্যাসাগরের বোধোদয় ও আখ্যানমঞ্জরী এবং মদনমোহন তর্কালংকারের 'শিশুশিক্ষা' উল্লেখ্য সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠের (Entertaining lessons) নামও স্মরণীয়। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতিও শিশুপাঠ্য কবিতা রচনা করেন। এই সকল রচনায় সংস্কৃতের ধ্বনি অস্পষ্ট নয়।

এই সময় বিদেশী গল্পসাহিত্যের অনুবাদও প্রচুর হয়। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, বিদেশী গল্পের রচনাদর্শেও সংস্কৃতের ছক লঙ্ঘিত হয় নাই। অনুবাদগুলি স্বচ্ছন্দ অনুবাদ হওয়ায় সংস্কৃত কথাসাহিত্যের উদ্দাম কল্পনা ও আজগুবি পরিবেশ প্রকারান্তরে তাহাতে প্রচ্ছন্ন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।[১] এমন কি যাঁহারা স্বাধীনভাবে শিশুসাহিত্য রচনায় অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারাও সংস্কৃত কথা-সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় হরিনাথ মজুমদারের 'বিজয়-বসন্ত' আখ্যান। প্রচলিত লোক-কথার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইলেও উহা একটি স্বাধীন রচনা। ডঃ আশা দেবী বলেন, 'লোককথার উপর নির্ভরশীল হইলেও ইহাই প্রথম শিশুসাহিত্যে খাঁটি দেশজ মৃত্তিকাসম্ভব উপন্যাস'।[২] এই গ্রন্থখানি রচনার উদ্দেশ্য 'বালকগণের চিত্তরঞ্জন ও নীতিশিক্ষা' [ভূমিকা—বিজয়-বসন্ত]; সংস্কৃত হিতকথা প্রণয়নেরও এই একই উদ্দেশ্য 'কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে' [হিত. অবতরণিকা]। বিজয়-বসন্তের কাহিনীটিও শৃঙ্গী মুনির পিতা কর্তৃক একটি উপদেশের দৃষ্টান্তছলে বর্ণিত হইয়াছে। উদ্দেশ্যে ও প্রকারে ইহা সংস্কৃত হিতোপদেশের অনুরূপ।

॥ বাংলা গল্প-উপন্যাস ॥

নব যুগের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষালব্ধ মননের ফল বাংলার গল্প-উপন্যাস। রূপকথায় দেখি, 'সাত সমুদ্র তের নদীর' পারে রাজকন্যা ঘুমাইয়া ছিলেন, পৈথানের সোনার কাঠি শিয়রে অদল-বদল করিয়া রাজপুত্র তাঁহার ঘুম ভাঙ্গাইলেন। সে রাজকন্যার কাহিনী বাংলার কথাসাহিত্যের সুপ্তিভঙ্গ করিতে পারে নাই। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলে 'সাত সমুদ্র তের নদী'র ওপার হইতে যে তরঙ্গ আসিল, তাহাতে বাংলা কথাসাহিত্যের আমূল পরিবর্তন ঘটিল। রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব কবিত্বময় ভাষায় সেই সুপ্তিভঙ্গের বর্ণনা দিতেছেনঃ 'কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি—কোথায় গেল সেই 'বিজয়বসন্ত', সেই 'গোলেবকাওলি', সেই বালকভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য !' [আধুনিক সাহিত্য]

একথা ঠিক যে নব্য যুগের গল্প-উপন্যাস এক নূতন সৃষ্টি এবং বঙ্কিমচন্দ্র হইতেই তাহার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠার মূলে পূর্ববর্তী কথাসাহিত্যের প্রভাব যে বিন্দুমাত্র পড়ে নাই, তাহা বলা চলে না। অরুণোদয়ের পূর্বে ঊষার শুক্লদ্যুতি উদয়সূর্যের পূর্বরাগ সূচনা করে, তেমনই প্রাচীন কথাসাহিত্য বাংলার নূতন গল্প-উপন্যাসের ভূমিকা প্রস্তুত করিয়াছে।

---

১. দ্রষ্টব্য মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের হংসরূপী রাজপুত্রদিগের বিবরণ বা মনোরমা গল্প।

২. বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ—ডঃ আশা দেবী।

আমরা এখানে রূপকথার কথা বলিতেছি না। কারণ, রূপকথার প্রকৃতি নূতন গল্প-উপন্যাস হইতে একেবারেই স্বতন্ত্র। রূপকথায় থাকে অতিপ্রাকৃত পরিবেশ, অসম্ভব কল্পনা, কল্পলোকের ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, পক্ষীরাজ ঘোড়া, রাক্ষস-রাক্ষসী, মেঘকন্যা বা পাতালপুরীর রাজকন্যার কাহিনী। কিন্তু সংস্কৃত কথাসাহিত্যে বিশেষতঃ দণ্ডীর দশকুমারচরিতে বা কথাসরিৎসাগরের কতিপয় আখ্যায়িকায় এমন কতকগুলি কাহিনী আছে, যাহা ঠিক অসম্ভব অবস্তু-রাজ্যের বিষয় নয়, যাহার অভিনয়মঞ্চ এই মাটির পৃথিবী, যে পৃথিবীতে আছে প্রেম ও বীর্যের অভিযান, শক্তি ও বুদ্ধির পরীক্ষা, তির্যক কামনার কুটিল গতি, ষড়যন্ত্র, অবিশ্বাস ও হত্যা-হানাহানি।

আধুনিক গল্প-উপন্যাসের মহামহোৎসবের অব্যবহিত পূর্বে এই ধরনের গল্প-কাহিনী অর্থাৎ সংস্কৃত কথাসাহিত্যের আদিরসাত্মক বীরত্ব ও অভিযানের কাহিনী বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল,—কোথাও অনুবাদের আকারে, কোথাও বা স্বাধীন রচনা হিসাবে। জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পারিজাতবিকাশ' গ্রন্থটির নাম করা যাইতে পারে। ইহা চন্দ্রাদিত্য নামক রাজার নিকট শুকপক্ষী বর্ণিত একটি কাহিনী। বিজ্ঞাপনে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, 'এই গ্রন্থ কোন আদর্শ অবলম্বন করিয়া রচিত হয় নাই; ইহার স্থানে স্থানে প্রাচীন ভাব ও প্রাচীন প্রণালী পরিগৃহীত হইয়াছে।' কাহিনীটির গঠনপদ্ধতি ও বর্ণনা বাণভট্টের কাদম্বরীর অনুরূপ। ইহা সংস্কৃত প্রেম ও অভিযান কাহিনীরই একটি কপোল-কল্পিত স্বাধীন প্রতিলিপি। নব্য বাংলার গল্প-উপন্যাস বিদেশীয় প্রভাবে গঠিত হইলেও প্রথমদিকে উহার পশ্চাতে এই সকল আখ্যায়িকার প্রভাব ছিল না।

॥ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সংস্কৃতসাহিত্যের ছায়া ॥

ঊনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলীর কয়েকটি দিক আলোচনা করিয়া নব্য বাংলার গল্প-উপন্যাসে কিভাবে প্রাচীন কথাসাহিত্যের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে।

নূতন বাংলা গল্প-উপন্যাস যখন লেখা আরম্ভ হইতেছে, তখন ইংরাজি সংস্পর্শের মোহময় নব রোমাঞ্চ অপগত হইয়াছে। বাঙালীর চিত্তে তখন ঘরমুখী হইবার প্রেরণা, তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবের মেলবন্ধনের তাগিদ। নূতন শিক্ষালাভে তখন স্বাজাত্যবোধ উদ্দীপ্ত হওয়ায় সাক্ষাৎভাবে পাশ্চাত্ত্য ভাবগ্রহণে দ্বিধাও যে না জাগিয়াছে এমন নয়। উপরন্তু তখন নব হিন্দুত্বের পুনর্জাগরণের সাড়াও জাগ্রত হইয়াছে। এই অবস্থায় বাংলাসাহিত্যের আসরে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পুরাপুরি পাশ্চাত্ত্য প্রভাব কল্পনার তেমন সুযোগ নাই। উহাতে প্রাচীন দীপ্তিও অনুসন্ধান করিতে হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজি শিক্ষায় পরিপুষ্ট হইলেও, তাঁহার মানস-গঠনে হিন্দুত্বের

আদর্শ একটি প্রধান উপকরণ। সংস্কৃত রসসাহিত্যের সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গ যোগাযোগ ছিল।[১] 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে দেখা যায়, নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীর সহিত যে গৃহে বাস করিতেন, তাহা শিল্পকুশল চিত্রকর দ্বারা অঙ্কিত কতকগুলি চিত্রে সজ্জিত। এই চিত্রের অধিকাংশ বিষয় গৃহীত হইয়াছে সংস্কৃত রসসাহিত্য হইতে। শকুন্তলার পূর্বরাগ, মহাদেবের চরণে প্রণতা কুসুমাভরণে সজ্জিতা পার্বতীর চিত্র, বিমানপথে সাগরের উপর দিয়া রাম-সীতার স্বদেশ যাত্রা এবং লতার উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগের সংকল্পে উন্মুখী রত্নাবলী প্রভৃতির উল্লেখদ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত অতি নিবিড় রস-যোগের পরিচয় দিয়াছেন। শকুন্তলার সহিত ইংরাজি সাহিত্যের মিরাণ্ডা ও দেসদেমোনার তুলনামূলক আলোচনা, জয়দেবের কবিত্বসমালোচনা এবং ভবভূতির উত্তরবামচরিতের রস-বিচার বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্কৃত-সাহিত্যজ্ঞানের গভীরতার প্রমাণ। উপরন্তু কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে কতকগুলি পরিচ্ছেদের সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ভাবানুষঙ্গে রঘুবংশ, রত্নাবলী, শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, উদ্ধবদূত হইতে শ্লোকাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাদ্বারা উপন্যাসের ঘটনা উদ্ভাবনে, চরিত্রসৃষ্টিতে কিংবা ভাবপরিকল্পনায় যে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবে উদ্বোধিত হইয়াছেন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলী হইতে দৃষ্টান্ত লইয়া দেখানো যাইতে পারে তাঁহার উপর সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব কোন ক্রমেই অল্প ছিল না ঃ—

১. বঙ্কিমচন্দ্র যে উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, তাহাদের সবগুলিই রোমান্স বা রম্যকথা। কল্পনার সমৃদ্ধি, সুন্দর ও বিস্ময়কর ঘটনার প্রতি মোহময় আকর্ষণ, চিত্ত-চমৎকারী দৃশ্যের অবতারণা স্বভাবতই সংস্কৃত রম্যকথার বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়। সংস্কৃত রম্যকথায় এই বাস্তব জগতের পরিবেশেই একটি মায়ার জগৎ সৃষ্টি করা হইয়াছে। নির্জন অরণ্য বা কোন ভগ্নমন্দিরে নায়ক-নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎ [কাদম্বরী ঃ মহাশ্বেতার বৃত্তান্ত বা কথাসরিৎসাগর ঃ পুষ্পদন্তের কাহিনী] সংস্কৃত কথাগুলির একটি চিরাগত রীতি। দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে ঝটিকাসংকুল পরিবেশে শৈলেশ্বরের মন্দিরে জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার প্রথম সাক্ষাৎ, কিংবা 'গম্ভীর নাদী বারিধি তীরে সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে' নবকুমারের অপূর্ব রমণীমূর্তি কপালকুণ্ডলার প্রথম দর্শন, কিংবা যুদ্ধের বিভীষিকায় পূর্ণ পর্বতবন্ধ্রে বিশাল-লোচনা সহাস্যবদনা চঞ্চলকুমারীর সহিত রাজসিংহের সাক্ষাৎ—পাঠকচিত্তকে সংস্কৃত রম্যকথার রাজ্যে পৌঁছাইয়া দেয়।

---

১. 'বঙ্কিমচন্দ্র কলেজে কোথাও সংস্কৃত পড়েন নাই—ভাটপাড়ার পণ্ডিতদের সাহায্যে বাড়ীতেই সংস্কৃত পড়িয়া ব্যুৎপন্ন হন।'—সাহিত্যসাধকচরিতমালা ২২. [কলেজে সংস্কৃত না পড়িলেও বঙ্কিমচন্দ্রকে পাঠ্য হিসাবে স্কুল-কলেজে বেতালপঞ্চবিংশতি, বত্রিশসিংহাসন, পুরুষপরীক্ষা প্রভৃতির বঙ্গানুবাদ পাঠ করিতে হইয়াছে]।

২. সংস্কৃত সাহিত্যে সাধক-সন্ন্যাসীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দৃষ্ট হয়ঃ তাঁহারা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন—কেহ যোগী, কেহ বামাচারী কাপালিক, কেহ বা ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা জ্যোতিষী [যেমন বেতাল পঞ্চবিংশতির উপক্রমণিকার যোগী তপস্বী কিংবা পঞ্চতন্ত্র অপরীক্ষিতকারকের অন্তর্গত সিদ্ধাচার্য ভৈরবানন্দ, কিংবা মালতী-মাধব নাটকের কাপালিক অঘোরঘণ্ট প্রভৃতি]। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসে সন্ন্যাসীর অমোঘ প্রভাব। দুর্গেশনন্দিনীর অভিরাম স্বামী, কপালকুণ্ডলার অঘোরঘণ্ট, মৃণালিনীর মাধবাচার্য, চন্দ্রশেখরের রমানন্দস্বামী, দেবীচৌধুরাণীর ভবানী পাঠক, সীতারামের গঙ্গাধর স্বামী প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। এই সকল সন্ন্যাসীর প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র সেই প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্মচিন্তা, যোগবল, মন্ত্র-প্রভাব ও অদৃষ্টবাদকে নূতন যুগের পরিবেশে নূতন করিয়া স্থাপন করিয়াছেন। সন্ন্যাসী প্রসঙ্গে রম্যকথার রহস্যময়তাও ঘনীভূত হইয়াছে। বাস্তব জগতের হাসি-কান্নার পালার মধ্যে অবস্তুজগতের এই অস্পষ্ট রশ্মিপাতে নিয়তির অলক্ষ্য অমোঘ বিধানে হৃদয় আচ্ছন্ন হয়।

৩. সংস্কৃত রম্যকাহিনীগুলির আর এক আকর্ষণ প্রকৃতির বর্ণনা। বঙ্কিম-উপন্যাসে এই প্রকৃতিবর্ণনা একটি মুখ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই প্রকৃতিচিত্র উপনিষদের আরণ্যক প্রকৃতি হইতে গৃহীত হয় নাই, ইহা বঙ্কিম মানসমুকুরে প্রতিফলিত হইয়াছে সংস্কৃত রস-সাহিত্য হইতে। কালিদাসের কণ্ব-তপোবন, রঘুবংশ-কুমারসম্ভবের বন-বর্ণনা, উত্তররামচরিতের পঞ্চবটী-সম্পদ এবং কথাসাহিত্যের অপূর্ব বন-শ্রীর প্রতিচ্ছবি বঙ্কিমচন্দ্রের অরণ্য-আলেখ্য। রঘুবংশের 'তমালতালী-বনরাজিনীলার'ই প্রতিলিপি, 'কাননকুন্তলা ধরণী,' 'আভূমি প্রণতা শ্যামলতা' [কপালকুণ্ডলা]। আনন্দমঠের 'আনন্দময় কানন'—'শ্যামল শোভাময় বৃক্ষ'—শস্যশ্যামল দেশজননীর 'ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদলশোভিনী' অপরূপ মূর্তি—দেবী-চৌধুরাণীর জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথে বর্ষার ত্রিস্রোতার সেই অপূর্ব বর্ণনা—সীতারাম-উপন্যাসে ললিতগিরির মনোহরণ প্রকৃতি-শ্রী—রাজসিংহ উপন্যাসের শিলাময় কঠিন পার্বত্য রন্ধ্রপথ আমাদের মনকে সেই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রকৃতিবর্ণনাবহুল রাজ্যে টানিয়া লইয়া যায়।

৪. শুধু প্রকৃতিবর্ণনায় নয় রমণীর রূপবর্ণনাতেও বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচ্যপন্থী। প্রথমদিকের উপন্যাসগুলিতে—দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনীতে—যে রূপবর্ণনা পাওয়া যায়, সংস্কৃতসাহিত্যের রূপবর্ণনার সহিত তাহার স্থানে স্থানে আক্ষরিক সাদৃশ্য রহিয়াছে। কালিদাসের 'চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিত সত্ত্বযোগা রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু' বাক্যের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় প্রায় প্রত্যেকটি রূপ-বর্ণনায়। যেমন, কপালকুণ্ডলা, 'যেন চিত্রপটের উপর চিত্র'; কিংবা চঞ্চল-কুমারীর এই রূপ—'কোন মানবীকে বিধাতা দেবীর মূর্তিতে গঠিয়াছেন' [রাজসিংহ]। রূপবর্ণনার উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তিগুলিও সংস্কৃতের প্রতিরূপ। 'আশমানীর বেণীর শোভা ফণিনীর ন্যায়; ফণিনী সেই তাপে মনে ভাবিল, যদি

বেণীর কাছে পরাস্ত হইলাম, তবে আর এ দেহ লোকের কাছে লইয়া বেড়াইবার প্রয়োজনটি কি ? আমি গর্তে যাই। এই ভাবিয়া সর্প গর্তের ভিতরে গেলেন।' ইহার সহিত তুলনীয় সংস্কৃত এই শ্লোকাংশ ঃ

এনীদৃশস্তামবলোক্য বেণীং
ভোগং ভুজঙ্গাধিপতিজুগোপ ॥

আনন্দমঠের শান্তির 'বেশভূষা নাই তবু সে সৌন্দর্য সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত'—কালিদাসের 'ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী' ; জলমগ্না মূর্চ্ছিতা রোহিণীর "বিশাল দীর্ঘবিলম্বিত ঘোরকৃষ্ণ কেশরাশি জলে ঋজু—তাহা দিয়া জল ঝরিতেছে, মেঘে যেন জলবৃষ্টি করিতেছে'—ইহারই ঝংকার শুনি সংস্কৃত কবিতায় 'জলবিন্দু-ভিশ্চিকুরা রুদন্তি' ঃ রূপবর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীনপন্থী এবং প্রাচীন কবিদেব মতই স্থানে স্থানে নিরংকুশ। তিনি বলেন, 'গ্রন্থকার প্রাচীন—লিখিতে লজ্জা নাই' [দেবীচৌঃ ১.৬]

৫. বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে চরিত্রসৃষ্টিতে ও ঘটনা-উদ্ভাবনে কতকগুলি ক্ষেত্রে কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ ও জযদেবের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। দুর্গেশনন্দিনীর বিদ্যাদিগ্‌গজ কতকটা সংস্কৃত নাটকের উদরসর্বস্ব বিদূষকেব প্রতিরূপ। শকুন্তলার মাধব্য মোদকখণ্ডলোভী ঃ রাজা বলেন, তোমাকে একটি কাজে সাহায্য করিতে হইবে। বিদূষক তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠেন, 'কিং মোদঅখণ্ডিআএ' ['মোয়া খাওয়া নাকি ?']। বিদ্যাদিগ্‌গজও পেটুক ব্রাহ্মণ ঃ ভোজনের নামে সে দিগ্‌ভ্রান্ত।

কপালকুণ্ডলা নাম মালতীমাধব নাটক হইতে গৃহীত, যদিও চরিত্র-প্রকৃতিতে দুইজন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কপালকুণ্ডলা শকুন্তলার আদর্শে গঠিত ঃ 'দ্বৌ অপিঅত্র আরণ্যকৌ' [দুবে বি এত্থ আরণ্যআ'] ; কাপালিক মালতীমাধব নাটকের কাপালিক অঘোরঘণ্টেরই প্রতিমূর্তি। সংস্কৃত নাটকের অঘোরঘণ্টের অন্ধবিশ্বাস, দেবী-ভক্তি, সংস্কারাচ্ছন্নতা ও চামুণ্ডাপ্রীত্যর্থে নরবলিদানের ব্যবস্থা—কপালকুণ্ডলার কাপালিকেও দৃষ্ট হয়। অঘোরঘণ্টের সংলাপেও কিছু সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ 'কস্ত্বং', 'তিষ্ঠ', 'মামনুসর', 'কপালকুণ্ডলে !'। রঘুবংশের 'দূরাদয়শ্চক্রনিভস্ব তন্বী' শ্লোক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে সমুদ্রদর্শনে মুগ্ধ নবকুমারের মুখে। কপালকুণ্ডলার সহিত সাদৃশ্যবোধে ১.৫ পরিচ্ছেদের শীর্ষে অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীদর্শনে বিস্মিত কুশের বাক্য উদ্ধার করা হইয়াছে 'যোগ প্রভাবো ন চ লক্ষ্যতে তে' ইত্যাদি। ১.৬ পরিচ্ছেদের সূচনায় পাওয়া যায় রত্নাবলী নাটকের বন্দিনী সাগরিকার উদ্দেশ্যে রাজার এই উক্তি 'কথং নিগড়সংযতাসি দ্রুতং নয়ামি ভবতীমিতঃ' [উক্তিটিতে কপালকুণ্ডলার মনোভাব আভাসিত হইয়াছে ; তিনি বন্দী নবকুমারকে কঠিন লতাবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছেন]। ১.৯ পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছে পতিগৃহে গমনোদ্যতা অশ্রু-উচ্ছ্বসিতা শকুন্তলার প্রতি কণ্বের উপদেশ, 'অলংরুদিতেন' ইত্যাদি [এখানে অধিকারী যেন দ্বিতীয় কণ্ব, বনদুহিতা কপালকুণ্ডলা দ্বিতীয়া শকুন্তলা]। ২.৫ পরিচ্ছেদের শীর্ষে পাই মেঘদূতের বিরহী যক্ষের উক্তি 'শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে' ইত্যাদি

[কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের উচ্ছ্বসিত প্রেম যক্ষের প্রণয়েরই মত ; নিষ্প্রয়োজনে তিনি কপালকুণ্ডলার কাছে আসিতেন, যেমন যক্ষ উচ্চৈস্বরে যে কথা বলা যায়, এমন কথাও প্রিয়ার আননস্পর্শের লোভে কাছে আসিয়া কানে কানে বলিতে উৎসুক হইতেন]। ২.৬ এ পাই কুমারসম্ভবের তপোনিরতা পার্বতীর প্রতি জটিলবটুর বাক্য 'কিমিত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে' ইত্যাদি [পার্বতী যৌবনে আভরণত্যাগ করিয়া বল্কলধারণ করিয়াছিলেন, কপালকুণ্ডলাও গৃহিণী হইয়া যোগিনী]। ৩.১ এর উদ্ধৃতি রত্নাবলীর যৌগন্ধরায়ণ-বাক্য 'কণ্ঠোহয়ং খলুভৃত্যভাবঃ' [লুৎফ-উন্নিসারও অনুরূপ মনোভাব ; মেহেরউন্নিসার দাসীত্ব তিনি কি করিয়া করিবেন ! 'যদি স্বাধীনতা ত্যাগ করিতে হইল, তবে বাল্যসখী মেহেরউন্নিসার দাসীত্বে কি সুখ ?']। ৫.৬ এ পাই কুমারসম্ভবের 'তদ্‌গচ্ছ সিদ্ধ্যৈ কুরু দেবকার্যম্‌' [ইন্দ্র এই কথা বলিয়া মদনকে মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে আদেশ করিতেছেন ঃ কাপালিকও দেবকার্যে সহায়তা করিবার জন্য নবকুমারকে প্ররোচিত করিতেছেন]। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদেও [৪.৯] রঘুবংশের 'বপুষা করণোজ্‌ঝিতেন সা' শ্লোকের উদ্ধৃতি [অচৈতন্য দেহে ইন্দুমতী ভূতলে পতিত হইলেন এবং অজকেও ভূতলে পাতিত করিলেন ; ইহার সহিত গভীর সাদৃশ্য রহিয়াছে কপালকুণ্ডলার পশ্চাতে নবকুমারের সাগর-নিমজ্জনে—কপালকুণ্ডলা নদীপ্রবাহে নিমজ্জিত হইলেন, নবকুমারও তৎপশ্চাৎ লম্ফ দিয়া জলে পড়িলেন]।

ভাবানুষঙ্গে সংস্কৃত ভাবের স্মরণ মাত্র নয়, কল্পনার চাতুর্যে, আলো-আঁধারি রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টিতে এবং বর্ণনার চমৎকারিত্বে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা সংস্কৃত রম্যকথারই অভিনব সংস্করণ।[১]

রচনা হিসাবে মৃণালিনী কপালকুণ্ডলা হইতে নিকৃষ্ট। ইহাতেও সংস্কৃত কথাসাহিত্যের প্রভাব বিদ্যমান। জ্যোতিষে বিশ্বাস সংস্কৃত কথার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। মৃণালিনীতে এই বিশ্বাসের উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। মনোরমা স্বামীর সহিত সহমরণে যাইবে, এই গণনা এখানে সফল হইয়াছে। কথাসাহিত্যের 'শ্বেতাম্বর পরিধায়িনী দিব্য নারীমূর্তি' [গুণাঢ্যের উপাখ্যান, কথা-সরিৎসাগর] 'শ্বেতবসনা সুন্দরী' মনোরমাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সংস্কৃত কথাসাহিত্যে ও

১. বিষয়বস্তুর দিক হইতেও কপালকুণ্ডলা-কাহিনীর সহিত সংস্কৃত কথাসাহিত্যের মিল দেখা যায়। দেবীর নিকট বধার্থ কাপালিক কর্তৃক নবকুমারের বন্ধন এবং কাপালিক প্রতিপালিতা কপালকুণ্ডলা কর্তৃক নবকুমারের প্রাণরক্ষা এবং অধিকারীর আগ্রহে নবকুমারের সহিত কপালকুণ্ডলার বিবাহ—এই ঘটনাগুলির সহিত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় কথাসরিৎসাগরের দশমতরঙ্গের শ্রীদত্ত-ব্যাধকন্যা কাহিনীর। শ্রীদত্ত ব্যাধগণ কর্তৃক শৃঙ্খলিত হন এবং ব্যাধেরা চণ্ডিকার সম্মুখে তাঁহার বলিদানের উদ্যোগ করে ; কিন্তু ব্যাধকন্যা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় শ্রীদত্ত গোপনে অন্তঃপুরে নীত হন এবং কন্যার মাতা শ্রীদত্তের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া তাহার পলায়নে সাহায্য করেন [কথাসরিৎ. ১০ম তরঙ্গ]

-নাটকে কল্যাণ-মৈত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিতা এক ধরনের পরিব্রাজিকা নারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, মৃণালিনীর বৈষ্ণবী গিরিজায়া অনেকটা সেই প্রকৃতির। সংস্কৃত সাহিত্যের সখীভাবেরও বিকাশ দেখা যায় গিরিজায়ায়।

বিষবৃক্ষ উপন্যাসেও এই প্রভাব রহিয়াছে। বিষবৃক্ষ সামাজিক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের অতীতচারী মন এখানে সমাজ-সংসারের কোঠায় নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু যে পরিবেশে কুন্দনন্দিনীর সহিত নগেন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে, যেভাবে তাঁহার মনে কুন্দনন্দিনীর সহিত প্রণয় জন্মিয়াছে—তাহা রম্যকথালোকের সামগ্রী। সূর্যমুখীর দেহত্যাগ, স্তিমিত প্রদীপে নগেন্দ্রনাথের সূর্যমুখীর ছায়া-মূর্তিদর্শন, বিষপানে কুন্দের আত্মহত্যা, হীরার তীব্র প্রতিহিংসাপরায়ণতা—সবই যেন কল্পনার অতিরঞ্জন। সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত স্পষ্ট যোগ লক্ষ্য করা যায় জয়দেবের 'স্মরগরলখণ্ডনং' গীতের উল্লেখে। গৃহের প্রাচীর-গাত্রে লম্বিত সূর্যমুখীর স্মৃতি-বিজড়িত চিত্রগুলিও সংস্কৃত রস-সাহিত্যের সহিত নিবিড় পরিচয় বহন করে। এই পরিচ্ছেদটির নাম 'স্তিমিত প্রদীপে'; পরিবেশের সহিত এই নাম কালিদাসের 'অথার্ধরাত্রে স্তিমিতপ্রদীপে শয্যাগৃহে সুপ্তজনে' শ্লোকটির স্মারক। এই অবস্থায় নগেন্দ্রের সূর্যমুখীদর্শন ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তার ছায়া। রাজা উদয়ন পদ্মাবতীর সমুদ্রগৃহে বাসবদত্তাকে প্রত্যক্ষই দেখিয়াছেন, কিন্তু রুমণ্বান্ কর্তৃক বাসবদত্তার মৃত্যু-কথা প্রচারিত হওয়ায় তিনি মনে করিয়াছেন, 'ময়া স্বপ্নো দৃষ্টঃ'; নগেন্দ্রনাথও দ্বারপথে সূর্যমুখীকেই দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সংবাদ পাইয়াছেন, সূর্যমুখীর মৃত্যু ঘটিয়াছে। উদয়ন ও নগেন্দ্রনাথের মানসিক অবস্থাও একপ্রকার—উভয়েই পূর্বস্ত্রীর স্মৃতি-চিন্তায় বিভোর। এই উপন্যাসে প্রাচীন সাহিত্যের সহিত অপর যোগ রক্ষিত হইয়াছে কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নদর্শনে।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসেব পরিবেশ-সৃষ্টিতেও প্রাচীন রম্যকথার প্রভাব আছে। এইরূপে প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাস হইতে দৃষ্টান্ত লইয়া দেখানো যাইতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্রের কথাসাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব যাহাই থাকুক, উহাতে প্রাচ্য রম্য কাহিনীর প্রচুর উপাদান বিদ্যমান। 'রজনী,' 'ইন্দিরা,' 'রাধারাণী'কে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই 'উপকথা'র অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কৃষ্ণকান্তের উইলের বস্তুগত আবেদন তীব্র হইলেও, বারুণী পুষ্করিণী, সেই পুষ্করিণীর জলে ডুবার দৃশ্য, রোহিণী-নিশাকর সংবাদ, গোবিন্দলালের সন্ন্যাস—রম্য কাহিনীর অনুসারী।

বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ পর্যায়ের উপন্যাস তিনখানি 'আনন্দমঠ,' 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'। আনন্দমঠের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহকাহিনী ইতিহাস হইতে সংগৃহীত ঃ কিন্তু ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট বন-বর্ণনা, বন-মধ্যে অবস্থিত 'মন্দির,' মন্দিরাভ্যন্তরে মহাবিদ্যাদির মূর্তি—পুরুষবেশধারিণী শান্তির অভিনব চিত্র—গভীর নিশীথে সত্যানন্দের নিকট অশরীরী মহাপুরুষের বাণী—এ সকলই অন্য জগতের ঘটনা ঃ সে জগৎ রম্যকথার জগৎ—যেখানে জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরে, ধর্ম আসিয়া কর্মকে ধরে, বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরে। এই উপন্যাসে জয়দেবের গীতের

প্রভাব আছে, আর আছে বাংলা-সংস্কৃত মিশানো নব দেবভাষায় দেশাত্মবোধের অমর সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম্'। দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসেও রহস্য-বিস্ময়ের অপূর্ব মিশ্রণঃ সেই বনের মায়া, মেঘের ছায়া, ত্রিস্রোতার জলে 'চিকমিকি...ঝিকমিকি।' বঙ্কিমচন্দ্রের এই বর্ণনাই দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছে ঃ 'জ্যোৎস্না এখন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর, একটু অন্ধকার মাখা'—পৃথিবী স্বপ্নময় আবরণের মত।' এখানে এই স্বপ্নময়বাস্তব ও কল্পনায় মিশামিশি। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ-উপন্যাস 'সীতারাম'। প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে এই উপন্যাসের সৃষ্টি। এখানেও কবি বঙ্কিম, সৌন্দর্য রহস্যের উপাসক বঙ্কিম, বিস্ময়-রহস্যের স্বপ্নময় রাজ্যে জীবন-দর্শনের শেষ সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রতিটি খণ্ডের শীর্ষনামগুলি এই রহস্যের দ্যোতক—'দিবা—গৃহিণী', 'সন্ধ্যা—জয়ন্তী', 'রাত্রি—ডাকিনী'। এই নামগুলি হইতেই বুঝা যায়, কোন্ রাজ্যে বঙ্কিম-মানসের অভিসার। সে রাজ্য ঠিক রুদ্রবাস্তবের সংঘাতে আরক্ত কঠিন কঙ্করময় ভূভাগ নয়—অতীতের স্বপ্নময়, বৈচিত্র্যময়, কড়ি ও কোমলে মিশ্রিত বিস্ময়কর সুন্দর রম্যকথার জগৎ।

৪. কবি কালিদাস ও বাংলাসাহিত্য

(i) প্রাচীন যুগ

বাংলা সাহিত্যে কবি কালিদাসের প্রভাব গুরুতর। কেহ কেহ কালিদাসকে বাঙালী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কালিদাসের প্রকৃতি-বর্ণনায় শ্যামলী বাংলার রূপের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, রচনায় 'মধুর কোমলকান্ত' ভাবের বিলাসও অল্প নয়। তথাপি কালিদাসের কাব্যে সর্বভারতীয় সংস্কার ও বিশিষ্টতারই প্রাধান্য। কালিদাস ভারতের কবি। সেই সূত্রে তিনি বাঙালীর অন্তরঙ্গ।

মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য বৈষ্ণবপদাবলীর মধুর কাকলিতে পূর্ণ। উহাতে পরম শৈব কবি কালিদাসের প্রভাব কিছুটা পড়িলেও ততটা পড়ে নাই। কিন্তু এই সময়ে বাংলাদেশে যে রামায়ণ ও চণ্ডীমঙ্গলাদি কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাতে কবি কালিদাসের সুস্পষ্ট প্রভাব আছে। অবশ্য প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি কালিদাসের প্রেম-চেতনার ছায়া যে বৈষ্ণবসাহিত্য একেবারেই পড়ে নাই, তাহা বলা চলে না। শ্রীরাধার রূপ-বর্ণনায় বৈষ্ণব কবিগণ যে উপমা-রূপক-অতিশয়োক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাদের ভিতর কালিদাসের বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের প্রভাব আবিষ্কার করা দুরূহ নয়। এমন কি, বৈষ্ণবীয় প্রেমচেতনা অধ্যাত্ম রাজ্যের সামগ্রী হইলেও তাহাতে কালিদাসীয় প্রেমের সম্ভোগ-বিলাস ও মাধুর্য স্থানে স্থানে বিকীর্ণ হইয়াছে। কালিদাসের দূতকাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবে রূপগোস্বামী উদ্ধবসন্দেশ ও হংসদূত রচনা করিয়াছেন। বিরহিণী রাধার মানস-বিশ্লেষণে বৈষ্ণবপদে অনেকস্থলে কালিদাসের ধ্বনি উঠিয়াছে। দিগ্‌দর্শন স্বরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল ঃ

১. কবি গোবিন্দদাসের 'যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চল চলই। তাঁহা তাঁহা থলকমলদল খলই' চরণ কালিদাসের উমার 'অভ্যুন্নতাঙ্গুষ্ঠ-নখ-প্রভাভির্নিক্ষেপাৎ... আজহ্রতুঃ...পৃথিব্যাং স্থলারবিন্দশ্রিয়মব্যবস্থাম্' [কুমার. ১.৩৩] বর্ণনার অনুরূপ।

২. কালিদাসের যক্ষ বলিয়াছে, 'আঙ্গেনাঙ্গং প্রতনু-তনুনা গাঢ়তপ্তেন তপ্তং... বৈর্বিশতি'—জ্ঞানদাসের রাধা বলেন 'প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।'

৩. কালিদাসের রতিবিলাপের 'অলিপংক্তিঃ...বিরুতৈঃকরুণস্বনৈরিয়ং শুক-শোকামনুরোদিতীব মাম্'—এর প্রতিধ্বনি গোবিন্দদাসিয়ার—'পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমরা। পিয়া বিনে মধু না খায় ঘুরি বুলে তারা' ; আর 'ত্বদধীনং খলু দেহিনাং সুখম্'-এর ধ্বনি বিদ্যাপতির 'সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ হাম পাশ'।

৪. বৈষ্ণবপদে বিরহ অবস্থায় রাধার তানব দশা বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রায় সকল কবিই 'চৌদশী চান্দ সমান' [বিদ্যাপতি], 'চৌদশীচাঁদ জনু অনুখন খীয়ত' [কবি-ভূপতি]—এই উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন। কালিদাসের যক্ষও নিজ বিরহিণী প্রিয়ার বর্ণনায় এই সুপরিচিত উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন 'প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ' [উত্তরমেঘ. ২৮]।

অবশ্য বৈষ্ণবপ্রেমের কবিতা সংস্কৃত প্রেমকবিতারই সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী ; প্রেমের এই সকল অবস্থা যে-কোন সংস্কৃত প্রেমকবিতার সাধারণ উপকরণ। রামায়ণে, হরিবংশে, অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ কাব্যে কালিদাসোত্তর সংস্কৃত কাব্যের বহু ধ্বনি বৈষ্ণব পদাবলীতে রহিয়াছে। তবু কান পাতিয়া শুনিলে বাংলার বৈষ্ণব কবিতায় এই সূত্রে কালিদাসের রতি-বিলাপ, অজ বিলাপ বা যক্ষ-বিলাপের বিপ্রলম্ভের সুর শ্রুত হয়।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে কালিদাসের প্রভাব অপরিসীম। কৃত্তিবাস বলেন, রঘুবংশের কীর্তি কেবা বর্ণিবারে পাবে। কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতীর বরে' ; কালিদাসও রঘুবংশের সূচনায় প্রায় এইরূপ উক্তিই করিয়াছেন, 'ক্ব সূর্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ'। কৃত্তিবাসী রামায়ণে কালিদাস-প্রদত্ত রঘুবংশের বংশ-লতিকাই গৃহীত হইয়াছে। বাল্মীকি-রামায়ণে দিলীপের অশ্বমেধযজ্ঞ, রঘুর দিগ্বিজয়, অজ-ইন্দুমতী কাহিনী নাই ; কালিদাসে উহাদের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। কৃত্তিবাস এসকল কাহিনী বর্ণনায় কালিদাসের দ্বারস্থ হইয়াছেন ঃ ভাষাও প্রায় কালিদাসের। দিলীপ রঘুকে যজ্ঞতুরঙ্গ রক্ষণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ['নিযুজ্য তং হোমতুরঙ্গরক্ষণে ধনুর্ধরং রাজসুতৈরনুদ্রুতম্'] ঃ কৃত্তিবাসে পাই ; 'ঘোড়া রাখিবারে নিয়োজিলেন রঘুরে।' রঘুর দানকীর্তি প্রসঙ্গে কৃত্তিবাস বলেন, 'অদ্য ভক্ষ্য রঘুরাজা নাহি রাখে ঘরে' ; কালিদাস সেখানে বলেন, 'তমধ্বরে বিশ্বজিতি ক্ষিতীশং নিঃশেষবিশ্রাণিত-কোষজাতম্'। কৃত্তিবাসের ইন্দুমতী-স্বয়ম্বর, অজবিলাপও কালিদাসের অনুকরণ। রামচন্দ্রের জন্ম হইলে 'আচম্বিতে রাবণের সিংহাসন দোলে। মাথার মুকুট খসি পড়ে ভূমিতলে' [কৃত্তিবাস] ঃ কালিদাসের বর্ণনাও অবিকল একরূপ ঃ 'দশাননকিরীটেভ্যস্তৎক্ষণং রাক্ষসশ্রিয়ঃ। মণিব্যাজেন পর্যস্তা পৃথিব্যামশ্রুবিন্দবঃ'

[রঘু. ১০.৭৫]। কৃত্তিবাস কালিদাসের নিকট ঋণ গ্রহণ করিলেও অক্ষরে অক্ষরে কালিদাসের অনুকরণ করেন নাই ; কৃত্তিবাসের অনুবাদ স্বচ্ছন্দ মুক্তানুবাদ। প্রকাশ ও বাচনভঙ্গি, এমন কি পরিবর্জন ও পরিবর্তন নীতি কৃত্তিবাসের নিজস্ব।

বাংলা মঙ্গলকাব্যে বিবাহ বর্ণনা প্রসঙ্গে বর দেখিবার জন্য পুরাঙ্গনাদের উগ্র ঔৎসুক্য বর্ণিত হইয়াছে। পুরনারীদের এই ব্যাকুলতার চিত্র অশ্বঘোষ-কালিদাসও অংকন করিয়াছেন। বাংলা কাব্যে অনুরূপ বর্ণনায় কালিদাসেরই সাক্ষাৎ প্রভাব। কালিদাসের 'পুরসুন্দরীণাং ত্যক্তান্যকার্যানি বিচেষ্টিতানি'-শ্লোকার্থের বিনিময় করা যায় কবিকঙ্কণের এই বর্ণনার সহিত ঃ [নাগরীদের বরদর্শনে গমন]

কোন নাগরীর আধ সীমন্তে সিন্দুর।
কারো ভ্রমে পদে হার করেতে নূপুর ॥
কারো এক নয়নে ভালে দিয়াছে কজ্জলে।
পত্রাবলী এক কুচে নাহিক সকলে ॥

চন্ডীমঙ্গল কাব্যাদির সূচনায় সতীর পার্বতীরূপে হিমগৃহে জন্মগ্রহণ, হিমপ্রস্থে শিবের তপস্যা, পার্বতীর পরিচর্যা, মদনভস্ম, রতিবিলাপ, গৌরীর তপস্যা, জটিল তাপসবেশে মহাদেবের গৌরীকে ছলনা, হরগৌরীর বিবাহ প্রভৃতি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল বর্ণনায় কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কবিকঙ্কণে কামদেব-ভস্ম বর্ণনা এইরূপ ঃ

সম্মোহন বাণ বীর পূরিল সত্বরে।
ঈষৎ চঞ্চল হর হইল অন্তরে ॥
ধ্যানভঙ্গ হয়ে শিব চারিদিকে চান।
সম্মুখে দেখেন চাপ ধরি পঞ্চবাণ ॥
কোপদৃষ্টে মহেশের বরিষে দহন।
দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইল মদন ॥

এই বর্ণনায় কালিদাসের 'সম্মোহনং নাম চ পুষ্পধন্বা ধনুষ্যমোঘং সমধত্ত বাণম্', 'হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্যঃ', 'দদর্শ চক্রীকৃত চারুচাপং', 'তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার' প্রভৃতি উক্তির প্রতিধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়।

রামেশ্বরের শিবসংকীর্তনেও এই পালা আছে। রামেশ্বরের হিমালয়বর্ণনা কুমারসম্ভবের বর্ণনার আক্ষরিক অনুবাদ বলা চলে। কালিদাস বলেন,

অনন্তরত্ন প্রভবস্য যস্য হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতম্।
একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাংকঃ ॥

রামেশ্বরের বর্ণনা,—

অনন্ত রত্নের প্রভু কোন দোষ নাই কভু
সবে মাত্র হিমের আলয়।
এক দোষগুণরাশি নাশে নাই যেন শশী
শশে ভাসে শোভা সমুচ্চয় ॥

কুমারসম্ভবের অন্যান্য বর্ণনার সহিত রামেশ্বরের যোগ অল্প। রামেশ্বরে মদন-ভস্মের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত ; রতিবিলাপ স্বচ্ছন্দ।

ভারতচন্দ্রে কালিদাসের ভাব আছে, কিন্তু বর্ণনা স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ। কালিদাসে মদন শরাসনে সম্মোহন বাণ যোজনা করিয়াছেন মাত্র, ভারতচন্দ্র মদনকে দিয়া বাণ নিক্ষেপ করাইয়াছেন ['ভুমে হাঁটু গাড়ি দিলা বাণ ছাড়ি']। ভারতচন্দ্রের রতিবিলাপও তরলতা-মুক্ত নয়। কালিদাসের রতি বসন্তের দুঃখে সহানুভূতি জানাইয়াছেন, ভারতচন্দ্রের রতি বসন্তকে অভিশাপ দিয়াছে—'বসন্ত অল্পায়ু হও/ বন্ধু হৈয়া বন্ধু নও, প্রভু বধি সবে পলাইলা'। কালিদাসের 'বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী' শোকার্তা রতির বিলাপে স্থল-বসুধা কাঁদিয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু ভারতচন্দ্রের রতিবিলাপের এই প্রলাপ হাসির খোরাক জোগাইয়াছে,

আহা আহা হরি হরি উহু উহু মরি মরি
হায় হায় গোঁসাই গোঁসাই।

তথাপি দুই একটি চরণে কালিদাসের ধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে ঃ

প্রথমে যে প্রীতি ছিল শেষে তাহা না রহিল
বিপরীত এ নহে বিধান।...
মিছা প্রেম বাড়াইয়া ভাল গেলা ছাড়াইয়া
এখন বুঝিনু মিছা খেলা ॥

সেখানে কালিদাসের বর্ণনা ঃ

হৃদয়ে বসসীতি মৎপ্রিয়ং যদবোচস্তদবৈমি কৈতবম্।
উপচারপদ ন চেদিদং ত্বমনঙ্গঃ কথমক্ষতা রতিঃ ॥

[তুমি আমার হৃদয়-বাসিনী—এই যে প্রিয়বাক্য আমাকে বলিতে, তাহা ছলনা, নচেৎ তুমি আজ অঙ্গহীন হইলেও রতি কেন অক্ষত আছে]

সংস্কৃত সাহিত্যে নানা প্রসঙ্গে ঋতুপর্যায়ের অসংখ্য বর্ণনা পাওয়া যায়। সৃষ্টির প্রথম লগ্নে মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তখন তাহার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল প্রকৃতির সহিত। এই প্রকৃতি তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে, তাহার খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে, তাহাব সুখ-দুঃখের সঙ্গী হইয়াছে। মানুষের জীবন প্রকৃতির সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। তাই ধর্মকল্পনায় বা জীবনের উৎসবে মানুষ প্রকৃতিকে ভুলিতে পারে নাই। বন-পাথর-জল তাহার ধর্মের ও উৎসবের অঙ্গীভূত হইয়াছে। মানুষের প্রেম ও সৌন্দর্যচেতনাকেও উদ্বুদ্ধ করিয়াছে প্রকৃতি। বৈদিক সাহিত্যে মধুক্ষারয়িত্রী দ্যাবাপৃথিবী, ওষধি-বনস্পতি-অরণ্য ও সূর্য-সোম নানা ছন্দে বন্দিত হইয়াছেন। ঋতুর অয়নকেও তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন। মধু-মাধব, বর্ষা, শরৎ—সকল ঋতুর কথাই বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। যজ্ঞকর্মগুলিও ঋতুর আবর্তনক্রমে উদ্‌যাপিত হইত।

রামায়ণে বসন্ত, বর্ষা ও শরতের অপূর্ব বর্ণনা রহিয়াছে। পম্পাসরোবরে বসন্তের আবির্ভাব—প্রকৃতির অজস্র পুষ্পবর্ষণ, মরুৎহিল্লোল, মত্ত কোকিলের

সংনাদ, ষট্পদের অনুগীত [রামা. কিষ্কিন্ধ্যা. ১] ; মাল্যবান পর্বতে বর্ষার সঞ্চরণ —'নভো মেঘৈঃ সংবৃতং গিরি সন্নিভৈঃ', কুটজ ও অর্জুন পুষ্পের সম্ভার, বাষ্পবারি মুঞ্চনশীলা মহী [রামা. কিষ্কিন্ধ্যা. ২৮] এবং বর্ষান্তে শারদ শোভা—'চন্দ্রকরোজ্জ্বল রাগবতী সন্ধ্যা', ক্ষীণতোয়া নদী, কহ্লার-শীতল পবন [রামা. কিষ্কি. ৩০] যে কোন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সংস্কৃত সাহিত্যে এই ঋতুবর্ণনা বর্ণাঢ্য রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে কালিদাসের কাব্যে। কুমারসম্ভব কাব্যের অকালবসন্ত বর্ণনা, মেঘদূতের বহুবিচিত্রা বর্ষা, রঘুবংশের শরদ্বর্ণনা তো আছেই, উপরন্তু 'ঋতুসংহার' কাব্যে আছে ছয় ঋতুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে 'বারমাস্যা' বর্ণনায় এই ঋতুবর্ণনার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

সংস্কৃত সাহিত্যের, বিশেষতঃ কালিদাসের ঋতুবর্ণনার প্রধানতঃ দুইটি দিক— এক—ঋতুপর্যায়ের বহিরঙ্গ চিত্র, দুই—মানব মনের উপর এই ঋতু-প্রকৃতির প্রভাব। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্তের 'ঋতুলিঙ্গ' [ঋতু-লক্ষণ] পৃথক পৃথক। মানুষের মনে এক এক ঋতুর এক এক প্রকার প্রভাব। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কালিদাসের এই ঋতু, সম্ভোগ বা বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারের সহিত জড়িত। কালিদাস প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি, তাঁহার প্রকৃতি নায়ক-নায়িকার প্রতিকৃতি, প্রকৃতির ক্রিয়া-কলাপ শৃঙ্গারানুভাবের দ্যোতক। বাংলা সাহিত্যের 'বারমাস্যা' সে স্থলে বিচিত্র ভাবের প্রেরক। প্রকৃতির পরিবেশে দাঁড়াইয়া বাঙালীর মন কেবল সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভের আকৃতি প্রকাশে শেষ হইয়া যায় নাই, অন্যান্য আকৃতিও প্রকাশ করিয়াছে। কালিদাসের কবিতার রাজ্য তাঁহার মেঘদূত কাব্যের অলকার মত। সেখানে অনন্ত বসন্ত, অনন্ত জোৎস্না, 'পাদপাঃ নিত্যপুষ্পাঃ'। সেখানেও দুঃখ আছে, কিন্তু সে দুঃখ প্রণয়-দুঃখ। বাংলা 'বারমাস্যা'য় এই ধরনের রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছেন ভারতচন্দ্র। বিদ্যার জীবনে বারমাসের ঋতুবৈচিত্র্য কামকলা-বিলাসের কিংবা কাম-বিরহিত দুঃখের দ্যোতক। বৈষ্ণবপদাবলীতেও ঋতু বর্ণনা অনেকটা এই ধরনের। কিন্তু কবিকঙ্কণে 'বারমাস্যা' জীবনের দারিদ্র্য-দুঃখের ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন, নিম্নবিত্ত বাঙালীজীবনের গভীর দুঃখের স্পর্শে করুণোচ্ছল।

তথাপি কবিকঙ্কণে ও অন্যান্য বাংলাকাব্যের ঋতুবর্ণনায় কালিদাস-বর্ণিত ঋতু-চিহ্নের প্রভাব লক্ষণীয়। কালিদাসের গ্রীষ্ম—'অসহ্যবাতোদ্ধতরেণুমণ্ডলা প্রচণ্ডসূর্যা-তপতাপিতামহী'। বাংলায় সেখানে পাই, 'অনল সমান পোড়ে বৈশাখের খরা', অথবা 'সুপাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠমাস প্রচণ্ড তপন' [কবিকঙ্কণ]। বর্ষার বর্ণনায় কালিদাস বলিয়াছেন, 'পয়োধরৈ-র্ভীমগভীরনিস্বনৈস্তড়িদ্ভিরুদ্বেজিতচেত সোভৃশম্'। বাংলায় পাই—'আষাঢ়েপূরএ মহী নবমেঘে জল' [কবিকঙ্কণ], কিংবা 'আষাঢ়ে নবীন মেঘে গভীর গর্জন' [ভারতচন্দ্র], আর 'শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী। সিতাসিত দুইপক্ষ কিছুই না জানি।।' [কবিকঙ্কণ]। শরদ্বর্ণনায় কালিদাসে আছে, 'কাশৈর্মহী শিশির-দীধিতিনা রজন্যো হংসৈর্জলানি সরিতাং কুমুদৈঃ সরাংসি'

(শরৎকালে পৃথিবীকাশপুষ্পে, রজনী শুভ্রচন্দ্রে, নদীজল হংস দ্বারা এবং সরোবর কুমুদদ্বারা শোভিত হয়)। বাংলায় আছে, 'আশ্বিনমাসে বিকশিত পদ্মিনী সারস-হংস নিশান' [গোবিন্দদাস]। হেমন্তের বর্ণনায় কালিদাস 'নবপ্রবালোদ্গমশস্যরম্যঃ' ও 'পরিপক্কশালিঃ'-এর কথা বলিয়াছেন ; বাংলা কাব্যেও পাই, 'আঘনে পাকএ শিষ', [শূন্যপুরাণ] কিংবা 'মাসমধ্যে মাইশর আপনি ভগবান। হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান ॥' [কবিকঙ্কণ]। শিশির বর্ণনায় কালিদাস বলিয়াছেন, 'তুষার সংঘাতনিপাত শীতলাঃ' হিমঋতু—এই সময় মানুষ 'গৃহীত তাম্বুল বিলেপনস্রজঃ' (মানুষ তাম্বুল, বিলেপন ও মাল্য ধারণ করে)। বাংলার শীতঋতুও ভয়ঙ্কর 'মাঘমাসে অনিবার সদাই কুজ্ঝটি' [কবিকঙ্কণ] কিংবা 'বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী' [ভারতচন্দ্র], আর এই শীতের পরিত্রাণ 'জানুভানু কৃশানু' [কবিকঙ্কণ]। কালিদাসের বসন্ত বর্ণনা ঃ 'মত্তদ্বিরেফপরিচুম্বিত চারুপুষ্পোমন্দানিলকুলিতনম্র-মৃদুপ্রবালাঃ।' কবিকঙ্কণে পাই—'মধুমাসে মলয় মারুত বহে মন্দ। মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ ॥'

প্রাচীন বাংলাকাব্যে প্রকৃতির বহিরঙ্গ চিত্রাংকনে কালিদাসের সহিত এই যে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, তাহা বস্তুগত সাদৃশ্য। কালিদাসের অতি সূক্ষ্ম প্রকৃতিদৃষ্টি প্রাচীন বাংলাকাব্যে নাই।

(॥) বাংলায় নব্যযুগ ও কালিদাস

বিশ্বগৌরব কালিদাস নূতনভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছেন নব্যযুগে। এ আবিষ্কারের মূলে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতবর্গের শ্রম ও চেষ্টা অবিস্মরণীয়। বাঙালীর সহযোগিতাও এ ব্যাপারে অসামান্য। মূলের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সূত্রে কালিদাসের সহিত নব্যবঙ্গের ভাবসাযুজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সাযুজ্যের প্রথম প্রকাশ ঘটিয়াছে অনুবাদ সাহিত্যে। কালিদাস বাংলায় অনূদিত হইয়াছেন শুধু রূপলোকে নয়, ভাবলোকে। বাঙালীর রস-চেতনায় তাঁহার অমোঘ প্রভাব। এই প্রভাবের ফল (১) কালিদাসের বিষয় অবলম্বনে নূতন কাব্য সৃষ্টি, (২) নূতন কাব্যসৃষ্টি করিতে গিয়া কালিদাসের ভাব, ভাষা ও অলঙ্কারের ঐশ্বর্য গ্রহণ, এবং (৩) কালিদাসের কাব্যের বিচার-বিশ্লেষণ ও নূতন তাৎপর্য আবিষ্কার।

নব্যযুগে নবজাগরণের সাড়ায় সংস্কৃত রসসাহিত্যের যে সকল অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, সংখ্যাধিক্যে কালিদাসের রচনাই তাহাদের ভিতরে প্রথম। কালিদাস গদ্য-সাহিত্য রচনা করেন নাই, কিন্তু কালিদাসের নাটক গদ্যে অনূদিত হইয়াছে। সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা। কুমারসম্ভব ও মেঘদূত কাব্যের একাধিক পদ্যানুবাদ পাওয়া যাইতেছে। কালিদাসের নাটক নাট্যাকারেই অনূদিত হইয়াছে নাট্যামোদীদের প্রেরণায়। এইভাবে নব্যবাংলায় কালিদাস জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। উপরন্তু ঘরে ও পরে কালিদাসের প্রচার ও প্রশংসা এবং কালিদাসের রচনাবলীর

স্বকীয় সৌন্দর্য ও ভাবসমৃদ্ধি কালিদাসকে আরও অন্তরঙ্গ করিয়া তুলিয়াছে এবং কাব্য নিকুঞ্জে তিনি 'পিককুলপতি' রূপে বন্দিত হইয়াছেন।

॥ মধুসূদন ও কালিদাস ॥

'কবিতানিকুঞ্জে তুমি পিককুলপতি'—কালিদাস সম্পর্কে এ প্রশস্তি মধুসূদনের। ভারতীয় কবিগণের মধ্যে মধুসূদন কালিদাসকে শ্রেষ্ঠ কবির আসন দিয়াছেন। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একটি পত্রে তিনি জানাইয়াছিলেন, 'As for me I never read any poetry except that of Valmiki, Homer, Vyasa, Virgil, Kalidas, Dante (in translation), Tasso (Do) and Mliton. These কবিকুলগুরুs ought to make a fellow a firstrate poet—if Nature has been gracious to him.'

নাটক কিংবা কাব্য রচনা করিতে গিয়া মধুসূদন কালিদাস হইতে প্রচুর প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। মধুসূদনের চারখানি নাটক—শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী ও মায়াকানন। প্রথম দুইটি নাটকে পাত্র-পাত্রীর সংলাপে মধুসূদন বহুস্থলে কালিদাসের সংলাপানুবাদ যোজনা করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় মূলের সহিত সাদৃশ্য দেখাইয়া অনেকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন।[১] তিনি আরও বলিয়াছেন, 'বাঙ্গালা নাটকের আদর্শ খুঁজিতে গিয়া স্বভাবতই মধুসূদনের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলের প্রতি। শকুন্তলার একটি শ্লোকে মধুসূদন প্রকল্পিত নাটকের কাহিনী-সূত্রের সন্ধান পাইলেন। শ্লোকটি পতিগৃহগমনোন্মুখী শকুন্তলার প্রতি কণ্বের আশীর্বচন,

যযাতেরিব শর্মিষ্ঠা ভর্তুর্বহুমতাভব।
সুতংত্বমপি সম্রাজং সেব পুরুমবাপ্নুহি ॥'

বস্তুতঃ ঘটনাসংস্থানে, শর্মিষ্ঠার সহিত রাজার প্রণয়লীলা সংঘটনে এবং শেষ পর্যন্ত দেবযানী কর্তৃক শর্ম্মিষ্ঠাকে স্বমর্যাদায় সপত্নীরূপে গ্রহণে কালিদাসের অনুকরণ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'শান্তরসাস্পদ আশ্রমপদ', 'মধুর অধরকে রতিসর্বস্ব বললেও বলা যেতে পারে', 'একি! আমার দক্ষিণবাহু স্পন্দন হত্যে লাগলো কেন', প্রভৃতি উক্তিও কালিদাসের প্রতিধ্বনি। শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণের ব্যাপারে ঋষি কণ্বের সহিত শুক্রাচার্যের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। কালিদাসের নাটকের নায়ক 'দক্ষিণ নায়ক'—মধুসূদনের যযাতিও 'দক্ষিণ নায়ক'।

পদ্মাবতী নাটকেও কালিদাসের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। নায়িকার পূর্বরাগ, শচীতীর্থের উল্লেখ, গৌতমী নাম এবং শার্ঙ্গরবের অনুকরণে শার্ঙ্গধর নামকরণে কালিদাসের অনুকরণ রহিয়াছে।

---

১. দ্রষ্টব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)—ডঃ সুকুমার সেন

মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাটক কৃষ্ণকুমারী। ইহাতে তিনি নানাদিক হইতে মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইউরোপীয় ট্রাজেডীর অন্তরঙ্গ লক্ষণ এই নাটকে সুপরিস্ফুট, তথাপি ইহাতে রত্নাবলী, মৃচ্ছকটিক প্রভৃতি নাটকের ছায়া দুর্লভ নয়। কালিদাসের প্রভাব এখানে মর্মে প্রসারিত। কালিদাসের ভাব লইয়া তিনি নূতন রস সৃষ্টি করিয়াছেন। বিক্রমোর্বশী নাটকে আছে, গৌরীর চরণস্পর্শে একটি পাষাণ মণিতে পরিণত হইয়াছিল ['সঙ্গমনীয়ো মণিরিহ শৈলসুতাচরণরাগযোনিরিয়ম্'—বিক্রমোর্বশী. ৪র্থ অংক]। মধুসূদন এই প্রসঙ্গটিকে প্রয়োগ করিয়াছেন ধনদাসের একটি উক্তিতে :

বিলাসবতী।···ওহে ধনদাস, তুমি যে একজন পরম রসিক পুরুষ হয়ে পড়লে হে ? ধনদাস। আর ভাই, না হয়ে করি কি ? দেখ গৌরীর চরণ স্পর্শে একটা পাষাণ মহারত্নের শোভা পেয়েছিল। [কৃষ্ণকু. ১ম অংক, ২য় গর্ভাংক]

ভাবানুষঙ্গে এইরূপে কালিদাসের স্মরণ নিঃসন্দেহে গভীর প্রভাবের পরিচায়ক। বিলাসবতীর নিকট রাজার স্ব-অপরাধ ক্ষালণের সংলাপটিও কালিদাসের পুরূরবার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অপরাধী রাজা দেবী ঊশীনরীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন,

অপরাধী নামাহং প্রসীদ রম্ভোরু বিরম সংরম্ভাৎ।
সেব্যো জনশ্চ কুপিতঃ কথং নু দাসো নিরপরাধঃ ॥ [বিক্রম. ২য় অংক]

কৃষ্ণকুমারী নাটকে রাজা বিলাসবতীকে বলিতেছেন,

রাজা। তুমি দেখছি ভাই, আমার উপর যথার্থই রেগেছো।...দেখ, যে ব্যক্তি অনুগত, তার উপর কি রাগ করা উচিত ? [কৃষ্ণ. ৪র্থ, ২ গর্ভাংক]

মায়াকানন নাটকে 'ইন্দুমতী', 'সুনন্দা', নামগুলি রঘুবংশের ইন্দুমতী-সুনন্দার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অজয় সুনন্দার নিকট জানিতে পারিলেন, ইন্দুমতী বণিককন্যা। কিন্তু এই পরিচয়ে অজয়ের মনে সন্দেহ জাগিল, 'এরা কি তবে যথার্থই বণিককন্যা ?—আর তাই-ই বা কেমন করে বলি ! মানস-সরোবর ভিন্ন অন্যত্র কি কখনো কনকপদ্ম প্রস্ফুটিত হয় ?—পতিতপাবনী ভাগীরথী হিমাদ্রির মণিময় গৃহেই জন্মগ্রহণ করেন।' অজয়ের এই স্বগতোক্তি রাজা দুষ্যন্তের উক্তির দূরাগত ধ্বনি, 'ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ।' অজয় যে ভাবানুষঙ্গে দুষ্যন্তের কথাই স্মরণ করিতেছিলেন, অজয়ের উক্তিই তাহার প্রমাণ : 'সুমুখি !... শকুন্তলাকে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে দেখে রাজা দুষ্মন্তের হৃদয়ই তাঁকে তাঁর পরিচয় দিয়েছিল, ঐযে ঋষিপালিত স্ত্রীরত্ন উনি কখনই ব্রাহ্মণ-কন্যা নন।'

মধুসূদনের কাব্য-কবিতাতেও কালিদাসের প্রভাব অপরিসীম : তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের আদর্শেই রচিত। সুন্দ-উপসুন্দের পরাক্রম তারক দৈত্যের পরাক্রম সদৃশ। পরাভূত দেবগণ যেমন বিপদ হইতে অব্যাহতি লাভের নিমিত্ত ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, এখানেও তেমনি পরাজিত সুরদল বিরিঞ্চিপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিয়াছেন। সুন্দ-উপসুন্দের হস্তে দেবনিগ্রহের বর্ণনা প্রায় এক প্রকার। দেবগণের বিরিঞ্চি-বন্দনা :

হে বিভো, জগৎ-যোনি, অযোনি আপনি,
জগদন্ত নিরন্তক, জগতের আদি
অনাদি। [তিলোত্তমা, ৩য় সর্গ]

কালিদাসে পাই :

জগদ্‌যোনিরযোনিস্ত্বং জগদন্তো নিরন্তকঃ।
জগদাদিরনাদিস্ত্বং জগদীশো নিরীশ্বরঃ ॥ [কুমার. ২৯]

তিলোত্তমা কাব্যেও বসন্তের আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে। এই বসন্তবর্ণনায় কালিদাসের প্রভাব থাকিলেও মধুসূদন স্বতন্ত্র। কালিদাসের ভাব মাত্র লইয়া তিনি নিজের মত করিয়া ঋতুরাজের প্রভাব বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রতিমুহূর্তেই যে কালিদাসের স্মরণ হইতেছে, তাহার প্রমাণ, তিলোত্তমার পদস্পর্শে বিন্ধ্যাচলের এই শিহরণের বর্ণনা :

শিহরিল বিন্ধ্যাচল ও পদ-পরশে
সম্মোহন-বাণাঘাতে যোগীন্দ্র যেমতি
চন্দ্রচূড় [তিলোত্তমা, ৪র্থ সর্গ]

তাহা ছাড়া, 'ভেলায় চড়িয়া কে পারে হইতে পার অপার সাগর' [তিলো. ২]—কালিদাসের 'তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্' [রঘু. ১.২]; 'ধিক্ সে যাচঞা, ফলবতী নীচ কাছে'—কালিদাসে 'যাচঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধ-কামা' [মেঘ. পূর্ব ৬] ইত্যাদি।

ব্রজাঙ্গনা কাব্যের কতকগুলি কবিতা কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের কথা মনে করাইয়া দেয়। মলয় মারুত কবিতায় রাধা মলয় পবনকে দূত করিয়াছেন; দূত মেঘের যেমন উচ্চবংশে জন্ম, তেমনই মলয় মারুতের জন্ম, মলয় গিরিতে। মেঘের প্রণয়িনী নদী, পবনেরও প্রণয়িনী 'নদী রূপবতী'। 'স্মরি রাধিকার দুঃখ, হইও সুখে বিমুখ, মহৎ যে পরদুঃখে দুঃখী সে সুজন'—বাক্যটি মেঘদূতের 'মন্দায়ন্তে ন খলু সুহৃদমেভ্যুপেতার্থকৃত্যাঃ' এর প্রতিধ্বনি।

'বীরাঙ্গনা' কাব্যের দুইটি পত্র কালিদাসের নাটকের বিষয় লইয়া রচিত—'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা' এবং 'পুরূরবার প্রতি উর্বশী'। শকুন্তলার পত্র কালিদাস-অঙ্কিত তপোবন-স্মৃতি জাগ্রত করে : সেই পাত্র-পাত্রী—রাজা দুষ্মন্ত, শকুন্তলা, অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, তাপসী গোতমী—সেই 'বেতস পরিক্ষিপ্ত লতামণ্ডপ' সেই 'মঅণলেহো' (মদন-লেখা অর্থাৎ প্রণয়পত্র), ভ্রমর বাধা অপসারণের জন্য রাজার আবির্ভাব, লতাকুঞ্জে শকুন্তলা সম্ভোগোদ্যোগ প্রভৃতি। রাজার চিন্তায় আত্মহারা শকুন্তলাকে দেখিয়া প্রিয়ংবদা বলিয়াছিলেন, 'পিয়সহী ভত্তুগদাএ চিন্তাএ অত্তাণং বি ণ এসা বিভাবেই'—(প্রিয়সখী পতির ভাবনায় নিজেকে পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছে) —ঠিক এই চিত্রটিই ফুটিয়া উঠিয়াছে শকুন্তলার পত্রে। মধুসূদন এখানে কালিদাসের ভাবেই ভাবিত; নিজের সংযোজনাও অবশ্য আছে। উর্বশী পত্রে আবার বিক্রমোর্বশী নাটকের রোমন্থন। পত্রিকার সূচনা তৃতীয় অঙ্কোল্লিখিত এই ঘটনাটি লইয়া :

লচ্ছীভূমিআএ বট্টমাণা উব্বসী বারুণীভূমিআএ বট্টমাণাএ মেণআএ পুচ্ছিদা—সমাগদা তেলোক্কপুরিসা সকেসবা লোঅবালা। কদমস্সিং দে হি অআহি ণিবেসোত্তি।...তাএ পুরিসোত্তমেত্তি ভণিদব্বে পুরুরবসিত্তি নিগ্গদা বাণী।

মধুসূদনের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ ঃ

গতরাত্রে অভিনিনু দেব নাট্যশালে
লক্ষ্মীস্বয়ম্বর-নাম নাটক, বারুণী
সাজিল মেনকা, আমি অম্ভোজা ইন্দিরা।
কহিলা বারুণী, 'দেখ নিরিখি চৌদিকে,
বিধুমুখি। দেবদল এই সভাতলে;
বসিয়া কেশব ওই। কহ মোরে শুনি,
কার প্রতি ধায় মন? গুরুশিক্ষা ভুলি,
আপন মনের কথা দিয়া উত্তরিনু,
'রাজা পুরুরবা প্রতি।'

[ভরতশিষ্য পেলবের উক্তিটি মধুসূদন উর্বশীর উক্তিরূপে ব্যবহার করিয়াছেন] প্রথম অঙ্কে উর্বশীর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে রাজা 'আবিভূতে শশিনি তমসা রিচ্যমানেব রাত্রিঃ'—শ্লোকটি বলিয়াছিলেন ; পত্রে তাহা এইরূপ হইয়াছে,

যথা নিশা......শশীর মিলনে
তমোহীনা ; রাত্রিকালে অগ্নিশিখা যথা
ছিন্নধূম পুঞ্জকায়া ; দেখ নিরখিয়া
এ বরাঙ্গ বররুচি রুচ্যমান এবে
মোহান্তে।

চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে 'কালিদাস', 'মেঘদূত', 'উর্বশী', 'পুরুরবা', 'শকুন্তলা' প্রভৃতি কবিতা হইতে মধুসূদনের উপর কালিদাসের অন্তগূঢ় প্রভাবের পরিমাণ অনুমান করা যায়। মধু কবিকে সর্বাপেক্ষা মুগ্ধ করিয়াছে কালিদাসের রসময়ী ভাষা এবং সেই ভাষার 'সঙ্গীত-তরঙ্গ'। মধুসূদনের প্রেম-চেতনাতেও কালিদাসের প্রভাব গভীরভাবে মুদ্রিত। কালিদাসের কাব্যের নায়ক একাধারে শৌর্য-বীর্য ও প্রেমের প্রতীক। যে দুষ্মন্ত মুহূর্তপূর্বে শকুন্তলাবিরহে মূর্ছিত, পরমুহূর্তে তিনিই আর্তত্রাণের জন্য কার্মুকধারী। মধুসূদনের অন্তরেও এই বীর্য-দীপ্ত প্রেমের অভীপ্সা। দূত মেঘের ভিতর তিনি একদিকে দেখিয়াছেন, 'গরুড়ের বেগ', 'ভীম স্বনন', 'খগেন্দ্র উপেন্দ্রসম' মূর্তি'—অপর দিকে কামীর ভুবনমোহন রূপ, যিনি কৌস্তুভরত্নের মত তড়িৎ-প্রিয়াকে মাল্যরূপে বক্ষে ধারণ করেন। পুরুরবার বীরত্বও যেন সার্থক হইয়াছে 'কাম-বনে' 'ভুবন-লোভ' উর্বশীকে লাভ করিয়া ঃ

যথা ঘোর বনে ব্যাধ বধি অজাগরে
চিরি শিরঃ তার, লভে অমূল্য রতনে :

বিমুখী কেশীরে আজি, হে রাজা সমরে
লভিলা ভুবন-লোভ তুমি কাম-বনে। [পুরুরবা : চতুর্দশপদী]

উর্বশী সৌন্দর্যে অনুপম মূর্তি, যেন 'পূর্ণিমা রাত্রে শরদের শশী'; এই সৌন্দর্য মূর্তি 'উন্মদা মদন মদে'। এই উর্বশী কিংকরীত্ব প্রার্থনা করে তাঁহারই কাছে, যিনি 'শূর'। এ স্থলে কালিদাসকে অবলম্বন করিয়া মধুসূদন নব প্রেম-চেতনার পরিচয় দিয়াছেন।

প্রেম ও বীর্যের মিলিতরূপ সার্থক হইয়া উঠিয়াছে মেঘনাদবধ কাব্যে—মেঘনাদের চরিত্রে। মেঘনাদ প্রেমিক, মেঘনাদ বীর। প্রথম সর্গেই এই প্রেমিক বীরের চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে। মেঘনাদ প্রমোদ-উদ্যানে বিহাররত ছিলেন: 'বিহারিছে বীরবর সঙ্গে বরাঙ্গনা প্রমদা'। কিন্তু লংকার দুর্ঘটনার কথা শুনিয়াই তাঁহার অন্য মূর্তি:

ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ; ফেলাইলা কনক-বলয়
দূরে; পদতলে পড়ি শোভিল কুণ্ডল।

আত্মধিক্কারে তিনি গর্জন করিয়া উঠিলেন।

হা ধিক মোরে! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলংকা, হেথা আমি রামাদল মাঝে?

সেই মুহূর্তেই পক্ষীন্দ্র গড়ুরের বেগে তিনি যুদ্ধসাজে লংকার দিকে যাত্রা করিলেন। এই দুর্ধর্ষ শৌর্য-মত্ততা প্রেমের নিগড়ে বাঁধা। সে নিগড় প্রেমিকা প্রমীলা,

জগতের রক্ষাহেতু গড়িলা বিধাতা
এ নিগড়ে, যাহে বাঁধা মেঘনাদ বলী—
মদকল কাল হস্তী।

কালিদাসের দুষ্মন্ত-পুরুরবাও ঠিক এই প্রকৃতিতে গড়া: এই অনমনীয় তেজ, এই প্রেমে বিগলন-স্বভাব। মধুসূদনের প্রেমিক বীর নায়কের চরিত্রে এইদিক হইতে কালিদাসের প্রভাব গণনীয়।

মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে মদন-সহায়ে ভবানীর হরধ্যানভঙ্গের কল্পনায় মধুসূদন কালিদাসের কল্পনাদ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। এই দৃশ্য কল্পনায় পাশ্চাত্ত্য প্রভাবও অল্প নয়, তথাপি ভারতীয় ভাব-ঝংকার সহজেই মনকে আকর্ষণ করে। এখানেও মহাদেবের ধ্যানভঙ্গের সহায় মদন: 'হাতে ফুলধনুঃ, পৃষ্ঠে তূণ, খরতর ফুলশরে ভরা' [কালিদাসে পাই, 'চাপমাসজ্য কণ্ঠে সহচর-মধু-হস্ত-ন্যস্তচূতাঙ্কুরাস্ত্রঃ'] কুমারসম্ভব কাব্যে ধ্যানমগ্ন মহাদেবের ধ্যানতন্ময় নিশ্চল মূর্তি যেন 'নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপ'। অবিস্পন্দিত নেত্র, অনুত্তরঙ্গ সাগরের ন্যায় প্রশান্ত। মধুসূদনের 'কপর্দী তাপস'

বিভূতিভূষিতদেহ, মুদিত নয়ন
তপের সাগরে মগ্ন বাহ্যজ্ঞান হত।

কালিদাসের মদন হরকে উদ্দেশ্য করিয়া বাণ স্পর্শ করিয়াছিলেন মাত্র [সম্মোহনং নাম চ পুষ্পধন্বা ধনুষ্যমোঘং সমধত্ত বাণম্’], তখন তাহার ‘আকুঞ্চিত সব্যপাদ’, হস্তে প্রহারোদ্যত ‘চক্রীকৃত চারুচাপ’। মধুসূদন সেখানে মদনকে দিয়া বাণ নিক্ষেপ করাইয়াছেন,—

হাঁটু পাড়ি মীনধ্বজ, শিঞ্জিনী টংকারি
সম্মোহন শরে শূর বিঁধিলা উমেশে।

কালিদাস মদনের শর-সন্ধানে কিঞ্চিৎ চঞ্চল মহাদেবের ছবি অংকন করিয়াছেন ঃ

‘হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিবৃত্ত ধৈর্য্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ’।

এবং ক্ষণপরে মদনকে দেখিয়া, ‘স্ফুরন্নুদর্চ্চিঃ সহসা তৃতীয়াদক্ষ্ণঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত’ [ললাটনয়ন হইতে সহসা উজ্জ্বলশিখ অগ্নি বিনির্গত হইল]। মধুসূদনের বর্ণনা এইরূপ ঃ

শিহরিলা শূলপাণি। নড়িল মস্তকে
জটাজূট, তরুরাজি যথা গিরিশিরে
ঘোর মড়মড় রবে নড়ে ভূকম্পনে।
অধীর হইলা প্রভু। গরজিলা ভালে
চিত্রভানু, ধকধকি উজ্জ্বল জ্বলনে।

এই সকল বর্ণনা পাশ্চাত্ত্য ভাবনায় ভাবিত হওয়ায় মূল আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু কালিদাসের প্রভাব ও দূরাগত ধ্বনিগুলি অস্পষ্ট হইয়া থাকে নাই।

মধুসূদনের উপর কালিদাসের সুস্পষ্ট প্রভাব পড়িয়াছে উপমাসৃষ্টিতে। প্রথম দিকের নাটকে ও কাব্যে মধুসূদন যে ‘Erotic Similes’ প্রয়োগ করিয়াছেন, বিশেষতঃ প্রেম বর্ণনায় চন্দ্র ও কমলিনীর প্রেমপ্রসঙ্গ, তাহা কালিদাস হইতেই গৃহীত। রাজনারায়ণ বসু এই সকল উপমা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করায় মধুসূদন লিখিয়াছিলেন ঃ You censure the erotic character of some of the allusions. Perhaps that is owing to a partiality for Kalidasa ঃ এখানে কালিদাসের প্রতি পক্ষপাতিত্বের স্পষ্ট উল্লেখ করা হইয়াছে। মধুসূদন অপর পত্রে জানাইয়াছিলেন ঃ In the present work (মেঘনাদবধ কাব্য) you will see nothing in the shape of "Erotic similes' ; no silly allusions to the loves of the Lotus and the Moon ; nothing about fixed lightnings...

কিন্তু মধুসূদন এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই। প্রেমবর্ণনায় কালিদাসের সুপ্রচলিত উপমাদ্বারা তিনি আগাগোড়া প্রভাবিত হইয়াছেন। প্রথমদিকের কাব্য-নাটকে তো বটেই, পরের দিকের রচনাবলীতেও এ প্রভাব বিদ্যমান। প্রেমের চাঞ্চল্য, স্পর্শকাতরতা, গভীরতা, নির্ভরতা ও তন্ময়তা বর্ণনায় কালিদাস (শুধু কালিদাস নয়, সংস্কৃত কবিমাত্রই)—চন্দ্র-কুমুদিনী, সূর্য-পদ্মিনী, চন্দ্র-রোহিণী চন্দ্র-রাত্রি, সমুদ্র-চন্দ্র, সমুদ্র-সরিৎ, বৃক্ষ-ব্রততী ও ভ্রমর-পুষ্পের প্রণয়কে উপমানরূপে গ্রহণ

করিয়াছেন। মধুসূদনের সমগ্র কবি-কৃতিতে এই প্রণয়সম্পর্কগুলি অমোঘ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে কালিদাসের প্রভাবই সমধিক। যথা,

কালিদাসে পাই 'অনপায়িনি সংশয়দ্রুমে গজভগ্নে পতনায় বল্লরী' [কুমার. ৪. ৩১] মধুসূদনে 'শুখাইলে তরুরাজ শুকায়রে' লতা [মেঘনাদবধ. ৯] ; মধুসূদনের তরঙ্গিণী সাগর-প্রিয়া—'পশিল সাগরে আসি রঙ্গে তরঙ্গিণী' [মেঘনাদবধ. ৩] কালিদাসে 'স্রোতোবহা সাগরগামিনীব' [রঘু. ৬. ৫২]; কালিদাস চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া বলেন, 'চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশি' [কুমার. ৩. ৬৭], অথবা 'উদম্বানিব চন্দ্রপাদৈঃ' [কুমার. ৭. ৭৩]—মধুসূদনে 'সুধাংশুর অংশুস্পর্শে যথা অম্বুরাশি' [মেঘাদবধ. ৩] ; কালিদাসে পাই, 'সূর্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বামভিখ্যাম্'—মধুসূদনে

সূর্যমুখী দুঃখী
মলিনবদনা, মরি, মিহির বিরহে। [মেঘনাদবধ. ৩]

কালিদাসে মেঘের কলত্র বিদ্যুৎ [উত্তরমেঘ. ৩৮] ; মধুসূদনেও মেঘনাদ-মেঘের প্রিয়া প্রমীলা-সৌদামিনী ঃ

যে মেঘের পাশে
প্রেমপাশে বাঁধা সদা সৌদামিনী [মেঘনাদবধ. ৩]

উপমা-সৃষ্টিতে পাশ্চাত্ত্য ভাব ও রচনাশৈলীদ্বারা প্রভাবান্বিত হইলেও প্রণয়োপমা সৃষ্টিতে মধুসূদনের মেজাজ কালিদাসের অনুসারী। মধুসূদন কোথাও কালিদাসের ঔপম্যগর্ভ বাচনভঙ্গীকে হুবহু গ্রহণ করিয়াছেন, কোথাও তাহার ভাব মাত্র গ্রহণ করিয়া নিজের পথে নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন। কালিদাস পার্বতীর রূপবর্ণনা করিতে গিয়া একটি সন্দেহালঙ্কার সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন, চঞ্চল নীলোৎপলনয়না পার্বতী কি তাঁহার দৃষ্টি হরিণীর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, না মৃগাঙ্গনাই তাহার ত্রস্তচঞ্চল দৃষ্টি পার্বতীর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে ! [কুমার. ১. ৪৬]। মধুসূদন এই ভাবেই একটি নিদর্শনা সৃষ্টি করিয়াছেন প্রমীলার রূপ-বর্ণনায় ঃ

উঠি দেখ, শশিমুখী, কেমনে ফুটিছে
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম। [মেঘনাদবধ. ৫]

॥ বিহারীলাল ও কালিদাস ॥

বাংলার গীতকবিতানিকুঞ্জে 'ভোরের পাখী' বিহারীলাল চক্রবর্তী। তাঁহার সমগ্র কাব্য ও কবিতায় কালিদাসের প্রভাব অসাধারণ। পূর্বে দেখান হইয়াছে, বিহারীলাল তাঁহার 'বন্ধুবিয়োগ', 'বঙ্গসুন্দরী', 'নিসর্গসন্দর্শন' প্রভৃতি কাব্যে ভাবানুষঙ্গে কালিদাসের কতিপয় শ্লোক বা শ্লোকাংশের উদ্ধৃতি দিয়াছেন। ইহা দ্বারা কবির চেতনায় কালিদাসের প্রভাব যে কত গূঢ়সঞ্চারী, তাহা অনুমান করা সম্ভব। যদিও

বিহারীলাল প্রায় সমস্ত সংস্কৃত কবিগণের কাব্যের সহিত পরিচিত ছিলেন, তথাপি কাব্যরচনায় ভবভূতি ও কালিদাসের প্রভাবই ছিল গুরুতর।

বিহারীলালের কবিতার প্রধান দুটি দিক : প্রেম ও প্রকৃতি। প্রেম-চিন্তায় কবির উপর কালিদাসের প্রভাব অল্প নয়। অবশ্য কালিদাসের কাব্যে প্রেমের নিবিড়তা অপেক্ষা দীপ্তি অধিক ; কালিদাসে বিপ্রলম্ভ অপেক্ষা সম্ভোগের অধিক সমাদর— এমন কি, বিপ্রলম্ভের শ্লোকগুলিও সম্ভোগবাসনায় ব্যাকুল। বিহারীলাল সেখানে প্রধানতঃ বিপ্রলম্ভ বা বিরহেরই কবি। মরমিয়া বাউলের মর্মস্পর্শী বিরহ-ক্রন্দন বিহারীলালের প্রেম-কবিতার অন্যতম ধ্বনি : কাজেই কালিদাসের সহিত কবির ভাব-সাযুজ্য সেইখানেই, যেখানে কালিদাসে আছে প্রেমের সূক্ষ্মতা, বিচিত্রতা ও গভীরতা, যেখানে প্রেম বিরহ-বেদনায় তন্ময় ও অধীর, যেখানে প্রেম সুন্দরের সহিত যুক্ত। কালিদাসে প্রেমের এই নিবিড় অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে—রতি-বিলাপে, জটিল তপস্বীর প্রশ্নে তাপসী উমার আচরণে ও প্রত্যুত্তরে, অজবিলাপে, পুরুরবার অধীর খেদে এবং মেঘদূতের বিরহীযক্ষের মূল দৌত্য-ভাষণে। বিহারীলালের প্রেম-কল্পনায় কালিদাসের এই অতি সুন্দর ভাবগুলিরই অশেষ প্রভাব। সারদামঙ্গলের 'মাথা থুয়ে পয়োধরে কোলে বীণা খেলা করে', কালিদাসের 'উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং' [উত্তরমেঘ. ২৫]—'কোন সুখ নাই মনে সব গেছে তার সনে' [সারদামঙ্গল. ২], রতিবিলাপের 'বঞ্চিত স্ত্বদধীনং খলু দেহিনাং সুখম্' [কুমার. ৪. ১০]—'কেমনে বা তোমা বিনে, দীর্ঘ দীর্ঘ রাত্রিদিনে, সুদীর্ঘ জীবনজ্বালা সব অকাতরে' [সারদামঙ্গল. ২], অজবিলাপের 'কথমত্যন্তগতা ন মাং দহে' [রঘু. ৮. ৫৬]—'বল দেবী মন্দাকিনী, ভেসে ভেসে একাকিনী, সোনামুখী তরীখানি গিয়াছে কোথায়' [সারদামঙ্গল. ৩], কালিদাসের 'কথং তুষ্ণীমেবাস্তে ! অথবা পরমার্থতঃ সরিদিয়ং, নোর্বশী। অন্যথা কথং পুরুরবসমপহায় সমুদ্রাভিসারিণী ভবেৎ।...ভবতু তমেব উদ্দেশং গচ্ছামি যত্র মে নয়নয়োঃ সা সুনয়না তিরোহিতা' [বিক্রমোর্বশী. ৪র্থ অংক] প্রভৃতি অংশের মিল সহজেই লক্ষণীয়। কালিদাস প্রেমের অমরাবতী চিত্রিত করিয়াছেন উত্তরমেঘের অলকা-বর্ণনায় : 'প্রেম-প্রবাহিনী' কাব্যের চতুর্থ সর্গে বিহারীলাল প্রেমের আবাসভূমির অনুসন্ধানে যাত্রা করিয়া কালিদাসের সেই অমর আলেখ্যটিকেই স্মরণ করিয়াছেন :

> হিমালয় শৃঙ্গে কুবেরের অলকায়,
> ছড়াছড়ি মণি চূর্ণ রয়েছে যথায়।...
> যথায় যৌবন ভিন্ন নাহিক বয়স,
> সুধারস ভিন্ন যাহে নাহি অন্যরস।
> প্রণয় কলহ ভিন্ন দ্বন্দ্ব নাই আর
> প্রেমঅশ্রু ভিন্ন নাহি বহে অশ্রুধার।...
> তথায় কি প্রেম সেই আমোদেতে মিশে
> বসি বসি হাসিখেলি করিছে হরিষে ?

এখানে বিহারীলাল কালিদাসের অমর শ্লোকাবলীর ভাবানুবাদ করিয়াছেন এবং প্রেমের স্বর্গ-কল্পনায় কালিদাসের সহিত সুগভীর সাযুজ্যের পরিচয় দিয়াছেন।

প্রকৃতি-দৃষ্টিতেও বিহারীলাল কালিদাসের সগোত্র। সংস্কৃত কাব্যে প্রকৃতির যে চিত্র আছে তাহাতে প্রকৃতির বস্তুরূপ অলঙ্কারসমৃদ্ধ ভাষায়, রঙে ও বিচিত্র রেখায় বর্ণিত। নিছক বস্তুবর্ণনা হিসাবে তাহাতে সূক্ষ্ম বাস্তব দৃষ্টিরও অসদ্ভাব নাই। কোথাও এই প্রকৃতি মানব-হৃদয়ের প্রেমোৎকণ্ঠাকে উদ্দীপিত করিবার উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু মানব-মনের সহিত তাহার অন্তরঙ্গ যোগ কিংবা অনুভূতির সহিত তাহার আত্মীয়তার সম্পর্ক তেমন প্রদর্শিত হয় নাই। এ বিষয়ে কালিদাস ব্যতিক্রম। তাঁহার কাব্যে ও নাটকে প্রকৃতি যেন মানবজীবনের অন্তরঙ্গ মর্মসঙ্গী। প্রকৃতির সহিত মানুষের সোদরস্নেহ বা সখ্য-প্রীতির সম্পর্ক। দুঃখের দিনে প্রকৃতি তাহার সমব্যথী, সুখের দিনে সুখের ভাগী। অবশ্য প্রকৃতির লাস্যময়ী প্রগল্ভ রূপও কালিদাস দেখিয়াছেন—আবার প্রকৃতির দরদী মূর্তিও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। কালিদাসের সহিত বিহারীলালের সাদৃশ্য এই অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার দিক হইতে। কালিদাসের হিমালয় বর্ণনা [কুমার. ১] বিহারীলালকেও মুগ্ধ করিরাছে ঃ সারদামঙ্গল কাব্যের চতুর্থ সর্গের হিমালয় বর্ণনায় কালিদাসের প্রভাব সহজ লক্ষ্য। হিমালয়ের সেই 'মহানমূর্তি', সেই 'মহানস্ফূর্তি', 'উথলে উঠেছে যেন অনন্ত জলধি'—কালিদাসের 'পূর্বাপরৌ তোয়নিধাবগাহ্য স্থিতঃ পৃথীব্যা ইব মানদণ্ডঃ' নগাধিরাজের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 'আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাং' [কুমার.] কিংবা 'বপ্রক্রীড়া পরিণত গজ প্রেক্ষণীয়ং' [পূর্বমেঘ] প্রভৃতি উক্তির প্রতিরূপ এই বর্ণনা,—

সানু আলিঙ্গিয়ে করে শূন্যে যেন বাজি করে
বপ্রকেলি কুতূহলে মত্ত করিগণ ;
নবীন নীরদমালা সঙ্গে সঙ্গে করে খেলা
দশন বিজলী-ঝালা ঝলসে কেমন।

হিমালয়-শিখরের 'বলাহকচ্ছেদবিভক্তরাগান্', 'মুহুঃকম্পিতদেবদারুঃ', 'কুর্বন্তি বাল-ব্যজনৈশ্চমর্যাঃ' প্রভৃতির বর্ণনাসাম্য লক্ষ্য করা যায়—'এই গণ্ডশৈলশিরে...বিকশে গৈরিক ঘটা ছটা রক্তময়', 'কিবা ওই মনোহারী দেবদারু সারি সারি' এবং 'অনিলে চামর চলে চন্দ্রিমালহরী' প্রভৃতি বর্ণনায়। রঘুর সমুদ্রবর্ণনার কতকগুলি চিত্রও বিহারীলালের 'সমুদ্রদর্শন' বা 'নভোমণ্ডল' কবিতায় স্থান লাভ করিয়াছে।

কিন্তু প্রকৃতিবর্ণনায় এই বস্তুগত সাদৃশ্য নিতান্ত বহিরঙ্গ সাদৃশ্য। কালিদাস মানুষের জীবনে প্রকৃতির যে আত্মীয়যোগ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই আত্মীয়যোগের স্বীকৃতিতেই কালিদাসের সহিত বিহারীলালের শরিকানী সম্পর্ক। পার্থক্য এই যে, কালিদাস প্রকৃতির সহিত মানুষের সম্পর্ক দেখাইয়াছেন নিজেকে দূরে রাখিয়া, বিহারীলাল সেখানে নিজেকে প্রকৃতির মধ্যে বিলীন করিয়া দিয়া এই যোগ নিজেরই অন্তরে অনুভব করিয়াছেন, বলিয়াছেন ঃ 'প্রণয় করেছি আমি প্রকৃতি রমণীসনে।' কালিদাস নৈর্ব্যক্তিক, বিহারীলাল ব্যক্তিনিষ্ঠ।

॥ কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ ॥

সংস্কৃত রসসাহিত্যের সহিত নব পরিচয়ের সূত্রে বাংলা সাহিত্য সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাবান্বিত হইয়াছে কালিদাসের ভাবে। কালিদাসের সহিত বাঙালীর যোগ অন্তরঙ্গ। একথা বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না যে, বঙ্কিমচন্দ্রের বনদুহিতা কপালকুণ্ডলা, কালিদাসেবই শকুন্তলার দ্বিতীয় প্রতিরূপ। কালিদাসের 'শকুন্তলা'-নাটক বাংলার সমালোচনা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। ঊনবিংশ শতকের একাধিক সমালোচনামূলক প্রবন্ধ 'শকুন্তলা'কে কেন্দ্র করিয়া রচিত। তন্মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'শকুন্তলা মিরন্দা এবং দেসদিমোনা', চন্দ্রনাথ বসুর 'অভিজ্ঞান শকুন্তলের অর্থ' প্রভৃতি প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কালিদাসের সহিত রবীন্দ্রনাথের যোগ। অবশ্য সংস্কৃত রসসাহিত্যের অন্যান্য কবির সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথেব পরিচয ছিল। জীবনস্মৃতি হইতে জানা যায়, জয়দেবের ছন্দ ও শব্দঝংকাব কিভাবে ববীন্দ্রনাথের কিশোর চিত্তকে আলোড়িত করিয়াছিল। গীতগোবিন্দের 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতায়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং'—এই লাইনটি কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনে সৌন্দর্যের উদ্রেক করিত এবং ইহার ছন্দঝংকারে তিনি মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। শৈশব রচনায়, বিশেষ করিয়া 'ভানুসিংহঠাকুরের পদাবলী'তে জয়দেবের ললিত পদের ঝংকার বাজিয়া উঠিয়াছে। জয়দেবের 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরং' শ্লোক রবীন্দ্রনাথের মনে যে কি গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায 'মানসী'র 'মেঘদূত' কবিতায়ঃ কবির গৌরব, তিনি জয়দেবের দেশের কবি। রবীন্দ্রনাথের বসন্ত বর্ণনায়, বাসকসজ্জা বা বিপ্রলব্ধা নায়িকার বর্ণনায় জয়দেবের শব্দঝংকার ও চিত্রের প্রচুর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বয়ঃসন্ধিকালে রবীন্দ্রনাথ হেবলিন সম্পাদিত 'সংস্কৃত কাব্য সংগ্রহ গ্রন্থ' পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, এই গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে 'সংস্কৃত কাব্যের ধ্বনি ও ছন্দের গতি আমাকে কতদিন মধ্যাহ্নে অমরুশতকের মৃদঙ্গাঘাত গম্ভীর শ্লোকগুলির মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরাইয়াছে।' [জীবনস্মৃতি]। তিনি যে কেবল এই শ্লোকগুলির' মৃদঙ্গাঘাত' গম্ভীর ঝংকার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহা নয়—অমরুশতকের ভাবও তাঁহার কাবিচিত্তে আসন গাড়িয়া বসিয়াছিল। 'চিরকুমারসভা'য় অমরুর এই শ্লোকটির এইরূপ অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন ঃ

> বরমসৌ দিবসো ন পুনর্নিশা ননু নিশৈব বরং ন পুনর্দিনম্।
> উভয়মেতদপি ব্রজতু ক্ষয়ং প্রিয়তমেন ন যত্র সমাগমঃ ॥ [অমরু]

> আসেতো আসুক রাতি আসুক বা দিবা
> যায় যদি যাক নিরবধি
> তাহাদের যাতায়াতে আসে যায় কিবা
> প্রিয়া মোর নাহি আসে যদি। [রবীন্দ্রনাথ]

রবীন্দ্রনাথে বাণভট্টের প্রভাবও অল্প নয়। বাণভট্টের 'কাদম্বরী' কাব্যে অচ্ছোদ-

সরোবরের তীরে মহাশ্বেতার বীণাবাদনরতা স্বপ্নময়ী মূর্তি এক অপার বিস্ময়। ঠিক এই চিত্রটিরই প্রতিরূপ দেখি 'চিত্রা'র 'প্রেমের অভিষেক' কবিতায় ঃ

মহারণ্যে যেথা
বীণা হস্তে লয়ে, তপস্বিনী মহাশ্বেতা
মহেশ-মন্দিরতলে বসি একাকিনী
অনন্ত বেদনা দিয়ে গড়িছে রাগিণী
সান্ত্বনা-সিঞ্চিত।

'চিত্রা'র 'বিজয়িনী' কবিতার 'অচ্ছোদসরসীনীরে' রহস্যময়ী ভুবনমোহিনী রমণীর আলেখ্যও কাদম্বরী কাব্যের মহাশ্বেতা-স্মৃতির আলেখ্য। কাদম্বরী কাব্যের বাগ্ভঙ্গি ও চিত্রাঙ্কন-দক্ষতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ চমৎকার আলোচনা করিয়াছেন 'প্রাচীন সাহিত্য'র অন্তর্গত 'কাদম্বরী' প্রবন্ধে। 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে আসিয়াছে কাদম্বরী কাব্যের রাজকুমার চন্দ্রাপীড়ের 'তাম্বূল করঙ্কবাহিনী' নিত্য সহচরী 'পত্রলেখা' চরিত্রের আলোচনা। এই সকল আলোচনা হইতে সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত রবীন্দ্রমানসের নিবিড় যোগের পরিচয় পাওয়া যায়। এই রসযোগকে রবীন্দ্র-নাথ স্বরচনায় প্রতিফলিত করিয়াছেন স্বকীয় কৌশলে। ইহা যেমন রবীন্দ্রনাথকে নব নব কল্পনায়, নব নব ভাবোদ্বোধনে সহায়তা করিয়াছে, তেমনই সংস্কৃত সাহিত্য যেন নব তাৎপর্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাস্পর্শে।

সকল কবির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রিয়তম কবি মানসলোকের 'চিরকবি' 'কবিপতি' কালিদাস। রবীন্দ্র-রচনায় এই প্রিয়-যোগের প্রকাশ বহুবিচিত্র। কালিদাসের যুগ ও কবি-প্রকৃতির সহিত কয়েকটি দিক হইতে রবীন্দ্রনাথের যুগ ও কবি-প্রকৃতিরও সাদৃশ্য আছে ঃ

১. কালিদাসের যুগ ভারতবর্ষের পক্ষে একটি পুনর্জাগরণের যুগ। ইহা ছিল গুপ্ত-অধিকার কাল। এই যুগে হিন্দুত্বের পুনরভ্যুত্থান ঘটে। প্রাচীন হিন্দু-ধর্মের ঐশ্বর্য ও দীপ্তি—তাহার শাস্ত্র, জ্যোতিষতত্ত্ব, চিকিৎসাবিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্যকে ভারতবাসী এই যুগে নূতন করিয়া আবিষ্কার করে। এই আবিষ্কারের উল্লাস গুপ্তযুগের স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও সাহিত্য। অজন্তার গিরিগুহায়, ইলোরার পাহাড়-গহ্বরে এই যুগের শিল্প-চিহ্ন আজিও অম্লান। কালিদাস এই যুগের প্রতিভূ ঃ তাঁহার সাহিত্য এই যুগের সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথের যুগেও ভারতবর্ষের এক নব জাগ্রত অবস্থা। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে ঘুমন্ত পুরীতে জাগরণের বিপুল কোলাহল। রবীন্দ্র-রচনায় সেই জাগরণের চিহ্ন অতি স্পস্ট। এই যুগের ব্যবধান সার্ধসহস্রবৎসর, কিন্তু নব জাগরণের স্পর্শোল্লাস উভয়স্থলে প্রায় এক।

২. কালিদাস যে সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা ছিল সৌন্দর্য-উপাসনার যুগ। নৃত্য, গীত, শিল্প—এক কথায় চতুঃষষ্টি কলার তখন পূর্ণ বিকাশ। তখন সুন্দরের সঙ্গে সুরুচির মেলবন্ধনের তাগিদ।

রবীন্দ্রনাথ যে পরিবেশে প্রবৃদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই ঠাকুর-পরিবারও ছিল সেযুগে রুচিসঙ্গত সৌন্দর্য-সাধনার কেন্দ্র। সঙ্গীতে, শিল্পচর্চায়, সাহিত্য-সৃষ্টিতে ঠাকুরবাড়ী সুন্দরের ধ্যানে মগ্ন। রবীন্দ্রনাথ এই সৌন্দর্য-চেতনায় লালিত। এই দিক হইতে তিনি কালিদাসের সগোত্র। উভয়েই সুন্দরের একনিষ্ঠ সাধক।

৩. এই সৌন্দর্য-সাধনায় আর একটি দিক হইতে কালিদাসের সহিত রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য রহিয়াছে। কালিদাসের যুগেও সৌন্দর্য-সম্ভোগ ও প্রেমচর্চা বিহ্বলতামুক্ত ছিল না। গান্ধর্ববেদে নরনারীর দীক্ষা তখন সম্পূর্ণ, বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রের চর্চাও সর্বত্র অবারিত। জনপদ ভোগচঞ্চল, নগরে কৃত্রিম নাগরবৃত্তির বিলাস, শুদ্ধান্তের প্রমোদোদ্যানে মদনমহোৎসবের বিক্রিয়া, অন্তঃপুরে উপেক্ষিতা হংসপদিকাদের গান। কালিদাস এই ইন্দ্রিয়জ সৌন্দর্য-সম্ভোগ ও কামকলাবিলাসের চিত্র অংকন করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি সুস্থ প্রেম-জীবনের ইঙ্গিতও প্রদান করিয়াছেন। তিনি শুনাইয়াছেন, অভোগদ্বারা স্নেহ প্রেমরাশিতে পরিণত হয় ['তে ত্বভোগাদিষ্টে বস্তুন্যপচিতরসাঃ প্রেমরাশীভবন্তি'—উত্তরমেঘ. ৫১], তিনি দেখাইয়াছেন 'ভোগেষ্বনুৎসেকিনী' মহিলাই গৃহিণীপদের যোগ্যা হন [শকুন্তলা], আর দেখাইয়াছেন পবিত্র দাম্পত্য বন্ধনের দ্বারা 'কুমারসম্ভবেই' নারীর নারীত্বে প্রতিষ্ঠা।

রবীন্দ্রনাথের প্রেম-চিন্তায় ও সৌন্দর্য-সম্ভোগে এই 'অভোগ', এই ত্যাগ, এই পবিত্র মঙ্গলবন্ধন স্বীকৃত হইয়াছে। কালিদাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করিয়াছিলেন,—'সৌন্দর্যচাঞ্চল্যের মাঝখানে ভোগ বৈরাগ্য স্তব্ধ হইয়া আছে', [প্রাচীন সাহিত্য ঃ কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা] সেই মন্তব্য রবীন্দ্রনাথের প্রতিও প্রযোজ্য। শ্রদ্ধেয় ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ঠিকই বলিয়াছেন, 'সম্পদে অপ্রমত্ততা, প্রাচুর্যে অপূর্ব সংযম, বৈচিত্র্য-বিলাসের ভিতরে সুনিপুণ বৈদগ্ধ্য রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মকে কালিদাসের কবিধর্মের একান্ত সজাতীয় করিয়া তুলিয়াছিল, তাই উভয়ের আত্মীয়তাও এত গভীর'।[১]

৪. আর একটি দিক হইতে কালিদাসের সহিত রবীন্দ্রনাথের সাধর্ম্য লক্ষণীয়। কৃত্রিম নাগরবৃত্তি ও নগরের কলকোলাহলের বিরুদ্ধে কালিদাসের মনে একটি অভিযোগ ছিল। কণ্ব-শিষ্য শার্ঙ্গরবের মুখে তিনি বলাইয়াছেন, 'জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরিতং গৃহমিব'—জনাকীর্ণ রাজবাড়ীকে একটি অগ্নিবেষ্টিত গৃহ বলিয়া মনে হইতেছে। শারদ্বত বলিয়াছেন, নগরের সুখমগ্ন লোকগুলিকে অস্নাত (অভ্যক্তম্), অশুচি, সুপ্ত ও বদ্ধ বলিয়া মনে হইতেছে [শকুন্তলা. ৫ম অংক] এই ভোগমগ্ন কৃত্রিম নগরজীবন হইতে কালিদাসের সতৃষ্ণ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে শান্তরসাস্পদ তপোবনের মনোরম অরণ্য-শ্রী এবং নিঃসীম প্রশান্তির প্রতি।

রবীন্দ্রনাথও ভোগচঞ্চল কৃত্রিম নাগরসভ্যতাকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন; লক্ষ্য করিয়াছিলেন, ইট-কাঠ-প্রস্তরের অন্তরালে নিষ্প্রাণ মানুষের অস্বাভাবিক স্বার্থপরতা

---

১. ত্রয়ী—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

ও সংকীর্ণতা ঃ ['ইঁটের পরে ইঁট, মাঝে মানুষ কীট, নাইকো ভালবাসা নাইকো খেলা']। তাঁহারও মন কাঁদিয়া উঠিত সহরের বন্ধন হইতে শান্ত, উদার প্রকৃতির মধ্যে মুক্তির জন্য ঃ

হায়রে রাজধানী পাষাণ কায়া।...
কোথা সে খোলা মাঠ উদার পথ ঘাট
পাখির গান কই বনের ছায়া। [মানসী ঃ বধূ]

কলকোলাহলময় প্রস্তরের বন্ধন হইতে প্রকৃতির কোলে মুক্তির আকূতি রবীন্দ্রনাথের সহজাত। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি বলিয়াছেন, বাড়িতে ছিল কড়িবরগা-দেয়ালের বন্ধন—এই 'বাড়ির বাহিরে যাওয়া আমাদের বারণ ছিল...সেই জন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বন্ধ—মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল।'

৫. বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি কালিদাসের যে নাড়ির টান ছিল, আবাল্য রবীন্দ্রনাথেরও সেই আকর্ষণ ছিল প্রকৃতির প্রতি। প্রকৃতি-দৃষ্টিতে উভয়কবি সমান-ধর্মা। এ বিষয়ে অপূর্ব প্রাকৃতিক শ্রী-সমৃদ্ধ ভারতবর্ষের চিরাগত প্রকৃতি-প্রীতিই উভয়ের সাধারণ সংস্কারলব্ধ সম্পদ।

৬. আরও একটি দিক হইতে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের সগোত্র। কালিদাস 'জন্মান্তর সঙ্গতিজ্ঞ' ঃ সুন্দর-দর্শনে তাঁহার মনে জন্মান্তর সৌহৃদের কথা স্মরণ হয়। এই দার্শনিকতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে শকুন্তলা নাটকে হংসপদিকার সঙ্গীত শ্রবণে রাজা দুষ্মন্তের উক্তিতে ঃ

রাজা।—(আত্মগতম্) কিংনু খলু গীতমাকর্ণ্য ইষ্টজন-বিরহাদৃতেঽপি বলবদুৎকণ্ঠিতোঽস্মি। অথবা—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধ পূর্ব্বং
ভাবস্থিরানি জননান্তর সৌহৃদানি॥ [শকু. ৫ম অঙ্ক]

—একি, এই গীত শ্রবণ করিয়া বিরহহীন অবস্থাতেও হৃদয় উৎকণ্ঠিত হইতেছে কেন? অথবা রম্যদৃশ্য দর্শন করিয়া বা মধুর কোন শব্দ শ্রবণ করিয়া সুখীজনের হৃদয়ও যে আকুল হয়, তাহার কারণ, নিশ্চয় হৃদয়ে তখন অজ্ঞাতসারে জন্মান্তরের কোন ভাবস্থির সৌহার্দ্যের স্মৃতি জাগিয়া উঠে!

ঠিক এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় 'মেঘদূত' কাব্যে ঃ

'মেঘলোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ' [পূর্বমেঘ. ৩]

মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকেও ঃ

'অনিমিত্তোৎকণ্ঠামপি জনয়তি মনসো মলয়বাতঃ' [মাল. ৩য় অঙ্ক]

সুন্দর-দর্শনে এই অনিমিত্ত উৎকণ্ঠা ও জন্মান্তর স্মৃতির উদ্বোধন রবীন্দ্র-

নাথেরও একটি স্বতঃস্ফূর্ত মানস প্রবণতা। কোন প্রভাবের অপেক্ষা না রাখিয়া এই প্রবণতা শৈশব হইতেই রবীন্দ্রনাথের মনে সঞ্চারিত হইয়াছে। শৈশবে 'জল পড়ে পাতা নড়ে' পড়িয়া, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' ছড়া শুনিয়া—ঘাটবাঁধানো পুকুর, চীনা বট, দক্ষিণের নারিকেলশ্রেণী, 'সিঙ্গীর বাগান' দেখিয়া শিশুর মনে যে গভীর ঔৎসুক্য-উৎকণ্ঠা জাগিয়া উঠিত জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ তাহার বর্ণনা দিয়াছেন ঃ

'মাথার উপরে আকাশব্যাপী খরদীপ্তি, তাহারই দূরতম প্রান্ত হইতে চিলের সূক্ষ্ম তীক্ষ্ন ডাক আমার কানে আসিয়া পৌঁছিত এবং সিঙ্গির বাগানের পাশের গলিতে দিবাসুপ্ত নিস্তব্ধ বাড়িগুলার সম্মুখ দিয়া পসারী সুর করিয়া 'চাই চুড়ি চাই, খেলনা চাই' হাঁকিয়া যাইত—তাহাতে আমার সমস্ত মনটা উদাস করিয়া দিত।' [জীবনস্মৃতি]

এই উৎকণ্ঠার 'অবোধপূর্ব' প্রকাশ দেখি সন্ধ্যাসঙ্গীতের 'সন্ধ্যা' নামক প্রথম কবিতাটিতেই ঃ সন্ধ্যার গান শুনিয়া কবি বলিয়া উঠেন,

যেন কী পুরনো স্মৃতি
জাগিয়া উঠেরে ওই গানে।

কালিদাসের কবি-প্রকৃতির সহিত রবীন্দ্রনাথের এই সাদৃশ্য রবীন্দ্রনাথকে আরও বেশি করিয়া কালিদাসের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে ঃ এ যেন জন্মান্তরের 'সঙ্গতি'। 'মনোহি জন্মান্তরসঙ্গতিজ্ঞম্'—মনই জন্মান্তরের এই 'সঙ্গতি'র কথা জানাইয়া দেয়।

শৈশবেই রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের ছন্দ ও শব্দঝঙ্কারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন ঃ মুলাজোড়ে গঙ্গার ধারে মেঘোদয়ে বড়দাদার মুখে মেঘদূতের আবৃত্তি শুনিয়াছিলেন। আবৃত্তির বিষয় তিনি বুঝেন নাই—'তাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই এবং বুঝিবার উপায়ও ছিলনা—তাঁহার আনন্দ-আবেগ পূর্ণ ছন্দ-উচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।' [জীবনস্মৃতি]। তাহার পরে আরও একটু বড় হইয়া তিনি পড়িয়াছিলেন কুমারসম্ভবের 'মন্দাকিনী[১] নির্ঝরশীকরাণাং বোঢ়া মুহুঃ কম্পিত দেবদারুঃ' শ্লোকটি ঃ 'এই শ্লোকটি পড়িয়া একদিন মনের ভিতরটা ভারি মাতিয়া উঠিয়াছিল। আর কিছুই বুঝি নাই—কেবল 'মন্দাকিনীনির্ঝরশীকর' এবং 'কম্পিত দেবদারু' এই দুইটি কথাই আমার মন ভুলাইয়াছিল। [জীবনস্মৃতি].

কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে পাইয়াছিলেন 'আভাসে' ঃ তিনি বলেন, না বুঝিয়াও 'এই আভাসে পাওয়ার মূল্য অল্প নহে।' ছন্দ ও শব্দ-ঝঙ্কারের ভিতর দিয়া এ যেন জন্মান্তরের সুহৃদের সঙ্গে চির পুরাতন নব পরিচয়—রহস্য-বিস্ময়ের প্রথম যোগ।

তাহার পর এই যোগ ঘনিষ্ঠ হইয়াছে। আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহাকে অর্থ করিয়া 'কুমারসম্ভব' পড়াইয়াছিলেন। কুমারসম্ভব তিন সর্গ যতটা পড়াইয়াছিলেন, তাহার আগাগোড়া সমস্তই তাঁহার

১. মূলের পাঠ 'ভাগীরথী নির্ঝরশীকরাণাং' ইত্যাদি।

মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। রামসর্বস্ব পণ্ডিত মহাশয় অর্থ করিয়া তাঁহাকে শকুন্তলা পড়াইতেন। এইভাবে 'রসতীর্থপথের পথিক' ঊনবিংশ শতকের কিশোর রবীন্দ্র-নাথের ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হইয়াছে পঞ্চম শতকের আর এক রসতীর্থ পথের প্রবীণ-পথিক কালিদাসের সহিত। আত্মা তাঁহার আত্মীয়কে চিনিয়া লইয়াছে ঃ স্বাভাবিক সৌন্দর্য-চেতনা যুগান্তরের ব্যবহিত দুই সৌন্দর্য সাধককে এক অব্যবহিত যোগে আবদ্ধ করিয়াছে। শৈশবে যাঁহাকে পাইয়াছিলেন 'আভাসে', 'সুরে'—বয়ঃসন্ধি-কালে ('ছবি ও গান'-এর যুগে) তাঁহাকেই পাইয়াছেন রূপ-পিয়াসীর রূপলোকে—অনুদ্দিষ্ট প্রেম-নায়িকার রহস্যময় কল্পনায় ঃ

ওই জানালার কাছে বসে আছে
করতলে রাখি মাথা। [ছবি ও গান ঃ সুখস্বপ্ন]

মধুর আবেশে 'আধমুকুলিত আঁখিয়া' এই নায়িকা দুষ্মন্তের স্বপ্নে বিভোর 'বামহত্থোবহিদবঅণা আলিহিদা বিঅ' শকুন্তলারই ছায়া। এই ছায়া আরও স্পষ্ট 'জাগ্রত স্বপ্ন' কবিতায় ঃ

কুসুম শয়নে আধেক মগনা
বাকল বসনে আধেক নগনা
সুখদুখ গানে গাইছে শুইয়া
গাঁথিতে গাঁথিতে মালা।

এই ছবি আরও সুস্পষ্ট 'মধ্যাহ্নে' কবিতায় ঃ

বুঝিরে এমনি বেলা ছায়ায় করিত খেলা
তপোবনে ঋষি বালিকারা,
পরিয়া বাকলবাস মুখেতে বিমল হাস
বনে বনে বেড়াইত তারা।
হরিণ শিশুরা এসে কাছেতে বসিত ঘেঁষে
মালিনী রহিত পদতলে
দুচারি সখীতে মেলি কথা কয় হাসি খেলি
তরুতলে বসি কুতূহলে।

[প্রথম অঙ্কে স-সখী শকুন্তলার চিত্র ও ষষ্ঠ অঙ্কে 'কার্য্যা সৈকত-লীলহংস-মিথুনা স্রোতবহা মালিনী' শ্লোকের প্রতিচ্ছবি]

সমগ্র রবীন্দ্র-রচনায় এই ধরণের প্রচুর ছবি আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ রস-চেতনাতেও এই ছবি বর্ণশাবল্যে চিত্রিত।

রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও সৌন্দর্য-চেতনাকে সর্বাপেক্ষা বেশি উদ্বুদ্ধ করিয়াছে কুমারসম্ভব', 'শকুন্তলা' ও 'মেঘদূত' এবং তাঁহার প্রকৃতি-দৃষ্টিতে নবাঞ্জন মাখাইয়া দিয়াছে 'মেঘদূত' ও 'ঋতুসংহার'। রঘুবংশের প্রসঙ্গ রবীন্দ্ররচনায় অতি অল্প ঃ চৈতালির 'তপোবন' ও 'প্রাচীনভারত' কবিতায় রঘুবংশের দুই একটি চিত্রের আভাস পাওয়া যায়। বিক্রমোর্বশী নাটকের প্রসঙ্গ নাই বলিলেও চলে। রবীন্দ্রনাথের

উর্বশী-কল্পনার উৎস স্বতন্ত্র। 'কড়ি ও কোমলে'র 'যৌবন-স্বপ্ন' কবিতায় উর্বশী-পাগল পুরূরবার যেন প্রকাশ হইয়াছে মুহূর্তের জন্য :

কে আমারে করেছে পাগল—শূন্যে কেন চাই আঁখি তুলে।
যেন কোন্ উর্বশীর আঁখি চেয়ে আছে আকাশের মাঝে।

রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কল্পনায় নূতন রঙ ধরাইয়া দিয়াছে 'কুমারসম্ভব' কাব্য। অবশ্য রবীন্দ্ররচনায় যে-কোন প্রভাব বিচারে একটি কথা স্মরণীয় ; সৃষ্টির প্রেরণা কবির নিজস্ব, তাহা একান্তই আপন অন্তরের সামগ্রী। কবির সৃষ্টিতে বাইরের রঙের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাকেও কবি নিজের মনের রঙে ছোপাইয়া লন এবং নিজের রুচি, বিশ্বাস ও অনুভব দ্বারা এমন ভাবে গ্রহণ করেন যে, তাহা যেন একটি ফুলের পাশে আর একটি ফুল হইয়া ফুটে। রবীন্দ্র-রচনায় কালিদাসের প্রভাব মানে, রবীন্দ্র-মনো-মুকুরে কালিদাসের নব আবির্ভাব, নব সমালোচন। রবীন্দ্রনাথের কালিদাস, রবীন্দ্র মানস-ধৃত কালিদাস ; রবীন্দ্র-রচনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে কাব্য, তাহাও রবীন্দ্র-কৃত কালিদাসের কাব্য-ভাষ্য।

'কুমারসম্ভব' কাব্যে কবি লক্ষ্য করিয়াছেন, কামনার উল্লাস ও পতন, দুঃখের তপশ্চর্যা ও প্রেমের অভ্যুদয়। কালিদাসের প্রেম-কল্পনায় তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন, মর্ত্যের আবিলতা ও স্বর্গের পবিত্রতা। এই আবিষ্কারে জার্মান কবি গ্যেটের মননের ছায়া আছে : গ্যেটে বলেন, শকুন্তলা নাটকে আছে মর্ত্য ও স্বর্গের সমসূত্রযোগ, আছে যৌবনের উদ্দামতা ও বার্ধক্যের প্রশান্তি।

গ্যেটের এই মন্তব্য রবীন্দ্রনাথ নিজচিন্তার সমর্থন রূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন, কালিদাস যেন মর্ত্য ও স্বর্গের এই লীলাযোগ দেখাইবার জন্যই কাব্য রচনা করিয়াছেন : 'যে প্রেমের কোনো বন্ধন নাই, কোনো নিয়ম নাই, যাহা অকস্মাৎ নরনারীকে অভিভূত করিয়া সংযম দুর্গের ভগ্ন প্রাকারের উপর আপনার জয়ধ্বজা নিখাত করে, কালিদাস তাহার শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কাছে আত্মসমর্পন করেন নাই।...শান্তির মধ্যেই সৌন্দর্যের পূর্ণতা, বিক্ষোভের মধ্যে নহে। কালিদাস তাঁহার কাব্যের রসপ্রবাহকে সেই স্বর্গমর্ত্যব্যাপী সর্বাঙ্গসম্পন্ন শান্তির মধ্যে মিলিত করিয়া তাহাকে মহান্ পরিণাম দান করিয়াছেন।' [প্রাচীন সাহিত্য : কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা]।

কালিদাসের কাব্য হইতে এই যে আদর্শ প্রেমের দৃষ্টান্ত আবিষ্কার, ইহা রবীন্দ্র-প্রেমচিন্তারই বহিঃপ্রকাশ। কেবল 'কুমারসম্ভব' কাব্যে নয়, 'শকুন্তলা' নাটকে ও 'মেঘদূত' কাব্য হইতেও রবীন্দ্রনাথ এই প্রেম-নির্যাস বাহির করিয়াছেন, বলিয়াছেন, 'তিনি দেখাইয়াছেন, যে অন্ধ প্রেমসম্ভোগ আমাদিগকে স্বাধিকার-প্রমত্ত করে, তাহা ভর্তৃশাপের দ্বারা খণ্ডিত, ঋষিশাপের দ্বারা প্রতিহত এবং দেবরোষের দ্বারা ভস্মসাৎ হইয়া থাকে।' [ঐ]

প্রেমসম্পর্কে এই চিন্তা রবীন্দ্রনাথের স্বানুভবেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, দেহসম্ভোগলোলুপ উন্মত্ত কামনা প্রেম নয়, 'বাসনা-নিশ্বাস' পবিত্র

প্রেমে গরল বর্ষণ করে : পবিত্র প্রেম অন্ধকারের আলো—'এনহে খেলার ধন, যৌবনের আশ...এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল আশ্বাস।' [কড়ি ও কোমল : পবিত্র জীবন]। এই প্রেমচিন্তায় কালিদাসের রঙ ধরিয়াছে, আবার কালিদাস নববর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়াছেন রবীন্দ্রনাথের অনুভবজাত প্রেম-কল্পনা দ্বারা। তখন কালিদাসের শিবের তপস্যা, মদনভস্ম, উমার তপশ্চরণ ও গৌরীর মিলন নব তাৎপর্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কবির প্রেমরাজ্যের সাতমহলা রহস্যদুয়ার উন্মুক্ত হওয়ায় কবিও নব নব ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। এক মদনভস্ম ঘটনাকে অবলম্বন করিয়াই কত বিচিত্র ভাবের বিস্তার :

প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথের মতে 'মদনভস্ম' হইল ভোগচঞ্চল কামনার নিঃশেষ অবসান। যতক্ষণ মদনের তাড়না ততক্ষণ ইন্দ্রিয়জ ভোগের মোহ—ততক্ষণ পবিত্র মঙ্গলজনক প্রেমেরও অসম্ভাব। মদনকে ভস্মসাৎ করিয়াই কল্যাণকর প্রণয়ের স্বাদ লাভ করা সম্ভব : 'সন্তানের জন্ম আমাদের দেশে একটি পবিত্র মঙ্গলব্যাপার।...মদন গোপনে শর নিক্ষেপ করিয়া ধৈর্যবাধ ভাঙ্গিয়া যে মিলন ঘটাইয়া থাকে তাহা পুত্রজন্মের যোগ্য নহে ; সে মিলন পরস্পরকে কামনা করে, পুত্রকে কামনা করে না। কুমার জন্মব্যাপারটা কী, তাহাই বুঝাইতে কবি মদনকে দেবরোষানলে আহুতি দিয়া অনাথা রতিকে বিলাপ করাইয়াছেন।' [প্রাচীন সাহিত্য—কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা]

দ্বিতীয়তঃ 'মদনভস্ম' স্থূলতা হইতে সূক্ষ্মতায়, মূর্তি হইতে ভাবে, দেহ হইতে দেহাতীতে, সীমা হইতে অসীমে মুক্তির প্রতীক। 'কল্পনা'র 'মদনভস্মের পূর্বে' ও 'মদনভস্মের পরে' কবিতাদ্বয়ে রবীন্দ্রনাথ মদনভস্মকে কেন্দ্র করিয়া এই দার্শনিক মনোভাবকে প্রকাশ করিয়াছেন। এখানেও প্রথম ভাবেরই সম্প্রসারণ। একদিন মদনের অঙ্গ ছিল, সেদিন 'বকুলবনে পবন হত সুরার মত সুরভি,' সেদিন ব্যাকুল বাসনার প্রকাশ্য সঞ্চরণ, কিন্তু মদন ভস্মীভূত হওয়ায় বিরহের মধ্যে প্রেম আজ ইঙ্গিতময়, প্রেম আরও সূক্ষ্ম ও গভীর—শুধু তাই নয় সীমিত প্রেম আজ অসীমে ব্যাপ্ত :

> পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী
> বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।

তৃতীয়তঃ 'মদনভস্মে'র ঘটনা হইতেছে, রুদ্রের সুন্দরের নিকট পরাভূত হইবার একটা কৌশল মাত্র, মদনকে দ্বিগুণতর ঔজ্জ্বল্যে প্রকাশ করিবার একটি উপায়। 'পূরবী'র 'তপোভঙ্গ' কবিতায় মদনভস্মের এই নূতন তাৎপর্য :

> হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব,
> সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
> ছদ্মরণবেশে।
> বারে বারে পঞ্চশরে
> অগ্নিতেজে দগ্ধ করে
> দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি বারে বারে বাঁচাইবে শেষে।

চতুর্থতঃ অঙ্গধর মদন হইতেছে শুষ্কতা, খর্বতা, অহংকার ও দম্ভের প্রতীক। রুদ্রের ললাট-বহ্নি এই হীনবৃত্তিগুলিকেই দগ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথের বহু গানে, বিশেষতঃ ঋতুরঙ্গশালায় নটরাজের গানে এই সত্য পরিস্ফুট হইয়াছে,

'সর্ব খর্বতাবে দহে তব ক্রোধদাহ'

এই দাহ বিশ্বকে অমৃত-দীক্ষা দেয়, অগ্নিদাহে বিশ্ব গ্লানিমুক্ত হইয়া শুচি হয়।

পঞ্চমতঃ ভস্মীভূত মদনকে কেন্দ্র করিয়া রবীন্দ্রনাথ বীর্য-দীপ্ত প্রেমের উজ্জীবন-আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। যাহা মরণীয়, যাহা স্থূল—তাহা দগ্ধ হউক। মদন রুদ্রদাহে দগ্ধ হইয়াছে মানে ভীরুতার অবসান ঘটিয়াছে। 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থে কবি সেই মদনের উজ্জীবন প্রার্থনা করিয়াছেন বীরের মূর্তিতে ঃ

ভস্ম-অপমান শয্যা ছাড়ো পুষ্পধনু,
রুদ্রবহ্নি হতে লহো জ্বলদর্চি তনু।...
মৃত্যুঞ্জয় তব শিরে মৃত্যু দিলা হানি ;
অমৃত সে মৃত্যু হতে দাও তুমি আনি।
সেই দিব্য দীপ্যমান দাহ
উন্মুখ করুক অগ্নি-উৎসের প্রবাহ
মিলনেরে করুক প্রখর,
বিচ্ছেদেরে করে দিক দুঃসহ সুন্দর
মৃত্যু হতে জাগো পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

রবীন্দ্র-বীণার তারে কালিদাসের কাব্য-ঝঙ্কার এমনই নব নব ঝংকার সৃষ্টি করিয়াছে ঃ কালিদাস হইতে বিষয়মাত্র গ্রহণ করিয়া তিনি নূতন সুরলহরী সৃষ্টি করিয়াছেন। এ যেন একটি ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দিয়া ফুলঝুরিতে বহু আগুনের ফুল সৃষ্টি করা। কালিদাস স্ফুলিঙ্গ ; রবীন্দ্ররচনা আগুনের ফুল।

কুমারসম্ভব কাব্যের ভাব রবীন্দ্রনাথের নন্দন-তত্ত্বকেও প্রভাসিত করিয়াছে। রবীন্দ্রকৃতভাষ্যে কুমারসম্ভবের তপঃশুদ্ধ প্রেম যে অভিনব তাৎপর্যে মণ্ডিত হইয়াছে, তাহারই আলোকে কবি-সৌন্দর্যের মূল তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে শিল্প সুন্দরেরই প্রতিমূর্তি ঃ কিন্তু এই সৌন্দর্য অসংযত কল্পনাবৃত্তির সৃষ্টি নয় ঃ সৌন্দর্যের আকর্ষণ সংযমের দিকে। তিনি বলেন,

'স্তব্ধভাবে নিবিষ্ট হইতে না জানিলে আমরা সৌন্দর্যের মর্মস্থান হইতে রস উদ্ধার করিতে পারি না।...সতীত্ব সেই চাঞ্চল্যবিহীন সংযম, যাহার দ্বারা গভীর-ভাবে প্রেমের নিগূঢ় রস লাভ করা সম্ভব হয়।...যথার্থ সৌন্দর্য সমাহিত সাধকের কাছেই প্রত্যক্ষ।' [সাহিত্য ঃ সৌন্দর্যবোধ]

রবীন্দ্রনাথের মতে কুমারসম্ভব কাব্যেরও ইহাই মর্মকথা। সংযমহীন সৌন্দর্য-প্রিয়তা মদমোত্ততাকেই প্রশ্রয় দেয়, মত্ততাকেই আনন্দ বলিয়া ভুল করে ঃ তখন

সৌন্দর্যের পরাভব। কিন্তু উন্মত্ততাকেই দমন করিয়া উহা যখন শান্ত হয়, শুচি হয়, তখনই সৌন্দর্যের সার্থকতা।

'কবি গৌরীর প্রেমের সর্বাপেক্ষা কমনীয় মূর্তি তপস্যার অগ্নিদ্বারাই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইযাছেন। সেখানে বসন্তের পুষ্পসম্পদ ম্লান, কোকিলের মুখরতা স্তব্ধ। অভিজ্ঞান শকুন্তলেও প্রেয়সী যেখানে জননী হইয়াছেন...সেইখানেই রাজদম্পতীর প্রেম সার্থক হইয়াছে। এই দুই কাব্যেই শান্তির মধ্যে, মঙ্গলের মধ্যে, যেখানেই কবি সৌন্দর্যের সম্পূর্ণতা দেখাইয়াছেন, সেইখানেই তাঁহার তুলিকা বর্ণবিরল, তাঁহার বীণা অপ্রমত্ত। বস্তুত সৌন্দর্য যেখানেই পরিণতি লাভ করিয়াছে, সেইখানেই সে আপনার প্রগল্‌ভতা দূর করিয়া দিয়াছে...সেই পরিণতিতেই সৌন্দর্যের সহিত মঙ্গল একাত্ম হইয়া উঠিয়াছে।' [ঐ]

ইহাই রবীন্দ্রমতে সৌন্দর্যের গোড়াব কথা। কুমারসম্ভবের ভাব দ্বারাই তিনি বুঝাইয়াছেন, প্রকৃত সৌন্দর্য মঙ্গলেব সহিত যুক্ত।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-দৃষ্টির সঙ্গেও কালিদাসের গভীর যোগ রহিয়াছে। ভারতীয় সাহিত্যে প্রকৃতি-দৃষ্টিব ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসটি কৌতূহলোদ্দীপক। বৈদিক ঋষিগণ প্রকৃতিকে চেতনরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন প্রকৃতির ভিতর দেবসত্তাকে দেখিয়া। সূর্যোদয়, ঊষার আবির্ভাব, মেঘের খেলা, বিদ্যুতের বিকাশ, বজ্রের গর্জন, নিশিরাত্রির আগমন, নদ-নদীর প্রবাহ প্রভৃতি দেব-জীবনের লীলা মানবজীবনের মতই স্নেহে-প্রেমে-রোষে-ক্ষোভে জীবন্ত। মানুষের সহিত এই প্রকৃতির অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ভক্তের সহিত দেবতার অন্তরঙ্গ সম্পর্কের অনুরূপ। মানুষ ইষ্টপ্রার্থী, প্রকৃতি-দেবতা ইষ্টদাতা।

মহাকাব্যের যুগ হইতে প্রকৃতি মিশ্রসত্তায় পরিণত হইয়াছে। দেবসত্তা তো আছেই, তদুপরি প্রকৃতি নিজেই একটি স্বতন্ত্র সত্তা। তাহার নিজস্ব রূপ আছে, ভীষণতা আছে। যে দৃষ্টিতে আমরা বস্তুরূপে প্রকৃতিকে দেখি, সেই বাস্তব সত্তার স্বীকৃতি এই যুগের প্রকৃতি-বর্ণনার একটি প্রধান লক্ষণ। এই বর্ণনায় প্রকৃতি প্রাণধর্ম হইতে বিছিন্ন হয় নাই। যেমন, বাল্মীকির সমুদ্র: সমুদ্র রাজা, সমুদ্র প্রেমিক; তিনি করগ্রাহী, তিনি নদী-বল্লভ। মানব জীবনের সহিত প্রকৃতির যোগাযোগও প্রদর্শিত হইয়াছে। তথাপি প্রকৃতির বস্তুগত বর্ণনারই এখানে প্রাধান্য।

সংস্কৃত কাব্যের যুগে প্রকৃতি-বর্ণনা আরও প্রাগ্রসর। সৌন্দর্যপিপাসু, রসিক, শিল্প-সচেতন বিদগ্ধ কবি প্রাণ ভরিয়া প্রকৃতির বস্তুগত রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ আস্বাদন করিতেছেন—প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র জীবন্তসত্তারূপে কল্পনা করিতেছেন—আবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির সহিত মানবজীবনের নিগূঢ় যোগাযোগ দেখাইয়া দিতেছেন। প্রকৃতি এখানে জীবন-রঙ্গশালা, যাহার হাসি-কান্নার অভিনয় মানবহৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে। মানব জীবনের পটভূমিরূপে প্রকৃতির ভূমিকা অসামান্য। বিশেষতঃ প্রকৃতি প্রগল্‌ভ প্রণয়লীলার রঙ্গভূমি, মানবের প্রেম-জীবনে ইহা বিপুল উদ্দীপনার হেতু। সংস্কৃত কাব্যের প্রকৃতি-বর্ণনার এই বিশিষ্টতা বিশেষ করিয়া প্রকট

হইয়াছে কালিদাসের কাব্যে। কালিদাস প্রকৃতিকে শুধু জীবন্ত কল্পনা করেন নাই, মানব-হৃদয়ের সহিত তাহাকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। তিনি মানবজীবনে দেখাইয়াছেন প্রকৃতির লীলা, প্রকৃতির ভিতর দেখাইয়াছেন মানবজীবনের জীবন্ত অভিনয়। উভয়ে উভয়ের সহিত একাত্ম ও একাকার।

'ঋতুসংহার' কাব্যে কালিদাস ছয় ঋতুর বহিরঙ্গ রূপের চিত্র অংকন করিয়াছেন। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, নর-নরীর প্রণয়লীলা এই ঋতুচিত্রে ছবির মত ফুটিয়া উঠিয়াছে: বর্ষার পৃথিবী নিজেই যেন 'শুক্লেতর রত্নভূষিতা বরাঙ্গনা।' কালিদাসের কাব্যে হরিণী বরাঙ্গনার দৃষ্টি গ্রহণ করে, কখনও বরাঙ্গনা হরিণীর দৃষ্টি গ্রহণ করে: প্রকৃতির সহিত মানুষের পরস্পর আদান-প্রদানের সম্পর্ক। বিরহী যক্ষ তাই প্রকৃতি-চিত্রে প্রিয়তমার সাদৃশ্যে দেখেন,

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণী প্রেক্ষণে দৃষ্টি-পাতং
বক্তচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি, সাদৃশ্যমস্তি॥ [উত্তরমেঘ. ৪৩]

রবীন্দ্র কাব্যেও প্রকৃতি ও মানুষ একাত্ম ও একাকার। নারীর 'মূরতি' গঠিত হইয়াছে প্রকৃতির বিশিষ্টতা দিয়া—নদীর ভঙ্গিমা, দাড়িম্ববনের রাগ-রঙ্গিমা, শ্রাবণের নৃত্যধারা, শিশিরের ঝিলিমিলি দিয়া: 'লতা যেন নারী হয়ে দিল চক্ষু ভরি' [মহুয়া, মূরতি]; শাজাহান প্রিয়া মিশিয়া আছেন,

প্রভাতের অরুণ আভাসে
ক্লান্ত সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলীর লাবণ্য বিলাসে [বলাকা]

তেমনিই প্রকৃতি-রাজ্যে আবার মানুষি-লীলার অনুকরণ:

শুনিয়া তপন অস্তে নামিল শরমে গগন ভরি,
শুনিয়া চন্দ্র থমকি রহিল বনের আড়াল ধরি।
শুনে সরোবরে তখনি পদ্ম নয়ন মুদিল ত্বরা
দখিন-বাতাস বলে গেল তারে "সকলি পড়েছে ধরা"। [কল্পনা, প্রকাশ]

রবীন্দ্রনাথের ঋতুবিষয়ক গানে ও কবিতায় কালিদাসের ঋতু-চিত্রের বহিরঙ্গ রঙ ও রেখার সাদৃশ্য অতি স্পষ্ট। কালিদাসের 'গ্রীষ্ম' অতি ভয়ংকর—সর্বতোঽগ্নি-বনান্তে' তৃষ্ণার 'বিশুষ্ক কণ্ঠ', কানন 'শুষ্কপর্ণা': রবীন্দ্রনাথেও গ্রীষ্ম 'দারুণ অগ্নি বাণেরে, হৃদয় তৃষায় হানেরে' অথবা 'প্রখর তপন তাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে, বায়ু করে হাহাকার।' কালিদাসে বর্ষায় 'রাজবদুদ্ধতধ্বনিনির্ঘনাগমঃ', ক্ষিতি 'শুক্লেতরা' (শ্যামা), 'বিকচ নব কদম্ব', কদম্ব-কেতকীবনে সমীরণকম্পন, কলাপশোভিত কলাপীর কেকাধ্বনি; রবীন্দ্রনাথেও বর্ষা 'শ্যামগম্ভীর সরসা', তখন 'উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে।' কালিদাস বর্ষায় নারীগণের সাজসজ্জার বিবরণ দিয়াছেন,—

মালাঃ কদম্ব-নব-কেশর-কেতকীভিরায়োজিতাঃ শিরসি বিভ্রতি যোষিতোঽদ্য।

কালাগুরু প্রচুর চন্দনচর্চিতাঙ্গ্যঃ পুষ্পাবতংস-সুরভিকৃত-কেশপাশাঃ। [ঋতুসংহার]
[সুন্দরীরা আজ নব কদম্বকেশর ও কেতকীর মালা গাঁথিয়া মাথায় পরিতেছে ঃ কালাগুরু ও চন্দনে অঙ্গ-চর্চিত করিয়াছে, কেশপাশ সুরভিত করিয়া কুসুমের কর্ণভূষণ পরিধান করিয়াছে]

রবীন্দ্রনাথে পাই,

কেতকী-কেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী। [বর্ষামঙ্গল]

কালিদাসের শরৎ ও বসন্ত বর্ণনার চিত্রগুলিও রবীন্দ্রনাথে স্পষ্ট। কিন্তু কালিদাস অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি আরও অধিক বৈচিত্র্যময়ী ; সর্বাপেক্ষা প্রধান পার্থক্য,—কালিদাস ঋতুচক্রকে দেখিয়াছেন কেবল শৃঙ্গারোদ্দীপনের প্রেক্ষাপটে, রবীন্দ্রনাথ ঋতুচক্রকে দেখিয়াছেন, মহাকাল নটরাজের বিচিত্র রঙ্গশালারূপে। ঋতু পর্যায়ের তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথে আরও গভীর ও তত্ত্বাশ্রয়ী। এই তত্ত্বের পশ্চাতে কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের 'রুদ্রের তপস্যা' আর এক নূতন তাৎপর্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড অগ্নি-তপস্যা রুদ্রের তপস্যার মতই কঠোর-কঠিন। গ্রীষ্ম যেন ধ্যানমগ্ন রুদ্র তাপস। তাঁহার সাধনা চলিয়াছে প্রেমের সঞ্জীবনী ধারায় বর্ষাকে সার্থক করিবার জন্য। রুদ্রের 'রুদ্রতপের সিদ্ধি' আষাঢ়ের 'মন্থর মেঘখানি'। এ যেন সেই কুমারসম্ভব কাব্য-কাহিনীরই প্রতিচ্ছবি ঃ

নিঠুর, তুমি তাকিয়েছিলে মৃত্যু ক্ষুধার মতো
তোমার রক্ত নয়ন মেলে।
ভীষণ, তেমার প্রলয়-সাধন প্রাণের বাঁধন যত
যেন হানবে অবহেলে।
হঠাৎ তোমার কণ্ঠে এ যে আশার ভাষা উঠল বেজে
দিলে তরুণ শ্যামল রূপে করুণ সুধা ঢেলে।। [গীতবিতান ঃ প্রকৃতি]

গ্রীষ্ম ও বর্ষায় নটরাজের লীলার ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ কুমারসম্ভবকাব্য হইতে মেঘদূতের রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন : অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ঋতু-ভাবনায় রুদ্রের তপস্যারূপ গ্রীষ্ম কেবল বর্ষার উদ্বোধন করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, বিরহী মনের বিচ্ছেদ-ক্রন্দনকেও অবারিত করিয়া দিয়াছে। ঋতু পরিক্রমায় কালিদাসের চিত্র ও চিন্তা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। 'রিক্তপাতা শুষ্কশাখ' শীতের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ ধ্যানমৌন রুদ্রের সেই কঠিন তপস্যাই দেখিয়াছেন, যে তপস্যা গোপনে বসন্তের স্বপ্নকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য অতি কঠিন তপে আত্মনিয়োগ করিয়াছে ঃ

হে সন্ন্যাসী,
হিমগিরি ফেলে নিচে নেমে এলে কিসের জন্য।
কুন্দমালতী করিছে মিনতি, হও প্রসন্ন ।।...
সাজাবে কি ডালা গাঁথিবে কি মালা মরণসত্রে।
তাই উত্তরী নিলে ভরি ভরি শুকানো পত্রে ? [নটরাজ]

॥ পালি সাহিত্য ॥

১. মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা

মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার সাধারণ নাম 'প্রাকৃত'। প্রাচীন বৈয়াকরণগণ মনে করেন 'সংস্কৃত' 'দৈবীবাক্' ['সংস্কৃতং নাম দৈবীবাগন্বাখ্যাতো মহর্ষিভিঃ'—দণ্ডী], প্রাকৃত এই সংস্কৃতেরই একটি রূপভেদ।

কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ এই মত সমর্থন করেন না। তাঁহারা বলেন, সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতের উদ্ভব হয় নাই। প্রাকৃত প্রাকৃতজন অর্থাৎ জনসাধারণের কথ্য ভাষা। বৈদিক ভাষা-ভাষীদের মধ্যেই এই কথ্য ভাষার প্রচলন ছিল। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শাখায় আর্যগণ ভারতবর্ষে আসেন। স্মরণাতীত প্রাচীনকালে যাঁহারা প্রথম আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে এদেশের আদিবাসী অস্ট্রিক, দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতির সহিত মিশিয়া যাওয়ায় তাহাদের ভাষা ও সংস্কৃতিও কিয়ৎ পরিমাণে বিশুদ্ধ বৈদিক আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল। বৈদিক সাহিত্যে ইঁহাদিগকে বলা হইয়াছে 'অদীক্ষিত'। এই অদীক্ষিতগণের ভাষা যদিও মূলতঃ বৈদিক ভাষা ['অদীক্ষিতাঃ দীক্ষিত-বাচং বদন্তি—পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ], তথাপি এই ভাষা সরস্বতী ও দৃশদ্বতীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের [ব্রহ্মর্ষিদেশের] ভাষা হইতে পৃথক হওয়ায় বহুল পরিমাণে আর্যেতর জাতির শব্দ, উচ্চারণ-রীতি ও বাগ্‌ভঙ্গি দ্বারা প্রভাবান্বিত। এই মিশ্র ভাষাই মধ্যযুগীয় ভারতীয় আর্যভাষার মূল। তৎকালের জনসাধারণ (প্রাকৃত জন) এই ভাষাতেই কথাবার্তা বলিতেন এবং অঞ্চলভেদে উহার রূপভেদও ছিল।

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার তিনটি রূপ বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে : [এক] পালি ও বৌদ্ধ সংস্কৃত, [দুই] প্রাকৃত এবং [তিন] অপভ্রংশ। এই ভাষায় রচিত সাহিত্যের পরিমাণও অল্প নয়। অমিতপ্রভ দৈবীবাক্ সংস্কৃতের প্রতিস্পর্ধীরূপে ইহাদের অভ্যুত্থান। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের অনেকগুলি মূল সুর ইহাতে বিধৃত এবং ভারতীয় জীবনের ধর্মে-কর্মে, চিন্তায় ও সাহিত্যে উহাদের প্রভাব অপরিসীম।

২. পালি ভাষার ইতিহাস

ভাষা হিসাবে পালি আজ মৃত। কিন্তু এমন একদিন ছিল, যেদিন এই ভাষায় বিপুলায়তন সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেদিন বিরাট জনতা এই বোধিবটের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পরমা শান্তি লাভ করিয়াছিল।

ভাষারূপে পালির প্রতিষ্ঠা পরবর্তীকালে। পালি বলিতে এখন বুঝায় এমন একটি ভাষা, যাহাতে প্রাচীন বুদ্ধবচন ও হীনযান বৌদ্ধশাস্ত্র লিপিবদ্ধ। কিন্তু খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্তও এই অর্থে পালির প্রতিষ্ঠা হয় নাই। পণ্ডিত বুদ্ধঘোষের [খ্রীষ্টোত্তর পঞ্চম শতাব্দী] উক্তিদ্বারা ['পালি মত্তমিধানীতং'],

প্রমাণিত হয় তখনও পালির অর্থ ছিল Text বা পাঠ। বুদ্ধদেবের রচনা বা উপদেশ যাহাতে পালিত বা রক্ষিত, তাহাই 'পালি'। কেহ বলেন, সংস্কৃত পংক্তি (a line, a row) হইতে পালির উৎপত্তি; কেহ বলেন, 'পল্লী' শব্দ হইতে। ব্যুৎপত্তি যাহাই হউক, পালির লক্ষ্যার্থই এখন রূঢ়, অর্থাৎ উহা বুদ্ধ-দেশনার ভাষা। পালি বৌদ্ধ প্রাকৃত।

পালি কোন্ অঞ্চলের প্রাকৃত, তাহাও বিতর্কিত। স্বয়ং বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্য-বর্গকে নিজের ভাষায় ("সক নিরুত্তি") ধর্মপ্রচার করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ উপদেশ দিবার সময় তিনি নিজেও নিজ অঞ্চলের ভাষা ব্যবহার করিতেন। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'পিটক'-এর ভাষা যদি বুদ্ধদেবের নিজ নিরুক্তি হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে 'পালি' কোশল-মগধের আঞ্চলিক ভাষারই একটি প্রকারভেদ। কিন্তু বুদ্ধ-বচন বুদ্ধদেবেরই নিজ অঞ্চলের ভাষা কিনা, সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে; কারণ পিটকগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সঙ্গীতিতে 'এবং মে সুতং' (এবং ময়া শ্রুতম্)—এই সূচনাবাক্য দিয়া বিবৃত করা হইত এবং 'মুখ পাঠবশে' (মুখে মুখে) উহা ভিক্ষুসংঘের মধ্যে প্রচারিত হইত। পিটক লিপিবদ্ধ হয় বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পরে সিংহলরাজ বট্ট-গামনির রাজত্বকালে [২৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে]। সিংহলে পালি লইয়া যান অশোকের পুত্র মহেন্দ্র (মতান্তরে অশোকের ভ্রাতা)। মহেন্দ্র অবন্তী-উজ্জয়িনীর অধিবাসী; অতএব পালি অবন্তী-উজ্জয়িনীর কথ্য ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত—এ মতেও অনেকে বিশ্বাসী।

কিন্তু মনে হয়, পালি কোন অঞ্চলবিশেষের ভাষা নয়, ইহা যেন মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির একটি সমন্বিত রূপ। একটি আদর্শ সাহিত্যিক ভাষারূপেই ইহা প্রাচীন বৌদ্ধদের ভিতর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। উত্তরে কপিলাবস্তু, শ্রাবস্তী, রাজগৃহ ও বুদ্ধগয়া হইতে দক্ষিণে কলিঙ্গ এবং পশ্চিমে সাংকাশ্য ও তক্ষশীলা হইতে পূর্বে অঙ্গ-বৈশালী পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের প্রচার-ক্ষেত্র ছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ধর্মপ্রচারার্থ এই সকল অঞ্চলে গমনাগমন করিতেন। পথে পথে সুবৃহৎ সংঘারাম বা গন্ধকুটী ছিল। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াতের জন্য প্রশস্ত রাজপথও ছিল। এই পথে অগণিত বণিক, পরিব্রাজক, শ্রমণ ও রাজকর্মচারী চলাচল করিতেন। মনে হয় পালি ছিল এই সকল লোকের বোধগম্য একটি সাধারণ ভাষা। ইহার জন্ম বৌদ্ধ সংঘে, কিন্তু ইহার প্রচার ছিল সর্বত্র।

পালি ভাষার উৎপত্তি ঠিক কোন্ সময়ে, সে সম্পর্কেও বিস্তর মতপার্থক্য আছে। মহামতি বুদ্ধদেব খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে আবির্ভূত হন [খ্রীঃ পূঃ ৫৬৪-৪৮৪]। জীবৎকালে তিনি সহস্র লোককে ধর্মউপদেশ দান করেন। পালিসাহিত্য এই উপদেশাবলীর সংকলন। কিন্তু এই উপদেশ মুখে মুখেই প্রচলিত ছিল। ইহা প্রথম আবৃত্তি করা হয় রাজগৃহের অন্তর্গত বৈভার পর্বতের সপ্তপর্ণী গুহায়। ইহাই প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের [খ্রীঃ পূঃ ৪৮৪]

অত্যল্পকাল পরেই এই সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এইখানেই পালির মুখপাঠের সূচনা। ইহার প্রায় একশত বৎসর পরে [৩৮৪ খ্রীঃ পূর্বাব্দে] বৈশালীর কূটাগার-শালায় বা মহাবনারামে (কাহারও মতে বালুকারামে) দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এখানেও 'বুদ্ধবচন' আবৃত্তি করা হয় এবং 'বিনয়' অংশ সংশোধিত রূপে পরিগৃহীত হয়। তখনও লিখিত আকারে পালির অস্তিত্ব দেখা যায় নাই। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে ২৫৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে পাটলিপুত্র নগরের 'অশোকারামে' তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এই সঙ্গীতির সভাপতি ছিলেন মোদ্‌গলিপুত্র তিস্‌স। এই অধিবেশনে 'কথাবত্থু' নামক অভিধম্মপ্রকরণ সংকলিত হয়। তখন যে পালি কিছু কিছু লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় সাঁচি, সারনাথ ও কৌশাম্বীর স্তম্ভলিপিগুলির ভিতর। কিন্তু পালি চূড়ান্তভাবে লিপিবদ্ধ হয় সিংহলরাজ বট্টগামনির রাজত্বকালে ২৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে।

কাজেই দেখা যাইতেছে, মুখে মুখে পালির প্রচলন ছিল বুদ্ধদেবের জীবৎকালেই।

৩. পালি সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়

পালি সাহিত্য কালক্রমে বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে, ক্ষুদ্র বোধিদ্রুম শাখায়-প্রশাখায় পল্লবিত ও প্রবৃদ্ধ হইয়া বিপুলায়তন বনস্পতিতে পরিণত হইয়াছে। এই বোধিদ্রুমের প্রধান দুইটি কাণ্ড ঃ এক কাণ্ড বুদ্ধদেবের বিচিত্র জীবন, জীবনাদর্শ ও বচনগুলি লইয়া—আর এক কাণ্ড সেই সকল বচনের ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যান্তর ও ইতিহাস লইয়া। কেহ কেহ দুইটি বৃহৎকাণ্ডকে স্থূলভাবে দুইটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন—(১) পালি (পিটক) ও (২) অনুপালি (অনুপিটক)।

'প্যালি' বলিতে বুঝায় মূল বুদ্ধবচন। প্রথম, মধ্যম ও অন্তিম বুদ্ধবচন। কিন্তু এই মূল বুদ্ধবচনের অর্থ বহু ব্যাপক। আচার্য বুদ্ধঘোষ বলেন, বুদ্ধবচন শুধু বুদ্ধদেবের বচন নয়, তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যদিগের মূল্যবান বচন এবং যে সকল বচন বুদ্ধদেবের অনুমোদিত তাহাদের সমষ্টি। বিভিন্ন বৌদ্ধ সঙ্গীতিতে বুদ্ধদেবের নিজস্ব যে সকল ভাবগম্ভীর 'সাসন-দেসনা' আবৃত্তি করা হইয়াছিল, যাহা ক্রমে ক্রমে বিরাট আকার ধারণ করিয়াছিল ; কাশ্যপ, আনন্দ, উপালি, মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌সের অনুমোদনক্রমে যে সকল বুদ্ধ-কথা প্রাচীন থেরবাদীদের মধ্যে ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল—তাহারই বিপুলায়তন কোষ 'পালি'।

'অনুপালি' এই সকল বুদ্ধবচনের 'অটঠকথা' [অর্থকথা=ভাষ্য]। শুধু তাই নয়, বৌদ্ধধর্মের যাঁহারা পোষ্টা—বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে তাঁহাদের বক্তব্য—এক কথায় মূল পালি ব্যতীত বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত যাবতীয় প্রাসঙ্গিক বিষয় 'অনুপালি'র অন্তর্ভুক্ত।

।। মূল পালি সাহিত্য ।।

অঞ্চল ও সম্ঘভেদে মূল পালি সাহিত্যেরও নানাপ্রকার ভাগ রহিয়াছে। তবে সাধারণভাবে প্রচলিত যে বিভাগটি বহু পরিচিত, তাহা পিটক-বিভাগ। মূল পালি

'তিপিটক' বা ত্রিপিটকে বিভক্ত। পিটক অর্থ পেটিকা বা 'ঝুড়ি'; কেহ ইহার অর্থ করিয়াছেন 'গ্রন্থাধার'। বর্তমানে পিটক বলিতে সুপ্রাচীন হীনযান সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থগুলিকেই বুঝায়। পিটক তিনটি ঃ বিনয়, সুত্ত ও অভিধম্ম।

কেহ কেহ মনে করেন, ধম্ম (সুত্ত) ও বিনয়—এই দুই ভাগেই বুদ্ধদেবের 'সাসনদেসনা' সীমাবদ্ধ ছিল, 'অভিধম্ম' পরবর্তীকালের যোজনা। তৃতীয় মহাসঙ্গীতিতে মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স কর্তৃক 'অভিধম্ম' বৌদ্ধশাস্ত্রে পরিগৃহীত হয়। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে (চুল্লবগ্‌গে) প্রথম মহাসঙ্গীতির যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে 'অভিধম্ম'-এর নাম অনুল্লিখিত থাকিলেও, পিটক যে তিনটি, তাহা উল্লেখিত হইয়াছে ঃ

উপালিং বিনয়ং পুচ্ছিং সুত্তন্তানন্দ পণ্ডিতং।
পিটকং তীনি সঙ্গীতিং অকংসু জিনসাবকা ॥

—সংঘনেতা কাশ্যপ উপালিকে 'বিনয়' সংক্রান্ত প্রশ্ন করিয়া 'বিনয়' গ্রহণ করিলেন, আনন্দকে 'সুত্ত' বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া 'সুত্ত' গ্রহণ করিলেন, এইভাবে জিনশ্রাবকগণ, সেই সঙ্গীতিতে তিনটি পিটক ['পিটকং তীনি'] করিলেন।

অনেকে বলেন, এই সঙ্গীতিতে স্বয়ং কাশ্যপ যে 'মাতৃকা' আবৃত্তি করিয়াছিলেন তাহাই 'অভিধম্মের' অংকুর।

বিনয়, সুত্ত ও অভিধম্ম লইয়াই বৌদ্ধ ত্রিপিটক। আচার্য বুদ্ধঘোষও এই তিনটি ভাগ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন—বিনয় পিটকং, সুত্তন্ত পিটকং এবং অভিধম্ম পিটকং। তিনি পিটকগুলির বিষয়বস্তু ও লক্ষণ সম্পর্কেও কয়েকটি গাথা উদ্ধার করিয়াছেন।

বিনয় পিটক ঃ 'বিনয় শব্দের অর্থ বিবিধ ও বিশেষ নয় বা বিষয়বিন্যাস এবং কায় ও বাক্যকে বিনয়ন করা।' বস্তুতঃ বিনয় হইতেছে বৌদ্ধ শ্রমণদের শীলাচার-বিষয়ক বিধি। বিনয়পিটকের মূলভাগ তিনটি—সুত্তবিভঙ্গ, খন্দক ও পরিবার পাঠ। সুত্তবিভঙ্গের অন্তর্গত—পারাজিয়, পাচিত্তিয় ও পাতিমোক্‌খ; খন্দকের দুইটি ভাগ—মহাবগ্‌গ ও চুল্লবগ্‌গ; পরিবার পাঠ বিনয়-বিষয়ক প্রশ্নোত্তর মালা।

মহাবগ্‌গ ও চুল্লগ্‌গে-এর ভিতর বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি হইতে প্রথম ধর্ম-দেশনা পর্যন্ত এবং তাহার পরবর্তী বুদ্ধ-জীবনের কতিপয় ঘটনার বিবরণ আছে। এই দিক হইতে খন্দকই বুদ্ধ-জীবনের আদি বীজাঙ্কুর।

সুত্তপিটক ঃ বুদ্ধবচনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ 'সুত্তপিটক'। এই পিটকেই বুদ্ধদেবের জীবন এবং কাহিনী ব্যপদেশে বৌদ্ধধর্মের মূল বক্তব্য বিবৃত হইয়াছে। বিনয় শ্রমণদের আচরণীয় ধর্ম কিন্তু সুত্তের আদেশ ও উপদেশ সর্বদেশের ও সর্বকালের মানবসাধারণের অনুসরণযোগ্য। ইহার কাহিনীগুলির আবেদনও সর্বজনগ্রাহ্য। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের সাহিত্যিক মূল্য যদি বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে সুত্তসাহিত্যকে অবলম্বন করিয়াই তাহা করিতে হইবে। আচার্য বুদ্ধঘোষ সুত্তপিটকের লক্ষণ বর্ণনা করিয়া একটি গাথা উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে

"সুত্তশব্দের অর্থ সূচনা, সু-উক্তি বা সুকথন, সবন, সূদন, সুত্রাণ, সূত্রপ্রমাণ ও সূত্র গ্রন্থন।' সু-উক্তির অর্থ সু+বুত্ত, অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতা অনুসারে যে বিষয়গুলি সুন্দররূপে উক্ত; সুত্তের 'সূদন' অর্থটি আরও সুন্দর—ধেনুর দুগ্ধধারার ন্যায় যাহা সূদিত বা নিঃসৃত, তাহাই 'সুত্ত'। বস্তুতঃ সুত্তপিটক যেন কামধেনুর স্বতঃক্ষরিত ক্ষীরধারা—উপনিষদের মধুবর্ষী শ্লোক ও আখ্যানের ন্যায় অমৃতনিস্যন্দী। এই সুত্তপিটক পঞ্চনিকায়ে বিভক্ত ঃ দীঘনিকায়, মজ্ঝিম নিকায়, সংযুত্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় ও খুদ্দক নিকায়। প্রথম চারিটি নিকায় চারিটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ এবং উহাদের নামের মধ্যেই পরিচয় অনেকটা সুপরিস্ফুট।

(i) **দীঘনিকায় ঃ** কতকগুলি সুদীর্ঘ নিবন্ধের সমষ্টি। ইহাতে বুদ্ধ-জীবনের কতিপয় ঘটনা ও বৌদ্ধ ধর্মের মূল আদর্শ বিবৃত হইয়াছে। ইহার প্রধান বক্তা স্বয়ং বুদ্ধদেব। ইহাতে ব্রহ্মজাল সুত্ত, শ্রামণ্যফলসুত্ত, তেবিজ্জ, মহাপরিনির্বাণ প্রভৃতি ৩৪টি সুত্ত আছে। সুত্তগুলি আকারে দীর্ঘ বলিয়া গ্রন্থনাম 'দীঘনিকায়'।

(ii) **মজ্ঝিম নিকায় ঃ** কতকগুলি নাতিদীর্ঘ সুত্তের সমষ্টি। ইহাতে মোট ১৫৪টি সুত্ত। সুত্তগুলি আকারে দীঘনিকায় হইতে ছোট, কিন্তু গ্রন্থের প্রতিপাদ্য দীঘনিকায় হইতে অভিন্ন অর্থাৎ কথাপ্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্মের নীতি, শীলাচার প্রভৃতির কথন। কতকগুলি সুত্ত বিষয়-বৈচিত্র্যে বিশিষ্ট, যথা রট্‌ঠপাল সুত্ত ও অঙ্গুলিমালা সুত্ত। প্রথমটিতে পাই এক রাজপুত্র ভিক্ষুর কাহিনী—পিতা তাহাকে চিনিতে না পারিয়া ভিক্ষা দিতে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। কিন্তু পরে যখন চিনিতে পারিলেন, তখন রাজপুত্রের প্রত্যাখ্যান। সংসারের অনিত্যতার কথাই সুত্তটিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। 'অঙ্গুলিমালে'র কাহিনীটিও সুন্দর। দস্যু অঙ্গুলিমাল ছিল দুধর্ষ মহাভয়াল ['সো মনুস্সে বধিত্বা বধিত্বা অঙ্গুলীনং মালং ধারেতি']। বুদ্ধদেবের অচিন্ত্য শক্তিবলে সেই অঙ্গুলিমাল অর্হৎ হন।

(iii) **সংযুত্ত নিকায় ঃ** বিষয়ানুসারে বিভক্ত কতকগুলি সুত্তের সংযুক্তি বা group; ইহাতে মোট ৫৬টি সংযুক্ত ৫টি বর্গে বর্গীকৃত। বর্গগুলির নাম—সগাথ-বগ্‌গ, নিদান, খন্দ, সড়ায়তন ও মহাবগ্‌গ। এক একটি বর্গে ১০-১২টি করিয়া সংযুক্ত. যেমন প্রথম বর্গের প্রথম সংযুক্তের নাম 'দেবতা সংযুক্ত'। এই নিকায়ের শেষ বর্গের শেষ সংযুক্তের ('সচ্চসংযুক্ত') অন্তর্গত বহুবিখ্যাত 'ধম্মচক্কপবত্তনসুত্ত'। সুত্তটি বিনয় পিটকের মহাবগ্‌গেও আছে। এই সুত্তের মূল বক্তব্য বুদ্ধদেবের আবিষ্কৃত মার্গ মধ্যম মার্গ ['মজ্‌ঝিমা পটিপদা']; উহা চক্ষুকরণী, জ্ঞানকরণী, শান্তিদায়ী ও নির্বাণ-প্রদায়ী; উহার শেষকথা—যাহা কিছু উদয়ধর্মা, তাহাই ব্যয় ধর্মা—'যং কিঞ্চি সমুদয় ধম্মং সব্বন্তং নিরোধধম্মন্তি'। বুদ্ধদেব মৃগবন উদ্যানে তাঁহার পঞ্চবর্গীয় শিষ্যের নিকট ইহা প্রথমে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এই সংযুক্ত নিকায়ের 'মারসংযুক্ত' ও 'ভিক্‌খুনী সংযুক্ত' অত্যন্ত কবিত্বপূর্ণ। আখ্যানগুলির নাটকীয়তাও উপভোগ্য।

(iv) **অঙ্গুত্তর নিকায় ঃ** বা 'একুত্তর নিকায়' এগারটি নিপাতে বিভক্ত। নিপাত-

গুলি বক্তব্য বিষয়ের সংখ্যানুপাতে বিন্যস্ত, যথা 'দুকনিপাত'—এই প্রকার বুদ্ধের কথা ও দুই প্রকার পাপের ফলভোগের কথা, 'তিকনিপাত'—কায়বাক্‌চিত্তবিষয়ক তিন প্রকার পাপ ও তিন প্রকার ভিক্ষুর কথা ইত্যাদি। অঙ্গুত্তর নিকায়ের সুত্ত নীতিমূলক।

(v) **খুদ্দকনিকায়** ঃ নিকায়-গ্রন্থগুলির ভিতর বহুবিশিষ্ট। নাম 'খুদ্দক', কিন্তু বিষয় গৌরবে ইহা সুমহৎ। ইহা পনেরখানি গ্রন্থের সমষ্টি ঃ

ক. 'খুদ্দক পাঠ' অর্থাৎ ক্ষুদ্র পাঠ, খুদ্দকনিকায়ের প্রথম গ্রন্থ। ইহা অতিক্ষুদ্র নয়টি পাঠের সংকলন এবং যে-কোন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর অবশ্য পাঠ্য প্রথম পাঠ। ইহার প্রথমেই বৌদ্ধধর্মের বিখ্যাত 'তিশরণ' মন্ত্র ['বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সংঘং সরণং গচ্ছামি'] ; দ্বিতীয়ে শীল-পাঠ, তৃতীয়ে দেহস্থ প্রত্যঙ্গের কথা, চতুর্থে শিক্ষার্থীর প্রশ্ন ও উত্তর ; পঞ্চমে বহুখ্যাত 'মঙ্গলসুত্ত', ষষ্ঠে 'রতনসুত্ত'—যাহার ধুয়া 'ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পনীতং এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু' [বুদ্ধদেবের ভিতর এই রত্ন আছে, এই সত্য ভাষণ দ্বারা কল্যাণ হউক]। 'রতনসুত্ত' অনেকটা বৈদিক সৌমনস্য সূক্তের মত—ইহারও প্রধান কথা 'সব্বেব ভূতা সুমনা ভবন্তু', খুদ্দক পাঠের শেষ পাঠ (নবম পাঠ) বহুখ্যাত "মেত্তসুত্ত'—বৌদ্ধধর্মের সার্বিক কল্যাণ-মৈত্রীর বচন-নির্যাস। কল্যাণ-মিত্রতার আদর্শ সারল্য ['উজু চ সুজু চ'], সুমিষ্ট ভাষণ ['সুবচো'], মৃদুতা ও অনতিমানিতা—উহার অভীপ্সা 'সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা' [সকলে সুখী হউক]—উহার আদেশ 'ন চ খুদ্দং সমাচরে কিঞ্চি' [ছোট কোন কাজ করিও না], 'নাঞ্‌ঞস্‌স দুক্‌খমিচ্ছেয্য' [অপরের যাহাতে দুঃখ হয়, তাহার ইচ্ছাও করিবে না] এবং সর্বোপরি—

মাতা যথা নিযংপুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্‌খে
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।
মেত্তং চ সব্বলোকস্মিং মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং
উদ্ধং অধো চ তিরিয়ং চ অসংবাধং অবেরং অসপত্তং। [মেত্তসুত্ত. ৭-৮]

—'মা যেমন একটি মাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন সমস্ত প্রাণীতে সেইপ্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করবে।'

ঊর্ধ্বে অধোতে চারদিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন, হিংসাহীন, শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে। [অনুবাদ—রবীন্দ্রনাথ]

খ. 'ধম্মপদ' ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাকার বুদ্ধবচনের সংকলন। ইহাকে বলা যায় বৌদ্ধধর্মের গীতা। ইহা বৌদ্ধধর্ম ও নীতির প্রকীর্ণ শ্লোকাবলীর সমষ্টি।

গ. 'উদান' ঃ ইহা বুদ্ধ-জীবন ও বাণীর সংকলন। জীবন অবশ্য ধারাবাহিক কোন জীবন নয়, কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনার সংকলন। অতি বিখ্যাত 'প্রতীত্য সমুৎপাদ' ['পটিচ্চ সমুপ্পাদ'] ইহার একটি অংশ। বুদ্ধদেব ধ্যানবলে এই সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, সমস্ত কিছুই প্রতীতি মাত্র এবং প্রত্যেকটি অস্তিত্ব পূর্ববর্তী কোন কারণের উপর নির্ভরশীল। 'ইমসিস্‌ং সতি ইদং হোতি...ইমসিস্‌ং

অসতি ইদং ন হোতি' [ইহা থাকিলে ইহা হয়, ইহা না থাকিলে উহা হয় না]—ইহাই প্রতীত্য-সমুৎপাদের মূল সূত্র। উদানের গাথা বা কবিতাকার বুদ্ধবচনগুলি সুগম্ভীর দার্শনিকতায় পূর্ণ। কোন কোন উদানে পৌরাণিক নীতিকথার সুর বাজে, যেমন 'সব্বং পরবসং দুক্খং সব্বং ইস্সরিয়ং সুখং' উদানটি।

ঘ. 'ইতিবুত্তক'—ইহা গদ্য-পদ্যে গ্রথিত। ইহাতে সুত্তগুলি আরম্ভ হইয়াছে 'বুত্তং হেতং ভগবতা' [ভগবান এইরূপ বলিয়াছেন]—এই বাক্য লইয়া।

ঙ. 'সুত্তনিপাত'—কতকগুলি বিখ্যাত সুত্তের সমষ্টি। বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শ এখানে কবিতার আকারে, কোথায়ও বা গদ্য-পদ্য মিশ্রিত নিবন্ধাকারে গ্রথিত।

চ. 'বিমানবত্থু' দেবনিবাস স্বর্গের কাহিনী। কুশলকর্মদ্বারা জীব এই স্বর্গ (বিমান) ও স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করে। বিমানবস্তু প্রকৃতপক্ষে সুকৃতির ফলশ্রুতি।

ছ. 'পেতবত্থু' দুষ্কৃতিকারীর দুর্গতি নরকের কাহিনী ; প্রেত-কথাই ইহার মূল প্রতিপাদ্য। বৌদ্ধধর্মমতে অকুশল কর্মের ফলে জীব প্রেতলোকে উৎপন্ন হয় এবং অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে ; প্রেতের উক্তির মধ্য দিয়া দুষ্কৃতির এই ভয়াবহ পরিণাম প্রদর্শিত হইয়াছে।

জ. 'থেরগাথা' বৌদ্ধ স্থবিরগণের উল্লাসপূর্ণ আত্মভাষণ। থের শব্দটি সংস্কৃত 'স্থবির' (=জ্ঞানবৃদ্ধ) শব্দের প্রতিরূপ। কিভাবে থেরগণ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছেন, ইহাতে সেই বিমুক্তি-সুখের পরমানন্দ উদাত্ত গাথায় প্রকাশ করা হইয়াছে। কত বিভিন্ন স্তরের মানুষ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশ হইতে মহাবোধিবটের ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, থেরগাথায় তাহার সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়। থেরগণের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সুভূতি, পূর্ণ, সীবক, কুণ্ডল, উত্তিয়, তিস্স, সুমঙ্গল, বিমল, অঙ্গুলিমাল, ছন্ন, উপালি, রাহুল, মহাপন্থক, চুলপন্থক, সুমন, রেবত, সারিপুত্ত, মোগ্গলায়ন, আনন্দ প্রভৃতি।

ঝ. 'থেরীগাথা'ও থেরগাথার মত নারী স্থবিরাদের (জ্ঞানবৃদ্ধাদের) বিমুক্তি-সুখের উল্লাসপূর্ণ বিজয় গান। ইঁহাদের ভিতর আছেন—গণিকা অর্ধকাশী (অড্ঢকাসী), অম্বপালী, সুন্দরী উপ্পলবর্ণা, পুত্রহীনা কিসাগোতমী, ব্যাধকন্যা চাঁপা, 'ভদ্দাকুণ্ডলকেসা', মহাপ্রজাপতি গোতমী প্রভৃতি। থেরীগাথা নারী-চিত্রশালা।

ঞ. 'জাতক' বুদ্ধের পূর্ব-পূর্ব জীবনের কাহিনী। বস্তুতঃ ইহাকে বলা যায় বোধিসত্ত্বাবদান। পূর্ণপ্রজ্ঞ সম্যক্স্মৃতিসপন্ন বুদ্ধদেব এই কাহিনীগুলি কোন-না-কোন প্রসঙ্গে শিষ্যবর্গের নিকট বিবৃত করিয়াছেন। ইহার সংখ্যা বৌদ্ধমতে ৫৫০।

ট. 'নিদ্দেস' ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ ; ইহা অনেকটা অর্থবাদ জাতীয়। ইহা মহানিদ্দেস ও চুল্লনিদ্দেস—এই দুই ভাগে বিভক্ত।

ঠ. 'পটিসম্ভিদাগ্গ'—বৌদ্ধ নীতির আলোচনা বিষয়ক গ্রন্থ।

ড. 'অপদান' থের, থেরী বা পূর্ববর্তী কোন মুনির কীর্তিকাহিনী। অপদান (অবদান) শব্দের অর্থ 'বিশিষ্ট কীর্তি'।

ঢ. 'বুদ্ধবংস' পূর্ব-পূর্ব বুদ্ধের জীবন-কাহিনী। ইহাতে কোন্ বুদ্ধ কিভাবে পূর্ব পূর্ব কল্পে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

ণ. 'চরিয়পিটক'—পদ্যে গ্রথিত ৩৫টি জাতকের সমষ্টি।

অভিধম্মপিটক ঃ অভিধম্মপিটক থেরবাদী বৌদ্ধ দর্শন ; ইহার অর্থ 'বিশেষ ধর্ম' (Special Dharma) ; সুত্তের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে এই পিটকের দান অসামান্য হইলেও, খুব সম্ভব ইহা পরবর্তীকালের যোজনা। এই পিটকের সাতখানি গ্রন্থ—ধম্মসংগণি, বিভঙ্গ, কথাবত্থু, পুগ্‌গল পঞ্‌ঞত্তি, ধাতুকথা, যমক ও পট্‌ঠান। অনেকেই মনে করেন, 'কথাবত্থু' মোগ্‌গলিপুত্র তিস্‌সের রচনা।

॥ অনুপালি সাহিত্য ॥

মূল পালি ধর্মশাস্ত্র ব্যতীত পালিতে রচিত যাবতীয় গ্রন্থ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই গ্রন্থগুলির বিশেষত্ব এই যে, এগুলি বুদ্ধ-বচন নয়, এগুলি পরবর্তীকালের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের রচনা। এগুলি বুদ্ধবচনের ভাষ্য-ব্যাখ্যা অর্থাৎ অট্‌ঠকথা। এই শ্রেণীর রচনার ভিতর বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—১. মিলিন্দোপঞ্‌হো' ২. নিদান-কথা ৩. বুদ্ধঘোষের 'অট্‌ঠকথা' ঃ বিসুদ্ধিমগ্‌গো, সমন্তপাসাদিকা, কংখাবিতরণী, সুমঙ্গলবিলাসিনী, পপঞ্চসূদনী, সারত্থপকাসনী, মনোরথপূরনী, ধম্মপদত্থকথা প্রভৃতি, ৪. ধর্মপালের 'অট্‌ঠকথা'—বিমানবত্থু, পেতবত্থু ও থের-থেরীগাথার টীকা, ৫. দীপবংস ও ৬. মহাবংস।

৪. কয়েকখানি পালিগ্রন্থের বিস্তৃততর পরিচয়

॥ দীঘনিকায় ॥

পঞ্চনিকায়ের আদি 'দীঘনিকায়' থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন গ্রন্থগুলির ভিতর অন্যতম। ইহাতে মোট ৩৪টি সুত্ত আছে। সুত্তগুলি অধিকাংশ গদ্যময়, কোথায়ও বা গদ্যের ভিতর গাথাজাতীয় পদ্য। সুত্তগুলি তিনটি বর্গে বিন্যস্ত—শীলক্‌খন্দ-বর্গ, মহাবর্গ ও পাটিকবর্গ। বর্গনামগুলি হইতে বর্গীকরণের উদ্দেশ্য অনেকটা অনুমান করা যায়। সীলক্‌খন্দ বর্গে আছে শীলাদির (চূলশীল, মধ্যমশীল ও মহাশীল) আলোচনা ; মহাবর্গের অধিকাংশ সুত্তই 'মহা' বিশেষণে বিশেষিত, যথা, মহাপদানসুত্তান্ত, মহাপরিনির্বাণসুত্তান্ত, মহাগোবিন্দসুত্তান্ত ইত্যাদি ; পাটিক বর্গের সুত্তগুলি বুদ্ধদেবের অলৌকিক ঋদ্ধিবলের কাহিনী।

'শীলক্‌খন্দ' বর্গের প্রথম সুত্ত 'ব্রহ্মজালসুত্ত' ; ইহাকে 'অর্থজাল সূত্র' বা 'অনুত্তরসংগ্রামবিজয়'ও বলা হইয়াছে। নানাদিক হইতে এই সুত্তটির মূল্য অসাধারণ। ইহাতে তৎকাল প্রচলিত ৬২টি দার্শনিক মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে শাশ্বতবাদ, আভাস্বর, অমরাবিক্ষেপিক, উচ্ছেদবাদ প্রভৃতি আস্তিক ও

নাস্তিক মতগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তখনকার দিনে—নৃত্য, গীত, বাদ্য, প্রেক্ষা, কবির গান, মঞ্চাভিনয়, ইন্দ্রজাল, হস্তী-অশ্বাদির যুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি প্রমোদ-কৌতুক প্রচলিত ছিল ; লোকে আলাপ-প্রসঙ্গে রাজকথা, চোরকথা, যুদ্ধকথা, গ্রাম-কথা, নিগমকথা, নগরকথা, জনপদকথা, পূর্বপুরুষকথা (বংশ) ও সৃষ্টিকথা আলাপ করিত ; জীবিকা-অর্জনের জন্য নানাপ্রকার বিদ্যা—অগ্নি-হোম, রক্তহোম, অঙ্গবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, অহিবিদ্যা, মণিলক্ষণ-কুমারীলক্ষণ প্রভৃতি লক্ষণদ্বারা ভবিষ্যৎ গণনা, নক্ষত্রবিদ্যা দ্বারা ভূমিকম্পাদি কথন, সৌভাগ্যকরণ, দুর্ভাগ্যকরণ, আদর্শ প্রশ্ন[১] কুমারী প্রশ্ন[২] অভ্যুজ্জ্বলন[৩] প্রভৃতি তান্ত্রিক ক্রিয়া প্রচলিত ছিল। বুদ্ধদেব এই সকল হীন কর্ম ও হীন জীবনোপায় হইতে বিরত ছিলেন। তাঁহার ধর্ম ছিল মৈত্রী ও করুণার ধর্ম, গ্রাম্যধর্মের ঊর্ধ্বে তাঁহার বিচরণ—'সমনো গতমো...দয়াপন্নো সব্ব পাণভূতহিতানুকম্পী বিহরতী'তি।'

সীলক্খন্দবর্গের 'শ্রামণ্যফলসুত্ত'টি চমৎকার। জ্যোৎস্নাময়ী অভিরাম রজনী। মগধরাজ অজাতশত্রু রাজামাত্য পরিবৃত হইয়া বলিতেছেন,

রমণীয়া বত ভো দোসিনা রত্তি। অভিরূপা বত ভো দোসিনা রত্তি।
দস্সনীয়া, বত ভো দোসিনা রত্তি। পাসাদিকা বত ভো দোসিনা রত্তি।
লক্খঞ্ঞা বত ভো দোসিনা রত্তি।

—কি রমণীয় জ্যোৎস্না রাত্রি! কি অভিরূপ জ্যোৎস্না রাত্রি! কি দর্শনীয় জ্যোৎস্না রাত্রি! কি প্রসন্ন জ্যোৎস্না রাত্রি! কি সুলক্ষণা জ্যোৎস্না রাত্রি!

আজ এই রাত্রিতে কাহার সংসর্গে আমার চিত্ত প্রসন্ন হইবে? রাজার প্রশ্ন শুনিয়া কেহ বলিলেন, পুরাণ কশ্যপ আছেন, মোক্খলি গোসাল আছেন, অজিত কেশকম্বলী আছেন, সঞ্জয় বেলট্‌ঠ পুত্র আছেন, পকুধকচ্চায়ন আছেন, নিগণ্ঠ নাতপুত্ত আছেন,—আপনি তাঁহাদের নিকট গিয়া চিত্তের প্রসাদ লাভ করুন। কাহারও কথাই রাজার মনঃপুত হইল না। সেখানে মৌনভাবে অবস্থান করিতেছিলেন কৌমারভৃত্য বৈদ্য জীবক। রাজা তাঁহাকে কহিলেন, জীবক, তুমি চুপ করিয়া আছ কেন? জীবক কহিলেন, মহারাজ, আমাদের আম্রকুঞ্জে সম্যক সম্বুদ্ধ আজ সার্ধ দ্বাদশশত ভিক্ষু সহ অবস্থান করিতেছেন, যাঁহার সম্পর্কে লোকে যশোগান গায়ঃ

'ইতিপি সো ভগবা অর্হং সম্মা সম্বুদ্ধো বিজ্জাচরণসম্পন্নো চ সুগতো লোক-বিদূ অনুত্তর পুরিসদম্মসারথি সত্থা দেব মনুস্সানাং বুদ্ধো ভগবা তি।'

—ইনিই সেই ভগবান বুদ্ধ, যিনি অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্‌, অনুপম দম্যপুরুষসারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা।

আপনি তাঁহার নিকট গমন করিয়া চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন। রাজা

---

১. ঐন্দ্রজালিক দর্পণ দ্বারা দৈববাণী প্রাপ্তি।
২. কুমারীকে প্রশ্ন করিয়া ভবিষ্যৎ জানা।
৩. মন্ত্র দ্বারা মুখে অগ্নি উৎপাদন।

জীবকের নির্দেশে হস্তীযানে যতদূর যাওয়া যায়, ততদূর মহা আড়ম্বরে আম্রবনে গমন করিলেন। তারপর পদব্রজে বনের সন্নিহিত হইয়া ভীতভাবে প্রশ্ন করিলেন, জীবক তুমি তো আমাকে প্রবঞ্চনা কর নাই ? তুমি বলিতেছ, আম্রবনে সার্দ্ধ দ্বাদশ-শত ভিক্ষু—তাঁহাদের কোন শব্দই তো শুনিতেছি না ! জীবক উত্তর দিলেন, 'মা ভায়ি মহারাজ···অভিক্কম মহারাজ, অভিক্কম মহারাজ। এতে মণ্ডলমালে দীপা ঝায়ন্তীতি।' [মহারাজ ভয় পাইবেন না, অগ্রসর হউন, এই যে মণ্ডলমালে দীপ জ্বলিতেছে]।

রাজা পদব্রজে মণ্ডলমালার দ্বারে উপনীত হইলেন, দেখিলেন নির্মল প্রসন্ন হ্রদের ন্যায় শান্ত তুষ্ণীভূত ভিক্ষুসংঘ মধ্যে উপবিষ্ট ভগবান বুদ্ধ। দেখিয়া এই প্রশান্তি তিনি কামনা করিলেন পুত্র উদায়িভদ্রের জন্য।

তাহার পর আরম্ভ হইল ভগবান-অজাতশত্রু সংবাদ। ভগবান দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত দিয়া রাজাকে শ্রামণ্য-ফল বুঝাইলেন, শীল উপদেশ দিলেন, প্রীতি-বৈরাগ্য-ধ্যান-ঋদ্ধির কথা বলিলেন। রাজা মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, আমি ভগবানের শরণ লইতেছি, ধর্মের শরণ লইতেছি। অজাতশত্রু উপাসক হইলেন বটে, কিন্তু পাপাচরণ হেতু বীতমল হইয়া ধর্মচক্ষু লাভ করিতে পারিলেন না।

দীঘনিকায়ের প্রায় প্রত্যেকটি নিবন্ধই চিত্তাকর্ষক ও মনোজ্ঞ উপাখ্যানে পূর্ণ। বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শগুলিই কাহিনী ও চিত্তরঞ্জক মধুর সংলাপের ভিতর দিয়া তুলিয়া ধরা হইয়াছে। উপাখ্যানগুলিতে একই উক্তির পুনরাবৃত্তি বহু স্থলেই বিরক্তি উৎপাদন করে। তথাপি সামগ্রিক ভাবে ইহার সৌন্দর্য উপেক্ষণীয় নয়। ধর্মোপদেশ ছলে রাজনীতি ও মানবতার আদর্শও ঘোষিত হইয়াছে। কুশলধর্ম, ধর্ম-শরণ, আত্ম-বিহার—এইগুলিই মানবতা-বিকাশের পরিপোষক ঃ 'চক্কবত্তি সীহনাদ' সুত্তান্তে [পাটিক বর্গ] এই আদর্শ একটি সুন্দর কাহিনীর মধ্যে ব্যক্ত করা হইয়াছে। কাহিনীটিতে রূপকথার আমেজ আছে ঃ

পূর্বকালে দৃঢ়নেমি নামে চতুরন্তবিজেতা এক রাজচক্রবর্তী ছিলেন ঃ তিনি ছিলেন সপ্তরত্নের (চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন ও পরিণায়করত্ন) অধিকারী। দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্তী হইলে তিনি জ্যেষ্ঠপুত্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণের সাতদিন পরে দিব্য চক্ররত্ন অন্তর্হিত হইল। কুমার বিষণ্ণ হইয়া প্রব্রজিত পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। পিতা বলিলেন, চক্রবর্তী-ব্রত পালন করিলেই পুনরায় দিব্য চক্ররত্ন আবির্ভূত হইবে। এই চক্রবর্তীব্রতের মূল কথা—ধর্মানুসারে জীবন-যাপন, কুশলধর্মে প্রতিষ্ঠা ও অকুশল কর্মের বর্জন। রাজকুমার এই ব্রত পালন করিয়া উপোসথ দিবসে প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। সহসা দেখিতে দেখিতে সহস্র অর, নেমি ও নাভিযুক্ত সর্বাকার পরিপূর্ণ দিব্য চক্ররত্নের আবির্ভাব হইল। রাজা ভৃঙ্গারের জল সিঞ্চন করিয়া চক্ররত্নকে অভিনন্দন করিলেন। চক্ররত্ন প্রতিষ্ঠিত হইলে রাজা হইলেন রাজ-চক্রবর্তী। রাজা রাজ্যমাঝে প্রচার করিলেন, প্রাণনাশ

করিও না, মিথ্যা কহিও না, ব্যভিচার করিও না, অদত্ত গ্রহণ হইতে বিরত হইও। এইভাবে তিনি বহুশত বৎসর রাজত্ব করিলেন। তাহার পর চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্তী হইলে তিনিও পিতার ন্যায় জ্যেষ্ঠকুমারকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। সপ্তমদিনে চক্ররত্ন অন্তর্হিত হইল। নবমূর্ধাভিষিক্ত রাজকুমার বিষণ্ণ হইলেন বটে, কিন্তু তিনি কাহারও নিকট রাজচক্রবর্তী-ব্রতের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, স্ব-মতে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তিনি দরিদ্রকে ধনদান করিলেন না। ফলে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইল। দারিদ্র্য হেতু চৌর্যকর্মের প্রসার হইল। রাজা নিজবুদ্ধিমতে চোরকে ধনদান করিলেন। এইরূপে সকলেই চুরি করিয়া রাজার দানে বড় হইতে প্রবৃত্ত হইল। রাজা ভুল বুঝিয়া এবার চোরের শাস্তিবিধান করিতে লাগিলেন। ফলে চোরেরা ক্রমে দস্যুতে পরিণত হইল, তাহার প্রাণনাশ করিয়া পরস্বাপহরণ করিতে লাগিল। এইরূপে চৌর্য হইতে প্রাণনাশ, প্রাণনাশ হইতে মৃষাবাদ, মৃষাবাদ হইতে আয়ুক্ষয় প্রাদুর্ভূত হইল—লোভ, বিদ্বেষ, অধর্মরাগ প্রবল হওয়ায় ব্যভিচার, মত্ততা ও অকুশলকর্মে রাজ্য পূর্ণ হইয়া উঠিল। যেন ঘোরকলি।

কাহিনীটিতে ভবিষ্যৎকল্পের এক বিভীষিকাময় চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ভবিষ্য-কল্পের ভাবী বুদ্ধ করুণকান্ত মৈত্রেয়। তিনি মানুষকে কুশলকর্মে দীক্ষা দিবেন এবং মৃতকল্প মানুষ আবার নবজীবনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে।

দীঘনিকায়ে এই ধরনের অনেক কাহিনী আছে। এই নিকায়ের আর এক সৌন্দর্য গৌতমবুদ্ধের সুমধুর ভাষণ, বিরোধীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া তাহার নিকট হইতেই নিজমতের উত্তর আদায়। যেমন, 'তেবিজ্জসুত্তে'র এই সংলাপটি :

[বাসেট্‌ঠ গৌতমকে প্রশ্ন করিলেন, বৈদিক ব্রাহ্মণোক্ত কোন্ ক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্মের সহিত মিলিত হওয়া যায়। গৌতম প্রতিপাদন করিলেন, ব্রহ্মাকে কেহ চোখেই দেখেন নাই, তাহার সহিত মিলিত হওয়ার কল্পনা সর্বৈব মিথ্যা]

> 'কিং পন বাসেট্‌ঠ, অত্থি কোচি তেবিজ্জানাং ব্রাহ্মণানাং এক
> ব্রাহ্মণোপি যেন ব্রহ্মা সক্খিদিট্‌ঠো তি ?'
> 'নো হি ইদং ভো গোতম।'[১]
> 'কিংপন বাসেট্‌ঠ অত্থি কোচি তেবিজ্জানাং ব্রাহ্মণানাং একাচরিযো
> পি যেন ব্রহ্মা সক্খিদিট্‌ঠো তি ?'
> 'নোহি ইদং ভো গোতম।'
> 'তং কিং মঞ্ঞসি বাসেট্‌ঠ, ননু এবং সন্তে তেবিজ্জানাং
> ব্রাহ্মণানাং অপ্পাটিহীরকতং ভাসিতং সম্পজ্জতী' তি ?'
> 'অদ্ধা খো ভো গোতম এবং সন্তে তেবিজ্জানাং ব্রাহ্মণানাং
> অপ্পাটিহীরকতং ভাসিতং সম্পজ্জতীতি।'

---

১. তখনকার দিনে ব্রাহ্মণেরা গৌতমকে তুচ্ছ করিয়া 'ভো গোতম' সম্বোধন করিতেন, এইজন্য তাঁহাদিগকে বলা হইত 'ভো-বাদী' ব্রাহ্মণ।

'বাসেট্‌ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে একজনও কি ব্রহ্মাকে সাক্ষাৎ দেখিয়াছেন ?'

'না, হে গৌতম।'

'ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কোন আচার্য কি ব্রহ্মাকে সাক্ষাৎ দেখিয়াছেন ?'

'না, হে গৌতম।'

'তাহা হইলে বাসেট্‌ঠ, তুমি কি মনে কর না, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য অর্থহীন ?'

'অবশ্যই গৌতম। এইরূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য অর্থহীন।'

বুদ্ধদেবের তর্ক করিবার প্রণালী সর্বত্রই এইরূপ। এইরূপে বিরুদ্ধমতালম্বী বহু সম্প্রদায় তাঁহার বশীভূত হইয়াছিল।

।। ধম্মপদ ।।

খুদ্দকনিকায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ধম্মপদ'। ইহা পালি ধর্মসাহিত্যের মধ্যমণি। বৌদ্ধগণের বিশ্বাস ধম্মপদের সমস্ত বচন বুদ্ধ-বচন। বচনগুলি পদ্যে নিবদ্ধ এবং ভাষা প্রাঞ্জল ও সুমধুর। বৌদ্ধধর্মাদর্শের সারাংশ ইহাতে সংবলিত।

বৌদ্ধ ত্রিপিটক নানাভাষাতেই অনূদিত হইয়াছে। ইহার ভিতর ধম্মপদের প্রচার সর্বাপেক্ষা অধিক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে এমন স্থান নাই, যেখানে ধম্মপদের আলো বিস্তৃত হয় নাই। ধম্মপদের এই দিগ্বিজয় নিঃসন্দেহে ইহার জনপ্রিয়তার স্বাক্ষর। ভারতীয় ধর্মসাহিত্যের তিনটি গ্রন্থ বিশ্ববরেণ্য আসন লাভ করিয়াছে—উপনিষৎ, গীতা ও ধম্মপদ। ধম্মপদ সমগ্র বৌদ্ধসাহিত্যের উপনিষদ্ ও গীতা।

ধম্মপদ ২৬টি বর্গে বিভক্ত ঃ ১. যমকবগ্‌গো ২. অপ্‌পমাদ (অপ্রমাদ) ৩. চিত্ত ৪. পুপ্‌ফ (পুষ্প) ৫. বাল ৬. পণ্ডিত ৭. অরহন্ত ৮. সহস্‌স (সহস্র) ৯. পাপ ১০. দণ্ড ১১. জরা ১২. অত্ত (আত্ম) ১৩. লোক ১৪. বুদ্ধ ১৫. সুখ ১৬. পিয় (প্রিয়) ১৭. কোধ (ক্রোধ) ১৮. মল ১৯. ধম্‌ম ২০. মগ্‌গ (মার্গ=পথ) ২১. পকিণ্ণক (প্রকীর্ণক=বিবিধ) ২২ নিরয় (নরক) ২৩. নাগ ২৪. তন্‌হা (তৃষ্ণা) ২৫. ভিক্‌খু ও ২৬. ব্রাহ্মণ বগ্‌গো। ইহাতে মোট ৪২৩টি শ্লোক আছে।

বৌদ্ধধর্মের মূল সূত্রগুলিই ধর্মপদের বক্তব্য। ত্রিশরণ, চারিটি আর্যসত্য এবং দুঃখ-উপশমের অষ্টাঙ্গিক মার্গ—এইগুলিই যে শ্রেষ্ঠ ও নিরাপদ শরণ, তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হইয়াছে এই কয়েকটি পদে ঃ

> যো চ বুদ্ধঞ্চ ধম্মঞ্চ সঙ্ঘঞ্চ সরণং গতো
> চত্তারি অরিয় সচ্চানি সম্মপ্‌পঞ্‌ঞায় পস্‌সতি।
> দুক্‌খং দুক্‌খ সমুপ্‌পাদং দুক্‌খস্‌স চ অতিক্কমং
> অরিয়ঞ্চট্‌ঠঙ্গিকং মগ্‌গং দুক্‌খূপসমগামিনং।
> এতং যো সরণং খেমং এতং সরণমুত্তমং
> এতং সরণমাগম্ম সব্বদুক্‌খা পমুচ্চতি। [বুদ্ধবগ্‌গো. ১২.১৪]

—যিনি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করেন এবং দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ ও দুঃখোপশমের উপায় স্বরূপ আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ—এই চতুরার্যসত্য সম্যক জ্ঞানে দর্শন করেন, তাঁহার এরূপ শরণ খেমংকর, ইহা উত্তম শরণ। এই প্রকার শরণ গ্রহণে সর্ব দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

ধম্মপদের বিশ্বব্যাপী খ্যাতি সম্প্রদায়-গত ধর্মদেশনার জন্য নহে। ভারতবর্ষের নিজস্ব কতকগুলি প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও প্রাণের বাণী আছে, যাহা কোন বিশেষ ধর্ম, বিশেষ সম্প্রদায়, বিশেষ দেশ ও বিশিষ্ট কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে—যাহা সার্বভৌমিক কল্যাণমৈত্রীর আদর্শদ্বারা প্রণোদিত—যাহা চিরকালীন মানবধর্মবোধে উদ্দীপ্ত—যাহা স্মরণাতীত কাল হইতে বেদে, উপনিষদে, গীতায়, সুভাষিতাবলীতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে—ধম্মপদের পদে পদে সেই আকাঙ্ক্ষা, সেই বাণীর সুর ধ্বনিত হইয়াছে। 'প্রাচীন সাহিত্যে' ধম্মপদং-এর আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথও ধম্মপদের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন,

'ভগবদ্‌গীতায় ভারতবর্ষ যেমন আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, গীতার উপদেষ্টা ভারতের চিন্তাকে যেমন একস্থানে একটি সংহত মূর্তি দান করিয়াছেন, ধম্মপদং গ্রন্থেও ভারতবর্ষের চিত্তের একটি পরিচয় তেমনি ব্যক্ত হইয়াছে।'

বস্তুতঃ বুদ্ধদেব জগতের অনিত্যতা ও অনাত্মতা সম্পর্কে যত কথাই বলুন না কেন, বৌদ্ধধর্ম প্রধানতঃ নীতিমূলক। ত্যাগে ও পরার্থপরতায়, অক্রোধে ও ক্ষমায়, উদার মানবধর্মবোধে গঠিত যে মানুষ, সেই মানুষ গঠন করাই বৌদ্ধধর্মের অন্যতম লক্ষ্য। ধম্মপদের প্রতিটি বর্গে এই সমুচ্চ নীতিধর্মের আদর্শ সুক্তিরূপে বাণীমূর্তি লাভ করিয়াছে। তথাগত বুদ্ধ যেন কালের অনতিক্রম্য বাধা ভেদ করিয়া এখনও বলিতেছেন ঃ

> ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং
> অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো। [যমক. ৫]

—বৈর দ্বারা বৈর কখনও সাম্য লাভ করে না ; অবৈর দ্বরাই বৈর প্রশমিত হয় ; ইহাই সনাতন ধর্ম।

> অপ্পমাদো অমতপদং পমাদো মচ্চুণোপদং
> অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি যে পমত্তা যথা মতা। [অপ্‌পমাদ. ১]

—অপ্রমাদ অমৃতের পথ, মৃত্যুর পথ প্রমাদ ; যাঁহারা অপ্রমত্ত তাঁহারা অমর, আর প্রমত্ত মৃততুল্য।

> যো চ বস্‌সসতংজীবে কুসীতো হীনবীরিয়ো
> একাহং জীবিতং সেয্যো বিরিয়ং আরভতো দলহং। [সহস্‌স. ১৩]

—অলস ও হীনবীর্য হইয়া সহস্র বৎসর বাঁচার অপেক্ষা, দৃঢ় ও বীর্যবান্‌ হইয়া একদিন বাঁচাও শ্রেয়ঃ।

> সব্বে তসন্তি দণ্ডস্‌স সব্বে ভায়ন্তি মচ্চুনো
> অত্তানং উপমং কত্তা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে। [দণ্ড. ১]

—সকলেই দণ্ডকে ভয় পায়, মৃত্যুকে ভয় পায়। নিজের মত মনে করিয়া কাহাকেও হনন করিও না, আঘাত করিও না।

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনম্। [কোধ. ৩]

—ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা, অসাধুকে সাধুতাদ্বারা, কৃপনকে দানদ্বারা এবং মিথ্যাবাদীকে সত্যদ্বারা জয় করিবে।

নত্থি রাগসমো অগ্গি নত্থি দোস সমো গহো
নত্থি মোহসমং জালং নত্থি তন্হাসমা নদী। [মল, ১৭]

—রাগের (কামের) তুল্য অগ্নি নাই, দোষের সমান গ্রহ নাই, মোহের মত জাল নাই, তৃষ্ণার মত নদী নাই।

ধম্মপদের অধিকাংশই সুউচ্চ নীতিবাক্য ঃ কিন্তু এই নীতিবাক্য জীবনমূল হইতে উৎসারিত বলিয়া উহার কাব্যমূল্য অপরিসীম। প্রাচ্য বিদ্যাবিৎ Macdonell বলেন, 'It is a collection of aphorisms representing the most beautiful, profound and poetical thoughts in Buddhist literature. [Hist of Sans. Lit.]—তাহা ছাড়া ধম্মপদের কতকগুলি পদে এমন কতকগুলি উপমা ও দৃষ্টান্তের প্রয়োগ আছে, যাহাদের শক্তি শুধু অর্থের মনোহারিত্বে নয়, হৃদয়কে আকর্ষণ করিবার ক্ষমতায়। যথা,

যস্স পাপং কতং কম্ম কুসলেন পিথীয়তি
সো ইমং লোকং পভাসেতি অব্ভামুত্তোবচন্দিমা। [লোক. ৭]

—যাঁহার পাপকর্ম কুশলকর্মদ্বারা আবৃত হয়, তিনি মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় এই জগতকে আলোকিত করেন।

অনুপুব্বেন মেধাবী থোকং থোকং খণে খণে
কম্মারো রজতসেস্ব নিদ্ধমে মলমত্তনো। [মল. ৫]

—কর্মকার যেমন অল্প অল্প করিয়া রজতমল দূরীভূত করে, তেমনি মেধাবী ক্রমে ক্রমে আত্মমল ক্ষালণ করেন।

এগুলি ছাড়া, 'পব্বতট্ঠো'ব ভুম্মট্ঠে ধীরো বালে অবেক্খতি' [ধীর ব্যক্তি পর্বতারূঢ় জনের ন্যায় ভূনিম্নে অবস্থিত মূঢ়কে অবলোকন করে—অপ্পমাদ. ৮], 'উদবিন্দুনিপাতেন উদকুম্ভোপি পূরতি' [বিন্দু বিন্দু জল পড়িয়া জলকুম্ভ পূর্ণ হয়—পাপ. ৭], 'নকখত্তপথং'ব চন্দিমা' [নক্ষত্রপথ পরিক্রমণকারী চন্দ্রের ন্যায়—সুখ. ১২] প্রভৃতি উপমাগুলিও সুন্দর।

॥ সুত্তনিপাত ॥

'সুত্তনিপাত' খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত পঞ্চম গ্রন্থ এবং ইহার কতকগুলি সুত্ত অতি প্রাচীন। গ্রন্থখানি পাঁচটি বর্গে বর্গীকৃত ঃ উরগবগ্গ, চূলবগ্গ, মহাবগ্গ, অট্ঠকবগ্গ ও পারায়ণবগ্গ। অন্যান্য নিকায়ের কতিপয় সুত্তও ইহাতে স্থান লাভ

করিয়াছে, যেমন রতনসুত্ত, মঙ্গলসুত্ত, মেত্তসুত্ত [খুদ্দনিকায়-খুদ্দকপাঠ]। সুত্ত-নিপাত যেন নিকায় গ্রন্থগুলির একটি সংক্ষিপ্ত ও বিশিষ্ট সংকলন। ইহার নিজস্ব মূল্যও অনল্প।

উরগবর্গের প্রথম সূত্র 'উরগসুত্তং'। ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে নির্বাণ লাভের পথ।

এই বর্গের দ্বিতীয় সুত্ত অতি বিখ্যাত 'ধনিয়সুত্ত'। ধনিয় একজন সুখী গোপ; সে বিত্তবান, স্বচ্ছল, নিরুদ্বেগ; তাহার পত্নীও ধীরস্বভাবা ও শুদ্ধ চরিত্রা ['গোপীমম অস্সবা অলোলা']। এই সম্পদ লইয়া সে সুখে কাল কাটায়। ইহারই পাশে চিত্রিত হইয়াছে বুদ্ধদেবের পূত চরিত্র। তিনি বলিতেছেন, চিত্ত আমার আসব-মুক্ত ['চিত্তং মম অস্সবং বিমুত্তং'], স্ত্রীপুত্রধনাদি পরিবৃত না হইযাও আমি সুখী। তিনি বন্ধ নন, মুক্ত। চির আনন্দময। প্রত্যেকটি শ্লোকের পরে 'অথ চে পত্থয়সী পবস্স দেব' [হে দেব, চাহ তো প্রচুর বর্ষণ কর] এই ধ্রুবপদ। বুদ্ধদেবের সুখই উৎকৃষ্ট, কাজেই ধনিয় গোপের মন পরিবর্তিত হইল। মারের প্রলোভনেই ধনিয় গোপ এতদিন নন্দি-রাগের বশীভূত ছিল। আজ বুদ্ধ মারকে পরাজিত করিলেন, বুঝাইলেন, 'উপধী হি নরস্স সোচনা, নহি সোচতি যো নিরূপধ' [বিষয়ভোগই শোকের হেতু, বিষয়বিমুক্ত ব্যক্তিই অশোক]।

সুত্তনিপাতে বৌদ্ধধর্মের আদর্শের সাহিত বুদ্ধ-জীবনের কতিপয় ঘটনাও বিবৃত হইযাছে। নালকসুত্তে [মহাবগ্গ] পাই বুদ্ধজন্মের চিত্র। দেবগণ আনন্দে অধীর 'সেলেন্তি গায়ন্তি চ বাদয়ন্তি চ'—কেহ উচ্চরবে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, কেহ গান করিতেছেন, কেহ বাদ্য বাজাইতেছেন। অসিত ঋষির প্রশ্নে দেবগণ বলিলেন,

'সো বোধিসত্তো রতনবরো অতুল্যো
মনুস্সলোকে হিতসুখতায় জাতো'

—প্রাণিগণের হিত-সুখের জন্য অতুল্য বোধিসত্ত্বরত্নবর আজ মনুষ্য লোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

ভবিষ্যতে ইনি কিভাবে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিবেন, তাহার ভবিষ্য ছবিও আঁকা হইয়াছে। অসিত দেবল তখন জীবিত থাকিবেন না, তাই নিজ ভাগিনেয় নালককে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন। উত্তরকালে নালক বুদ্ধের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছিলেন করুণা-মৈত্রীর শ্রেষ্ঠ বাণী :

যথা অহং তথা এতে যথা এতে তথা অহং
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে।

—আমি যেমন অপরেও তেমনই, অপরে যেমন আমিও তেমনই : এইরূপে আপন-উপমায় কাহাকেও হত্যা করিও না, কাহাকেও আঘাত করিও না।

এমনই 'পবজ্জাসুত্তে' আছে বিম্বিসার-গোতম-সংবাদে প্রব্রজ্যাসুখের বর্ণনা। 'পধানসুত্ত' মার-বিজয়ের অমর চিত্র।

সুত্তনিপাতের কতকগুলি বাণী, শাশ্বত মানবতার বাণী। মনুষ্যত্বের পূজারী মাত্রেরই এ বাণী প্রণিধানযোগ্য ঃ

১. উট্‌ঠহত নিসীদথ কো অত্থো সুপিনেন বো।
আতুরানং হি কা নিদ্দা সল্লবিদ্ধান রূপ্পতং ॥ [উট্‌ঠানসুত্ত. ১]

—ওঠ, বস, শুইয়া থাকিলে কি লাভ ? শল্যবিদ্ধ রোগীর নিদ্রা কোথায় ?

২. পাণং ন হানে চ ঘাতয়েয্য
ন চানুজঞ্‌ঞা হননং পরেসং।
সব্বেসু ভূতেসু নিধায় দণ্ডং
যে থাবরা যে চ বসন্তি লোকে ॥ [ধম্মিকসুত্ত. ১৯]

—সংসারে স্থাবর বা জঙ্গম সকলের প্রতি হিংসা ত্যাগ করিবে, নিজে প্রাণবধ করিবে না, কাহাকেও দিয়া করাইবে না, এমনি কি অপরকেও প্রাণিবধে অনুমতি দিবে না।

॥ থেরীগাথা ॥

'থেরগাথা' ও 'থেরীগাথা'—দুই পালিসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। একটিতে আছে পুরুষ স্থবিরদের আত্মভাষণ, অন্যটিতে আছে মহিলা স্থবিরাদের বিমুক্তি সুখের কথা। ভারতীয় সাহিত্যে পুরুষের ত্যাগ ও ধর্মপথ পরিক্রমার কাহিনী সুদুর্লভ নয়, কিন্তু নারীগণ কাব্যের উপেক্ষিতা। প্রাচীন সাহিত্যে—কয়েকজন মহীয়সী নারীর কাহিনী পাওয়া যায়. বেদের ঘোষা, অপালা, আত্রেয়ী, বিশ্ববারা, বাক্—উপনিষদের বাচক্নবী গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী মৈত্রেয়ী ; পুরাণেও কিছু কিছু মনস্বিনী নারীর সংবাদ আছে। কিন্তু পালি 'থেরীগাথা'য় এইরূপ শতাবধি মহীয়সী নারীর উল্লেখ রহিয়াছে। এই সকল নারী কেবল সমাজের উচ্চ কোটির অন্তর্ভুক্ত নহেন। তাঁহারা অধিকাংশই অতি সাধারণ ভারত-নারী—কর্মকার দুহিতা, নলকার পত্নী, মৃগলুব্ধক ব্যাধের দুহিতা ও পতিতা বারাঙ্গনা। এইদিক হইতে 'থেরীগাথা' কেবল বৌদ্ধ সাহিত্যের নয়, সমগ্র প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের গৌরব। এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ-শাস্ত্রবিদ্ প্রসিদ্ধ Rhys Davids-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ

It affords a very instructive picture of the life they led in the valley of the Ganges in the time of Gotama, The Buddha. It was a bold step on the part of the leaders of the Buddhist reformation to allow so much freedom and to concede so high a position to women. But it is quite clear that the step was a great success, and that many of these ladies were as distinguished for high intellectual attainments, as they were for religious earnestness and insight.[১]

---

১. Buddhism—Rhys Davids. P. 72.

থেরীগাথা শ্লোকসংখ্যা অনুযায়ী একনিপাত [এক শ্লোকের রচনা], দুকনিপাত [দুই শ্লোকের রচনা] এই ক্রমে নবনিপাত এবং একাদস, দ্বাদস, সোলস (ষোল), বীসতি (কুড়ি), তিংস (তিরিশ), চত্তালীস (চল্লিশ) এবং মহানিপাত—এই ষোড়শ নিপাতে বিভক্ত। ইহাতে প্রায় ৭৩ জন থেরী বা জ্ঞানবৃদ্ধা নারীর আত্মকাহিনী বিবৃত হইয়াছে ঃ সর্বত্রই যে সম্পূর্ণ কাহিনী আছে, তাহা নয়—কোন কোন স্থলে কেবল থের হইবার সূত্রটুকুই দেওয়া হইয়াছে। থেরীগণের কোন কোন রচনা ও জীবনচরিত 'অপদান' সাহিত্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আচার্য ধর্মপাল ইহার একটি মনোজ্ঞ ভাষ্য রচনা করেন। তাহা হইতে ইহাদের জীবনের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। ভোগে বীতশ্রদ্ধ হইয়া, কিংবা কোন বিশেষ ঘটনায় পড়িয়া যেভাবে এই মহিলাগণ পুণ্যশ্লোক তথাগতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা উপন্যাসের মত বিস্ময়কর। রচনা সমস্তই পদ্যে নিবদ্ধ এবং ভাষাও প্রাচীনতর।

এক নিপাতের প্রথম গাথাটি 'মণ্ডপদায়িকা' নাম্নী একজন থেরীর। তিনি বলিতেছেন ঃ

সুখং সুপাহি থেরিকে কত্বা চোলেন পারুতা
উপসন্তো হি তে রাগো সুক্খডাকং'ব কুম্ভিয়ং।

—ওগো থেরী, চীবরে দেহ আবৃত করিয়া সুখে ঘুমাও ঃ জলশূন্য পাত্রের মত তোমার রাগ আজ উপশান্ত ও শব্দহীন।

দুকনিপাতের সুমুত্তিকার গাথাটিও করুণ ও সুন্দর। ইনি ছিলেন এক নলকারের পত্নী, জীবন ছিল দারিদ্র্য-দুর্বহ। থেরী হইবার পর যে শান্তি তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই গাথার বর্ণনীয় বিষয় ঃ

সুমুত্তিকে সুমুত্তিকা সাধু মুত্তিকম্হি মুসলস্স
অহিরিকো মে ছত্তকং বাপি উক্খলিকা মে দলিদ্দভাবা।
রাগঞ্চ অহং দোসঞ্চ বিচ্ছিন্দন্তী বিহরামি
সা রুক্খমূলমুপগম্ম অহো সুখন্তি সুখতো ঝায়ামি।

অনুবাদ ঃ সুমুত্তিকা মোর নাম। মুসল-মুক্তিকা আমি ওরে!
ছাতাটির মত স্বামী (কি নির্লজ্জ!) আচরিত মোরে ;
গেছে সে দারিদ্র্য মোর ; আজি আমি বাধা নই ডোরে।
রাগ দোষ তেয়াগিয়া আজি আমি করি বিচরণ ;
বৃক্ষছায়ে লভি সুখ ধ্যানে মগ্ন করি মোর মন।[১]

এমনই ছায়া-ছবির মত ভাসিয়া ওঠেন, কাশী নগরীর অর্ধসম্পদের অধিকারিণী থেরী 'অড্ঢকাসী', পতিতা 'অভয়মাতা', পুরাণগণিকা 'বিমলা', 'পুরাণ নিগন্থী ভদ্দাকুণ্ডলকেসা'। ভদ্দাকুণ্ডলকেসা—রাজগৃহের সম্পন্ন শ্রেষ্ঠীর কন্যা, ঢেউখেলানো তাঁহার কেশ, তাই নাম কুণ্ডলকেশা। তিনি এক ব্রাহ্মণ কুমারের প্রণয়ে পড়েন ঃ

---

১. অনুবাদ বিজয়চন্দ্র মজুমদার, দ্রষ্টব্য তৎসম্পাদিত 'থেরী গাথা'।

ব্রাহ্মণকুমার 'সত্থুক' ছিল চোর। একদিন যখন সত্থুককে চৌর্যাপরাধে ঘাতকগণ বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতেছিল, তখন ভদ্রাই অর্থদ্বারা তাহার জীবন রক্ষা করেন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস—কুচরিত্র সত্থুক ভদ্রার অলংকার চুরি করিবার ছলে একদিন তাঁহাকে পর্বতশিখরে লইয়া যায় এবং অলংকার ছিনাইয়া লইয়া তাঁহাকে শিখর হইতে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করে। ভদ্রা এবার স্বামীর স্বরূপ বুঝিতে পারেন এবং শেষ আলিঙ্গনের ছলে তিনিই স্বামীকে পর্বতের অধোদেশে নিক্ষেপ করেন। 'ইত্থিপি পণ্ডিতা হোতি'—স্ত্রীগণও সময়ে সময়ে পণ্ডিত হইতে পারেন, ভদ্রাকুণ্ডলকেশা তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ। ভদ্রার গাথাটিও সুন্দর।

থেরীসংঘের নেত্রী ছিলেন 'মহাপজাপতি গোতমী'। ইনি বুদ্ধদেবের ধাত্রীমাতা, বুদ্ধজননী 'মায়া'র ভগিনী। মায়াদেবীর মৃত্যু হইলে ইনিই পাটরাণী (অগ্‌গমহিসী) হন। ইঁহারই নির্বন্ধাতিশয্যে বুদ্ধদেব সংঘে নারীপ্রবেশের অধিকার প্রদান করেন। গোতমীর গর্ব—তিনি পরমসুগত 'বুদ্ধমাতা' নামে পরিচিতা! তিনি বলেন,

বুদ্ধ বীর নমোতাত্থু সব্বসত্তানমুত্তমং
যো মং দুক্‌খা পমোচেসি অঞ্ঞঞ্চবহুকং জনং।

—ওগো বুদ্ধবীর! তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্বসত্তোত্তম। আমার ও অন্যান্য কতজনের দুঃখ তুমি মোচন করিয়াছ।

থেরীগাথার জীবন দুঃখবেদনার সংঘাতে প্রাণময় ঃ চরিত্রগুলি অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল। দুঃখ ও মৃত্যু-শোকের আঘাতে বিপর্যস্ত হইয়া কেমন করিয়া নারীগণ একে একে সংঘের আশ্রয়ে সর্বশান্তি লাভ করিয়াছেন, প্রায় প্রত্যেকটি গাথা, তাহারই বেদনাময় কাহিনী। কোন কোন গাথার চমক ও আঘাতের স্বরূপ এমন ভয়ংকর—যে পাঠ করিতে করিতে দেহ শিহরিত হয়, যেমন 'কিসা গোতমী'র (কৃশা গোতমীর) গাথাটি। তিনি বলিতেছেন, নারীর জীবন দুঃখময়—নারীকে সপত্নী লইয়া ঘর করিতে হয়, প্রসবযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়; কেহ যন্ত্রণায় উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে, কেহ বিষ খায়। স্বয়ং কৃশা গোতমীর দুঃখ আরও গভীর ঃ

দ্বে পুত্তা কালংকতা পতি চ পন্থে মতো কপণিকায়
মাতা পিতা চ ভাতা চ ডহ্যন্তি একচিতায়াং।

—আমার দুইপুত্র কালের কবলগত হইয়াছে, পতি অনশনে পথে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, মাতা-পিতা-ভ্রাতা একচিতায় দগ্ধ হইয়াছেন।...সংসারের এই পরিণাম দেখিয়া হতকুলিকা গোতমী বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন। আজ তাঁহার শান্তি, আজ দুঃখের শেষ, আজ 'কান্তসল্লা ওহিতভারা' (বিগতশল্য ভারমুক্ত) গোতমী।

আর একটি ভয়াবহ কাহিনী থেরী 'উৎপলবণ্ণা'র। তিনি বলিতেছেন 'উভো মাতা চ ধীতা চ ময়ং আসুং সপত্তিয়ো'—আমরা মাতা ও দুহিতা—উভয়ে ছিলাম সপত্নী। অশুচি কামনার এই ভয়াবহতাই উৎপলবর্ণাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণে প্রেরণা দিয়াছিল। থেরী অম্বপালীর কাহিনীও বিস্ময়কর ঃ তিনি ছিলেন বেসালী-পতির অনুগৃহীতা, তিনিও অবশেষে বুদ্ধের কৃপালাভ করেন। রূপ-রূপো গর্বিতা বারাঙ্গনা

রাজকোষের সমস্ত অর্থের লোভ পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধদেবকে নিজকাননে আমন্ত্রণ করেন এবং সর্বস্ব সঙ্ঘের জন্য দান করিয়া থেরী হন।

থেরীগাথা ভারতীয় নারী চরিত্রের অপূর্ব চিত্রশালা।

॥ জাতক ॥

বৌদ্ধ পালিসাহিত্যের আর একখানি সম্পদ 'জাতক'। বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধাঙ্কুররূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া বুদ্ধদেব যে-সকল লোক-কল্যাণকর কর্ম করিয়াছিলেন, 'জাতক' তাহারই কাহিনী। বৌদ্ধমতে বুদ্ধদেব বোধিসত্ত্ব রূপে ৫৫০ বার ['পঞ্ঞপঞ্ঞাসত'] জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাজেই জাতকে ৫৫০টি কাহিনী থাকিবার কথা। কিন্তু অধ্যাপক ফৌস্‌বেল যে 'জাতক' সম্পাদনা করিয়াছেন, তাহাতে ৫৪৭টি কাহিনী আছে। তন্মধ্যে কয়েকটি কাহিনী আবার একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল বলিয়া জাতকের কিছু অংশ হয়তো লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ আবার অনুমান করেন, কালক্রমে অন্যান্য কাহিনীও সংযোজিত হইয়াছে।

একটি পূর্ণাঙ্গ জাতক তিনটি অংশে বিভক্ত : ১. পচ্চুপ্পন্ন বত্থু (প্রত্যুৎপন্ন বস্তু বা বর্তমান কথা). ২. অতীতবত্থু (গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত বোধিসত্ত্বের অতীত কাহিনী) এবং ৩. সমবধান (অতীত বস্তুর সহিত বর্তমান বস্তুর যোগ নির্ণয়)। এগুলি ছাড়াও 'গাথা' ও 'বেয্যাকরণ' নামক আরও দুইটি ভাগ আছে। জাতকের পদ্যাংশই 'গাথা' ; এই গাথা অতিপ্রাচীন কথার 'কথাঙ্কুর'। গাথার ব্যাখ্যা অংশের নাম 'বেয্যাকরণ'।

অতীত বস্তুই জাতকের মূলাংশ। এগুলি বোধিসত্ত্ব-জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শের কথায় পূর্ণ। বুদ্ধত্ব অর্জন করা সহজ নয়, উহা জন্মজন্মান্তরের 'মৈত্রিবুদ্ধি' ও কুশলকর্মের পুণ্যফল। প্রত্যেকটি জাতকে এই কল্যাণ-মৈত্রির কথা নানা কাহিনীছলে ঘোষিত হইয়াছে।

জাতক প্রাচীন ভারতীয় কথাসাহিত্যের অনর্ঘ রত্নকোষ। রামায়ণে, মহাভারতে, পঞ্চতন্ত্রে, হিতোপদেশে যে সকল কথা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, জাতক তাহাদেরই আদি সংগ্রহ গ্রন্থ।[১] শুধু তাই নয়, পণ্ডিতপ্রবর ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় দেখাইয়াছেন, ঈশপের বহু গল্প, গ্রীমভ্রাতৃদ্বয়ের অনেক কাহিনী, কবি চসারের Pardoner's Tale প্রভৃতির মূল রহিয়াছে জাতকে।[২]

জাতকের মূল লক্ষ্য বৌদ্ধধর্মের অহিংসা, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও শীলাদির ব্যাখ্যা ও প্রচার। অধিকাংশ জাতককাহিনী সুউচ্চ নীতির সুরে বাঁধা। পশুর প্রতি গৃহীর

---

১. 'The Jatakas are the oldest fairy tales of the Aryan race'—Horrwitz.

২. জাতকমঞ্জরী (উপক্রমণিকা)—ঈশানচন্দ্র ঘোষ।

অত্যধিক আদর যে পশুরই ক্ষতির কারণ, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে 'মুণিক' ও 'শালুক' জাতকদ্বয়ে। এক ভূস্বামী প্রভৃত যবাগু খাওয়াইয়া এক শূকরকে পালন করিতেন। শূকরটিকে হৃষ্টপুষ্ট করিয়া তুলিবার কারণ অহেতুক দাক্ষিণ্য নয়, কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রিতদের রসনেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন। 'বেদব্ভ' জাতকের উপদেশ—লোভই বিনাশের মূল। বেদব্ভ ছিলেন মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। তিনি মন্ত্রবলে নক্ষত্রযোগে রত্নবর্ষণ করাইতে পারিতেন। একবার এক দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রাণরক্ষার নিমিত্ত তিনি রত্নবর্ষণ করান। ফলে দস্যুহস্তে তাঁহার মৃত্যু ঘটে এবং দস্যুরাও রত্নলোভে পরস্পর হানাহানি করিয়া বিনষ্ট হয়। ক্ষান্তির একাদর্শ 'খন্তিবাদী জাতক'। বোধিসত্ত্বের ক্ষমা ও সহনশীলতা অসাধারণ। রাজার নির্দেশে তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করা হইল, কিন্তু অটল বোধিসত্ত্বের ক্ষান্তি-গুণ। জাতকের জীবজন্তুমূলক কাহিনীগুলি পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশের নীতিকাহিনীরই অনুরূপ। পার্থক্য এই যে, জাতকের কাহিনীতে জীবনের স্বাদ অধিক ; মানব-কাহিনীর আকর্ষণও জাতকে বেশি।

ইতিহাসের দিক হইতেও জাতকের অসাধারণ মূল্য। অধিকাংশ জাতকের কথা শুরু হইয়াছে এই বাক্য দিয়া 'অতীতে বারাণসীয়ং ব্রহ্মদত্তো রজ্জং কারেসি'। ব্রহ্মদত্ত ঐতিহাসিক না কাল্পনিক, তাহা গবেষণার বিষয় ; কিন্তু ঐতিহাসিক রাজন্যবর্গের নামও দুর্লভ নয়—পসেনদি (প্রসেনজিৎ), উদেন (উদয়ন) প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাম। এইদিক হইতে জাতক সার্দ্ধ দ্বিসহস্রাধিক বর্ষপূর্বের রাষ্ট্র, সমাজ ও পারিবারিক জীবনের অমর আলেখ্য।

রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ ও পুরাণের অনেক কাহিনীও জাতকে স্থান লাভ করিয়াছে। এই সকল কাহিনী কোথাও ঈষৎ বিকৃত, কোথাও বা অবিকৃত। কে উত্তমর্ণ—তাহা মীমাংসা করিবার উপায় নাই। কেহ কেহ বলেন, জাতকই উত্তমর্ণ—জাতকের প্রভাবেই রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদিতে বৌদ্ধ ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু এ সকল সিদ্ধান্ত বিতর্কের অতীত নয়।

(i) জাতকে রামায়ণ-কাহিনী ঃ

'অলম্বুসা' জাতকে পাওয়া যায় ঋষ্যশৃঙ্গমুনির উপাখ্যান। ইহাতে হরিণীগর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গের জন্মকাহিনী বিবৃত হইয়াছে। বাল্মীকি-রামায়ণে এ কাহিনী নাই, কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে ঋষ্যশৃঙ্গের এই অস্বাভাবিক জন্মবৃত্তান্তের সংবাদ পাওয়া যায়। [দ্রষ্টব্য কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আদিকাণ্ড]

'দশরথ জাতকে' রামের বনবাস, ভরতের রামপাদুকা গ্রহণ প্রভৃতি বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। রামায়ণের সহিত তাহার সাদৃশ্য থাকিলেও বৈসাদৃশ্য অল্প নয়। এই জাতকে রামচন্দ্র হইয়াছেন রামপণ্ডিত, আর পিতা দশরথ বারাণসীর রাজা। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা দশরথের প্রথমা মহিষীর সন্তান। এই মহিষীর মৃত্যু হইলে দশরথ নবীনা এক রাণীকে অগ্রমহিষী করেন। তাঁহার গর্ভে ভরতকুমারের জন্ম হয়। নবীনা মহিষী নিজের পুত্রের জন্য প্রার্থনা করিলে, দশরথ বিমাতার কূট চক্রান্ত

হইতে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রমহিষীর পুত্র-কন্যাদিগকে দ্বাদশবৎসরের জন্য বনে প্রেরণ করেন এবং দ্বাদশবৎসরান্তে রাজ্যে ফিরিয়া রাজছত্র গ্রহণ করিতে নির্দেশ দেন। লক্ষ্মণ ও সীতাসহ রামপণ্ডিত পিতার নির্দেশানুসারে বনে গমন করেন। কিন্তু দ্বাদশবৎসরের তিনবৎসর পূর্বেই দশরথের মৃত্যু হইলে ভরতকুমার তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বনে যান। পিতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে লক্ষ্মণ ও সীতা সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিতে লাগিলেন, কিন্তু রামপণ্ডিত ধৈর্যহারা হইলেন না। তিনি স্থিরভাবে সংসারের অনিত্যতা ব্যাখ্যা করিলেন এবং পিতৃআজ্ঞা পালনের নিমিত্ত আরও তিন বৎসর বনবাস করিবেন বলিয়া সংকল্প করিলেন। ভরতকুমার অগত্যা রামের পাদুকা ও লক্ষ্মণ-সীতা সহ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া পাদুকাকে প্রতিনিধি করিয়া রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিন বৎসর অতিক্রান্ত হইলে রাম-পণ্ডিত রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া সীতাকে অগ্রমহিষীর পদে বরণ করিয়া অভিষিক্ত হইলেন এবং রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

সীতা রামের সহোদরা ভগ্নী ও পত্নী—এ তথ্য সর্বৈব নূতন। সংসারের অনিত্যতা সম্পর্কে রামপণ্ডিতের ভাষণটিও বৌদ্ধ আদর্শের প্রতীক। এই জাতকের শেষে যে গাথাটি আছে, তাহার সহিত আর্ষ রামায়ণোক্ত উক্তির সাদৃশ্য লক্ষিত হয়ঃ

দসবস্‌স সহস্‌সানি সট্‌ঠিবস্‌স সতানি চ।
কম্বুগীবো মহাবাহু রামো রজ্জমকারয়ি ॥ [দশরথজাতক]
দশবর্ষ সহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি ॥ [রামা. বাল.]

পতি রামের সহিত সীতা বনবাসে গিয়াছিলেন, এ প্রসঙ্গ 'বিশ্বম্ভর' জাতকেও আছে। রাজর্ষি জনকের প্রসঙ্গ রহিযাছে 'মহাজনক জাতকে'; রামচন্দ্র কর্তৃক হরধনুভঙ্গের কাহিনী এখানে মহাজনকে আরোপিত হইয়াছে।

(ii) জাতকে মহাভারত ও হরিবংশের কাহিনীঃ

মহাভারত ও হরিবংশের কাহিনীও পরিবর্তিত আকারে জাতকে পাওয়া যায়। 'কণ্হদীপায়ন' জাতকে আছে মহাভারতোক্ত অণিমাণ্ডব্যের কাহিনী [আদি. ১০৭] দ্বৈপায়নের কৃষ্ণবর্ণ হইবার উপাখ্যানে নূতনত্ব আছে। শূলারোপিত মাণ্ডব্যের রক্ত দেহে ধারণ করাতেই দ্বৈপায়ন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। বিদুরের প্রসঙ্গ আছে 'দসব্রাহ্মণ' জাতকে। শিবি মহারাজের ব্রাহ্মণকে চক্ষুরত্ন দানের কাহিনী 'শিবি' জাতকে বর্ণিত হইয়াছে। শিবিগোত্রজ আর এক রাজার অত্যাশ্চর্য সংযম-ব্রতের কাহিনী রহিয়াছে 'উম্মদন্তী' জাতকে। শিবিরাজকুমার একবার তাঁহার বন্ধু সেনাপতি অহিপারকের স্ত্রীর রূপ দেখিয়া মোহিত হন এবং আত্মদমনে প্রায় অসমর্থ হইয়া মৃতবৎ হইয়া পড়েন, কিন্তু অবশেষে কঠিন সংযমবলে তিনি চিত্ত-বৈকল্য দমন করেন। শিবিরাজ সম্পর্কে এ সকল কাহিনী মহাভারতে নাই। দুষ্মন্ত-শকুন্তলা উপাখ্যানের ছায়া দেখা যায় 'কট্‌ঠহারি' জাতকে।

'হরিবংশো'ক্ত বাসুদেব-কৃষ্ণের কাহিনী পাওয়া যায় 'ঘটজাতকে'। কিন্তু ঘট-

জাতকের কাহিনী বিচিত্র ও নানাদিক হইতে নূতন। জাতকে বাসুদেব ও বলদেব সহোদর; বাসুদেবই অগ্রজ। মুষলদ্বারা যদুবংশ ধ্বংস হইবে—এ অভিশাপ জাতকে দিয়াছেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ কথা, জাতকে বাসুদেব ও বলদেব উচ্ছৃঙ্খল, কিন্তু কংস পরম দয়াশীল। হিন্দু আদর্শকে বিকৃত করিবার জন্যই এরূপ করা হইয়াছে, না, লোক-কাহিনী আদৌ এইরূপই ছিল, তাহা বিতর্কের বিষয়।

(iii) জাতকে পুরাণ-কাহিনী:

পুরাণেরও বহু কাহিনী বৌদ্ধজাতকে পাওয়া যায়: তবে কাহিনীগত অনৈক্যও আছে। 'ভিস' জাতকের শত্রুকর্তৃক মৃণাল অপহরণের কাহিনী আছে মহাভারতে ও পদ্মপুরাণে (সৃষ্টিখণ্ড)। পদ্মপুরাণের কাহিনীর সহিত জাতককাহিনীর মিল বেশি। উভয়স্থলেই 'অপ্রতিগ্রহ' ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে এই কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। 'সীলবীমংসন' জাতকে সাংখ্যসূত্রোক্ত দুইটি কাহিনীর প্রসঙ্গ আছে। সূত্রে যাহা বীজ, জাতকে তাহার অংকুর। সূত্রে মাত্র আছে 'শ্যেনবৎ সুখদুঃখী ত্যাগ-বিয়োগাভ্যাম্' [সাংখ্য প্রবচন সূত্র, ৪।৫], 'নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ' [সাংখ্য প্রবচন সূত্র, ৪।১১]। বৌদ্ধজাতকে বাসনাত্যাগের দৃষ্টান্তরূপে কাহিনী দুইটির ঈষৎ বিস্তার করা হইয়াছে। এক শ্যেন মাংসখণ্ড চুরি করায় শকুনদল তাহাকে উৎপীড়িত করে, মাংসখণ্ড ত্যাগ করিয়া শ্যেন নিস্তার লাভ করে। সংসার বাসনাও মাংসখণ্ডবৎ; উহার ত্যাগেই সুখ। পিঙ্গলার কাহিনীও অনেকটা এইরূপ। পিঙ্গলা-নাম্নী এক দাসী একজন পুরুষকে সংকেত করিয়া সারারাত্রি আশা করিয়া বসিয়াছিল; শেষরাত্রে 'মানুষটি আর আসিবে না'—এই ভাবিয়া সে সুখে নিদ্রা গেল। আসক্তিতে নিরাশ হইতে পারিলেই সুখ। পিঙ্গলার এই কাহিনী আরও বর্ণাঢ্য রেখায় চিত্রিত হইয়াছে ভাগবত পুরাণের একাদশ স্কন্ধে। সেখানেও কাহিনীর উদ্দেশ্য একই প্রকার:

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্
যথা সংছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা ॥ [ভাগ. ১১.৭]

৬. অনুপালি সাহিত্য

॥ মিলিন্দপঞ্হো ॥

অনুপালি সাহিত্যগুলির ভিতর খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে রচিত 'মিলিন্দপঞ্হো' গ্রন্থখানি উল্লেখযোগ্য। হীনযান বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক আলোচনার জন্য গ্রন্থখানির মূল্য অপরিসীম। ইহার রচয়িতা কে, তাহা জানা যায় নাই। গ্রন্থটি প্রশ্নোত্তর ছলে লিখিত। প্রশ্নকর্তা সাকল রাজ্যের ('সাগলং নাম নগরং') বিখ্যাত পণ্ডিত মেধাবী রাজা মিলিন্দ, আর উত্তরকর্তা বহুশ্রুত, চিত্রকথা-নিপুণ ভিক্ষু নাগসেন। মিলিন্দ প্রখ্যাত গ্রীকরাজ মিনাণ্ডার।

গ্রন্থখানির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের অতি দুরূহ সূক্ষ্মতত্ত্ব-

গুলি মনোজ্ঞ কাহিনী ও দৃষ্টান্তের সাহায্যে এখানে সুস্পষ্ট করা হইয়াছে। বৌদ্ধ-ধর্মের অনাত্মবাদ, পুগ্‌গল, জন্মান্তর রহস্য, কুশলধর্মের যাবতীয় উপাদান ও নির্বাণ—কোন কথাই বাদ যায় নাই। অপার জ্ঞানতৃষ্ণা লইয়া মহারাজ মিলিন্দ প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া চলিয়াছেন, আর ভিক্ষু নাগসেন শান্তভাবে দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝাইয়া দিতেছেন। উত্তরের ধরন অনেকটা স্বয়ং গৌতমবুদ্ধের মত। পণ্ডিত নাগসেন প্রশ্নকর্তার চিরাচরিত বিশ্বাসে আঘাত না করিয়া, তাঁহারই নিকট হইতে উত্তর আদায় করিয়া প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসও ঠিক এইভাবে গ্রামবাসীদের প্রশ্নের উত্তর দিয়া নিজস্ব মত প্রতিষ্ঠা করিতেন। যেমন 'পুগ্‌গল' বা জীবসত্তা সম্পর্কে মিলিন্দ ও নাগসেনের এই সংলাপটি :

[একদিন রাজা মিলিন্দ নাগসেনকে ব্যক্তি ও পুগ্‌গলের পার্থক্য সম্পর্কে প্রশ্ন করিলেন। নাগসেন-নামটিকেই তিনি পুগ্‌গল মনে করিয়া বলিলেন. নাগসেন যদি 'পুগ্‌গল' না হয়, তবে কে ভোগ করে? কে শীলরক্ষা করে? কে কুশল বা অকুশল কর্ম করে? নাগসেন তখন বলিলেন]

'স চে ত্বং মহারাজ রথেনাগতো'সি, রথং মে আরোচেহি। কিন্নু খো মহারাজ ঈশা রথো' তি !'

'ন হি ভন্তে' তি।'

'অক্‌খো রথো'তি···যুগংরথোতি, রস্মিয়োরথোতি, পতোদলট্‌ঠি রথো'তি ?'

'ন হি ভন্তে' তি।'···

'তমহং মহারাজ পুচ্ছন্তো পুচ্ছন্তো ন পস্‌সামি রথং, সদ্দো যেব নু খো মহারাজ রথো, কো পন এত্থ রথো, অলিকং ত্বং মহারাজ ভাসসি মুসাবাদং।···

'নাহং ভন্তে নাগসেন মুসা ভণামি। ঈসঞ্চ পটিচ্চ, অক্‌খঞ্চ পটিচ্চ, চক্কানি রথপঞ্জরং চ পটিচ্চ, রথদণ্ডকঞ্চ পটিচ্চ। রথো'তি সংখা সমঞ্‌ঞা পঞ্‌ঞত্তি বোহারো নামং পবত্ততী'তি।'

'সাধু খো ত্বং মহারাজ রথং জানাসি। এবমেব যো মহারাজ মহ্যম্পি কেসে চ পটিচ্চ···রূপঞ্চ পটিচ্চ, বেদনা চ পটিচ্চ···নাগসেনো'তি সংখা সমঞ্‌ঞা পঞ্‌ঞত্তি বোহারো নামমত্তং পবত্ততি, পরমত্থতো পন এত্থ পুগ্‌গলো নুপলব্‌ভতি।'

—মহারাজ আপনি তো রথে আসিয়াছেন, রথ কি বলুন? মহারাজ, রথের ঈশই কি রথ?'

'না মহাশয়।'

'তবে কি অক্ষ রথ? চক্র রথ? রথপঞ্জর রথ? কিংবা যুগ, রশ্মি, পতোদ-যষ্টি রথ?'

'না ভদন্ত, এগুলির কোনটাই রথ নয়।'

'তাহা হইলে হে মহারাজ, আপনাকে প্রশ্ন করিয়া করিয়াও তো রথের নাগাল পাইলাম না। রথ কি একটা শব্দ? কি এই রথ? আপনি তবে মিথ্যাকথা বলিয়াছেন।'

'হে ভদ্র নাগসেন, আমি মিথ্যা বলি নাই। ঈশ, অক্ষ, চক্র, রথপঞ্জর, রথদণ্ডের সমবায়ে রথ একটা প্রতীতি মাত্র—ইহা একটা ব্যবহারিক নাম।'

'সাধু, মহারাজ, এই তো রথ কি, আপনি জানেন। এইপ্রকার, কেশ, লোম, রূপ, বেদনার সমবায়ে নাগসেন একটা সংজ্ঞা বা প্রতীতিমাত্র। লোকব্যবহারের জন্যই নাম, পরমার্থতঃ ইহা দ্বারা পুদ্গলের বোধ হয় না।

মিলিন্দপ্রশ্নের সমস্ত সংলাপ এইরূপ কৌতূহলোদ্দীপক। দৃষ্টান্তগুলিও সাধারণের বোধগম্য এবং মনোজ্ঞ। এই গ্রন্থের বর্ণনাত্মক গদ্য অলংকার-সমৃদ্ধ। বাণভট্টাদির সংস্কৃত গদ্য রচনার রীতি যে আকস্মিক নয়, মিলিন্দপঞ্হের গদ্য তাহার প্রমাণ। Rhys Davids ইহাকে 'The masterpiece of Indian prose' বলিয়াছেন।

॥ আচার্য বুদ্ধঘোষের রচনাবলী ॥

'পালিমুক্ত' বা পিটকসংজ্ঞার বহির্ভূত পালি গ্রন্থরচনায় আচার্য বুদ্ধঘোষের কীর্তি অবস্মরণীয়। বুদ্ধগয়ার সন্নিকটে কোন এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে বুদ্ধঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়া তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং তর্কে জম্বুদ্বীপের প্রায় অধিকাংশ পণ্ডিতকে পরাভূত করেন। কিন্তু এই তীক্ষ্ণধী ব্রাহ্মণ সন্তানের পরাজয় ঘটে তৎকালীন মহাথের অর্হৎ রেবতের নিকট। তাঁহার নিকটেই তিনি ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করেন এবং বৌদ্ধশাস্ত্রে বিপুল পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁহার বাগ্মিতাও ছিল অসাধারণ। এইজন্য তিনি 'বুদ্ধঘোষ' আখ্যায় ভূষিত হন।

বৌদ্ধ পিটক অধ্যয়ন করিয়া বুদ্ধঘোষ বৌদ্ধ শাস্ত্রের 'অট্ঠকথা'র সংকলন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু এদেশে তখন 'অট্ঠকথা' ছিল না। স্থবির মহেন্দ্র সিংহলী ভাষায় একটি 'অট্ঠকথা' প্রণয়ন করিয়াছিলেন। জ্ঞানপিপাসু বুদ্ধঘোষ তাহা দেখিবার জন্য সিংহলে গমন করেন। তখন মহানাম [৪১০-৪৩২ খ্রীষ্টাব্দ] সিংহলের রাজা ছিলেন। অনুরাধাপুরের মহাবিহারে অবস্থান করিয়া বুদ্ধঘোষ সিংহলী অট্ঠকথা আয়ত্ত করেন এবং উহাকে পালিভাষায় অনুবাদ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রথমে ত্রিপিটক অবলম্বনে 'বিসুদ্ধিমগ্গ' নামক গ্রন্থ রচিত হয়। থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে ইহা এক অমূল্য গ্রন্থ।

'বিসুদ্ধিমগ্গ' ব্যতীত তিনি পিটকান্তর্গত অন্যান্য গ্রন্থেরও 'অট্ঠকথা' প্রকাশ করেন। ধম্মপদত্থকথার ব্যাখ্যাগুলি অতি মনোরম। গাথাগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি যে কত 'বুদ্ধবচন', কত প্রাচীন কথা ও প্রাচীন ইতিহাসের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা কঠিন।

থেরবাদ বৌদ্ধসাহিত্যে বুদ্ধঘোষের দানের পরিমাপ করা অসম্ভব। বেদের ভাষ্য রচনায় 'সায়নাচার্যে'র যে স্থান, পিটকের অট্ঠকথা রচনায় 'বুদ্ধঘোষে'রও সেই স্থান। প্রাচীন কালের এই সকল অমিত প্রতিভাধর ব্যক্তিগণের কথা আজ বোধগয়ার

অতিকায় বুদ্ধপদচিহ্নের মতই অবিশ্বাস্য বলিয়া ধারণা জন্মে, কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য, এরূপ প্রতিভা একদিন সত্যই এদেশে বর্তমান ছিল।

॥ দীপবংস ও মহাবংস ॥

দীপবংস [খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক] ও মহাবংস [খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক]—পালি-সাহিত্যে সিংহলের দুটি মহামূল্য দান। দুইখানিই ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

গ্রন্থদুইখানিতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতক পর্যন্ত সিংহলের রাজবংশের ইতিহাস এবং তাহার সহিত বৌদ্ধধর্মের উন্মেষ ও ক্রমবিকাশের কাহিনী কবিতায় লিপিবদ্ধ।

'দীপবংস' হইতে প্রাচীন বৌদ্ধ সঙ্গীতিগুলির বিবরণ সংগ্রহ করা যায়। চুল্ল-বগ্গের বর্ণনার সহিত কোথাও কোথাও কিছু অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়, যেমন, চুল্লবগ্গের মতে প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতির স্থান রাজগৃহ, কিন্তু দীপবংসের মতে উহা গিরিব্রজের সমীপবর্তী সপ্তপর্ণীগুহা। বৌদ্ধধর্মের প্রমাণিক গ্রন্থহিসাবে দীপবংসের বিবৃতি বিচারযোগ্য।

মহাবংসের বর্ণনাও অনেকস্থলে দীপবংসের অনুরূপ। ইহাও সিংহলের কাব্যময় ইতিহাস। প্রসঙ্গত ইহাতে বিম্বিসার হইতে অশোক পর্যন্ত সকল রাজার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইতিহাসের সত্যদৃষ্টি কোন কোন স্থলে কল্পনাচ্ছন্ন হইলেও বিবৃতি-গুলিকে প্রমাণিক বলিয়াই গ্রহণ করা হয়। বিজয়সিংহের লঙ্কাজয়ের কাহিনী অনেকটা রূপকথার আকার গ্রহণ করিয়াছে। 'সীহবাহুনরিন্দজো' [নরেন্দ্রসিংহবাহুর পুত্র] বিজয় লঙ্কাদ্বীপে গিয়া দেব উৎপলবর্ণের দ্বারা রক্ষিত হইয়া ভীষণ যক্ষ ও যক্ষিণীদের পরাভূত করিয়া লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। সিংহবংশের নামে বিজিত লঙ্কার নাম হয় সিংহল:

> সীহবাহুনরিন্দো সো সীহং আদিন্নবা ইতি।
> সীহলো তেন সম্বন্ধা এতে সব্বে পি সীহলা ॥ [মহাবংস][1]

৭. বুদ্ধদেবের জীবন ও ধর্মাদর্শ

পালিসাহিত্য প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের রত্নকোষ। প্রসঙ্গতঃ ইহাতে বিবৃত হইয়াছে ইতিহাস, সমাজ ও রাজনীতি। ইহা কথাসাহিত্যেরও মহামূল্য ভাণ্ডার। সাধারণ মানুষের নিকট পালির আদর জীবন-চিত্রের দিক হইতে। উপাসক-উপাসিকা, শ্রমণ-

---

১. মহাবংসের বিবরণমতে বিজয় ছিলেন 'লাঢ়'বাসী: কাহারও কাহারও মতে এই 'লাঢ়' গুজরাটের প্রাচীন রাজধানী; কেহ কেহ মনে করেন, ইহা বাংলার 'রাঢ়'দেশ! বাঙালী কবি [সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত] বিজয়সিংহকে বাঙালী বলিয়াই গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন।

শ্রমণী, থের-থেরী, রাজা-সেনাপতি, কামার, ব্যাধ, চণ্ডাল, গণিকা যেন জীবনের বিচিত্র প্রতিমাগৃহ। এই জীবন-বিচিত্রার প্রাণকেন্দ্র স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ।

গৌতমবুদ্ধের ধারাবাহিক জীবন মূল পালিসাহিত্যে নাই। নিকায় গ্রন্থগুলির ভিতর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি উপকরণ পাওয়া যায়। দীঘনিকায়ে 'মহাপদান সুত্তান্তে' পূর্ববুদ্ধ বিপসিসের প্রসঙ্গে গৌতমজীবনের কিছু অংশ এবং 'মহাপরিনির্বাণ সুত্তান্তে' পাই বুদ্ধের অন্তিম জীবনের ঘটনা ও চিত্র। মধ্যমনিকায় এবং খুদ্দকনিকায়ের জাতক, সুত্তনিপাত প্রভৃতি গ্রন্থে এবং বিনয়পিটকের কিছু অংশে বুদ্ধ-জীবনের কিছু প্রসঙ্গ আছে। এই সকল গ্রন্থ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া 'নিদান-কথা'য় এই জীবনের ধারাবাহিক চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে।[১] এখানে এই নিদানকথা ও অন্যান্য সূত্রঅবলম্বনে অতি সংক্ষেপে বুদ্ধদেবের জীবন বিবৃত হইতেছে ঃ

ভবিষ্যদ্বাণী হইয়াছিল রাজা শুদ্ধোধনের অগ্রমহিষী মায়াদেবীর গর্ভে যিনি জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনি 'রাজচক্রবর্তী' হইবেন ['রাজা ভবিস্সতি চক্কবত্তি'—নিদানকথা]। তখনকার রাজগৃহ-কাশী-কৌশাম্বী-কোশলাদি লইয়া 'উত্তরে আয়ত এবং দক্ষিণে শকটমুখ' [দীঘনিকায়, মহাগোবিন্দ সুত্তান্ত] যে ভারতবর্ষ গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা ছিল শতধা বিচ্ছিন্ন। সেই বিছিন্ন ভারতে ৫৬৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রাজচক্রবর্ত্তীর মতই গৌতমের আবির্ভাব। ধন্য বিশাল শাল-শোভিত রমণীয় লুম্বিনী, যেখানে সিদ্ধার্থ ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, ধন্য শাক্যকুলের মহারাজ শুদ্ধোধন, যাঁহার কুলপাবন পুত্র স্বয়ং শাক্যসিংহ। পুত্রজন্মের পর মাতা মায়াদেবী মায়ালীলা সংবরণ করেন, নবজাতককে স্নেহে পালন করেন ধাত্রী মাতা গোতমী। তুষিতলোকাবতীর্ণ বোধিসত্ত্বের নাম রাখা হয় গৌতম।

ভবিষ্যদ্বাণী হইয়াছিল, 'জরাজিণ্ণং ব্যাধিতং মতং পব্বজিতং' (জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও প্রব্রজ্যা) দর্শন করিয়া গৌতম সংসারে বীতস্পৃহ হইবেন। রাজা শুদ্ধোধন ষোড়শবর্ষীয় পুত্রের প্রমোদ-বিহারের জন্য 'চতুসু দিসাসু' 'আরক্ষ' (প্রাসাদ) নির্মাণ করাইলেন—কোনটি পঞ্চভূমক, কোনটি সপ্তভূমক, কোনটি নবভূমক—তাহাতে বিলাসের নানা নাটকীয় উপকরণ, সর্বোপরি সুন্দরী রাহুল-মাতার বন্ধন। কিন্তু আকর্ষণ ব্যর্থ হইল, সত্য হইল ভবিতব্যের 'ভবত্যেব' বাণী। উদ্যানভূমিতে ভ্রমণ করিতে গিয়া সিদ্ধার্থ জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর বীভৎস রূপ দেখিলেন, দেখিলেন প্রব্রজিতের প্রশান্তি।

সিদ্ধার্থের 'মহাভিনিষ্ক্রমণ' ('মহাভিণিক্খমণ') ইতিহাসবিশ্রুত ঘটনা—যেমন করুণ, তেমনই করুণাপূর্ণ। 'চত্তারি নিমিত্তানি' দর্শন করিয়া সিদ্ধার্থ চিন্তিত হইলেন। এমন সময় পুত্র রাহুলের জন্ম হইল। সিদ্ধার্থ ভাবিলেন 'রাহুলো

১. ফৌসবেলসম্পাদিত জাতক-কথার ভূমিকারূপে এই 'নিদান-কথা' সংযোজিত হইয়াছে।

জাতো বন্ধনং জাতং।' ঠিক সেই সময়েই নগরপ্রদক্ষিণ কালে শুনিলেন কিসা গোতমীর (একজন ক্ষত্রিয়কন্যা) প্রশংসোক্তি. বোধিসত্ত্বের রূপশ্রী দেখিয়া তিনি বলিতেছেন ঃ

নিব্বুতা নূন সা মাতা নিব্বুতো নূন সো পিতা
নিব্বুতা নূন সা নারী যস্সায়মিদিসো পতি। [নিদানকথা]

—সুখী তাঁহার মাতা, সুখী তাঁহার পিতা, সুখী তাঁহার পত্নী, যাঁহার এমন পতি।

'নিব্বুত' (নিব্বুর্ত=সুস্থিত) শব্দটি গৌতমের মর্মস্পর্শ করিল। তিনি নিপুণ সারথি 'ছন্দ'কে ডাকিয়া অভিনিষ্ক্রমণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন এবং শেষবারের মত পুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত রাহুলমাতার কক্ষের গর্ভদ্বারে গেলেন, দেখিলেন, গর্ভপ্রকোষ্ঠে গন্ধতেলের প্রদীপ জ্বলিতেছে। রাহুলমাতা পুষ্পাচ্ছাদিত পালঙ্কে পুত্রের মস্তকে হস্ত ন্যস্ত করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। দেখিয়া তিনি প্রাসাদতল হইতে অবতরণ করিলেন এবং অশ্ববর কন্থকের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া 'উত্তরাসাড়া-নক্খত্তে' গৃহত্যাগ করিলেন। সঙ্গে চলিল সারথি ছন্ন।

ছন্ন-বিদায় আর এক করুণ দৃশ্য। অনোমা নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া রাজপুত্র গৌতম 'রজতপাত্র সদৃশ বালুকাপুলিনে' দাঁড়াইয়া খড়্গদ্বারা কেশ ছিন্ন করিলেন, আভরণ খুলিয়া ছন্নকে বলিলেন, 'ছন্ন মম বচনেন মাতাপিতুন্নং আরোগ্যং বদেহি'।

জগতের ক্লেশনাশের জন্য সিদ্ধার্থের কঠোর অন্বেষণ শুরু হইল। জ্ঞানলাভের জন্য তিনি আলারকালাম, রামপুত্র উদ্দক প্রভৃতি জ্ঞানতপস্বীর নিকট গেলেন। কিন্তু পিপাসা নিবৃত্ত হইল না। অবশেষে উরুবেল্ল নগরে আসিয়া অনাহারে কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনায় নিমগ্ন হইলেন। ছয় বৎসর ধরিয়া দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধনা চলিল। আহার বর্জনের ফলে তাঁহার সুবর্ণ দেহ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল ['সুবন্নবন্নো কায়ো কালবন্নো আহোসি'—নিদানকথা]—এমনকি একদিন ধ্যানে বসিয়া তিনি মহাবেদনায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে 'মধুপায়াস' লইয়া আসিলেন দারিকা সুজাতা। নদীতে স্নান করিয়া সেই অন্নভোজন করিয়া সিদ্ধার্থ সুস্থ হইলেন এবং কৃতসঙ্কল্প হইয়া নিরঞ্জনা নদীতীরে ['নদীং নেরঞ্জরং'] বোধিবৃক্ষের মূলে পীঠে আসীন হইলেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন,

'কামং তচো চ নহারু চ অট্ঠি চ অবসুস্সতু উপসুস্সতু সরীরে মংসলোহিতং,
ন ত্বেব সম্মাসম্বোধিং অপ্পত্বা ইমং পল্লঙ্কং ভিন্দিস্সামি।' [নিদানকথা]

—কাম, ত্বক্, নখ, অস্থি শুষ্ক হউক, শরীরে মাংস-শোণিত শুষ্ক হইয়া যাউক, সম্যকসম্বোধি লাভ না করিয়া এই আসন ত্যাগ করিব না।

এই অবস্থায় নমুচী (মার) আসিল ঃ মার প্রমত্তবন্ধু পাপবৃত্তি ['পমত্তবন্ধু পাপিমা'], তাহার অনেক সেনা—তন্মধ্যে 'কাম' হইল প্রধান। প্রলোভিত করিয়া মার বলিল,—প্রায় তো মরিতে বসিয়াছ, মরিয়া গেলে পুণ্য লইয়া কি করিবে? 'জীব ভো জীবিতং সেয়্যো, জীবং পুঞ্ঞানি কাহসি।'—জীবনে বাঁচ, বাঁচাই মুখ্য,

বাঁচিলে তবে পুণ্যার্জন। ভগবান বলিলেন, ওগো প্রমত্তবন্ধু, আমার পুণ্যের প্রয়োজন নাই—আমার শ্রদ্ধা আছে, বীর্য আছে, প্রজ্ঞা আছে—অতএব সমাহিত আমাকে বাঁচিবার জন্য কি লোভ দেখাইতেছ—

অত্থি সদ্ধা ততো বিরিয়ং পঞ্ঞা চ মম বিজ্জতি
এবং মং পহিতত্তংপি কিং জীবং অনুপুচ্ছসি ঃ [পধান সুত্ত]

আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তোমার যে সেনাকে সদেবতা মানুষ পরাজিত করিতে পারে না, আমি মৃৎপাত্রের ন্যায় তাহাকে চূর্ণ করিব।

মার সাতবৎসর বুদ্ধের পিছনে লাগিয়া রহিল, কিন্তু স্মৃতিমান বুদ্ধের কোন ছিদ্র খুঁজিয়া পাইল না। তাহার কক্ষা হইতে বীণা খসিয়া পড়িল এবং ভয় পাইয়া সে অন্তর্ধান করিল।

এইবার জ্ঞানের আলো প্রকাশ পাইতে লাগিল। রাত্রির প্রথম যামে তিনি পূর্বনিবাসজ্ঞান লাভ করিলেন, মধ্যম যামে লাভ করিলেন দিব্য চক্ষু এবং পশ্চিম-যামে প্রতীত্যসমুৎপাদ জ্ঞান আয়ত্ত হইল। জ্ঞানের দ্বার উন্মোচিত হইলে অনুলোম প্রতিলোমক্রমে দুঃখের কারণ ও দুঃখনিরোধের উপায় পুংখানুপুংখ বিচার করিয়া তিনি চতুরার্য সত্যের এবং দুঃখনিরোধের অষ্টাঙ্গিক মার্গের সন্ধান লাভ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

অনেক জাতিসংসারং সন্ধাবিসসং অনিব্বিসং
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খাজাতি পুনপ্পুনং
গহকারক দিট্ঠো'সি পুন গেহং ন কাহসি
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্গা গহকুটং বিসংখিতং
বিসংখার গতং চিত্তং তন্হানং খয়মজ্ঝগা।[১]

বুদ্ধত্বলাভের পর ইহাই প্রথম বুদ্ধবচন।

বুদ্ধদেব বুদ্ধত্বলাভ করিয়া 'ইসাপতন'-এ ফিরিয়া পঞ্চবর্গীয় শিষ্যের নিকট 'ধর্মচক্র' প্রবর্তন করেন। তারপর রাজগৃহ হইতে আসেন কপিলাবস্তুতে। মাতার নির্দেশে রাহুল পিতার নিকট দায়াদ প্রার্থনা করিতে যান। মাতা শিখাইয়া দেন, 'গচ্ছ নং দায়জ্জং যাচ' ঃ 'অহং তাত কুমারো অভিসেকং পত্বা চক্কবত্তী ভবিসসামি, ধনেন মে অত্থো, ধনং মে দেহি সামিকো' মায়ের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া রাহুল বলিলেন, 'দায়জ্জং মে সমণ দেহি, দায়জ্জং মে সমণ দেহি।' বুদ্ধদেব তাঁহাকে পিতার দায়াদ প্রদান করিলেন—আর্যধন, লোকোত্তর দায়াদ—প্রব্রজ্যা।

বুদ্ধত্বলাভের পর বুদ্ধদেব ৪৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। এইসময় অনাথপিণ্ডদ-

১. গৃহের (দেহের) নির্মাণকর্তাকে খুঁজিয়া অনেকবার সংসারে দুঃখময় জন্ম গ্রহণ করিয়াছি ঃ হে গৃহকারক, এইবার তোমার দেখা পাইয়াছি ; আর তুমি গৃহ নির্মাণ করিতে পারিবে না ঃ তোমার গৃহ রচনার উপকরণ পার্শুক ও গৃহকূট ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। এখন চিত্ত সংস্কারমুক্ত, তৃষ্ণাও ক্ষয়প্রাপ্ত।

ক্রীত শ্রাবস্তীর 'জেতবন', রাজগৃহের 'বেণুবন', কৌশাম্বীর 'ঘোষিতারাম', বৈশালীর 'সপ্তপর্ণীগুহা'—বুদ্ধদেবের পুণ্য স্পর্শে ধন্য হয়। এইসকল স্থানে কোটি কোটি দুঃখিত মানুষ আসিয়া তাঁহার আশ্রয়ে শান্তির পথ খুঁজিয়া পান। মধুবর্ষী বাণীতে তিনি কত যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। সমগ্র পালিসাহিত্যে এই সকল ঘটনা ও উপদেশ রক্ষিত হইয়াছে।

৮০ বৎসর বয়সে [৪৮৪ খ্রীঃ পূর্বাব্দে] বুদ্ধদেব কুশীনারায় 'মহাপরিনির্বাণ' লাভ করেন। দীঘনিকায়ের 'মহাপরিনিব্বাণ সুত্তন্তে' এই ঘটনা অমর অক্ষরে মুদ্রিত আছে। মহাপরিনির্বাণের পূর্বে ভিক্ষুসংঘকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি শেষ বচন উচ্চারণ করেন, 'হন্দ দানি ভিক্খবে আমন্তয়ামি ভো—বয় ধম্মাসংখারা অপ্পমাদেন সম্পাদেথা'তি।' [মহাপরিনিব্বাণ সুত্তান্ত]—ভিক্ষুগণ, আমি শেষবারের মত তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি, সংসারের সকল বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, তোমরা অপ্রমত্ত হইয়া নির্বাণ কামনায় যত্নশীল হও।

দুঃখের হাত হইতে আত্যন্তিক নিবৃতিই ('নিব্বুতি') বৌদ্ধধর্মের প্রধান লক্ষ্য। 'কিসা গোতমী'-উচ্চারিত 'নিব্বুত' কথাটি গৌতমের চিন্তার সূত্র খুলিয়া দিয়াছে। জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর বিভীষিকা হইতে ত্রাণ লাভের উপায় খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্যই তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবিচ্ছিন্ন ধ্যান-যোগে তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, 'যং কিঞ্চি সমুদয়ধম্মং সব্বন্তং নিরোধ ধম্ম'ন্তি' [ধম্মচক্কপবত্তন সুত্ত] —যাহা কিছু উৎপত্তিশীল, তাহাই ধ্বংসশীল। দুঃখ আছে, দুঃখের উৎপত্তি হয়, দুঃখের নিরোধ আছে, দুঃখনিরোধের উপায়ও আছে। এই চারিটি আর্য সত্য ['চত্তারি অরিয় সচ্চানি'] সিদ্ধার্থের ধ্যানের আবিষ্কার। অনুলোম-প্রতিলোম ক্রমে বিচার করিয়া তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন—দুঃখের মূল দ্বাদশ নিদান। 'ভবচক্র' এই দ্বাদশ নিদানের আবর্তন মাত্র। অবিদ্যাই 'প্রতীত্যসমুৎপাদে'র (causal production) মূল হেতু। অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন (Six organs of sense), ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ (contact), স্পর্শ হইতে বেদনা (feelings), বেদনা হইতে তৃষ্ণা (তন্হা), তৃষ্ণা হইতে উপাদান,[১] উপাদান হইতে ভব (Becoming), ভব হইতে জাতি (Birth), জাতি হইতে জরা-ব্যাধি-মৃত্যুরূপ দুঃখ।

দুঃখ কি চিরন্তন? দুঃখ একটা প্রতীতি মাত্র এবং কার্যকারণ সূত্রে উহার উৎপত্তি। যাহা উৎপন্ন, তাহার বিনাশ আছে। অতএব দুঃখেরও নিরোধ আছে। এই নিরোধের উপায় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ['অরিয়ট্ঠঙ্গিকং মগ্গং'] ঃ সম্যক্‌দৃষ্টি ('সম্মাদিট্ঠি'), সম্যকসংকল্প ('সম্মাসংকপ্প'), সম্যক্‌বাক্য ('সম্মাবাচ'), সম্যক্‌কর্মান্ত

১. উপাদান—'It typifies attachment to worldly thing which the human being ignorantly grasps at, supposing they will quench their craving thirst which has arisen from sensation'—Rhys Davids.

('সম্মাকম্মান্ত'), সম্যক্‌জীবিকা ('সম্মাজীব'), সম্যক্ ব্যায়াম ('সম্মা বায়াং'), সম্যক্ স্মৃতি ('সম্মাসতি') ও সম্যক্ সমাধি ('সম্মাসমাধি')।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, বুদ্ধ-প্রচারিত এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ কায়, বাক ও চিত্তসংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত। মিথ্যায়, অনাচারে, অসৎসংকল্পে বিভ্রান্ত মানুষকে নৈতিক ধর্মে দীক্ষিত করাই বুদ্ধ প্রচারিত পঞ্চশীল ও কুশলকর্মের প্রধান লক্ষ্য। ত্রিপিটকে বার বার বলা হইয়াছে, গোতম প্রাণিহত্যা হইতে বিরত, অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরত, মৃষাবাদ হইতে বিরত, পরুষ বাক্য হইতে বিরত, বৃথা প্রলাপ হইতে বিরত—তিনি গ্রাম্য কর্ম হইতে বিরত, দ্যূত ও অলসক্রীড়া, তুচ্ছ নৃত্য-গীত-প্রদর্শনী, জঘন্য কর্ম—প্রবঞ্চনা, অভিচারাদি ক্রিয়া হইতে বিরত, মিথ্যা ও হীন জীবিকাঅর্জন হইতে বিরত: তিনি অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয়, দম্য-পুরুষসারথি, দেব ও মনুষ্যের শাস্তা। সমস্ত দিক হইতে এই যে পরিপূর্ণ মানুষ, যিনি দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণসম্পন্ন, যিনি লোকমধ্যে 'রাজচক্রবর্তী', যিনি সকল কুসংস্কারমুক্ত—এই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠাই এই ধর্মের অন্যতম লক্ষ্য। বৌদ্ধধর্ম এই দিক হইতে চিরকালের সার্বিক মানব-ধর্ম।

কিন্তু বুদ্ধদেব যে মূর্তিতে ভারতবর্ষের হৃদয়ে অমর আসনে বিরাজিত, তাহা কল্যাণ-মিত্র বুদ্ধের মূর্তি। বুদ্ধদেবের জীবৎকালেই তাঁহার সম্পর্কে এই কল্যাণশব্দ উচ্চারিত হইত: 'সমনো গাতমো...দয়াপন্নোসব্বপাণভূতহিতানুকম্পী বিহরতি' 'শ্রমণ গোতম...বিনয় ও দয়াশীলতার সহিত সর্বপ্রাণীর প্রতি মৈত্রী ও করুণা প্রণোদিত হইয়া বিচরণ করেন।'[১]

বুদ্ধদেব যে ধর্ম উপদেশ করিয়াছেন, তাহার আদি কল্যাণময়, মধ্য কল্যাণময় ও অন্ত কল্যাণময় ['সো ধম্মং দেসিতি আদিকল্যাণং মজ্‌ঝেকল্যাণং পরিয়োসানকল্যাণং' —[দিঘনিকায় অম্বট্‌ঠসুত্ত]। সমগ্র বৌদ্ধদেসনা এই কল্যাণের লক্ষ্যে নিযুক্ত। 'মেত্তসুত্তে' বুদ্ধ উচ্চারণ করিয়াছেন, 'সব্বেসত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা'—সকলের কল্যাণ হউক, সকল প্রাণী সুখী হউক। এই কল্যাণের মূল হেতু, অবৈর, অক্রোধ, দয়া ও মৃদুতা। তিনি বার বার বলিয়াছেন, 'কোধং জহে' (ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে), 'অক্কোধেন জিনে কোধং'—অক্রোধদ্বারা ক্রোধকে জয় করিবে [ধম্মপদ, ক্রোধবর্গ]; উপমং 'অত্তানং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে'—আত্মতুল্য মনে করিয়া কাহাকেও হত্যা করিবে না, কাহাকেও আঘাত করিবে না [ধম্ম. দণ্ডবর্গ], বজ্রস্বরে উচ্চারণ করিয়াছেন:

> 'অনাকুলা চ কম্মানি এতং মঙ্গলমুত্তমং' [মঙ্গলসুত্ত]
> ['অনাকুল কর্মকরা—এই উত্তম মঙ্গল'][২]

---

১. অনুবাদ—ভিক্ষুশীলভদ্র (দীঘনিকায়-ব্রহ্মজালসুত্ত)।

২. অনুবাদ—রবীন্দ্রনাথ (ব্রহ্মবিহার প্রবন্ধ)।

এবং সর্বোপরি বলিয়াছেন 'নাঞ্‌ঞমঞ্‌ঞস্স দুক্খমিচ্ছেয্য'—যাহাতে কাহারও দুঃখ হয় এরূপ ইচ্ছাও করিবে না।

বৌদ্ধধর্মে নির্বাণকামনা হইতে এই কুশলকর্মের উপর, বিশুদ্ধ জীবিকার উপর, সর্বোপরি অহিংসা ও মৈত্রীভাবনার বেশি গুরুত্ব। তিনি পশুঘাতদর্শনে সকরুণ ও সদয়হৃদয় 'সদয়হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্' [জয়দেব]। ভারতবাসীর জীবনে করুণকান্ত বুদ্ধ এই ভূমিকাতেই প্রতিষ্ঠিত।

করুণাঘন মূর্তিতে বুদ্ধদেবের এই প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে অন্য একটি ইতিহাস আছে। বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনে তাহার গুরুত্ব অসাধারণ।

৮. বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন ও বৌদ্ধ সংস্কৃতসাহিত্য

কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম দুইটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়। উহার একটি রূপ দেখা যায় সিংহল-মালয়-যবদ্বীপ দ্বীপময় ভারতে। তাহাদের ধর্মগ্রন্থ পালি ত্রিপিটক, আদর্শ—থেরবাদ, লক্ষ্য—নির্বাণ এবং উপায়—শীলাদির অনুশীলন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ এই শাখাকে বলিয়াছেন Southern Buddhism বা দক্ষিণাপথের বৌদ্ধধর্ম।

বৌদ্ধধর্মের আর একটি রূপ দেখা যায়, নেপাল-তিব্বত-চীন ভারতের উত্তরাপথে। উহাদের ধর্মগ্রন্থও মূলতঃ ত্রিপিটক; কিন্তু এই পিটক পরিবর্তিত এবং মিশ্র সংস্কৃত ভাষায় গ্রথিত। ধর্মের লক্ষ্যে ও উপায়েও পার্থক্য বিদ্যমান; বুদ্ধ সেখানে পরম দেবতা, তাঁহার সংখ্যা অসংখ্য, শক্তিও অলৌকিক। অগণিত বোধিসত্ত্ব সেই দেবতার ধ্যানে তন্ময়। বোধিসত্ত্বগণ কল্যাণ-মৈত্রীর একাদর্শে অনুপ্রাণিত। এই বোধিসত্ত্বই এই সম্প্রদায়ের আদর্শ, তাঁহাদের ধর্ম পারমিতার অনুশীলন। এই বৌদ্ধধর্মকে বলা হয় Northern Buddhism বা উত্তরাপথের বৌদ্ধধর্ম।

কিন্তু এই নাম দুইটি কপোল-কল্পিত। বৌদ্ধসাহিত্যে উহাদের নাম যথাক্রমে হীনযান ও মহাযান। শেষোক্ত নাম দুইটিও খ্রীষ্টাব্দ-পূর্ব কোন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। খুব সম্ভব হীনযান ও মহাযান নামকরণ কণিষ্ক-সঙ্গীতি হইতে। তবে খ্রীষ্টপূর্বাব্দেও বৌদ্ধসংঘে ভেদ ছিল। শাখাভেদে উহাদের নাম ছিল স্থবিরবাদ, হৈমবত, ধর্মগুপ্ত, মহীশাসক, কাশ্যপীয়, সর্বাস্তিবাদ, মূলসর্বাস্তিবাদ, সাম্মতীয়, মহাসাঙ্ঘিক ও লোকোত্তরবাদ। মতে ও পথে উহাদের কিছু কিছু পার্থক্য ছিল। মহাসাঙ্ঘিক ও লোকোত্তরবাদে স্বাতন্ত্র্য ছিল অতি স্পষ্ট। মহাযানের অঙ্কুর এই মহাসাঙ্ঘিক ও লোকোত্তরবাদ। ইহাদের যাবতীয় গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে তথাকথিত বৌদ্ধসংস্কৃতে, আর এই গ্রন্থগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে নেপাল, কাশ্মীর, তিব্বত ও চীন দেশ হইতে। এই গ্রন্থগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য—এগুলিতে যেমন একদিকে স্থবিরবাদের প্রতিধ্বনি রহিয়াছে, তেমনই অপরদিকে প্রতিধ্বনি রহিয়াছে মহাযানমতের; ইহাদের একপাদ স্থাপিত থেরবাদে বা হীনযানে, অপর পাদ স্থাপিত

মহাযান মতে। বৌদ্ধসংঘে জাতিবর্ণনির্বিশেষে লোক অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার ফলে ইহাতে যে লৌকিক ও ব্রাহ্মণ্য প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা হইতেই মহাযান মতের সূত্রপাত। দেববাদ, ভক্তিবাদ, বোধিসত্ত্ববাদ,—এইগুলিই মহাযান মতের বিশেষত্ব। অপর বিশেষত্ব মহাকরুণাঘনরূপে বোধিসত্ত্বের প্রতিষ্ঠা।

বৌদ্ধসংস্কৃত গ্রন্থগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়ঃ একভাগে পড়ে হীনযান মতের গ্রন্থাবলী, যাহাতে মহাযানের প্রতিধ্বনি আভাষিত—আর একভাগে পড়ে মহাযান শাখার গ্রন্থাবলী। প্রথম পর্যায়ের গ্রন্থগুলির ভিতর বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—১. মহাসাংঘিক-লোকোত্তরবাদসম্প্রদায়ের 'মহাবস্তু', ২. ধর্মগুপ্ত-সম্প্রদায়ের 'বুদ্ধচরিত'[১] ও ৩. সর্বাস্তিবাদীদের 'অবদানসাহিত্য' [(i) অবদানশতক (ii) দিব্যাবদান, ও (iii) অবদানকল্পলতা প্রভৃতি]। এই গ্রন্থগুলি হীনযান ও মহাযানমতের সন্ধি। আর দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রন্থগুলির ভিতর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—(i) ললিতবিস্তর, (ii) সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, (iii) প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি এবং আরও পরবর্তীকালে নাগার্জুন, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, শান্তিদেবের রচনাবলী। নিম্নে বৌদ্ধসংস্কৃতে লিপিবদ্ধ কতকগুলি গ্রন্থের পরিচয় লিপিবদ্ধ হইতেছে।

(i) হীনযান বৌদ্ধসংস্কৃত গ্রন্থ

॥ মহাবস্তু ॥

মহাসাংঘিক-লোকোত্তরবাদ সম্প্রদায়ের বিখ্যাত গ্রন্থ 'মহাবস্তু' বা 'মহাবস্ত্ববদান।' ইহা বুদ্ধজীবনী ও বুদ্ধ-জীবনাদর্শের মহাকোষঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, 'A cyclopaedia of Buddhist legends and doctrines'[২] ঃ ইহা একাধারে নিদান-কথা, জাতক, অবদান (বৌদ্ধ আচার্য ও ভিক্ষুগণের অতুলনীয় কীর্তি), বুদ্ধবচন ও ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের আচরণীয় ধর্মের মহাগ্রন্থ। পণ্ডিতপ্রবর E'Senart তিনটি খণ্ডে সম্পাদনা করিয়া ইহা প্রকাশ করিয়াছেনঃ প্রথম খণ্ডকে বলা যায় 'দূরেনিদান' —অতীত বুদ্ধদের কীর্তিকাহিনী এবং সুমেধতাপসের প্রণিধান ; দ্বিতীয় খণ্ড 'অবিদূরেনিদান'—বুদ্ধের জন্ম হইতে বুদ্ধত্বলাভ পর্যন্ত ঘটনাবলীর বিবরণ এবং তৃতীয় খণ্ড 'সন্তিকেনিদান' অর্থাৎ বুদ্ধের ধর্মচক্রপ্রবর্তন। এই নিদান-কথাগুলি জাতক ও অবদান-কাহিনীতে পূর্ণ।

ইহাতে গদ্য ও পদ্য দুইই ব্যবহৃত হইয়াছেঃ কোথায়ও একই ঘটনা গদ্যে বর্ণনা করিয়া আবার পদ্যে বিবৃত হইয়াছে। ভাষা সর্বত্রই ভাঙ্গা সংস্কৃত। মহাবস্তুতে অঙ্কিত বুদ্ধজীবন হীনযান বৌদ্ধগ্রন্থের উপরই প্রতিষ্ঠিত। নালক, প্রব্রজ্যা, পধান, ধর্মচক্রপবর্তন সুত্তগুলিই এই গ্রন্থোক্ত বুদ্ধজীবনের মূল ভিত্তিঃ বুদ্ধবচনগুলিও মূল পালির ভাঙ্গা সংস্কৃত অনুবাদ।

---

১. সংস্কৃত মহাকাব্য আলোচনার প্রসঙ্গে 'বুদ্ধচরিত' -এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।
২. Sans. Buddhist Lit. of Nepal.

কিন্তু হীনযান মত গৃহীত হইলেও মহাবস্তুতে মহাযান ভাবধারারও পরিচয় রহিয়াছে। বুদ্ধের দেবত্ব ঘোষণায়, অতীত ও অনাগত অসংখ্য বুদ্ধের স্বীকৃতিতে এবং বোধিসত্ত্বের মাহাত্ম্য-খ্যাপনে ইহা মহাযান মতের পরিপোষক। গৌতম বুদ্ধের পূর্বেও অসংখ্য বুদ্ধ ছিলেন ['যে চাপি বুদ্ধা পুরিমা অতীতা'] এবং তাঁহাদের সকলেরই কথা 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় লোকানুকম্পায় মহতো জনকায়স্যার্থায় হিতায় সুখায় দেবানাং চ মনুষ্যাণাং চ।'

মহাবস্তুর অন্যতম আকর্ষণ উহার কাহিনী। উহাদের সাহিত্যিক মূল্যও উপেক্ষণীয় নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহবস্তুবদানের কতিপয় কাহিনী অবলম্বনে অপূর্ব কবিতা ও নাটক রচনা করিয়াছেন।[১] সংক্ষেপে সেই কাহিনীগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে।

১. মালিনীর কাহিনী ঃ একদিন এক 'প্রত্যেক বুদ্ধ' বারাণসীতে ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিয়া কোথাও ভিক্ষা না পাইলে একটি মেয়ে তাঁহাকে গৃহে আনিয়া তৃপ্তি সহকারে ভোজন করায় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর একটি স্তূপ নির্মাণ করিয়া প্রতিদিন তাহা মাল্যভূষিত করে। এই পুণ্যের ফলে সে মাল্যভূষিতা 'মালিনী'রূপে দেবলোকে উৎপন্ন হয় এবং তথা হইতে বারাণসীরাজ ক্রিকির কন্যা 'মালিনী' নামে জন্মগ্রহণ করে। মালিনী ভগবান কশ্যপকে ভিক্ষুসংঘসহ নিজ গৃহে আহ্বান করিয়া ভিক্ষা প্রদান করে। ইহাতে বারাণসীরাজের গণ্যমান্য ব্রাহ্মণ সভাসদগণ ক্রুদ্ধ হইয়া রাজার নিকট মালিনীর নির্বাসন প্রার্থনা করেন। মালিনী সাতদিন সময় চায়। এই সাতদিনে মালিনীর পাঁচশত ভ্রাতা এবং বহু সেনাপতি ও মন্ত্রী মালিনীর আর্য-ধর্মে দীক্ষিত হয়। তাহারা মালিনীকে সাক্ষাৎ ত্রাণকর্ত্রীরূপে গ্রহণ করে এবং ব্রাহ্মণদের দমন করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হয়। ব্রাহ্মণেরা ভয় পাইয়া রাজার শরণ গ্রহণ করেন এবং মালিনীর নির্বাসনদণ্ড প্রত্যাহারের আবেদন জানান। ব্রাহ্মণদের আক্রোশ গিয়া পড়ে ভগবান কশ্যপের উপর। কশ্যপের অলৌকিক শক্তিবলে পৃথিবী-দেবীর সহায়তায় ব্রাহ্মণগণ বিনষ্ট হন। [মহাবস্তু 1]

২. শ্যামাজাতক [বজ্রসেন-শ্যামার কাহিনী]° যশোধারাকে উপেক্ষা করিয়া গৌতম প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন কেন, ভিক্ষুগণ এই প্রশ্ন করায় বুদ্ধ এই জাতক বর্ণনা করিয়াছিলেন। তক্ষশিলার অশ্ববণিক বজ্রসেন বাণিজ্য-ব্যপদেশে বারাণসী যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে চোর-কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় বজ্রসেনের সমস্তই অপহৃত হয় এবং আহত বজ্রসেন কোন প্রকারে মৃতের বস্ত্রে দেহ গোপন করিয়া বারাণসীর এক 'শূন্যাগারে' শয়ন করিয়া 'শ্রান্তোক্লান্তো প্রসুপ্তো'। সেই রাত্রিতে বারাণসীর

---

১. এই কাহিনীগুলি রবীন্দ্রনাথ মূল হইতে গ্রহণ করেন নাই, গ্রহণ করিয়াছেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত নেপালী সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের সংক্ষেপিত বিবরণের মাধ্যমে।

রাজকুলে চুরি হয়। রাজভট্টগণ বজ্রসেনকে তদবস্থ দেখিয়া তাহাকে বন্ধন করে। রাজা ছিলেন চণ্ড ও উগ্রশাসন। তিনি মুক্তকশ্মশানে বজ্রসেনের শূলদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন। মদ্যপানোন্মত্ত ঘাতকগণ পটহে ঘোষণা করিতে করিতে শ্মশানের দিকে অগ্রসর হয়। পথে 'গণিকাবীথি'। সেখানকার অগ্রগণিকা 'আঢ্যা, মহাধনা, মহাকোশা' শ্যামা। বজ্রসেনকে দেখিয়াই শ্যামা প্রেমাসক্ত হইয়া ভাবিল, 'যদি এতং পুরুষং ন লভামি মরিষ্যামি'। তাই চেটিকাকে দিয়া সে বলিয়া পাঠাইল, আমি এত এত হিরণ্য-সুবর্ণ দিব, এই পুরুষকে নিহত করিও না ; অন্য এক পুরুষ যাইবে, তাহাকে হত্যা করিও। ঘাতকেরা রাজি হইল। শ্যামা অর্থের বিনিময়ে দ্বাদশবর্ষের জন্য এক শ্রেষ্ঠিপুত্রকে ক্রয় করিয়াছিল। আহার্য্য দ্রব্য লইয়া সে তাহার নিকট গিয়া ছলনা পাতিল। 'স্ত্রী-মায়া হি অনন্তিকা'—শ্যামা এই মায়া পাতিয়া শ্রেষ্ঠিপুত্রকে আহার্যসহ ঘাতকদের নিকট পাঠাইয়া দিল। ঘাতকেরা তাহাকে নিহত করিয়া বজ্রসেনকে মুক্ত করিয়া দিল। চেটী বজ্রসেনকে শ্যামার গৃহে লইয়া আসিল। শ্যামা তাহাকে স্নান করাইয়া মহার্য বস্ত্র পরাইয়া পালংকে বসাইয়া পঞ্চকামগুণ সমর্পণ করিল ['উভৌ ক্রীড়ন্তি রমন্তি প্রবিচারয়ন্তি']। কিন্তু কয়েকদিন পরেই আসল ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া বজ্রসেনের মুখ শুকাইয়া গেল। আহারে-বিহারে রুচি নাই। শ্যামা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, তক্ষশিলায় এক উদ্যান-শোভিতা পুষ্করিণী আছে, বিলাসীরা সেখানে উদকক্রীড়া করে। শ্যামা বলিল, বারাণসীতেও উদ্যান, আরাম, পুষ্করিণী আছে—আমরা ক্রীড়ার্থ সেইখানে যাইব। শ্যামা-বজ্রসেন জলবিহারে চলিল, সঙ্গে চেটী। বজ্রসেন ভাবিল, এই সুযোগে পলায়ন করিতে হইবে। চেটীকে কথাছলে দূরে ভাণ্ডমূলে সরাইয়া দিয়া সে শ্যামাকে পানোন্মত্ত করিয়া তুলিল, তাহার পর শ্যামাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বন্ধ করিয়া জলকেলির ছলে তাহাকে জলে ডুবাইতে লাগিল। মদোন্মত্তা শ্যামা ভাবিল, আর্যপুত্র খেলাই করিতেছেন। কিন্তু ক্রমে সে ক্ষীণপ্রাণা হইল। মৃত মনে করিয়া বজ্রসেন তাহাকে সোপানে ফেলিয়া পলায়ন করিল। ক্ষণেকপরে চেটী আসিয়া শ্যামাকে তদবস্থ দেখিয়া তাহাকে উঠাইল। সুস্থ হইয়া শ্যামা বুঝিল, বজ্রসেন পলায়ন করিয়াছে। তখন সে নিজের গৃহে ফিরিয়া এক চণ্ডালের নিকট হইতে একটি অনাদগ্ধ মৃতদেহ ক্রয় করিয়া তাহাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া কাঁদিতে বসিল। তাহার নির্দেশে চেটী ও দাসীরাও উচ্চ স্বরে রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিল, হায়, 'আর্যপুত্র কালগতো আর্যপুত্র কালগতো'। সকলে আসিয়া বুঝিল, শ্যামা-ক্রীত শ্রেষ্ঠিপুত্র মরিয়া গিয়াছে, শ্যামা তাহারই শোকে কাঁদিতেছে। শ্রেষ্ঠিপুত্রের মাতাপিতাও আসিলেন, ভাবিলেন, শ্যামা তাঁহাদের পুত্রের জন্যই শোক করিতেছে। তাঁহারা শ্যামাকে তাঁহাদের গৃহে লইয়া আসিলেন। শ্যামা আজ 'ওমুক্তমণিসুবর্ণা ওদাত বস্ত্রাম্বরধরা একবেণীধরা'—সে বজ্রসেনের জন্য শোকার্তা। কিন্তু শ্রেষ্ঠিপুত্রের মাতাপিতা ভাবেন, তাঁহাদের পুত্রের শোকেই শ্যামার এই অবস্থা। কিছুদিন পরে তক্ষশিলা হইতে একদল নট বারাণসীতে আসিলে শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল,তোমরা

উত্তরাপথের বজ্রসেনকে জানো ? তাহারা বলিল, জানি। শ্যামা তাহাদের নিকট বজ্রসেনের উদ্দেশ্যে একটি গাথা পাঠাইল "

যাং ত্বং সালেহি ফুল্লেহি শ্যামাং কৌশেয়বাসিনীং।
গাঢ়ং অঙ্কেন পীড়েসি সা তে কৌশল্যং পৃচ্ছতি ।।

বজ্রসেন শ্লোক শুনিয়া গাথায় বলিল, 'কথং সা মুক্তিকা নারী মম কৌশল্যকং ভণে।' নটদারকগণ বলিল, শ্যামা মরে নাই ঃ

নাপি সা ম্রিয়তে নারী নাপ্যন্যমভিকাংক্ষতি।
একবেণীধরা বালা ত্বামেব অভিকাংক্ষতি ।।

বজ্রসেন বুঝিল, আরও দূরে চলিয়া না গেলে শ্যামার কবল হইতে মুক্তি নাই। তখন সে শ্যামাকে উপেক্ষা করিয়া আরও দূরতর দেশে প্রস্থান করিল।

[এই জাতকের শ্যামা হইলেন এ জন্মের যশোধারা, আর বজ্রসেন স্বয়ং বুদ্ধ মহাবস্তু. II]

৩. কুশজাতক [কুশ ও রাণী সুদর্শনার কাহিনী] ঃ ইন্দ্রের বরে ভেষজ-গুণ্ডিকা বাটিয়া কুশাগ্রে উদকবিন্দু পান করার ফলে রাজা ইক্ষ্বাকুর পাঁচশত মহিষীতে পাঁচশত পুত্র হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম 'কুশ' অন্যান্য পুত্রের নাম—ইন্দ্রকুশ, দেবকুশ, কুশদ্রুম প্রভৃতি। অন্যান্য রাজপুত্র রূপে অতুলনীয়। পুষ্কলতার মত দর্শনীয় বর্ণ, কিন্তু দেবী অলিন্দার পুত্র কুশ হইলেন 'দুর্বর্ণো দুর্দর্শো স্থূলোষ্ঠো স্থূলশিরো স্থূলপাদঃ মহোদরো কালো মষিরাশিবর্ণো'। ইক্ষ্বাকুর মৃত্যুর পর এই কুশই রাজা হইলেন—তিনি রাজচক্রবর্তী, নরর্ষভ—তাঁহার শাসনে ইক্ষ্বাকুকুল ঋদ্ধ, স্ফীত, সুভিক্ষ। কুশ মাতা অলিন্দাকে তাঁহার জন্য প্রাসাদিকা দর্শনীয়া ভার্যা সংগ্রহ করিতে বলিলেন। কিন্তু কে কুশের মত কৃষ্ণবর্ণ পুরুষকে কল্যাণরূপা কন্যা দান করিবেন ? খুঁজিয়া-পাতিয়া কন্যা পাওয়া গেল, কান্যকুব্জের মদ্রকরাজ মহেন্দ্রের কন্যা সুদর্শনা—জম্বুদ্বীপে যে কন্যা রূপে ও গুণে অতুলনীয়া। কিন্তু রাণী অলিন্দা ভাবিলেন, বরের রূপ দেখিলে রাজকন্যা নিশ্চয় ক্ষুব্ধা হইবে। কাজেই বর-বধূর জন্য তিনি এক অন্ধকার গর্ভগৃহ নির্মাণ করাইলেন। সুদর্শনা সেই গৃহে কুশের সহিত বাস করিতে লাগিলেন ঃ সে গৃহ 'অজ্যোতিক', তাহাতে 'নৈব রাত্রং ন দিবা দীপা দীপ্যন্তি।' সুদর্শনার মনে প্রশ্ন জাগিল, শয়নগৃহে দীপ জ্বলে না কেন ? সুদর্শনা স্বামীর রূপ দেখিবার জন্য পাগল হইলেন। স্থির হইল, রাজা যখন দর্শনশালায় বসিবেন, তখন সুদর্শনা প্রাসাদের উপর হইতে রাজাকে দর্শন করিবেন। এদিকে দেবী অলিন্দা পরামর্শ দিলেন, রাজপুত্রের মধ্যে 'কুশদ্রুম'কে সিংহাসনে বসাইয়া দেখাইতে হইবে—'এষঃ রাজা কুশোতি'। সুদর্শনা সেইভাবেই রাজাকে দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। কিন্তু মনে মনে দুঃখিত হইলেন রাজার ছত্রধরকে দেখিয়া। এমন রাজার এই 'দুর্বর্ণো' ছত্রধর ? সুদর্শনা শ্বশ্রূমাতার নিকট প্রস্তাব করিলেন, এ ছত্রধরকে বিদায় দিয়া অন্য কাহাকেও ছত্রধর নিযুক্ত করা হউক। রাণী তাহাতে সম্মতি দিলেন না। ছত্রধরই স্বয়ং কুশ ! অলিন্দা পুত্রবধূকে বুঝাইলেন, ছত্রধরের জন্যই রাজ্যের

সমৃদ্ধি। সে কুরূপ, কিন্তু 'গুণেহি মহাত্মকো শীলবন্তো সত্যবাদী ধার্মিকো পুণ্য-বন্তো বলবান্ পররাষ্ট্র-প্রমর্দকঃ'। রাত্রিতে কুশও সেই নিষ্প্রদীপ গৃহে সুদর্শনার নিকট ছত্রধর সম্পর্কে একই মন্তব্য করিলেন।

এবার কুশ সুদর্শনাকে দেখিতে চাহিলেন। অলিন্দার পরামর্শে পদ্মবনে, আম্রকুঞ্জে কুশ সুদর্শনার সহিত মিলিত হইলেন। সুদর্শনা ভয়ে শিহরিয়া ভাবিলেন, নিশ্চয় কোন উদকরাক্ষস বা বনপিশাচ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। বুঝিলেন না, ইনিই তাঁহার স্বামী কুশ। কিন্তু একদিন আসল তথ্য প্রকাশ পাইয়া গেল। রাজার হস্তীশালায় এক রাত্রে আগুন লাগিল। অন্তঃপুরিকারা ছুটিয়া হস্তীশালার নিকট আসিলেন। বলশালী কুশলী কুশ সেই জ্বলন্ত অগ্নিশিখা হইতে নিজ বিক্রমে হস্তীযূথকে উদ্ধার করিলেন। সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল, 'রাজ্ঞো কুশস্য বলো অহো পরাক্রমং'। একজন কুব্জা (সৈরিন্ধ্রী) আবেগভরে কুশের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলে সুদর্শনা বুঝিতে পারিলেন, এই রক্ষকই স্বয়ং কুশ। তিনি কুশের তাদৃশ বর্ণ দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। দেবভবন সদৃশ রাজকুলে তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিল, ভাবিলেন, 'নাহং অৎস্যামি ন ভোক্ষ্যামি। কিং জীবিতেন মে যদহং পিশাচেন সার্ধং সংবসামি।' মানিনী সুদর্শনা কান্যকুব্জে পিতৃভবনে চলিয়া গেলেন।

এদিকে কুশ সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া মাতাকে কহিলেন, 'অহং পি গচ্ছামি কণ্ণকুব্জং।' কুশদ্রুমকে সিংহাসনে বসাইয়া তিনি একাকী উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং ঘুরিতে ঘুরিতে কান্যকুব্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মালাকর, ধোবক, রজক, সুবর্ণকার এবং মণিকার রূপে প্রত্যেকটি বিষয়ে আশ্চর্য শিল্পদক্ষতার পরিচয় দিয়া তিনি রাজভবনে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সুদর্শনা প্রতিটি ক্ষেত্রে বুঝিতে পারিলেন, ইহা কুশের কীর্তি। তিনি কুশের প্রত্যেকটি শিল্প-কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। অনন্যোপায় কুশ পাচকরূপে মহেন্দ্রক-ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। একদিন সুদর্শনার সহিত তাঁহার দেখা হইল। সুদর্শনা মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, নিজের রাজ্যে ফিরিয়া যাও। কুশ বলিলেন, 'সুদর্শনে নাহং ত্বয়া বিনা গমিষ্যামি।' সুদর্শনা ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন,

বিক্ষেপ তব চিত্তস্য যদনিচ্ছন্তীমিচ্ছসি
অকামাং রাজ কামেসি নৈতং পণ্ডিত লক্ষণং ॥

তথাপি কুশের এক উত্তর, তোমাকে না লইয়া ফিরিব না। সুদর্শনাও কহিলেন, তোমার মত দুর্বর্ণের মুখও আমি দেখিতে চাই না।

এদিকে সুদর্শনা কুশকে ত্যাগ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া 'দুর্মতি' নামক এক রাজার প্ররোচনায় সাতজন পরাক্রান্ত প্রতিরাজ মিলিত হইয়া রাজা মহেন্দ্রকের নিকট সুদর্শনাকে যাচঞা করিল। রাজা তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। প্রত্যাখ্যাত রাজারা ক্রুদ্ধ হইয়া মহেন্দ্রকের রাজ্য অবরোধ করিল। মহেন্দ্রক তখন ক্রুদ্ধ হইয়া কন্যাকে বলিলেন, কেন তুই কুশকে ত্যাগ করিয়া আসিলি? তোকে সাতখণ্ড করিয়া কাটিয়া সাত রাজাকে দিব।

সুদর্শনা ভীতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মাকে বলিলেন ঃ

অম্বে যদি মে সপ্তক্ষত্রিয়া পরম্পরং বিরুধিত্বা ঘাতয়িষ্যান্তি ততঃ ভস্মায়িত্বা অস্থিনি সংহরয়িত্বা ততো মে এলুকাং কারাপয়েসি। তত্র চ এলুকাম্বারে কর্ণিকার-বৃক্ষং রোপায়সি। ততো গ্রীষ্মাণামত্যয়েন প্রথমে প্রাবৃষমাসে বর্তমানে সো কর্ণিকার বৃক্ষো সর্বপরিফুল্লো ভবেয়া হেম-প্রকাশবর্ণঃ ততো মে স্মরসি এদৃশা মে বর্ণেন ধীতা সুদর্শনা আসীতি।

—মা, যদি সাত রাজা বিরোধ করিয়া আমাকে মারিয়া ফেলে, তাহা হইলে দাহ করিয়া আমার অস্থিগুলি দিয়া 'ছিটাবেড়া' তৈরি করিও। সেই ছিটাবেড়ার মুখে কর্ণিকার গাছ রোপণ করিও। গ্রীষ্মের অবসানে প্রথম বর্ষা আসিলে যখন কর্ণিকার বৃক্ষ সোণার বর্ণে প্রস্ফুটিত হইবে, তখন সেই বর্ণ দেখিয়া মনে করিও, এই বর্ণেরই মত ছিল আমার দুহিতা সুদর্শনা।

মহাদেবী মেয়ের কথা শুনিয়া কন্যার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, বীর্যবলে পরাক্রান্ত জামাতা কুশ থাকিতে আমার কন্যার সে অবস্থা হইবে কেন?

সুদর্শনা তখন কুশের নিকট গেলেন। ক্রমে সকলে জানিতে পারিলেন, মহা-পরাক্রম জামাতা কুশ পাচকরূপে মহেন্দ্রকভবনে আছেন। রাজা শুনিয়া ভীতসম্ভ্রান্ত হইয়া কুশকে বহু সম্মান প্রদর্শন করিলেন। কুশ বলিলেন, 'মা ভীহি মহারাজ'। এই বলিয়া 'সিংহনাদ' করিতেই সাতরাজা বশীভূত হইয়া মহেন্দ্রককে আসিয়া প্রণাম করিল। কুশের পরামর্শে রাজা মহেন্দ্রক সাতরাজাকে তাঁহার অপর সাতকন্যা দান করিলেন এবং কন্যা সুদর্শনাকে কহিলেন, 'সুদর্শনে রাজং কুশং ভর্তারং প্রেম্নেন চ গৌরবেণ চ উপস্থিহেসি।' সুদর্শনা প্রাঞ্জলিবদ্ধ হইয়া রাজার নির্দেশ পালন করিলেন। পত্নীসহ রাজা কুশ স্বরাজ্যে ফিরিয়া চলিলেন।

পথে আসিতে আসিতে সরোবরজলে নিজ কুৎসিত প্রতিবিম্ব দেখিয়া কুশ নিজেই অত্যন্ত ক্ষুন্ন হইয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। তখন ইন্দ্র তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'জ্যোতিরস' নামক দিব্য মণিরত্ন প্রদান করিলেন। সেই মণিস্পর্শে কুশ 'প্রাসাদিক দর্শনীয়' রূপ প্রাপ্ত হইলেন।

[সামান্য 'উক্কাস শব্দে' দুর্জয় মার পরাভূত হওয়ায় ভিক্ষুগণ সিদ্ধার্থকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বুদ্ধ তাঁহাদিগকে এই কুশজাতক বলিয়াছেন। যুগে যুগেই কেবল 'সিংহনাদ' করিয়া তিনি পাপী মারকে পরাভূত করিয়াছেন। কুশ-জাতকের কুশ স্বয়ং বুদ্ধ, সুদর্শনা এজন্মে যশোধারা এবং 'দুর্মতি' পাপী মার। মহাবস্তু II]

৪. আজ্ঞাত কৌণ্ডিণ্য জাতক [কোশলরাজ ও কাশীরাজের কাহিনী]ঃ মৃগদাবে বুদ্ধদেবের উপদেশ শুনিয়া পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের ভিতর কৌণ্ডিণ্যই সর্বপ্রথম বীতমল হইয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। কৌণ্ডিণ্যের পূর্ব-সুকৃতি প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব এই জাতক বর্ণনা করেন। কোশলরাজ ছিলেন 'কৃতপুণ্যো মহেশাখ্যো মহাবলো মহাকোশো

মহাবাহনো।' তাঁহার রাজ্য ছিল সুসমৃদ্ধ, সুভিক্ষ ও সুখী প্রজায় পূর্ণ। দেশে দেশে তাঁহার কল্যাণকীর্তিবাচক শ্লোক ঘোষিত হইত।

কাশীরাজ তাঁহার এই খ্যাতি সহ্য করিতে না পারিয়া সৈন্যসামন্ত সহ কোশল আক্রমণে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু পথেই ভগ্নমনোরথ হইলেন ; আবার অগ্রসর হইয়াও, ভগ্ন হইলেন। বার বার যুদ্ধে জীবক্ষয় হয় দেখিয়া কোশলরাজ রাজ্য ত্যাগ করিয়া রিক্ত অবস্থায় বনে চলিয়া গেলেন। কোশলরাজ্য কাশীরাজের অধীন হইল।

এদিকে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে কোশলরাজের সহিত এক সার্থবাহের সাক্ষাৎ হইল। সমুদ্রে নৌকাডুবি হওয়ায় সার্থবাহ সর্বস্বান্ত হইয়া কোশলরাজের নিকট অর্থ প্রার্থনা করিতে চলিয়াছে। শুনিয়া কোশলরাজ নিজের পরিচয় দিয়া তাঁহার দৈন্যের কথা ব্যক্ত করিলেন। আশা নির্মূল হইল দেখিয়া সার্থবাহ কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলঃ

তব প্রবাদেন হি ত্যাগশূর
দূরতো শ্রুত্বা ইহ আগতোঽস্মি।
মনোরথা শাবলেন বৃংহিতা মে
আশা নিরাশা কৃত দর্শনেন॥

রাজা তাহাকে বলিলেন, প্রবাদ ব্যর্থ হইবে না, আমি প্রাণ দিয়া তোমার আশা পূর্ণ করিব। তুমি আমাকে বন্ধন করিয়া কাশীরাজের নিকট লইয়া চল। তাহা হইলে তিনি তোমাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিবেন। সার্থবাহ বলিলেন, হে পুরুষর্ষভ আমি অর্থের জন্য এমন পাপ করিতে পারি না। রাজা বলিলেনঃ

কিং জীবিতফলং তেষাং যেষাং শ্রবো ন মহাভগো
অর্থার্থো ন উপগতো ভগ্নপ্রণয়ো নিবর্তয়ে॥

কোশলরাজের আগ্রহাতিশয্যে বণিক রাজাকে বাঁধিয়া কাশীরাজের নিকট উপস্থিত করিল। কাশীরাজ কোশলরাজের মহত্ত্বে মুগ্ধ হইলেন এবং কোশলরাজকে তাঁহার হৃতরাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন।

[পূর্বজন্মে বুদ্ধই ছিলেন কোশলরাজ, আর কৌণ্ডিণ্য ছিলেন সেই সার্থবাহ। মহাবস্তু III]

মহাবস্তু এই ধরনের বহু মনোজ্ঞ উপাখ্যানের ভাণ্ডার। মহাবস্তুর সাহিত্যিক মূল্য এই কাহিনী-মূল্যে।

॥ অবদান সাহিত্য ॥

বৌদ্ধ সংস্কৃতে গ্রথিত 'অবদান' সাহিত্যও জীবন-রসপূর্ণ গল্পের ভাণ্ডার। 'অবদান' বলিতে বুঝায় 'স্মরণীয় কীর্তি' ('Noteworthy deed') ; বিশেষতঃ বৌদ্ধ আচার্য, শ্রমণ, ভিক্ষু ও উপাসকদের উল্লেখযোগ্য পুণ্য কর্ম বা কুশলকর্ম। পালিতে আছে 'অপদান' ; উহাতে বৌদ্ধ থের ও থেরীদের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। সংস্কৃত 'অবদান'-সাহিত্যেরও উপজীব্য এই ধরনের কীর্তি-কাহিনী।

নেপাল হইতে এই ধরনের বহু অবদান-সাহিত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজেন্দ্র-লাল মিত্র তাঁহার Sanskrit Bnddhist Literature of Nepal-গ্রন্থে অবদান শতক, দিব্যাবদানমালা, বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা, দ্বাবিংশ অবদান ও কল্পদ্রুমাবদান প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদান করিয়াছেন। এই পরিচিতি হইতে অবদান সাহিত্যের সাহিত্যিক উপকরণ আবিষ্কার করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ইহা হইতে কাহিনীর বীজ মাত্র লইয়া অতি চমৎকার কবিতা ও নাটক রচনা করিয়াছেন। অবদান গল্পমালার অসংখ্য কাহিনীর ভিতর রবীন্দ্র-পরিগৃহীত কাহিনীগুলির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

॥ **অবদান শতক**[১] ॥

অবদান-গ্রন্থগুলির ভিতর ইহাই প্রাচীনতম। ইহা দশটি বর্গে বিভক্ত; প্রত্যেক বর্গে দশটি করিয়া কাহিনী। কয়েকটি কাহিনীর সংস্কৃত মূল এখনও অনাবিষ্কৃত। বর্গগুলি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে বিন্যস্ত। গ্রন্থখানি বৌদ্ধ সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের গ্রন্থ বলিয়া অনুমিত। প্রায় প্রত্যেকটি কাহিনীর প্রারম্ভে 'বুদ্ধো ভগবান্ সৎকৃতো মানিতঃ পূজিতো······বিহরতি' এই বাক্য এবং পরিশেষে ভগবান বুদ্ধের নীতি উপদেশ এবং ভিক্ষুদের সানন্দ অভিনন্দন। অবদানশতকে গতানুগতিক কাহিনী ও বিবৃতির অভাব নাই, তৎসত্ত্বেও কতকগুলি কাহিনী অতি সুন্দর। যথা—

১. পদ্ম-অবদান [P. L. Vaidya সম্পাদিত গ্রন্থে ইহা ৭নং অবদান]ঃ

রাজা প্রসেনজিৎ বুদ্ধ-শাসনে প্রবিষ্ট হইয়া বুদ্ধদেবকে প্রীতিসহকারে ধূপ-দীপ-গন্ধমাল্য-বিলেপনে অর্চনা করিতেন। একদিন একজন 'আরামিক' (উদ্যান-পালক) একটি নূতন পদ্ম লইয়া রাজাকে দিতে যাইতেছিল। পথে একজন তীর্থিক প্রশ্ন করিল, পদ্ম বিক্রয় করিবে? ঠিক সেই সময়ে গৃহপতি অনাথপিণ্ডদও সেই পথে যাইতেছিলেন। পদ্ম দেখিয়া তিনিও বুদ্ধ-অর্চনার জন্য সেই পদ্ম কিনিতে চাহিলেন। তীর্থিকে ও অনাথপিণ্ডদে পদ্মের মূল্য লইয়া ক্রমে ডাক চড়িতে লাগিল। তখন সংশয়াপন্ন হইয়া আরামিক অনাথপিণ্ডদকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এ পদ্ম কাহাকে দিবেন? অনাথপিণ্ডদ বলিলেন, ভগবান্ বুদ্ধকে। 'ক এষ বুদ্ধো' —উদ্যান-পালকের এই প্রশ্নে অনাথপিণ্ডদ বিস্তৃতভাবে বুদ্ধগুণ ব্যাখ্যা করিলেন। শুনিয়া মালী বলিল, 'গৃহপতে অহং স্বয়মেব তং ভগবন্তমর্চয়িষ্যে।' মালী আরামে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সহস্রসূর্যের মত দীপ্তিমান্ রত্নপর্বতের মত দ্যুতিসম্পন্ন ভগবান্ বসিয়া আছেন। দেখিবামাত্র মালী সেই পদ্ম বুদ্ধচরণে নিক্ষেপ করিল। নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র সেই পদ্ম চক্রাকারে বুদ্ধের মস্তকে শোভা পাইল। বিস্মিত মালী মূর্ছিতের মত ভগবানের চরণে লুটাইয়া পড়িল। ভগবান্ বুদ্ধ আনন্দকে কহিলেন, এই কুশলকর্মের ফলে এই মালী 'পদ্মোত্তম' নামে স্যমক সম্বুদ্ধ হইবে।

১. P. L. Vaidya-সম্পাদিত।

২. শ্রীমতী-অবদান [অবদান সংখ্যা ৫৪]ঃ রাজগৃহে রাজা বিম্বিসারের রাজত্বকালে রাজ্য ছিল ঋদ্ধ, স্ফীত, সুভিক্ষ সর্বসম্পৎপূর্ণ। একদিন রাত্রিকালে অন্তঃপুরিকাদের লইয়া রাজা ভগবদ্দর্শনে গেলেন। অন্তঃপুরিকারা বলিলেন, প্রতিদিন আমরা ভগবানকে দেখিবার সুযোগ পাইব না, অতএব ভগবানের কেশনখ লইয়া পুরোদ্যানে একটি স্তূপ নির্মিত হইলে আমরা প্রতিদিন পুষ্প-গন্ধ-মাল্য-বিলেপনে পূজা করিতে পারিব। বিম্বিসার রাণীদের অভিপ্রায় অনুসারে ভগবান বুদ্ধের কেশনখ চাহিয়া পুরমধ্যে একটি স্তূপ নির্মাণ করাইয়া দিলেন। অন্তঃপুরিকাগণ প্রতিদিন দীপ-ধূপ-গন্ধমাল্যে উহার অভ্যর্চনা করিতেন।

অজাতশত্রু পিতাকে নিহত করিয়া রাজা হইয়া দেবদত্তের প্ররোচনায় বুদ্ধপূজার বিরুদ্ধে নির্দেশ প্রচার করিলেন, কেহ যেন তথাগতস্তূপে পূজা না দেয় ['ন কেনচিত্তথাগতস্তূপে কারাঃ কর্তব্যাঃ']।

পঞ্চদশী প্রবারণা সমাগত হইল। কেহই সেদিন কেশনখস্তূপ মার্জনা করিল না, দীপধূপে অর্চনাও করিল না। অন্তঃপুরিকাগণ স্তূপের সেই অবস্থা দেখিয়া রাজা বিম্বিসারকে স্মরণ করিয়া 'করুণ করুণং রোদিতুমারব্ধাঃ'—হায় ধর্মরাজের বিয়োগ হওয়ায় আমরা ধর্ম হইতেও বঞ্চিত হইলাম। সেখানে ছিলেন শ্রীমতী নামে অন্তঃপুরিকা। তিনি নিজের জীবন গণনা না করিয়া ['স্বকং জীবিতমগণয়িত্বা'] সেই কেশনখ স্তূপ মার্জনা করিয়া দীপমালা জ্বালাইয়া দিলেন ['দীপমালাম-কার্ষিৎ'] প্রাসাদতল হইতে অজাতশত্রু সেই উদার আলোক দেখিয়া ['তমুদারমব-ভাসং দৃষ্টবা'] উহা শ্রীমতীর কার্য জানিতে পারিয়া তাহাকে আহবান করাইয়া প্রশ্ন করিলেন, 'কিমর্থং রাজশাসনমতিক্রমসি ?' শ্রীমতী সতেজে উত্তর দিলেন, আমি আপনার শাসন লঙ্ঘন করিয়াছি, কিন্তু ধর্মরাজ বিম্বিসারের শাসন অতিক্রম করি নাই।

অজাতশত্রু তৎক্ষণাৎ কুপিত হইয়া চক্র নিক্ষেপ করিয়া শ্রীমতীর জীবনান্ত করিলেন। ভগবানে আত্মসমর্পণহেতু শ্রীমতী মৃত্যুর পরে অপূর্ব তনুশ্রীর অধি-কারিণী হইয়া ['তনুশ্রীরতুলা'] দেবকন্যা রূপে দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন।

৩. বস্ত্র-অবদান [অবদান. ৫৫]ঃ অনাথপিণ্ডদ ভগবান বুদ্ধকে জেতবন দান করিয়া ভাবিলেন, এই দানে আমার পুণ্য হইল, কিন্তু শ্রাবস্তী-বাসী দরিদ্রজনের তো কোন পুণ্য হইল না। সকলের নিকট হইতে 'ছন্দকভিক্ষণ' (স্বেচ্ছাকৃত দান) লইয়া যাহাতে সকলেই বুদ্ধ-সেবার ফল অর্জন করে, তাহাই করিতে হইবে ভাবিয়া তিনি রাজার নিকট অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। রাজা ঘণ্টার ঘোষণা করিয়া শ্রাবস্তীর লোকদিগকে এই অভিপ্রায়ের কথা জানাইয়া দিলেন। সাতদিনের দিন গৃহপতি অনাথপিণ্ডদ ছন্দকভিক্ষা করিতে বাহির হইলেন। যাহার যাহা সামর্থ্য, তাহাই দান করিতে লাগিল। কেহ হার দিল, কেহ কটক, কেহ কেয়ূর, কেহ অঙ্গুলিমুদ্রা, কেহ মুক্তাহার, কেহ বা হিরণ্য-সুবর্ণ, কেহ বা একটি মাত্র কার্ষাপণ। অনাথপিণ্ডদ সকলের কল্যাণে সব দানই গ্রহণ করিলেন।

একটি স্ত্রীলোক ছিলেন পরম দরিদ্রা। তিন মাস কষ্ট করিয়া তিনি একটি গাত্রবস্ত্র ['পটক'] ক্রয় করিয়াছিলেন। সেই বস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া তিনি পথে বাহির হইলেন। তিনি দূর হইতে অনাথপিণ্ডদকে এইরূপে ভিক্ষায় বহির্গত দেখিয়া অন্য একজন উপাসককে প্রশ্ন করিলেন, গৃহপতি অনাথপিণ্ডদ মহাধনবান, তিনি পরকুলে ভিক্ষা করিতেছেন কেন? উপাসক উত্তর দিলেন, পরের মঙ্গলের জন্য সকলেই সবুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়া পুণ্য অর্জন করিতে পারে না, সকলের যাহাতে পুণ্য হয়, তাহার জন্যই এই ছন্দকভিক্ষা। শুনিয়া সেই দারিকা ভাবিলেন, আমিও তো অকৃতপুণ্যা; আমার এমন শক্তি নাই সশ্রাবকসংঘ ভগবানকে ভোজন করাই। কিন্তু এই বস্ত্রখানি ব্যতীত আমার অন্য কোন বিভবও নাই। তিনি ভাবিলেন, বস্ত্রখানি দান করিলে আমি নগ্ন হইয়া যাইব। যাহা হউক, বৃক্ষান্তরালে গিয়া আমি এই বস্ত্র দান করিব। ইহা স্থির করিয়া তিনি বৃক্ষান্তরাল হইতে নিজদেহের সেই বস্ত্র খুলিয়া দূর হইতে অনাথপিণ্ডদের উদ্দেশ্যে ছুড়িয়া দিলেন। অনাথপিণ্ডদ বুঝিলেন, নিশ্চয়, এই বস্ত্রই ইহার একমাত্র সম্বল। পুরুষেরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, স্ত্রীলোকটি শরণ-সংস্থায় দেহ গোপন করিয়া আছেন। সেখান হইতে তিনি বলিলেন, আমার যাহা সামর্থ্য বুদ্ধপ্রীতির জন্য তাহাই দান করিয়াছি। অনাথপিণ্ডদ বিস্মিত হইলেন, তিনি সেই স্ত্রীলোকটিকে সেই বস্ত্রের পরিবর্তে বিচিত্র বস্ত্রাভরণ প্রদান করিলেন। কালক্রমে এই পুণ্যফলে সেই দরিদ্র দারিকা দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিলেন।

॥ দিব্যাবদান ॥

অবদান গ্রন্থগুলির ভিতর আর একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'দিব্যাবদান'। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার Sans. Buddhist Lit. of Nepal গ্রন্থে দিব্যাবদানের উল্লেখ করেন নাই; তাঁহার উল্লেখিত গ্রন্থখানির নাম 'দিব্যাবদানমালা'। কিন্তু ঐ গ্রন্থের সহিত দিব্যাবদানের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। P. L. Vaidya-সম্পাদিত দিব্যাবদানে মোট ৩৮টি অবদান আছে। মনে হয়, ইহা বিবিধ অবদান গ্রন্থমালার একটি সঞ্চয়ন। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা, শার্দূলকর্ণাবদান, অশোকাবদান প্রভৃতি অবদানসাহিত্যের কাহিনীও দিব্যাবদানে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার রচনারীতিও কোন কোন স্থলে বিশুদ্ধ ও অলংকারসমৃদ্ধ। অবদানগুলিতে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন কাহিনী স্থান পাইয়াছে; অবদানশতকের কাহিনীও কয়েকটি আছে। দিব্যাবদানেরও প্রধান আবেদন কাহিনীর দিক হইতে। রবীন্দ্রনাথ যে কাহিনীগুলি লইয়া কবিতা ও নাটক রচনা করিয়াছেন, নিম্নে সেই কাহিনীগুলির সারসংক্ষেপ দেওয়া যাইতেছে।

১. পাংশুপ্রদানাবদান [উপগুপ্ত-বাসবদত্তার কাহিনী][1] ইহা দিব্যাবদানের ২৬নং অবদান। গন্ধবণিক উপগুপ্ত বৌদ্ধ উপাসক। তিনি 'রূপসম্পন্নশ্চাতুর্য

---

১. রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংগ্রহে ইহা 'বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা'র অন্তর্ভুক্ত।

মাধুর্যসম্পন্নশ্চ'। মথুরার গণিকা বাসবদত্তা তাঁহার রূপে মুগ্ধা হইয়া দূতী প্রেরণ করেন। পণ্যা বাসবদত্তার পণ পাঁচশত পুরাণ। উপগুপ্ত বলিলেন, আমি এত পণ দিতে পারিব না। বাসবদত্তা বলিয়া পাঠাইলেন, এক কার্ষাপণও পণ লাগিবে না, 'কেবলমার্যপুত্রেণ সহ রতিমনুভবেয়ম্'। উপগুপ্ত উত্তর দিলেন, 'অকালস্তে ভগিনি মদ্দর্শনায়েতি'—ভগিনি, ইহা দর্শনের যোগ্য কাল নয়।

কালক্রমে বাসবদত্তা হত্যার দায়ে অভিযুক্তা হইলেন। রাজা আদেশ দিলেন, কর্ণ-নাসা ছেদন করিয়া উহাকে শ্মশানে নিক্ষেপ কর। আদেশ প্রতিপালিত হইল। উপগুপ্ত ভাবিলেন, 'ইদানীং তু তস্যা দর্শনকাল ইতি'। কারণ, এতদিন প্রশস্তাম্বর পরিধান করিয়া বিচিত্র আভরণে ভূষিতা বাসবদত্তা ছিল মোক্ষপরাঙ্মুখ—কিন্তু আজ সে রূপহীনা হইয়া গর্ব-বর্জিতা—'ইদানীং তু তস্যাঃ কালোঽয়ং দ্রষ্টুং গতমান রাগহর্ষায়াঃ'—এখন তাহাকে দর্শন দিবার যোগ্য সময়।

উপগুপ্ত শ্মশানে গিয়া দেখিলেন, রূপহীনা বাসবদত্তা শ্মশানে পড়িয়া আছে। পূর্বের সেই দাসীটি পূর্বানুরাগবশে তখনও দূরে দাঁড়াইয়া কাক তাড়াইতেছে। উপগুপ্ত উপস্থিত হইতেই দাসী বাসবদত্তাকে জানাইল। বাসবদত্তা কোনপ্রকারে নিজের দেহ আবৃত করিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল, যখন এই পঙ্কজগর্ভকোমল দেহ মহার্ঘ বস্ত্রে ও অলঙ্কারে শোভিত ছিল, ছিল দর্শনীয় ও ভোগক্ষম, তখন আপনি আসেন নাই; আজ এই দেহ 'প্রণষ্টশোভা', ইহা শোণিত-পঙ্কে অনুলিপ্ত এবং লীলারতির অনুপযুক্ত। আজ কেন আসিলেন? 'এতর্হি কিং দ্রষ্টুমিহাগতোঽসি?' উপগুপ্ত উত্তর করিলেন, ভগিনি, আমি তো কামার্ত হইযা তোমার কাছে আসি নাই, অশুভকামনার পরিণাম দেখিবার জন্য আসিয়াছি:

বহির্ভদ্রাণি রূপাণি দৃষ্টবাবালোঽভিরজ্যতে।
অভ্যন্তর বিদুষ্টানি জ্ঞাত্বা ধীরো বিরজ্যতে।।

—বাইরের ভদ্ররূপ দেখিযা মূর্খেরা রাগগ্রস্ত হয; উহাদের অভ্যন্তরের বিরূপ দেখিয়া পণ্ডিতগণ রাগমুক্ত হন।

উপগুপ্তের এই কথা শুনিয়া বাসবদত্তা তৎক্ষণাৎ স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিল এবং বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিল। বাসবদত্তা কালগতা হইয়া দেবকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

২. শার্দূলকর্ণাবদান[১]: ইহা দিব্যাবদানের ৩৩ সংখ্যক অবদান। ইহার প্রথম অংশ [প্রকৃতি ও আনন্দ-কাহিনী] খাঁটি অবদান; দ্বিতীয় অংশ একটি জাতক-কাহিনী। অবদান অংশটি অর্থাৎ আনন্দ ও চণ্ডালকন্যা প্রকৃতির কাহিনীটি সত্যই সুন্দর। প্রেম-ভিখারিণী চণ্ডালকন্যা প্রকৃতিই এই অবদানের প্রধান আকর্ষণ। 'এবং ময়া শ্রুতম্,'—এই পরিচিতি বাক্য দিয়া কাহিনীর সূচনা। মাতঙ্গ-দারিকা প্রকৃতি

১. রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংগ্রহে ইহা একটি পৃথক 'অবদান'রূপে অনূদিত হইয়াছে।

একদিন জল তুলিতেছিল। বুদ্ধ-শিষ্য আয়ুষ্মান্ আনন্দ তৃষ্ণার্ত হইয়া তাহার নিকট জল চাহিল, 'দেহি মে ভগিনি পানীয়ম্'। প্রকৃতি কহিল, ভদন্ত, আমি চণ্ডালকন্যা। আনন্দ কহিলেন, আমি তো জাতির কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, 'দেহিমে পানীয়ং পাস্যামি।' প্রকৃতি জল দিল। আনন্দ পান করিয়া চলিয়া গেলেন। প্রকৃতি আনন্দের দেহে, মুখে ও স্বরে পাইল সাধুত্বের স্বাদ। আনন্দে 'সংরাগচিত্তা' হইয়া সে স্থির করিল, এই আনন্দই হইবে তাহার স্বামী ঃ 'মাতা চ মে মহাবিদ্যাধরী'— তিনি আনন্দকে আনয়ন করিতে সক্ষম হইবেন।

গৃহে ফিরিয়া পানীয় ঘট একান্তে নামাইয়া জননীকে সে বলিল, মা, শোন— মহাশ্রমণ গৌতমের শ্রাবক আনন্দ, আমি তাঁহাকে স্বামীরূপে প্রার্থনা করি, তুমি তাঁহাকে আনিতে পারিবে ? জননী উত্তর দিলেন, বীতরাগ ও মৃত ব্যতীত যে-কোন লোককে আকর্ষণ করিতে পারিব। কিন্তু রাজা প্রসেনজিৎ গৌতমের উপাসক, তিনি জানিতে পারিলে চণ্ডালকুলের অনর্থ হইবে। প্রকৃতি বলিল, আনন্দকে যদি পাই, বাঁচিব—নচেৎ 'জীবিতং পরিত্যজেয়ম্'। মা বলিলেন, পুত্রি, জীবন পরিত্যাগ করিও না, আমি শ্রমণ আনন্দকে আনয়ন করিতেছি।

প্রকৃতির মাতা অঙ্গন গোময়ে লেপন করিয়া বেদীতে দর্ভ বিস্তৃত করিয়া অগ্নি জ্বালিলেন এবং আটশত অর্কপুষ্প (জবাফুল) লইয়া মন্ত্র[1] পড়িয়া এক একটি ফুল অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

আনন্দের চিত্ত আক্ষিপ্ত হইল। বিহার হইতে তিনি চণ্ডাল গৃহের দিকে চলিলেন। দূর হইতে আনন্দকে আসিতে দেখিয়া চণ্ডালী প্রকৃতিকে বলিলেন, ওই যে শ্রমণ আনন্দ আসিতেছেন, শয্যা প্রস্তুত কর।

প্রকৃতি হৃষ্টতুষ্ট হইয়া শয্যা পাতিল।

আয়ুষ্মান আনন্দ চণ্ডালগৃহে উপনীত হইয়া বেদী আশ্রয় করিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, বলিতে লাগিলেন, 'ব্যসন প্রাপ্তোঽস্মি। ন চ মে ভগবান্ সমন্বাহরতি।' ভগবান বুঝিতে পারিয়া সম্বুদ্ধমন্ত্রে[2] চণ্ডালমন্ত্র প্রতিহত করিয়া আনন্দকে আকর্ষণ করিলেন।

---

১. মন্ত্রটি এইরূপ ঃ

অমলে বিমলে কুংকুমে সুমনে। যেন বন্ধামি বিদ্যুৎ। ইচ্ছয়া দেবো বর্ষতি বিদ্যোতিতি গর্জতি। বিস্ময়ং মহারাজস্য সমভিবর্ধয়িতুং দেবেভ্যো মানুষেভ্যো গন্ধর্বেভ্যঃ শিখিগ্রহা দেবা বিশিখিগ্রহা দেবা আনন্দস্যাগমনায় সংগমনায় ক্রমণায় গ্রহণায় জুহোমি স্বাহা।

২. সম্বুদ্ধ মন্ত্রটি এইরূপ ঃ

স্থিতিরচ্যুতিঃ সুনীতিঃ। স্বস্তি সর্বপ্রাণিভ্যঃ ।।
সরঃ প্রসন্নং নির্দোষং প্রশান্তং সর্বতোঽভয়ম্।
ইতয়ো যত্র সাম্যন্তি ভয়ানি চলিতানি চ।
তদ্বৈ দেবা নমস্যন্তি সর্বসিদ্ধাশ্চ যোগিনঃ
এতেন সত্যবাক্যেন স্বস্ত্যানন্দায় ভিক্ষবে ।।

চণ্ডালমন্ত্র প্রতিহত হইলে আনন্দ জেতবন বিহারের দিকে চলিতে লাগিলেন। প্রকৃতি আনন্দকে যাইতে দেখিয়া মাকে বলিল, মা, শ্রমণ আনন্দ চলিয়া যাইতেছেন! বা বলিলেন, পুত্রি, নিশ্চয় শ্রমণ গোতম উঁহাকে স্মরণ করিতেছেন, তাই আমার মন্ত্র প্রতিহত হইয়াছে।

আনন্দ ভগবৎ-সমীপে উপনীত হইয়া মস্তকে পাদবন্দনা করিয়া একান্তে বসিলেন। গোতম তাঁহাকে ষড়ক্ষরী বিদ্যা প্রদান করিয়া উহা ধারণ করিতে উপদেশ দিলেন।

এদিকে প্রকৃতি পরদিন প্রভাতে স্নান করিয়া শুদ্ধকাপড় পরিয়া মুক্তামালার আভরণে সাজিয়া শ্রাবস্তী নগরীর কপাটদ্বারে আয়ুষ্মান্ আনন্দের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আনন্দ প্রকৃতিকে দেখিয়াই বিমনা হইয়া সত্বর নগর হইতে জেতবনে চলিয়া গেলেন। বুদ্ধের চরণ বন্দনা করিয়া বলিলেন,

'ইয়ং মে ভগবান্ প্রকৃতির্মাতঙ্গারিকা পৃষ্ঠতঃ পৃষ্ঠতঃ সমনুবন্ধা গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি তিষ্ঠন্তমনুতিষ্ঠতি। তদ্ যদেব কুলং পিণ্ডায় প্রবিশামি তস্য তস্যৈবদ্বারে তুষ্ণীভূতা তিষ্ঠতি। ত্রাহি মে ভগবন্ ত্রাহি মে সুগত।' ভগবান তখন প্রকৃতিকে ডাকাইয়া বলিলেন, আনন্দে তোমার প্রয়োজন কি? প্রকৃতি উত্তর করিল, 'স্বামিনং ভদন্ত আনন্দমিচ্ছামি।' ভগবান বলিলেন, মা-বাবার অনুমতি লইয়াছ? প্রকৃতি বলিল, হাঁ ভগবন্। ভগবান বলিলেন, সত্যই তুমি আনন্দের প্রত্যাশী? প্রকৃতি বলিলেন, ভগবন্ সুগত—আমি সত্যই আনন্দের প্রত্যাশী। 'তাহা হইলে আনন্দ যে বেশ ধারণ করিয়াছে, সেই বেশ ধারণ করিতে হইবে।' 'হে ভগবন্, হে সুগত তাহাই করিব। আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।' ভগবান বলিলেন, 'এহি ত্বং ভিক্ষুণি চর ব্রহ্মচর্যম্'।

ভগবান কেশমুণ্ডন করাইযা প্রকৃতিকে কাষায় পরাইলেন এবং শীলধর্ম উপদেশ করিলেন। প্রকৃতি মুদিতচিত্তা হইলে ভগবান তাহাকে চতুরার্যসত্য উপদেশ দিলেন।

অবদান সাহিত্য বিপুলকায়। গ্রন্থের সংখ্যাও অনেক। উহাদের সাহিত্যিক আবেদন প্রধানতঃ গল্পের দিক হইতে। রবীন্দ্রনাথ 'দিব্যাবদানমালা'[১] হইতে গ্রহণ করিয়াছেন 'সামান্যক্ষতি' কবিতার কাহিনী। কাহিনীটি একটি জাতক-কাহিনীর অতীতবস্তু: রাজা উদয়নের প্রধান মহিষী শ্যামাবতী পাঁচশত সহচরীসহ অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে উদয়নের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বুদ্ধ এই কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন: পূর্বজন্মে এই শ্যামাবতী ছিলেন কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের অগ্রমহিষী। তিনি পাঁচশত সহচরী লইয়া একবার বন-বিহারে গিয়া স্নানান্তে শীতবোধ করায় একটি তাপসের কুটীরে আগুন ধরাইয়া শীত নিবারণ করেন। তাপস কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করেন। তিনি ক্রুদ্ধ না হইয়া বরং রাণীদের প্রতি আশীর্বাণী

১. রাজেন্দ্রলাল মিত্র-উল্লেখিত ও পরিচায়িত Sans. Buddhist Lit. of Nepal.

উচ্চারণ করেন। রাণীরা প্রার্থনা করেন, পাপের শাস্তিভোগের পরে তাঁহারা যেন জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। পূর্বজন্মের সেই রাণীই এই অগ্নিদগ্ধা শ্যামাবতী।

রবীন্দ্রনাথ 'নগরলক্ষ্মী' কবিতার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন 'কল্পদ্রুমাবদানের' ষোড়শ অবদান সুপ্রিয়া-কাহিনী হইতে। সুপ্রিয়া ছিলেন গৃহপতি অনাথপিণ্ডদের কন্যা। সাতবছর বয়সেই তিনি মহাপ্রজাপতি গোতমী কর্তৃক দীক্ষিতা হইয়া ভিক্ষুণী হন। একবার ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে বুদ্ধদেব তাঁহার অনুচরদিগকে সুপ্রিয়ার শরণ গ্রহণ করিতে নির্দেশ দেন। সুপ্রিয়া দরিদ্র গৃহস্থদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনগণকে রক্ষা করেন।

(ii) মহাযান বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ

সংস্কৃতে বৌদ্ধ গ্রন্থাদি রচনা করার কীর্তি প্রধানতঃ মহাযান-পন্থী বৌদ্ধদের। হীনযান শাখার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া যাহাদের নামে বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে (যেমন মহাবস্তু, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত এবং অবদান সাহিত্য) তাহাতেও মহাযান মতের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। বৌদ্ধসংঘে কালক্রমে বহু ব্রাহ্মণ প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, মহাযান তাঁহাদেরই সৃষ্টি। বৌদ্ধধর্মের ব্রাহ্মণ্যরূপটিই 'মহাযান'; ইহার শাস্ত্র ও তত্ত্বে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও তত্ত্বের প্রভাব। মহাযান বহুল পরিমাণে পুরাণ ও হিন্দুদর্শনের তত্ত্ব আত্মসাৎ করিয়াছে। উহাদের গ্রন্থাদিও রচিত হইয়াছে ব্রাহ্মণ্য ভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃতে। যে সুগত বুদ্ধে আদৌ দেখা গিয়াছে 'সম্যক সম্বুদ্ধ' আদর্শ মানুষের ভাব, আচার আচরণ—তিনি মহাযানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন স্বয়ম্ভূ ভগবান রূপে, তাঁহার অত্যাশ্চর্য অলৌকিক শক্তি। এই মহান্ দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া বৌদ্ধধর্মে দেব-বাদ, ভক্তিবাদ ও দেবার্চনপদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে, নির্বাণের আদর্শ প্রায় বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্বে পর্যবসিত হইয়াছে। শুধু তাই নয়, মহাযান শাখাতেই যোগাচার, তন্ত্রাচার ও অসংখ্য দেবদেবীর পূজা প্রবর্তিত হইয়াছে। 'বৌদ্ধতন্ত্রে'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তাহার আভাস দিয়াছি। এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ যে সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে মহাযানমত প্রথমতঃ স্পষ্টরূপে পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

ললিতবিস্তর

'ললিতবিস্তর।'[১] গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত বৌদ্ধ সংস্কৃতে গ্রথিত বুদ্ধ-জীবনী। ইহা ২৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত, শেষ অধ্যায় গ্রন্থ-প্রশস্তি। ইহাকে বলা হইয়াছে 'ললিত বিস্তরো নাম মহাপুরাণম্'। বস্তুতঃ পুরাণে যেমন পাওয়া যায় অতিকথন, অতি আশ্চর্য অলৌকিক ঘটনানিচয়ের সমাবেশ—ললিতবিস্তরও তেমনই ভগবান বুদ্ধের

১. S. Lefman সম্পাদিত।

অতিলৌকিক জীবনকাহিনী। বুদ্ধের জন্ম হইতে ধর্মচক্র প্রবর্তন পর্যন্ত জীবনী ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। বুদ্ধ-জীবনের মূল ঘটনাগুলি পালিসাহিত্যে বিবৃত ঘটনাবলী হইতে স্বতন্ত্র নয়; বরং স্থানে স্থানে উহা পালি নিদানকথার বা বিনয় পিটকান্তর্গত মহাবর্গের সংস্কৃত প্রতিধ্বনি। কিন্তু ইহার স্বাতন্ত্র্য অন্যান্য মহাযান গ্রন্থাবলীর ন্যায় অমিতপ্রভ বুদ্ধের ভগবত্তা প্রতিষ্ঠায় এবং অলৌকিক শক্তির বর্ণনায়ঃ 'দসদিগনন্তা পর্যন্ত' বিস্তৃত তাঁহার মহিমা, তিনি সর্ববুদ্ধ, অসংখ্য বোধিসত্ত্ব, সংখ্যাহীন দেবতা, প্রত্যেকবুদ্ধ ও আর্যশ্রাবক পরিবৃত—তাঁহার দেহজ্যোতিতে উদ্ভাসিত অনন্ত লোক। গ্রন্থখানির সূচনা বুদ্ধ-নমস্কারের পর 'এবং ময়া শ্রুতমেকস্মিন্ সময়ে ভগবান্ শ্রাবস্ত্যাং বিহরতি স্ম' বাক্য লইয়া এবং ইহার সমাপ্তি বাক্য 'শ্রীললিত বিস্তরো নাম মহাযানসূত্রং রত্নরাজং পরিসমাপ্তম্'। ললিতবিস্তর মহাযান শাখার গ্রন্থ হইলেও ইহাতে হীনযান মতেরও অসংখ্য প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়। পালি সাহিত্যে যেমন বলা হইয়াছে, ভগবান বুদ্ধের ধর্ম 'গম্ভীরা দুদ্দসা দুরনুবোধা' [দীঘনিকায়], ললিতবিস্তরেও তাহারই প্রতিধ্বনি 'গম্ভীরং দুর্দর্শং সুক্ষ্মং ধর্মচক্রং প্রবর্তিতং, [২৬ অধ্যায়]। তথাপি ললিতবিস্তরে মহাযান মতেরই প্রাধান্য। ইহা প্রধানতঃ পুরাণের আদর্শে রচিত। হিন্দু পুরাণের স্তুতির অনুরূপ বুদ্ধ-স্তুতিগুলি লক্ষণীয়। যেমন মার-বিজয় প্রসঙ্গে বোধিবৃক্ষ-দেবতাগণের এই স্তুতি ঃ

উপশোভসে ত্বং বিশুদ্ধসত্ত্ব চন্দ্রইব শুক্লপক্ষে।
অভিবিরোচসে ত্বং বিশুদ্ধসত্ত্ব সূর্যইব প্রোদয়মানঃ ।।
প্রফুল্লিত স্ত্বং বিশুদ্ধ সত্ত্ব পদ্মমিব বারিমধ্যে।
নদসি ত্বং বিশুদ্ধ সত্ত্ব বনরাজাবনুচারী ।। [২১ অঃ—মারধর্ষণ পরিবর্ত]

অলৌকিক আতিশয্য উক্তিগুলি বাদ দিলে ললিতবিস্তরে কবিত্বের অংশও অল্প নয়। মনে হয়, ললিতবিস্তরে যে সুপ্রাচীন কবিত্বময় গাথা ও কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে, সেই জাতীয় গাথা ও কাহিনীগুলিকে ভিত্তি করিয়াই অশ্বঘোষ প্রমুখ কবি 'বুদ্ধচরিত' মহাকাব্য রচনার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন।[১]

সদ্ধর্মপুণ্ডরীক

মহাযান শাখার বহুবিখ্যাত গ্রন্থ 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক'।[২] ইহা মহাযান সূত্র সমূহের 'শিরোমণি'। ইহা ললিতবিস্তরের মত বুদ্ধদেবের জীবনী নয়, ইহা বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, ও বৌদ্ধধর্মাদর্শের মাহাত্ম্য-কাহিনী। প্রধান বক্তা স্বয়ং তথাগত শাক্যমুনি এবং শ্রোতা

---

১. বাংলাদেশে ললিতবিস্তরের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। অক্ষয়কুমার দত্ত, রামদাস সেন প্রমুখ পণ্ডিতগণ যে বুদ্ধজীবনের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ উদ্ধৃতি ললিতবিস্তর হইতে গৃহীত।

২. Sacred Books of the East. vol. XXI.

শ্রাবক, অগ্রশ্রাবক, ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, নাগ, কিন্নর, দেবতা। তথাগতের অবস্থান-স্থান রাজগৃহের গৃধ্রকূট। এইখান হইতেই এক একজন জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে তিনি জলদগম্ভীর স্বরে বচনামৃত বর্ষণ করিয়াছেন। এইদিক হইতে গ্রন্থখানির সংলাপময় নাটকীয় ভঙ্গি যে-কোন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সদ্ধর্ম পুণ্ডরীকের তথাগত শাক্যমুনি দেবাদিদেবের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত, তিনি কোন ব্যক্তি নহেন, একটি আদর্শের প্রতীক। তাঁহার অনন্ত বিভূতি, অনন্ত শক্তি; তিনি যুগ যুগ ধরিয়া আছেন, থাকেন ও থাকিবেন। মূর্খেরাই মনে করে, তিনি নির্বাণ লাভ করেন, বস্তুতঃ তিনি চির অনির্বাণ; উপায়-কৌশল্য দেশনার জন্য অসংখ্য কোটি তথাগত, অর্হৎ ও সম্যক সম্বুদ্ধদিগকে তিনিই নির্মাণ করিয়া থাকেন ['তেষাং চ তথাগতানাম্ অর্হতাং সম্যক সম্বুদ্ধানাং পরিনির্বাণায় ময়েব তানি কুলপুত্র উপায় কৌশল্য ধর্মদেশনায় নির্হারনির্মিতানি'—স. পু. XV]। মহাযানমতে বোধিসত্ত্বের ভূমিকাও মহনীয়। সদ্ধর্মপুণ্ডরীকে এই বোধিসত্ত্বগণের মহিমময় চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর [স. পু. XXIV]ঃ তিনি 'কৃপাসম্ভূত মৈত্রগর্জিতা', তিনি 'শুভগুণ মৈত্রমনা মহাঘনা'।

মহাযান গ্রন্থগুলির ভিতর 'লঙ্কাবতার', 'প্রজ্ঞাপারমিতা', 'সুখাবতীব্যূহ', 'জাতকমালা' প্রভৃতি গ্রন্থও বহু বিখ্যাত। নাগার্জুন, অসঙ্গ, বসুবন্ধুর গ্রন্থাবলীর আলোচনা বৌদ্ধতন্ত্র (প্রাচীন ভা. সা. ও বাঙালীর উত্তরাধিকার ১ম খণ্ড) প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

॥ বাংলাদেশ ও বৌদ্ধধর্ম ॥

মহামতি বুদ্ধদেব বৃহৎবঙ্গের প্রান্তসীমায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম প্রচারের কেন্দ্রগুলির ভিতর মগধও ছিল বিশিষ্ট কেন্দ্র। সেই সূত্রে গৌড়বঙ্গে প্রাচীন বৌদ্ধ মতের প্রভাব নিশ্চয়ই ছিল। সম্রাট অশোকের চেষ্টায় থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ সমগ্র ভারতেই বিস্তৃত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েনসাঙের বিবরণ হইতে জানা যায়, তখনও তাম্রলিপ্ত, পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট ও কর্ণসুবর্ণে বিপুলসংখ্যক থের বৌদ্ধ ছিলেন। এই বৌদ্ধগণ কোথায় গেলেন? বাংলাদেশের ধর্ম-কর্ম ও সাহিত্যচিন্তায় প্রাচীন বৌদ্ধমতের অতি অল্প চিহ্নই বর্তমান।

হীনযান বৌদ্ধধর্ম বহুকাল পূর্বেই কেন্দ্রচ্যুত হইয়া দক্ষিণে দ্বীপময় ভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে অমেয় প্রভাবে বিদ্যমান ছিল মহাযান মত। তথাপি প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের সুউচ্চ নীতি, শীলাচার, অহিংসা ও ক্ষান্তির আদর্শ লুপ্ত হইয়া যায় নাই। যজ্ঞবিরোধী হইলেও ভগবান বুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য ধর্মেও অবতারের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যসংস্কারের সূত্রেই বুদ্ধদেব ও প্রাচীন বৌদ্ধমতের কিছু কিছু উল্লেখ বাংলাদেশেও পাওয়া যায়।

দ্বাদশ শতকে জয়দেবের বুদ্ধবন্দনা[১] এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। অহিংসার মূর্ত প্রতীক করুণাকান্ত বুদ্ধ এদেশবাসীর অন্তরে যে কতখানি শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত জয়দেবের এই প্রশস্তি তাহার স্মারক।

প্রাচীন বৌদ্ধমতের কিছু কিছু চিহ্ন এদেশের ধর্মে ও সাহিত্যেও রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন ডাক ও খনার বচনগুলির ভিতর প্রাচীন বৌদ্ধমতের ছায়া আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'এই সকল বচন রচনার সময় বৌদ্ধ প্রভাব বঙ্গদেশ হইতে উৎপাটিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে পুষ্করিণী-খনন, বর্ত্ম-নির্মাণ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি সাধারণের উপকারজনক ধর্ম যে অবশ্য পালনীয়, তাহা অনেকবার নির্ধারিত হইয়াছে ঃ

ধর্ম করিতে যবে জানি।
পোখরি দিয়া রাখিব পানী ॥
গাছ রুইলে বড় কর্ম।
মণ্ডপ দিলে বড় ধর্ম ॥

আচার্য সেন ধর্মঠাকুরের ভিতরেও বৌদ্ধধর্মের চিহ্ন দেখিয়াছেন ঃ 'রামাই পণ্ডিতকৃত ধর্মপূজাপদ্ধতি পাওয়া গিয়াছে, ইহা শূন্যপুরাণ নামে পরিচিত। তন্মধ্যে অনেক কথায়ই বৌদ্ধধর্মের পরিষ্কার আভাষ আছে, যথা, 'ধর্মরাজ যজ্ঞ নিন্দাকরে' ('নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহশ্রুতিজাতম্'), 'শ্রীধর্মদেবতা সিংহলে বহুত সম্মান' ; এতদ্ব্যতীত রামাই পণ্ডিতোক্ত শূন্যবাদও বৌদ্ধধর্মেরই কথা'।[২]

ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় মনে করেন, বৈদিক যাগ-যজ্ঞ ও পশুঘাত কর্মের পরিবর্তে অহিংসার প্রভাব বুদ্ধদেব দ্বারাই বিস্তৃত হইয়াছে ; বৈষ্ণবধর্ম বহুল পরিমাণে এই অহিংসার নীতিকে আত্মসাৎ করিয়াছে ঃ 'বৌদ্ধধর্মের বিশ্বব্যাপী মৈত্রী ও প্রেম, অহিংসা ও দয়া, মানুষে মানুষে সাম্যভাব, ধর্মপালনে সকল জাতির সমান অধিকার প্রভৃতি বৌদ্ধ উদার নীতি স্বীকার করিয়া লইয়া বৈষ্ণবধর্ম বৌদ্ধধর্মের ন্যায় আপামর জনসাধারণের প্রিয় হইয়া উঠে।[৩]

কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙালীর ভাব-কল্পনায়, ধর্মে ও সাহিত্যে এ হেন বৌদ্ধপ্রভাব আবিষ্কার কিছুটা কষ্টকল্পিত। বাংলাদেশে ভগবান বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকিলেও প্রাচীন হীনযান বৌদ্ধমত বহুকাল পূর্বেই ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। বহুকাল পূর্বেই হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্ম বুদ্ধ-প্রচারিত অহিংসা, শীলাচার ও সাম্যনীতিকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিল। বাংলাদেশে প্রাচীন বৌদ্ধমতের যাহা

---

১. নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্।
কেশবধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ [গীতগোবিন্দ. ১. ১৩.]

২. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন।

৩. আমাদের পরিচয়—ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত।

কিছু স্বীকৃতি তাহা হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সূত্রেই। এদেশের ধর্মে-কর্মে বরং প্রভাব বিস্তার করিয়াছে মহাযান বৌদ্ধ মত। থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম ছিল শুষ্ক নীতিপ্রধান এবং কিয়ৎপরিমাণে সংরক্ষণশীল। তুলনায় মহাযান বৌদ্ধমত ছিল উদার ও গ্রহণশীল। বুদ্ধদেবের তিরোধানের পরে এই মহাযান মত প্রবর্তিত হয় এবং নীরস শীলাচারের পরিবর্তে দেববাদ ও ভক্তিবাদকে স্বীকার করিয়া লওয়ায় জনমানসে উহা অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। বাঙালীর স্বভাবের সহিত সাদৃশ্য থাকায় এই মহাযানী বৌদ্ধদের মধ্যস্থতায় এদেশে বৌদ্ধতান্ত্রিকতা ও বুদ্ধমূর্তির পূজা-অর্চনা হিন্দুদের ভিতর প্রচারিত হইতেও বাধা পায় নাই। ধূপদীপনৈবেদ্যাদি দ্বারা বুদ্ধের পূজা নির্বাহের জন্য ভূমিদানের পুণ্য অর্জন করার সংবাদ কতিপয় তাম্রশাসন ও ভূমিদানপত্রেও পাওয়া যায়। আরও পরে সহজপন্থী বৌদ্ধদের মাধ্যমে রহস্যময় গুহ্য যোগাচার এদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দেহ-দেবালয়ে বুদ্ধের পুরীকল্পনা, গুহ্য যোগমার্গে চরম বুদ্ধত্ব বা নির্বাণ (এই নির্বাণ ঠিক শূন্যতা নয়, এক মহানন্দময় অবস্থা) লাভের চেষ্টা সহজিয়াদের অন্যতম কীর্তি। ইহাদেরই রচনা প্রাচীনতম বাংলাভাষায় গ্রথিত চর্যাপদাবলী। বাংলার নাথপন্থ শৈবযোগীদের সঙ্গীতে, সহজিয়া বৈষ্ণব পদাবলীতে ও বাউলগানে যে যোগতত্ত্ব ও দেহতত্ত্বমূলক সাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহার মূলেও হিন্দু যোগ-তন্ত্রের সহিত বৌদ্ধ দেহ-সাধনার সংস্কার মিশ্রিত। মহাযানের মাধ্যমেই কিছু রূপান্তরিত বৌদ্ধদেবতা ও বৌদ্ধসংস্কার এদেশের লৌকিক সমাজে রক্ষিত হইয়াছে। বাংলার কতিপয় মঙ্গলদেবতার মধ্যেও বিস্তৃত হইয়াছে মন্ত্রযানীদের প্রভাব এবং বাংলার নব্য ন্যায়েও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে দিঙ্‌নাগ, ধর্মকীর্তি প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্য-প্রচারিত মহাযান বৌদ্ধ ন্যায়।

পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইয়াছেন, বঙ্গদেশের চণ্ডাল কাপালী ও হাড়ি-ডোমের ভিতর যে ধর্মপূজা প্রচলিত আছে, তাহা মহাযান বৌদ্ধধর্মেরই বিকৃতি বা রূপান্তর।[১] চৈতন্যমহাপ্রভুর সময়েও এদেশে বৌদ্ধের অস্তিত্ব ছিল; তাঁহারাও নব মতাবলম্বী অর্থাৎ মহাযানী বৌদ্ধ এবং তাঁহাদের শাস্ত্র তর্ক-প্রধান। মহাপ্রভু তাঁহাদের মত খণ্ডন করিয়াছিলেন:

তর্কপ্রধান বৌদ্ধ শাস্ত্র নবমতে।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু না পারে স্থাপিতে॥ [চৈ. চ. মধ্য. ৯]

আরও পরেও বাংলাদেশে বৌদ্ধের অস্তিত্ব ছিল। রামায়ণ-রচয়িতা রামানন্দ ঘোষ নিজেকে বুদ্ধাবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন:

রামানন্দ কহে শুন সংসারের লোক।
ঘুচাহ চিত্তের যত তাপ দুঃখ শোক॥

---

১. কিন্তু ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মনে করিন, ধর্মঠাকুর 'প্রাক্‌-আর্য আদিবাসী কোমের দেবতা' [দ্রষ্টব্য 'বাঙালীর আদি ধর্ম'—বিশ্বভারতী পত্রিকা ৬ষ্ঠ বর্ষ. ৪র্থ সংখ্যা]

শক্তিহেতু দ্বিজঅংশে হইল প্রচার।
কলিযুগে জীব লাগি বুদ্ধ অবতার ।। [আদিকাণ্ড]

কিন্তু রামানন্দের উক্তি হইতেই বুঝা যায়, বুদ্ধের এই অবতার 'কালীর ভক্ত'—

কালী কৈলা তোমা হৈতে হইবেক পথ।
একেবারে সিদ্ধ হবে জগ-মনোরথ ।।

যে পঞ্চশক্তি স্থাপনের ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারা কেহই বৌদ্ধ দেবতা নহেন, হিন্দুদেবতা—'রাধাকালী লক্ষ্মীবাণী গঙ্গা গুণবতী।' রামানন্দ হিন্দু, মুখে মন্ত্রযানী বৌদ্ধ। প্রাচীন বাংলার যাবতীয় বৌদ্ধ সংস্কার মহাযান সংস্কার।

বুদ্ধদেব নূতন ভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছেন ঊনবিংশ শতকে। বুদ্ধদেবের সর্বত্যাগী সংযত জীবন, তাঁহার উদার ধর্মনীতি এবং জাতিবর্ণনির্বিশেষে সার্বিক প্রেমের বাণী এবং সর্বোপরি অহিংসা ও কল্যাণ-মৈত্রীর আদর্শ সংস্কারমুক্ত বাঙালীর চিত্তে এক বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। এই আদর্শে প্রথম অনুপ্রাণিত হইয়াছেন তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ, বিশেষতঃ সনাতন ধর্মের আবিষ্কারক ব্রাহ্মসমাজ।

সর্বপ্রথম ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক নব্যযুগে প্রাচীন পালিসাহিত্যের দ্বার উন্মোচিত হয়। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত Burnouf-এর Introduction a-l'historie du Buddhism Indien প্রকাশিত হয়। বহুদিন পর্যন্ত এই গ্রন্থখানিই ছিল বৌদ্ধ-ধর্মালোচনার দৃষ্টি-প্রদীপ। তাঁহার পরে Oldenberg, Fousboll প্রমুখ পণ্ডিতগণ আলোচনা শুরু করেন। ইঁহাদের সরণি অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হন প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ Max Muller ঃ অতঃপর Rhys Davids বৌদ্ধ পালিসাহিত্যের মূল্যবান আলোচনা প্রকাশ করেন ঃ তাঁহার 'Buddhism' (1891) একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। Mrs. Rhys Davids-এর দানও এবিষয়ে স্মরণীয়। ইহার মধ্যে Edwin Arnold কর্তৃক 'Light of Asia' (1879) কাব্যগ্রন্থখানি রচিত হয়। ইহা বাঙালী-কবিচিত্তে অভূতপূর্ব প্রেরণা সৃষ্টি করে। Light of Asia বুদ্ধচরিতের অপূর্ব কাব্যরূপ এবং প্রাচ্য আদর্শের প্রতি পাশ্চাত্ত্য প্রতিভার শ্রদ্ধাঞ্জলি।[১] এই গ্রন্থে বুদ্ধদেবের পবিত্র জীবন, চরিত্র ও কর্মের ভিতর দিয়া আদি বৌদ্ধদর্শন এবং সর্বোপরি মানবতার পূজারী ও মানবমুক্তির সাধক সিদ্ধার্থের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। তুষিত লোক হইতে বুদ্ধদেবের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্মচক্রপ্রবর্তন পর্যন্ত ঘটনাবলী এই গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়।

---

১. বুদ্ধদেবের সম্পর্কে তাঁহার ঘোষণা ঃ

Lord Buddha—Prince Siddhartha Styled on earth—
In Earth and Heavens and Hells Incomparable,
All-honoured, Wisest, Best, most Pitiful ;
The Teacher of Nirvana and the Law.

[Light of Asia—Book the first]

সিংহলী পালিসাহিত্যগুলি প্রথম আবিষ্কৃত হওয়ায় হীনযান বৌদ্ধমতের প্রতিই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং বাঙালী শিক্ষিত মানসে মানব-প্রেমিক গৌতমবুদ্ধের চিত্রটি দৃঢ়রেখায় মুদ্রিত হয়। প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্য ও বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শ উদ্ঘাটনে বাঙালীর দানও অল্প নয়। বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধপালিসাহিত্য সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করেন রামদাস সেন। ১৮৭৪-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'ঐতিহাসিক রহস্য' -এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহাতে 'বৌদ্ধধর্ম', 'বৌদ্ধমত ও তৎসমালোচন', 'পালিভাষা ও তৎসমালোচন' প্রভৃতি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই আলোচনায় লেখক তেমন মৌলিকতা প্রদর্শন করিতে না পারিলেও বুদ্ধদেবের পূত জীবন ও তাঁহার 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' ধর্মাদর্শের প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করিয়াছেন। 'শাক্যসিংহের দিগ্বিজয়' নামক একটি কবিতায় লেখকের এই শ্রদ্ধাতর্পণটি উদ্ধৃতিযোগ্য :

জয় জয় জয়, সবে বল জয়
অহিংসা পরমধর্মের জয়।
সর্বজীবে সম দয়া অনুপম
হেন ধর্ম কভু না হবে ক্ষয়।

Light of Asia গ্রন্থখানি শিক্ষিত বাঙালী চিত্তে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। প্রথমতঃ গ্রন্থখানির কাব্যগত আবেদন, দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধ-প্রচারিত অহিংসা, সাম্যবাদ ও সংস্কারমুক্ত মানবধর্মের আকর্ষণ। প্রথমেই মনে পড়ে নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেবচরিত' (১৮৮১ ; প্রথম অভিনয় ১২৯৩) নাটকখানির কথা। এই নাটক 'লাইট অব্ এসিয়া' কাব্য অবলম্বনে রচিত এবং লেখক এডুইন আরনল্ডকেই উৎসর্গীকৃত। নাটকখানি পৌরাণিক বিশ্বাস এবং বেদান্ত দর্শনের রঙে অনুরঞ্জিত হইলেও বুদ্ধদেবের ত্যাগদীপ্ত চরিত্র-চিত্র হিসাবে ইহার আবেদন তুচ্ছ নয়। নাটকে এডুইন আরনল্ডের কাব্যের কবিত্ব ও সুউচ্চ কল্পনা নাই, গিরিশচন্দ্র কোন কোন স্থলে নূতন ঘটনাও সৃষ্টি করিয়াছেন—তথাপি নাটকে বহুক্ষেত্রে মূল কাব্যের প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে : যেমন দেববালাদের এই গান,

Light of Asia : We are the voices of the wandering wind,
Which moan for rest and rest can never find ;
Lo ! as the wind is, so is mortal life,
A moan, a sigh, a sob, a storm, a strife [Book III]

বুদ্ধদেবচরিত : জুড়াইতে চাই—কোথায় জুড়াই ?
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই !
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।...
অধীর—অধীর যেমতি সমীর,
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই। [২য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক]

গিরিশচন্দ্র বিম্বাসার রাজার নিকট বলিদান-প্রথার বিরুদ্ধে যে সিদ্ধার্থ-উক্তি যোজনা করিয়াছেন তাহাতে মূলের ধ্বনি থাকিলেও গিরিশের উক্তি যেন মৌলিক সৃষ্টি। মূল কাব্যে সিদ্ধার্থের উক্তি পরোক্ষ বাক্যে, নাটকের উক্তি অপরোক্ষ-বাক্যে। নাটকে কাব্যের পারম্পর্যও লক্ষিত ঃ

Light of Asia ঃ Then, craving leave, spake,
Of life, which all can take but none can give,
Life, which all creatures love and strive to keep,
Wonderful, dear and pleasant unto each,
Even to the meanest ;
Nor, spake he, shall one wash his spirit clean
By blood ; nor gladden gods, being good, with blood.

বুদ্ধদেব-চরিত ঃ হিংসায় কভু কি হয় ধর্ম উপার্জন ?
দেব তুষ্ট হিংসায় কি হয় ?
মহাশয়, জানিহ নিশ্চয়
হিংসার অধিক পাপ নাহিক জগতে।
প্রাণদানে নাহিক শকতি,
হে ভূপতি,
তবে কেন কর প্রাণ-নাশ ?
প্রাণের বেদনা বুঝ আপনার প্রাণে। [৪র্থ অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্ক]

প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের 'প্রতীত্যসমুৎপাদ', 'দুঃখবাদ', 'নির্বাণবাদ' প্রভৃতি তত্ত্ব বেদান্তের মায়াবাদ ও ব্রহ্মবাদের সহিত একাকার করিয়া ফেলিলেও গিরিশচন্দ্রের বুদ্ধদেবচরিত হইতে মানবপ্রেমিক বুদ্ধ নব্যবাংলায় যে কি অপরিমেয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা সম্ভব। কবি নবীনচন্দ্র সেনও এই অনুপ্রেরণায় 'অমিতাভ' (১৮৯৫) কাব্য রচনা করেন। মানবধর্মের জয়গান করার উদ্দেশ্যেই সুললিত মধুর ভাষায় কাব্যখানি রচিত। লাইট অব্ এসিয়ার অনুসরণে কবি সিদ্ধার্থ-দেবদত্ত-রাজহংসের যে আখ্যানটি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে রাজপুত্র সিদ্ধার্থের হৃদয়ে বিশ্বব্যাপী করুণার পুণ্যপ্রস্রবণ রূপ মনুষ্যধর্মের প্রথম স্ফুরণের চিত্রটি বড় মনোরম ঃ

কুমার কহিলা ধীরে, "হত জীব হত্যাকারী
পায় যদি ভাই ! কোনো ধর্ম শাস্ত্রবলে,
যে দেয় জীবন তারে সে কি তারে পাইবে না ?[১]

---

১. তুলনীয় ঃ "If life be aught, the saviour of a life
Owns more the living thing than he can own
Who sought to slay—that slayer spoils and wastes,
The cherisher sustains. [Light of Asia, Book I]

বৌদ্ধধর্মের অপৌত্তলিকতা, সংস্কারমুক্ততা, উদার মানবধর্ম ও অহিংসাদি নৈতিক আদর্শ তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের উপরেও অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ; ব্রাহ্মধর্মের আদি জনক রাজা রামমোহন রায় 'ত্রিপিটক' অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎপ্রচারিত সনাতন ধর্ম ও সংস্কারমুক্তির আদর্শে প্রাচীন বৌদ্ধমতের প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রকাশিত হয় ; ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হন অক্ষয়কুমার দত্ত। ইনি 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' ২য় খণ্ডে 'বুদ্ধাবতার' প্রবন্ধে বুদ্ধের জীবন, বৌদ্ধসাহিত্য ও বৌদ্ধধর্মের পরিচয় প্রদান করেন। বৌদ্ধধর্মের স্বরূপ ও বিকৃত রূপ এবং উহার প্রভাব সম্পর্কে বিচার অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি বুদ্ধদেবের মধ্যে দেখিয়াছেন 'অসাধারণ মানসিক বীর্য' এবং বৌদ্ধধর্মের আদর্শে লক্ষ্য করিয়াছেন বিষমধর্মবিপ্লবের 'প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরাশি'। আচার্য কেশবচন্দ্রের অনুবর্তী অঘোরনাথ গুপ্ত তিন খণ্ডে 'শাক্যমুনিচরিত' রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বৌদ্ধধর্ম' বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাও স্মরণীয়। তিনি 'আর্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সংঘাত' বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের আদর্শ ও অন্তর্নিহিত শক্তির কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, 'অভ্যুদয় কামনা করিয়া যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তি সাধন করা যে নিতান্তই বৃথা কার্য, আর আত্মপ্রভাবে ইন্দ্রিয় মন দমন করিয়া এবং চরিত্র সংশোধন করিয়া দয়াধর্ম অনুষ্ঠান করা যে শ্রেয়ঃ পথের একমাত্র দ্বার—এই কথাটির প্রতি বুদ্ধদেব জনসাধারণের চক্ষু ফুটাইয়া দিলেন। আপামর সাধারণ লোকের প্রতি বুদ্ধদেবের প্রধান উপদেশ ছিল এই যে, 'ঠিক মত ভাবনা করিতে শেখ', 'ঠিক কথা বলিতে শেখ'. 'ঠিক পথে চলিতে শেখ।' তিনি আরও বলিয়াছেন, 'প্রকৃত কথা এই যে, বুদ্ধদেব পৃথিবীর মধ্যে একজন সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ধর্মবীর, এমন কি তাঁহার মতো উচ্চাশয় ধর্মবীর পৃথিবী মধ্যে আজ পর্যন্ত জন্মিয়াছেন কিনা সন্দেহ'...বিশুদ্ধ ব্যবহারধর্মের প্রতি—অহিংসা, দয়া, সত্যপরায়ণতা, অব্যভিচারিতা, সদাচার এবং শুদ্ধাচারের প্রতি আপামর সাধারণ সকল শ্রেণীর লোকদিগের চক্ষু ফুটাইয়া দেওয়া কম কথা নহে।'

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই সকল উক্তি হইতে বুদ্ধদেব নব্যমানসকে ও নবযুগের সাধনাকে কোন কোন দিক হইতে স্পর্শ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। নবযুগের আদর্শও ছিল 'ঠিক মত ভাবনা করিতে শেখা' এবং সর্বোপরি মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ অহিংসা দয়া ও সত্যপরায়ণতার অনুশীলনদ্বারা মানবতার ভিত্তি সুদৃঢ় করা। দেবারাধনা হইতেও ইহা অনেক বড়। ব্রাহ্মসমাজের মর্মকেন্দ্রে ছিল মনুষ্যধর্মের এই সকল সুউচ্চ আদর্শ। প্রতীকোপাসনা ও কুসংস্কারের আবর্জনা অপসারিত করিয়া ধর্মবিপ্লব দ্বারা সনাতন ধর্মাদর্শে দেশকে অনুপ্রাণিত করার সঁহিত বুদ্ধদেবের ধর্মবিপ্লবের সাদৃশ্য ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপনিষদের বাছা বাছা শ্লোক চয়ন করাইয়া যে 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ সংকলন করাইয়াছিলেন, তাহার একভাগে ছিল

জীবনের ব্যবহারধর্মের কথা ও সুউচ্চ নৈতিক আদর্শ দয়া-ধর্মের কথা। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই ব্রাহ্মধর্মের বাংলা পদ্যানুবাদ করেন। এই পদ্যানুবাদের ২য় খণ্ড ৮ম অধ্যায়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ধম্মপদের 'কোধবর্গে'র অন্তর্ভুক্ত 'অক্কোধেন জিনে কোধং' পদটির অনুবাদ সন্নিবিষ্ট করেন,

অক্রোধে জিতিবে ক্রোধ, অসাধুতা সাধুত্বের গুণে।
অসত্য জিতিবে সত্যে, কদর্যে শোভন সদ্‌গুণে ॥

ধম্মপদের সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ (১৯০৪) প্রকাশ করেন চারুচন্দ্র বসু। ইহাই ধম্মপদের প্রথম বঙ্গানুবাদ। ধম্মপদে নিবদ্ধ শাশ্বত মানবধর্মের সার্বিক আদর্শ প্রচার করাই এই অনুবাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। প্রাচীন বৌদ্ধ আদর্শের প্রতি এই অনুরাগেই পরবর্তী কালে বিজয়চন্দ্র মজুমদার 'থেরীগাথা' মূলসহ অনুবাদ করেন ; মহীয়সী বৌদ্ধমহিলাদের (স্থবিরাদের) আদর্শ উদ্ঘাটন করা ছিল উহার লক্ষ্য। পণ্ডিত ঈশান চন্দ্র ঘোষ সম্পূর্ণ জাতকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। এই সকল রচনা হইতে বৌদ্ধ যুগ ও বৌদ্ধধর্মের মূল নীতির সহিত বাঙালীর ভাবসাযুজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নব্যবাংলার চিন্তায় ও কর্মে, ব্যবহারিক ধর্মে এবং সাম্য, সৌভ্রাত্র ও মৈত্রীভাবনায় থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অল্প নয়।

এই তো গেল নব্য বাংলায় হীনযান বৌদ্ধমত বিচারের একদিক। এই ধর্মের অপরদিক উত্তরাপথের মহাযান বৌদ্ধ মত। দক্ষিণাপথের বৌদ্ধ সাহিত্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাপথের মহাযান সাহিত্যের ঐশ্বর্য ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু উত্তরাপথে নেপালে, তিব্বতে, চীনে ও জাপানে যে বিপুলকায় বৌদ্ধ সাহিত্য প্রচলিত ছিল, তাহার অতি স্বল্প উপাদান সংগৃহীত হওয়ায় সেই সকল উপাদানের উপর ভিত্তি করিয়া যে-সকল আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা অভ্রান্ত ছিল না। উত্তরাপথের বৌদ্ধ সাহিত্য আবিষ্কার ও তাহাদের যথাযথ মূল্য নিরূপণে বাঙালী বিবুধবর্গের দাম অসামান্য। যদিও এই সকল আলোচনার অধিকাংশই ইংরাজীতে নিবদ্ধ, তথাপি ইহার ভিতর দিয়া বাঙালীর অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয় অতি স্পষ্ট।

উত্তরাপথের বৌদ্ধ গ্রন্থ পরিচায়নে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম। পুরাতত্ত্ব গবেষণায় তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যম বিস্ময়ের বিষয়। তিনি বহু ভাষাবিৎ পণ্ডিত ও গবেষক। উত্তরাপথের বৌদ্ধ গ্রন্থ বিষয়ে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' ; এই গ্রন্থে তিনি ৮৫ খানি নেপালী বৌদ্ধ সংস্কৃত রচনার পরিচয় দিয়াছেন। এই পরিচায়িত গ্রন্থগুলির ভিতর —অশোকাবদান, অবদানশতক, বোধিসত্ত্বাবদান, বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা, বুদ্ধচরিত, দিব্যাবদানমালা, মহাবস্ত্বদান, শার্দুলকর্ণাবদান প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়াই বৌদ্ধ গল্পসাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন।

উচ্চাবচ পর্বতবেষ্টিত দুর্গম তিব্বতের অরণ্য-পর্বত-বিহার ভ্রমণ করিয়া যিনি মহাযান বৌদ্ধ গ্রন্থ ও ধর্মাদর্শের সহিত এদেশবাসীকে পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন

তিনি বাঙালীর অপর গৌরব শরৎচন্দ্র দাস। দার্জিলিং টিবেটান বোর্ডিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে কাজ করিতে করিতে তিনি তিব্বতী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং 'made that pleasurable yet reckless plunge into the unknown regions beyond the snowy Himalayas.'[১] শরৎচন্দ্র দাসের উদ্যোগে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় Buddhist Text Society প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি Journal and Text of the Bubdhist Text Society of India-র সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই পত্রিকায় উত্তরাপথের মহাযান বৌদ্ধ সাহিত্যের বহু মূল্যবান গ্রন্থের পরিচয় ও তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে। সম্পাদক নিজেও সিকিম-তিব্বতে প্রচলিত বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার অনেক গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন।

উত্তরাপথের মহাযান বৌদ্ধ গ্রন্থের লুপ্ত রত্নোদ্ধারে পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দান স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইবার যোগ্য। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির কর্মাধ্যক্ষ রূপে তিনি নেপাল ভ্রমণ করিয়া বহু মূল্যবান পুঁথি ও তথ্য আবিষ্কার করেন। যদিও সামগ্রিক ভাবে ভারতীয় ঐতিহ্যের পুরাতত্ত্ববিদ্ রূপেই তাঁহার খ্যাতি, তথাপি তাঁহার সমধিক আগ্রহ ও লক্ষ্য ছিল নেপাল-তিব্বতের মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি। তাঁহার এই অনুসন্ধিৎসার ফলেই বহু তন্ত্রগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। শুধু তাই নয়, মহাযান বৌদ্ধধর্মের সুউচ্চ আদর্শ ও লক্ষ্যের কথাও তিনিই বঙ্গীয় সমাজে প্রচার করিয়া এই ধর্ম সম্পর্কে এদেশের ঔৎসুক্য জাগ্রত করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের অন্যতম কীর্তি নেপাল হইতে 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'র আবিষ্কার। ইহা বাংলা ভাষা-সাহিত্যের নূতন দুয়ার খুলিয়া দিয়াছে। সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের চিত্র হিসাবে তাঁহার 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসখানিও অতি সুন্দর।

এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রীমহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নামও উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ তন্ত্র 'Sadhan Mala' গ্রন্থের সম্পাদনা তাঁহার অমর কীর্তি। বাংলাভাষার রচিত তাঁহার 'বৌদ্ধদের দেবদেবী' গ্রন্থখানিও মহামূল্য সম্পদ।

নব্যযুগে মহাযান বৌদ্ধমত সম্পর্কে এই সকল অনুসন্ধান ও আলোচনা বাঙালীর চিন্তাজগতের একটি নূতন দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছে এবং গবেষণার রাজ্যে এক বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। এই মহাযান মতকে কেন্দ্র করিয়া বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের গুরুত্ব বিষয়ে বিস্ময়কর তথ্যাবলী অনাবৃত হইয়াছে। হীনযান পালি সাহিত্য হইতে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে যে ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছিল, প্রেম ও মৈত্রীর প্রচারক হিসাবে বুদ্ধদেব সম্পর্কে যে মত প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল—মহাযানমতের প্রকৃত মূল্যমান নিরূপিত হওয়ায় তাহা আরও দৃঢ়বদ্ধ, সুন্দর ও মহিমময় মানবকল্যাণের আদর্শরূপে বাঙালীর অন্তর-রাজ্যকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। করুণার মূর্তি গৌতমবুদ্ধ আজ মহাকারুণিক

১. Journal and Text of Buddhist Text Society of India Vol. I, Pt. III.

অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের[১] সহিত একীভূত হইয়া 'করুণাঘন' মহামানব মূর্তিতে বাঙালীর মানসলোকে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

॥ রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধধর্ম ॥

প্রাচীন সাহিত্যের ভিতর যে সাহিত্যগুলি রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বৌদ্ধসাহিত্য একটি ; প্রাচীন ভারতের যে ধর্মাদর্শগুলি রবীন্দ্রচিত্তে স্থায়ী প্রভাব মুদ্রিত করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম অন্যতম। কিন্তু বৌদ্ধ-ধর্মের যে দুইটি প্রধান বিভাগ—হীনযান ও মহাযান—উহাদের ভিতর কোন্‌টির প্রভাব রবীন্দ্রনাথে বেশি ? শৈশব হইতে তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ভক্ত ছিলেন ঃ তাঁহার 'ছবিওয়ালা' মাসিকপত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ খুশি হইতেন [জীবন-স্মৃতি] ; তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' পাঠ করিয়া উহার কতকগুলি মনোজ্ঞ কাহিনী অবলম্বনে কতিপয় সুন্দর কবিতা ও নাটক রচনা করিয়াছিলেন। আবার কতকগুলি প্রবন্ধে ও অভিভাষণে তিনি হীনযান বৌদ্ধসুত্তের, যথা মঙ্গলসুত্ত, মেত্তসুত্ত এবং ধম্মপদের শ্লোক উদ্ধার করিয়া বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[২] মনে হইতে পারে, রবীন্দ্রনাথে হীনযানের প্রভাবই গুরুতর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উক্তি দিয়াই সমর্থন করা যায়, তিনি মহাযান মতকে উপেক্ষা করেন নাই। তিনি বলেন, 'ইতিহাসের কোনো একটি বিশেষ স্থানে যাহা থামিয়া গিয়াছে তাহাকেই বৌদ্ধধর্ম বলিব—আর, যাহা মানুষের জীবনের মধ্যে নব নব কালে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, নব নব খাদ্যকে আত্মসাৎ করিয়া আপন জীবনকে পরিপুষ্ট প্রশস্ত করিয়া তুলিতেছে, তাহাকে বৌদ্ধধর্ম বলিব না—এই যদি পণ করিয়া বসি তবে কোনো জীবিত ধর্মকে ধর্ম নাম দেওয়া চলে না।' [বৌদ্ধধর্ম ও ভক্তিবাদ]। তিনি মনে করেন, 'হীনযানও পূর্ণ-বৌদ্ধধর্ম নহে মহাযানও পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম নহে'। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে তাঁহার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, বৌদ্ধধর্ম যে কি, তাহা নির্ণয় করিবার বেলায় তাহার সচলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।' এই উক্তিই প্রমাণ করে, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন হীনযান-মহাযান বিতর্কের উর্ধ্বে। বৌদ্ধধর্মের ভিতর যে শাশ্বত অমর সত্য আছে, যে সত্য সকল ধর্মেরই গম্যস্থান, তিনি ছিলেন তাহারই পূজারী। হীনযানে

---

১. 'Arya Avalokiteswar—who has vowed not to enter the blissful region till there is a single sentient being unemancipated. The conception of this charatcter is the highest that the Mahayana school is capable of. And the conception may be regarded as one of the greatest things human intellect has attaind by its exertions'—Pandit Haraprasad Sastri [Journal Buddhist Text Society. Vol II. Pt. II].

২. দ্রষ্টব্য 'ব্রহ্মবিহার' প্রবন্ধ—শান্তিনিকেতন।

আত্মশক্তির প্রাধান্য ছিল, দেববাদ বা ভক্তিবাদের স্থান ছিল না—আবার মহাযানে ছিল দেববাদ-ভক্তিবাদের তরঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন, বৌদ্ধধর্মের মর্মসত্য নিহিত আছে এই দুয়ের মিলিত রূপে। জ্ঞান ও প্রেমের সমন্বয়ে যে বৌদ্ধধর্ম, আত্মশক্তি ও ভক্তির সামঞ্জস্য বিধানে যে বৌদ্ধধর্ম পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রকাশক, রবীন্দ্রমানসে সেই বৌদ্ধধর্মেরই স্থায়ী আসন।

রবীন্দ্রনাথে বৌদ্ধধর্মাদর্শ প্রতিফলনের একটি ক্রমিক ইতিহাস আছে। ঊনবিংশ শতকের শেষ দুই দশকে বাংলাদেশে নানাদিক হইতে স্বাদেশিকতার তরঙ্গ উত্থিত হয়। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের প্রকাশ (১৮৮১), জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা (১৮৮৫), মহামতি তিলককর্তৃক শিবাজী-উৎসবের সূচনা (১৮৯৫) প্রভৃতি এই সময়ের যুগান্তকারী ঘটনা। দেশব্যাপী তখন প্রাচীন ঐতিহ্য-অবগাহনের প্রতি প্রবল অনুরাগ। রবীন্দ্র-মানসেও তখন এই অনুরাগের রঙ। প্রাচীন ভারতের গৌরবময় কাহিনীগুলির প্রতি তখন তাঁহার দৃষ্টি। শিখ, মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানের ইতিহাসে মনুষ্যত্বের প্রকাশক বীর্যদীপ্ত ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল কাহিনীগুলি রবীন্দ্রচিত্তে সুগভীর চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছিল। ঠিক ইহারই অব্যবহিত পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Sanskrit Buddhist Text of Nepal (১৮৮২)। ঐতিহ্য-অবগাহনের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের বৌদ্ধ গল্পগুলির প্রতি চৌম্বক আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন। ইহারই প্রথম ফল 'মালিনী' নাটক (১৩০২)। বৌদ্ধধর্মের মানবধর্মের আদর্শ, যাহা প্রত্যক্ষভাবে লোককল্যাণে নিয়োজিত, তাহাই মালিনী নাটকের কেন্দ্রীয় প্রেরণা। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, 'আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তখন গৌরীশঙ্করের উত্তুঙ্গ শিখরে শুভ্র নির্মল তুষারপুঞ্জের মতো নির্মল নির্বিকল্প হয়ে স্তব্ধ ছিল না। সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলমৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে' [মালিনী-সূচনা]।

'মালিনী' নাটকের উৎস রাজেন্দ্রলাল মিত্র পরিচায়িত মহাবস্ত্ববদানের (I) অন্তর্গত মালিনী-কাহিনী। মূলের কাহিনী রবীন্দ্রনাথে পরিবর্তিত হইয়াছে। প্রত্যেকবুদ্ধকে মাল্যদ্বারা ভূষিত করার সুকৃতির ফলেই যে মাল্যধারিণী 'মালিনী' নাম, রবীন্দ্রনাথ সে ইঙ্গিত দেন নাই। গল্পমধ্যে ভগবান কাশ্যপের অলৌকিক শক্তিবলে ব্রাহ্মণগণকে পরাজিত করিবার কাহিনী পরিত্যক্ত হইয়াছে। রাজমহিষীর চরিত্র সম্পূর্ণ নূতন এবং সুপ্রিয়-মালিনীর প্রেমবৃত্তটিও কল্পনার নব সংযোজন। নাটকমধ্যে মালিনী-চরিত্রে সর্বোপরি প্রকট হইয়াছে বুদ্ধের অপরিমেয় 'মৈত্রী' ভাবনার আদর্শ।

প্রাচীন ভারতীয় জীবনের ত্যাগ, ধর্মনিষ্ঠা, অহিংসা, নীতি ও বীরত্বকে উপজীব্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে 'কথা' কাব্যগ্রন্থ (১৩০৬) প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতার বিষয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত নেপালী সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত: 'শ্রেষ্ঠভিক্ষা' 'পূজারিণী' ও 'মূল্য প্রাপ্তি' কবিতা তিনটির উৎস যথাক্রমে অবদানশতকের 'বস্ত্রাবদান', 'শ্রীমতী-অবদান' ও 'পদ্মাবদান';

'পরিশোধ' ও 'মস্তকবিক্রয়' কবিতার মূল যথাক্রমে 'মহাবস্তু'র অন্তর্গত 'শ্যামাজাতক' [মহাবস্তু II] এবং 'আজ্ঞাত কৌণ্ডিণ্য জাতক' [মহাবস্তু III]; 'অভিসার'—বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতার উপগুপ্ত-অবদান, 'সামান্যক্ষতি'—দিব্যাবদানমালা ও 'নগরলক্ষ্মী'—কল্পদ্রুমাবদান হইতে গৃহীত।

কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে রবীন্দ্রনাথে ঋণ-গ্রহণের পদ্ধতি স্বতন্ত্র। বৌদ্ধ কাহিনীর যাবতীয় অলৌকিক মাহাত্ম্যকে তিনি পরিহার করিয়াছেন, বৌদ্ধজন্মান্তরবাদ ও বুদ্ধদেবের সর্বজ্ঞতার দৃষ্টান্তস্বরূপ যে জাতক কাহিনীগুলি বিবৃত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহারও গুরুত্ব দেন নাই এবং সর্বোপরি শাস্তা বুদ্ধের সৎকার-পূজারূপ কুশলকর্মের ফল স্বরূপ বৌদ্ধ কাহিনীতে যে স্বর্গলাভ ও জন্মান্তরে সুগতি লাভের পরিণাম প্রদর্শিত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহাকেও পরিত্যাগ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে কাহিনীগুলির কাব্যগত সৌন্দর্যে এবং বুদ্ধভক্তদের সত্যাগ্রহ, ধর্মনিষ্ঠা ও ত্যাগের আদর্শে।

'ছন্দক-ভিক্ষা' প্রদানে এক দরিদ্র বৃদ্ধার নিষ্ঠা রূপায়িত হইয়াছে 'শ্রেষ্ঠভিক্ষা' কবিতায়। সুকৃতির স্বর্গফল নয়, ত্যাগের মহিমাই এই কবিতার বিষয়। 'পূজারিণী' কবিতায় মূল অবদানোক্ত কুশল-কৃতির প্রভাবে শ্রীমতীর দিব্য প্রভাযুক্ত অনুপম দেহশ্রীর অধিকারিণী হইয়া ('গাত্রশ্রীরতুলা') দেবলোকে উৎপন্ন হওয়ার কোন কথাই স্থান লাভ করে নাই; রবীন্দ্রনাথ এখানে দেখাইয়াছেন, সত্যাগ্রহে অনমনীয় নিষ্ঠার শক্তি এবং অনুভূত সত্য রক্ষার জন্য যে-কোন দুঃখবরণের তেজ। মূল অবদানে অজাতশত্রুর দীপধূপপুষ্পে বুদ্ধস্তূপপূজার নিষেধাজ্ঞার ফলে অন্তঃপুরিকাগণের করুণ-ক্রন্দনের চিত্রটিই মাত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেখানে রাজমাতা, রাজবালা ও রাজবধূর ভিতর দেখাইয়াছেন দুর্বলের দ্বিধাচিত্ততা ও ভীতির রূপ। তাঁহাদের বুদ্ধভক্তির মূল অন্তরের গভীর মূলে প্রতিষ্ঠিত নয়। তুলনায় সামান্যা দাসী হইলেও শ্রীমতীর ধর্মনিষ্ঠা হৃদয়ের গভীরে সম্প্রসারিত। দুর্বল চিরকাল দ্বিধাগ্রস্ত, সত্য চির অকুতোভয়—ইহাই পূজারিণী কবিতার মূল বক্তব্য। 'মূল্যপ্রাপ্তি' কবিতার মধ্যেও মূল অবদানোক্ত অলৌকিক ঘটনার (বুদ্ধের উদ্দেশ্যে পদ্মটি নিক্ষেপ করিলে সেই পদ্ম শকটচক্র প্রমাণ হইয়া ভগবান বুদ্ধের মস্তকোপরি বিরাজ করিতে লাগিল) পরিত্যক্ত হইয়াছে; এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে সামান্য একজন আরামিকের নির্লোভ নিঃস্বার্থ ভক্তির উদ্যম। এই কবিতায় আরামিকের 'সুদাস' নামকরণটিও রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব।

বৌদ্ধ জাতককাহিনীগুলির অন্যতম বিশিষ্টতা হইল অতীত বস্তুর আলোকে প্রত্যুৎপন্ন বস্তুর 'বেক্সজকরণ' (ব্যাখ্যা)। 'মহাবস্তু' গ্রন্থে এই ধরনের বহু জাতক কাহিনী আছে। উহা দ্বারা বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা এবং জন্মান্তরের সুকৃতি বা দুষ্কৃতির পরিণাম প্রদর্শিত হইয়াছে। মহাবস্তুর শ্যামাজাতক ও আজ্ঞাত কৌণ্ডিণ্য জাতক এই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করিয়াছে। ভিক্ষুগণ বুদ্ধদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তিনি যশোধারাকে উপেক্ষা করিয়া প্রব্রজ্যা নিলেন কেন? বুদ্ধদেব তাহার উত্তরে

বলিয়াছিলেন, পূর্বজন্মেও তিনি এইভাবে তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্যামাজাতকের বিবৃতি ; পূর্বজন্মের অশ্ববণিক বজ্রসেন স্বয়ংবুদ্ধ এবং অগ্রগণিকা শ্যামা যশোধারা। কিন্তু 'শ্যামা জাতক' অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ যে 'পরিশোধ' কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে অতীত-বর্তমানের কোন সম্পর্কই নাই। অতীতবস্তুটিকে মাত্র অবলম্বন করিয়া তিনি উদ্দাম প্রেমের বিভীষিকা ও অনুরাগ-বিরাগের সুতীব্র এক দ্বন্দ্বকে রূপায়িত করিয়াছেন। 'পরিশোধ' কবিতা প্রেম-মনস্তত্ত্বের এক অপূর্ব আলেখ্য। প্রেমের ভিতর একটা উদ্দাম উগ্রতা আছে, তাহা অনেক সময় নির্মম জঘন্য পাপের আশ্রয়েও অভীষ্ট লাভ করিতে উদ্যত হয়। রূপমুগ্ধ শ্যামা বজ্রসেনকে লাভ করিবার জন্য পাপমূল্যে সেই প্রেম ক্রয় করিয়াছে অর্থাৎ উত্তীয়কে বধ্যরূপে প্রেরণ করিয়া বধ্য বন্দী বজ্রসেনকে মুক্ত করিয়াছে [মূল জাতকে 'উত্তীয়' নামটি নাই, ক্রীত শ্রেষ্ঠি-পুত্র শ্রেষ্ঠি-পুত্র নামেই অভিহিত হইয়াছে]। কিন্তু বজ্রসেন এই পাপকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই, তিনি শ্যামাকে মরণ-আঘাত হানিয়া এই পাপ-ক্রীত উন্মত্ত প্রেমের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু প্রেম যত উদ্দামই হউক, তাহার আকর্ষণ অল্প নয় ; উদ্দামতার অন্তরালে নিবিড়তাকে কে উপেক্ষা করিতে পারে ? তাই বজ্রসেন আবার শ্যামার প্রেমের জন্য অধীর হইয়াছেন, শ্যামার স্মৃতি বুকে ধরিয়া তাহাকে আহবান করিয়াছেন 'এসো এসো প্রিয়া'। কিন্তু সেই শ্যামাই যখন আবার মূর্তি ধরিয়া আসিয়াছে, তখন বজ্রস্বরে তাহাকে দূরে সরাইয়া দিয়াছেন। প্রেমের স্থূলতা অপেক্ষা অতিন্দ্রীয় রহস্যময়তাকেই রবীন্দ্রনাথ এই প্রেমের বৃত্তে শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইয়াছেন। মূল জাতকের বজ্রসেন অপেক্ষা 'পরিশোধে'র বজ্রসেন অধিক মনোরম। মূলের বজ্রসেন প্রাণভয়ে ভীত হইয়াই শ্যামার হস্ত হইতে মুক্তি চাহিয়াছেন এবং জলক্রীড়াছলে তাহাকে সোপানতলে মূর্ছিত করিয়া পলায়ন করিয়াছেন এবং যাহারা রাগাসক্ত তাহারা প্রতিশোধ কামনায় অধীর হয়, এই ভয়ে শ্যামা হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পরিশোধের বজ্রসেন পাপকে ঘৃণা করিয়াছেন, পাপীর প্রেমটুকুর সৌরভ হৃদয় ভরিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মূলের অগ্রগণিকা শ্যামা রাগাসক্ত ও ছলনাময়ী ; পরিশোধের শ্যামা উন্মত্তা প্রেমিকা।

রবীন্দ্রনাথের 'মস্তকবিক্রয়' কবিতাতে উদ্ঘোষিত হইয়াছে দয়াধর্মের অতি উচ্চ আদর্শ। কাশীরাজের সদম্ভ অহমিকার পার্শ্বে কোশলরাজের ক্ষেম ও 'বহুজনহিতায়' দয়াপন্ন মূর্তিটি অতি উজ্জ্বল। 'আজ্ঞাত কৌণ্ডিণ্য জাতকে'র 'কিং জীবত ফলং তেষাং যেষাং লোকে শ্রবো ন মহাভগো'—এর জীবনাদর্শটিরই প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে মস্তকবিক্রয় কবিতায়।

জীবনের চিরন্তন আদর্শের ও ভারতাত্মার মর্মবাণীর প্রকাশমূলক কাহিনীগুলিই রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ করিয়া সংস্কৃত বৌদ্ধ গল্পগুলির প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে। 'সামান্য ক্ষতি' কবিতার উৎস দিব্যাবদানমালার শ্যামাবতী-কাহিনী। রাজা উদয়নের অগ্রমহিষী শ্যামাবতী পাঁচশত পরিচারিকা সহ অগ্নিদগ্ধ হন। ইহার কারণ

অনুসন্ধান করিয়া উদয়ন জানিতে পারেন, শ্যামাবতী পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির ফলেই অগ্নিদগ্ধ হইয়াছেন। পূর্বজন্মে শ্যামাবতী ছিলেন রাজা ব্রহ্মদত্তের অগ্রমহিষী। একদিন পাঁচশত পরিচারিণী সহ তিনি উদ্যান-ভ্রমণে গিয়া স্নানের পর প্রবল শীত অনুভব করেন এবং একটি সাধুর কুটীরে অগ্নিসংযোগ করিয়া শীত নিবারণ করেন। এই দুষ্কৃতির ফলেই এজন্মে তাঁহাকে অগ্নিদগ্ধ হইতে হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে কাহিনীর অতীতবস্তুটিকে অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের নিরপেক্ষ রাজধর্মের একটি উজ্জ্বল চিত্র অংকন করিয়াছেন। সন্ন্যাসীর কুটীরে অগ্নিসংযোগ করার ফলে সমগ্র গ্রাম জ্বলিয়া যায় এবং গৃহহীন প্রজা রাজদ্বারে অভিযোগ জানায়। রাজা রাণীকে প্রশ্ন করিলে রাণী উত্তর দেন, 'কতটুকু ক্ষতি হয়েছে প্রাণীর ?' রাজার বিচার সূক্ষ্ম ও নির্মম। তিনি সমুচিত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে রাণীকে আভরণহীনা করিয়া রিক্তবেশে পথের ভিক্ষুণী করিয়া দেন এবং 'হয়েছে জগতে কতটুকু ক্ষতি জীর্ণ কুটীর নাশিয়া' বৎসর পরে তাহার জবাব দিতে বলেন।

'নগরলক্ষ্মী' কবিতার উৎস কল্পদ্রুমাবদানের সুপ্রিয়া-কাহিনী। সুপ্রিয়া অনাথ -পিণ্ডদের দুহিতা, জন্ম হইতে বুদ্ধের উপাসিকা। তিনি দুর্ভিক্ষকালেও দরিদ্রের কুটীর হইতে মাধুকরী সংগ্রহ করিয়া কিরূপে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সেবা কার্য নির্বাহ করিয়াছিলেন মূল অবদানে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় ব্যক্তিগত প্রচুর সামর্থ্যের উপরে সমষ্টিগত ক্ষুদ্র দানের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। গণ্যমান্য সামন্ত ও শ্রেষ্ঠিগণ যখন দুর্ভিক্ষ-নিবারণের পথ খুঁজিয়া পাইলেন না, তখন সুপ্রিয়া কহিলেন, 'ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বসুধা, মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।' এখানে রবীন্দ্রনাথ সংঘ-শক্তি বা সমবেত শক্তির উপরই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন ঃ একার পক্ষে যাহা দুঃসাধ্য, বহুর তিলপ্রমাণ চেষ্টায় তাহা অতি সহজসাধ্য।

'অভিসার' কবিতায় রূপায়িত হইয়াছে একজন নিরাসক্ত, নির্লোভ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর অনুকম্পাঘন মহাপ্রেমিকের চিত্র। কাহিনীটির উৎস বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতার উপগুপ্ত-অবদান। কাহিনীটি দিব্যাবদানে 'পাংশুপ্রদানাবদানম্' শীর্ষনামে বিবৃত-হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ রাজেন্দ্রলাল মিত্র পরিচায়িত কাহিনী। রবীন্দ্রনাথ অনেকখানি পরিবর্তন করিয়া কাহিনীকে গ্রহণ করিয়াছেন। কাম-রাগের প্রতি বিরক্ত ও অশুভকামনার স্বভাব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মূলের কাহিনীটি রচিত। বৌদ্ধ উপাসক গন্ধবণিক উপগুপ্ত পঞ্চশত কার্যাপণপণ্যা গণিকা বাসবদত্তার প্রলোভনকে জয় করিয়াছেন। কিন্তু গণিকা যখন নরহত্যার দায়ে মশানে নির্যাতিত হইয়া নাসাকর্ণ হারাইয়া বিগতরূপা হইল, তখন উপগুপ্ত আসিয়া তাহাকে অশুভ কামনার কুফলের কথা উপদেশ দিলেন এবং তাহার ফলে গণিকা বাসবদত্তা স্রোতাপত্তি ফললাভ করিয়া সঙ্ঘের শরণ লইল। 'অভিসার' কবিতায় সন্ন্যাসী উপগুপ্তের মানব-প্রেমের মহিমময় দিকটি উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এখানে উপগুপ্ত উপদেষ্টা মাত্র নন, সেবাব্রতধারী মানবপ্রেমিক—তিনি দুঃখীর সেবকবন্ধু। বাসবদত্তাকে দেখানো হইয়াছে নিদারুণ মারীগুটিকায় আক্রান্ত পরিত্যক্তা অনাথা রূপে।

বৌদ্ধসাহিত্যের মনোজ্ঞ গল্পের আবেদন রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনার ভিতরেও লক্ষ্য করা যায় ঃ তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'রাজা' (১৩১৭) ও 'চণ্ডালিকা' (১৩৪০) নাটকদ্বয়। এই দুইটি নাটক রবীন্দ্রনাথের রস-চেতনার প্রকৃষ্ট প্রকাশ। বৌদ্ধধর্মের বিশেষ কোন নীতি বা আদর্শ ইহাদের প্রেরণা নয়, ইহাদের মূল প্রেরণা রবীন্দ্র-মানসের অজ্ঞেয় রসবোধ। অন্তত 'রাজা' নাটক সম্পর্কে একথা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য।

'রাজা' নাটকের কাহিনী-উৎস মহাবস্তুবদানের (II) কুশজাতক। কুশ ছিলেন দুর্বর্ণ, দুর্দর্শ, কালো। তাঁহার বিবাহ হয় কান্যকুব্জরাজ মহেন্দ্রকের 'প্রাসাদিকা দর্শনীয়া' কন্যা সুদর্শনার সহিত। পাছে কুশকে দেখিয়া সুদর্শনা বিরক্ত হয়, এই আশংকায় কুশ-জননী এক 'অজ্যোতিক গর্ভগৃহ' নির্মাণ করাইয়া সেইখানে পুত্র-পুত্রবধূর মিলনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সুদর্শনা স্বামীকে দেখিবার জন্য ক্রমে এত উৎকণ্ঠিত হন যে তাঁহাকে ছল করিয়া দেখানো হয় কুশের অন্য ভ্রাতা রূপবান কুশদ্রুমকে! সুদর্শনা জানেন, তাঁহার স্বামী সুন্দর। কিন্তু একদিন হস্তীশালায় আগুন লাগায় তাহার ভুল ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার স্বামী অতি কদাকার। সুদর্শনা বিরূপ হইয়া পিতৃগৃহে চলিয়া আসেন। সুদর্শনাকে লাভ করিবার জন্য দুর্মতি মহেন্দ্রক-ভবন অবরুদ্ধ করে। এই ভয়ংকর বিপদে কুশের বীর্যবত্তায় সুদর্শনা বিপন্মুক্ত হন এবং তখন স্বামীর প্রকৃত পরিচয় পাইয়া সুদর্শনা তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করেন 'প্রেমেনন চ গৌরবেণ চ'।

মূল কাহিনীর এই ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথ যে নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহা মৌল উদ্ভাবনায় অভিনব। মূল কাহিনীর অনেক কিছু তিনি পরিবর্তন করিয়াছেন, অনেক নূতন চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন দাসী সুরঙ্গমা, ঠাকুরদা, রাজবেশধারী সুবর্ণ প্রভৃতি। ঘটনাতেও নূতনত্ব আছে, যেমন রাজার দর্শন উপলক্ষ্যে বসন্ত-পূর্ণিমায় উৎসব, কাঞ্চীরাজের চক্রান্তে করভোদ্যানে অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় কথা, রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে রূপায়িত করিয়াছেন বিশ্বরাজ্যের রাজার রহস্যময় স্বরূপ। রাজা নাটকের রাজা ও সুদর্শনা জাতক-কাহিনীর ব্যক্তিমাত্র নহেন, তাঁহারা সংকেতময় প্রতীক। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলা যায়, রাজা হইতেছেন সেই প্রভু 'যে প্রভু কোনো বিশেষরূপে, বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে প্রভু সকল দেশে, সকলকালে আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়' [অরূপ-রতন[১] নাটকের ভূমিকা]। আর সুদর্শনা রূপ-চেতনায় অস্থির জীব-সত্তা, যে রাজাকে দেখিতে চায় স্থূলরূপে বিশিষ্ট সুন্দরের মধ্যে, সুদর্শনা অহং-অনুবিদ্ধ অভিমান! যতদিন এই অভিমান, ততদিন তো নির্বিশেষকে উপলব্ধি করা যায় না, ততদিন মন বহির্মুখী। যেদিন নিদারুণ আঘাতে এই অভিমানের ক্ষয়, সেইদিন নির্বিশেষ সত্যের উপলব্ধিতে

১. 'অরূপ-রতন' (১৩২৬) 'রাজা' নাটকের একটি সংক্ষেপিত, সংহত অভিনেয় সংস্করণ।

সত্যকার আত্মদর্শন ও আত্মসমর্পণ। বৌদ্ধকাহিনীর আধারেই রবীন্দ্রনাথ এই অরূপ-রতন-তত্ত্ব পরিবেশন করিয়াছেন। গল্পের রহস্যময় অন্ধকার গর্ভগৃহটিই রবীন্দ্র-মানসে রহস্যঘন তত্ত্বের রসাবেশ সৃষ্টি করিয়াছে।

বৌদ্ধ অবদান সাহিত্যের আর একটি কাহিনী অবলম্বিত হইয়াছে 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত নেপালী সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্যের অন্তর্গত শার্দূলকর্ণাবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণই এই নাটকের মূল উৎস। নাটকের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই সেই মূলের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু এই কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া রবীন্দ্রনাথ চণ্ডালিকা প্রকৃতির যে চিত্র অংকন করিয়াছেন, তাহা অভিনব। চণ্ডালিকায় মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে উদার মনের স্পর্শে একটি অস্পৃশ্যা চণ্ডালকন্যার হৃদয়ের জাগরণ এবং তাহার দুর্দম প্রণয়-ব্যাকুলতা। মূল কাহিনীতে প্রদর্শিত হইয়াছে যাদুমন্ত্রের উপর সম্বুদ্ধমন্ত্রের বিজয় এবং প্রেমের জন্য প্রকৃতির বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণের ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ সেগুলিকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এমন কি প্রকৃতির নিকট আনন্দের তৃষ্ণার জল প্রার্থনার দৃশ্যটিও পরিত্যক্ত হইয়াছে। চণ্ডালিকা নাটকের সূচনা হইয়াছে অন্ত্যজের হৃদয়জাগরণের অপূর্ব সংবেদন লইয়া ঃ প্রকৃতি বলিতেছে, 'আমার মনের মধ্যে বাজিয়ে দিয়ে গেছে 'জলদাও'...কেবল একটি গণ্ডূষ জল নিলেন আমার হাত থেকে, অগাধ অসীম হল সেই জল। সাতসমুদ্র এক হয়ে গেল সেই জলে, ডুবে গেল আমার কুল, ধুয়ে গেল আমার জন্ম।' চণ্ডালিকা নাটক এই নবজাতকের হৃদয়কুলপ্লাবী দুরন্ত প্রণয়াকাঙ্ক্ষার রূপক। চাণ্ডাল মন্ত্র এই প্রণয়াকাংক্ষা নিবৃত্তির উপায়রূপে গৃহীত হইয়াছে মূলের প্রয়োজনে, আসলে প্রকৃতির দুর্বার আকাঙ্ক্ষাই আনন্দকে আকর্ষণ করিয়াছে। মায়া-দর্পণের উদ্ভাবনা সম্পূর্ণ নূতন। এই দর্পণেই প্রতিবিম্বিত হইয়াছে আনন্দের হৃদয়-দ্বন্দ্বের প্রচণ্ড সংঘাত-চিত্র। জয় কাহার হইয়াছে, প্রকৃতির না আনন্দের, তাহা বলা শক্ত। প্রকৃতি বর্ণিত আনন্দের যে শেষ ছবিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা পরাজয়ের গ্লানিবহ—'কী দেখলেম। ওগো, কোথায় আমার সেই দীপ্তউজ্জ্বল, সেই শুভ্রনির্মল, সেই সুদূর স্বর্গের আলো! কী ম্লান কী ক্লান্ত, আত্মপরাজয়ের কী প্রকাণ্ড বোঝা নিয়ে এল আমার দ্বারে।' কিন্তু পরক্ষণেই প্রকৃতির মুখে শুনি, 'জয় হোক তোমার জয় হোক।' প্রকৃতির মা-ও বলিলেন 'জয় হোক প্রভু'। আনন্দের মুখে সমগ্র নাটকে একটিমাত্র শেষ বাণী ধ্বনিত হইল ঃ

বুদ্ধো সুবুদ্ধো করুণো মহাণ্ণবো
যোচ্চন্তসুদ্ধব্বর-ঞানলোচনো।
লোকস্স পাপূপকিলেসঘাতকো
বন্দামি বুদ্ধম্ অহমাদরেণ তম্॥

এই বন্দনা-শ্লোক গভীর তাৎপর্যবোধক, যাহা সমস্ত জয়-পরাজয়কে ছাপাইয়া রহস্যময় সংকেতের দ্যোতনা করে।—সম্বুদ্ধ মন্ত্রের বিজয় ও প্রকৃতির ধর্ম-দীক্ষা নাটকে অনুদ্ঘাটিত।

বৌদ্ধসাহিত্যের গল্পগত আকর্ষণ অপেক্ষা লোককল্যাণকর বৌদ্ধধর্মাদর্শের আকর্ষণ রবীন্দ্রমানসে আরও গভীর। রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট ধারা আছে, ধর্মসাধনার একটি বিশিষ্ট লক্ষ্য আছে, যেখানে সমস্ত ভারতীয় ধর্ম এক ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যও সেই ধারার বাহক। ১৩১২ সালে তিনি চারুচন্দ্র বসু সম্পাদিত 'ধম্মপদং'-এর ভূমিকা লিখিয়া দেন। তাহাতেও তিনি বৌদ্ধধর্মের পরিপূর্ণ মনুষ্যধর্মসাধনার প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করিয়া বলেন, ভারতীয় ধর্মসাধনার চিরন্তন বৈশিষ্ট্যের 'বহুতর উপকরণ বৌদ্ধ-শাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে'। এই জন্য লুপ্তপ্রায় পুরাতত্ত্বের পুনরুদ্ধারে বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রকাশকে তিনি অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতের গৌরবগাথা কীর্তন করিতে গিয়া তিনি নিজেও বৌদ্ধ গল্পের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম শুধু সন্ন্যাসের ধর্ম বা সংসারবিরাগের ধর্ম বা শুধু নীতি-প্রধান—একথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন, 'যারা বলে ধর্মনীতিই বৌদ্ধধর্মের চরম, তারা ঠিক কথা বলেনা'; বৌদ্ধধর্মের শেষ লক্ষ্য নির্বাণকেও তিনি 'সর্বশূন্যতার মধ্যে নির্বাপণ' বলিয়া ভাবিতে পারেন নাই; তিনি এই ধর্মে দেখিয়াছেন অপরিমেয় প্রেমের প্রকাশ, 'যে প্রেম স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা'। তিনি বলেন, 'এতো বাসনা সংহরণের প্রণালী নয়, এতো বিশ্ব হতে বিমুখ হবার প্রণালী নয়, এযে সকলেব অভিমুখে আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পদ্ধতি। এই প্রণালীর নাম, 'মেত্তি-ভাবনা'—মৈত্রীভাবনা' [ব্রহ্মবিহার]। এই ব্রহ্মবিহার প্রবন্ধে তিনি বৌদ্ধধর্মের শাশ্বত আদর্শ উদ্ঘাটন করিয়া 'মঙ্গলসুত্ত' ও 'মেত্তসুত্ত' হইতে বুদ্ধ-দেবের অন্তর্নিহিত সত্যকে প্রকাশ করিয়াছেন।

১. সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্ঝা হোন্তু
সুখী অত্তানং পরিহরন্তু।

—সকল প্রাণী সুখিত হোক, শত্রুহীন হোক, অহিংসিত হোক, সুখী আত্মা হয়ে কালহরণ করুক।

২. মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে।
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং॥

—মা যেমন একটি পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন, সমস্ত প্রাণীতে সেই প্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করবে। [ব্রহ্মবিহার]

রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মকে উপলব্ধি করিয়াছেন এই দৃষ্টিতেই। বুদ্ধদেবের (অপরিমেয় মৈত্রীভাবনা), অবের (অহিংসা), করুণাঘন মূর্তি, ত্যাগের আদর্শ, দুঃখের তপস্যা ও জ্ঞান (বোধি) রবীন্দ্রমানসে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

বুদ্ধদেবের জীবনাদর্শের এই সকল প্রভাব কেবল বাহিরে নয়, রবীন্দ্রনাথের মর্মমূলে প্রসারিত হইয়াছে এবং ক্রমে একটি বিশিষ্ট বিশ্বাসে পরিণত হইয়া উহা একটি জীবন্ত আকৃতির রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। 'বুদ্ধের শরণ লইলাম'—এই বাণী

যেন রবীন্দ্রনাথের অন্তর হইতে উৎসারিত আত্মার গভীরতম ক্রন্দন। পরাধীনতার গ্লানিতে. হিংসার উন্মত্ততায় ইহারই ভিতর যেন কবি পরিত্রাণের আশ্রয় খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় হইতেই তিনি সাম্রাজ্যলোভী বণিকজাতির লোভের উদ্যত গ্রাস লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন, লক্ষ্য করিতেছিলেন হিংস্রতার ভয়ংকর রূপ। এই হিংসা ও লোভ, স্বার্থের কাড়াকাড়ি ও ভুরিভোজের মত্ততার জঘন্যতম রূপের সহিত মুখোমুখি পরিচয় হইল এই শতকের প্রথম মহাযুদ্ধের পর, যেদিন রাজা চুক্তিভঙ্গ করিল, শক্তির বিকৃত মূর্তি ডায়ারের গুলি চলিল জালিয়ানওয়ালাবাগে (১৯১৯)। এই সময়েই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটভূমিকায় দেখা দিয়াছেন গান্ধীজী তাঁহার অহিংসা ও সত্যাগ্রহের আদর্শ লইয়া। এই পরিবেশে করুণকান্ত বুদ্ধের জীবনাদর্শ কবিচিত্তে একটি স্থিরবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করিতে থাকে। তিনি বুঝিতে পারেন, ভারতের মোহ-আবরণ ভেদ করিতে, তন্দ্রাতুর জাতির অন্তরে চেতনার সাড়া জাগাইতে প্রয়োজন বোধিদ্রুমতলে সেই মহাজাগরণের বাণী ঃ মৃতপ্রায় ভারতকে সঞ্জীবিত করিতে প্রয়োজন অমিতায়ুর বোধন-মন্ত্র। একদিকে অত্যাচারী শাসকের নিষ্ঠুর শাসন ও নির্মম দমন-নীতি, অপরদিকে অসহায় দুর্বলের দ্বিধাচিত্ততা—ইহার মধ্যে প্রয়োজন সত্যের জন্য সুকঠিন আত্মত্যাগ। ১৩৩৩ (ইং ১৯২৬) প্রকাশিত হয় কবির বিখ্যাত নাটক 'নটীর পূজা'। ইহা পূর্বে প্রকাশিত 'পূজারিণী' কবিতার নৃত্য-নাট্যরূপ। বৌদ্ধ আদর্শের জন্য, নটী শ্রীমতীর দুর্জয় সাহসে মৃত্যুবরণ এই নাটকের মূল বিষয়। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী' গানটিও এই সময়ে বুদ্ধজন্মোৎসব উপলক্ষ্যে রচিত।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে কবি পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে—যবদ্বীপ, বোরোবুদুর ও সিয়ামে গমন করেন। সমগ্র দ্বীপময় ভারতে বুদ্ধদেবের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া কবি বিস্মিত হন। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। 'বোরোবুদুর' মন্দিরে কবি দেখিলেন 'বুদ্ধের শরণ লইলাম' মহাবাণীর অমৃত অক্ষর। অতীত ভারতের এই মহিমায় কবি যেন নূতন করিয়া তীর্থ-স্নান করিলেন, বুঝিলেন, লোভের বিকারে চিত্ত যেখানে শান্তিহীন, বাসনার তাড়নায় তৃপ্তিহীন ধরায় যেখানে মানুষ ছুটিয়াছে স্বার্থ-মৃগয়ার লোভে, যেখানে সর্বগ্রাস ক্ষুধানল অন্তহীন আহুতি লালসায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে—সেখানে পীড়িত মানুষকে আবার এই তীর্থদ্বারেই আসিতে হইবে, শুনিতে হইবে—

> পাষাণের মৌনতটে যে বাণী রয়েছে চিরস্থির—
> কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
> আকাশে উঠিছে অবিরাম
> অমেয় প্রেমের মন্ত্র, 'বুদ্ধের শরণ লইলাম।' [বোরোবুদুর]

'সিয়াম' কবিতাতেও সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা ঃ একদিন যে 'তিশরণ মহামন্ত্র' জগতের চিত্তদ্বার উন্মোচন করিয়াছে, সীমার বন্ধন ছিন্ন করিয়া যাহা 'মরুপারে শৈলতটে সমুদ্রের কূলে-উপকূলে' বিস্তার লাভ করিয়াছে—'সে মন্ত্র অমৃতবাণী'

সিয়ামের কানেও পেঁাছিয়াছে, তাঁহারও জীবন-মন্দিরে পদ্মাসনে সমাসীন আছেন সেই বুদ্ধ—

মৌন যাঁর শান্তি অন্তহারা
বাণী যাঁর সকরুণ সান্ত্বনার ধারা। [সিয়াম]

ইহার পর কবি বহু প্রসঙ্গে এই প্রেমের বাণী ও সকরুণ সান্ত্বনাকে প্রার্থনা করিয়াছেন। ১৯৩০-এর পর হইতে সমগ্র বিশ্বে 'বর্বরতার বিকার-বিড়ম্বনা' প্রকট হইতে থাকে। শাসকের অহমিকা, শক্তির দম্ভ, দমন-নীতি ও বণিকের জঘন্য লোভ চরম আকার ধারণ করে। সাম্রাজ্যবাদের কুফলও স্পষ্টভাবে দেখা দেয় এবং চারিদিকে বিশ্বের পটভূমি দ্রুত পরিবর্তিত হইতে থাকে। ১৯৩৯ এ হিটলার কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রান্ত হয়ঃ ইউরোপে সংগ্রাম ব্যাপক আকার ধারণ করে। ১৯৪১ পর্যন্ত বিশ্বরঙ্গভূমির এই পরিবর্তন, লাভ ও লোভের কাড়াকাড়ির ভিতর রবীন্দ্রনাথ পুনঃ পুনঃ বৌদ্ধধর্মের অহিংসানীতি ও অপরিমেয় মৈত্রীভাবনাকে স্মরণ করিয়া কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেন—হিংসার পথ মুক্তির পথ নয়, হিংসার প্রতিক্রিয়ায় হিংসাই প্রশ্রয় পায়, অহিংসাই জগতকে আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে, অমেয় প্রেমভাবনা দ্বারাই হিংসার তাণ্ডব সমূলে উচ্ছিন্ন হইতে পারে' সর্বোপরি এই কথাই তিনি শুনাইয়া গিয়াছেন,

"পাশবতার সাহায্যে মানুষের সিদ্ধিলাভের দুরাশাকে যিনি নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন, যিনি বলেছিলেন, 'অক্কোধেন জিনে কোধং', আজ সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করে মনুষ্যত্বের জগদ্ব্যাপী এই অপমানের যুগে বলবার দিন এলঃ বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।...আজ স্বার্থক্ষুব্ধান্ধ বৈশ্যবৃত্তির নির্মম নিঃসীম লুব্ধতার দিনে সেই বুদ্ধের শরণ কামনা করি, যিনি আপনার মধ্যে বিশ্বমানবের সত্যরূপ প্রকাশ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন" [বুদ্ধদেব. ১৩৪২]।

॥ প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্য ॥

১. ভূমিকা ও প্রাকৃতের প্রাচীন নিদর্শন

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার বিশিষ্ট শক্তিশালী রূপ 'প্রাকৃত'। আদৌ ইহা ছিল জনসাধারণের কথ্য ভাষা। যাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতি ছিল লৌকিক, অথচ যাঁহাদের জীবন ও বৃত্তি ছিল বহুবিচিত্র—তাঁহাদেরই দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক ভাষা প্রাকৃত। কালক্রমে এই ভাষা হইল সংস্কৃতের প্রতিস্পর্ধী। সেদিন প্রাকৃতই হইল লৌকিক ধর্ম-কর্ম ও সাহিত্যের বাহন। 'পালি' এই প্রাকৃতেরই বৌদ্ধ রূপ।

প্রাকৃত ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য সরলতা। কথ্যভাষা বলিয়াই ইহা যথাসম্ভব সহজ ও আটপৌরে। এই ভাষায় ঋ, ঐ, ঔ প্রভৃতি ধ্বনি নাই, উহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে অন্য কোন স্বরধ্বনি [যথা, মৃগ>মগ, ঋতু>উতু, ঐরাবত>এরাবত,

ঔষধ>ওসধ] ; ণ ও ন-এর মধ্যে আছে কেবল ণ [পালিতে 'ন'] ; তিনটি শ, ষ, স-এর ভিতর আছে শ বা স [অন্যান্য প্রাকৃতে স, মাগধী প্রাকৃতে শ] ; সংযুক্ত ব্যঞ্জন এখানে সমীভূত [যথা, রক্ত>রত্ত, সুপ্ত>সুত্ত, চক্র>চক্ক, আদ্য>অজ্জ] ; শব্দরূপে দ্বিবচন লুপ্ত এবং প্রায় সমস্ত শব্দই অ-কারান্ত শব্দের অনুরূপ এবং ধাতুরূপে ভ্বাদিগণীয় ধাতুর সারূপ্য।

শুধু সরলতা নয়, প্রাকৃতের আর একটি গুণ কোমলতা। রাজশেখর বলেন,

পরুসা সক্কঅবন্ধা পাউঅবন্ধো বি হোই সুউমারো।
পুরুসমহিলাণং জেত্তিঅং ইহন্তরং তেত্তিঅ ইমাণং [কর্পূরমঞ্জরী]

—সংস্কৃত রচনা পরুষ, প্রাকৃত রচনা সুকুমার। পুরুষ ও মহিলায় যে পার্থক্য, সংস্কৃত ও প্রাকৃতেরও সেই পার্থক্য।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক হইতে খ্রীষ্টাব্দ ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত প্রাকৃতের প্রসারকাল। এই সময়ে অঞ্চলভেদে ভারতবর্ষে বহু প্রাকৃত প্রচলিত ছিল। কাহারও মতে ইহার সংখ্যা ছিল আঠারটি। বররুচি চারিটি প্রাকৃতের নাম করিয়াছেন—পৈশাচী, মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী ও মাগধী ; আচার্য দণ্ডীও চারিটি প্রাকৃতের নাম করিয়াছেন—মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, গৌড়ী ও লাটী। মনে হয়, সাহিত্যের বাহনরূপে চারিটি প্রাকৃতই ছিল প্রধান—উত্তর-পশ্চিমে পৈশাচী, দক্ষিণে মহারাষ্ট্রী, মধ্যদেশ শৌরসেনী এবং পূর্বভারতে প্রাচ্যা বা মাগধী।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পূর্বে একমাত্র পালি ব্যতীত প্রাকৃতের অন্য কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। সম্রাট অশোক-প্রদত্ত অনুশাসনগুলিই প্রাচীনতম প্রাকৃতের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। সম্রাট অশোকের যে সকল শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের ভিতর 'শাহবাজগড়ী' (উদীচ্যা প্রাকৃত), 'গির্ণার অনুশাসন' (দাক্ষিণাত্যা), 'কালসী' (প্রাচ্য মধ্যা) এবং 'ধৌলী অনুশাসন' (প্রাচ্যা) বহুখ্যাত। এইগুলিই অতি প্রথমস্তরের প্রাকৃত। ভাষা সরল ও অনলঙ্কৃত, বিষয়—বৌদ্ধধর্মের কল্যাণ-মৈত্রির আদর্শ, তথা প্রিয়দর্শী অশোকের মঙ্গলধর্মের নীতি। যেমন, গির্ণার অনু-শাসনের এই অংশটি ঃ

দেবানাং পিয়ো প্রিয়দসি রাজা এবং আহ অস্তি জনো উচাবচং মংগলং করোতে আবাধেসু আবাহ বিবাহেসু বা পুত্র লাভেসু বা প্রবাসম্হি বা···অপফলং তু খো এতারিসং মংগলং। অয়ং তু মহাফলে মংগলে য ধংমমংগলে।

—দেবদেব প্রিয়দর্শী রাজা এই কথা বলিতেছেন ঃ লোকে নানাবিধ মঙ্গল-অনুষ্ঠান করে—আপদে, পুত্রবিবাহে, কন্যাবিবাহে, সন্তানলাভে, প্রবাসগমনে···তবে এই সকল মঙ্গল-অনুষ্ঠান অল্প ফলপ্রদ। ধর্ম-মঙ্গল অনুষ্ঠানই মহাফলপ্রদ মঙ্গল আচার।

এই সময়ের আর একটি প্রত্নলিপি 'সুতনুকা' প্রত্নলিপি। রামগড় পাহাড়ের যোগীমারা গুহায় এই লিপিটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভাষাতাত্ত্বিকগণ ভাষার দিক হইতে এই লিপিটিকে মূল্যবান বলিয়াছেন ; কিন্তু ইহার মধ্যে একজন দেবদাসীর

জীবনের যে নিগূঢ় সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মূল্যও বড় কম নয়। এ যেন ক্ষুদ্র তিনটি ছত্রে একটি সুমহৎ ছোট গল্পের বীজ। লিপিটি এইরূপ ঃ

শুতনুক নম দেবদশিক্যি
তং কময়িথ বলনশেয়ে
দেবদিনে নম লুপদখে।

—সুতনুকা নামে দেবদাসী। তাহাকে কামনা করিয়াছিল বারাণসীবাসী দেবদীন (আধুনিক দেওদীন) নামে রূপদক্ষ।[১]

২. পরবর্তী স্তরের প্রাকৃত সাহিত্য

প্রত্নলিপি-বহির্ভূত যে প্রাকৃত সাহিত্য পাওয়া যাইতেছে, তাহার একভাগে পড়ে বিপুলাকার জৈনশাস্ত্র, অপর ভাগে পড়ে প্রাকৃত রসসাহিত্য কাব্য-নাটকাদি।

॥ জৈন ধর্মসাহিত্য ॥

বৌদ্ধধর্মের মত জৈনধর্মও ভারতবর্ষের একটি বিশিষ্ট ধর্ম। তবে বৌদ্ধধর্ম যেমন বহুব্যাপ্ত, জৈনধর্ম তেমন বহু প্রসারিত নয়। ভারতবর্ষের মধ্যেই ইহা সীমাবদ্ধ। উভয় ধর্মই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিস্পর্ধী এবং কালানুক্রমে জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্মের পূর্ববর্তী।

জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠা মহাবীর বর্ধমান হইতে। তিনিই এই ধর্মের কেন্দ্রীয় শক্তি। জৈনগণ মনে করেন, এই ধর্ম আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; মহাবীরের পূর্বেও জৈনধর্ম ছিল; তৎপূর্বে ২৩ জন তীর্থংকর[২] [১. ঋষভ ২. অজিত ৩. সম্ভব ৪. অভিনন্দন ৫. সুমতি ৬. পদ্মপ্রভ ৭. সুপার্শ্ব ৮. চন্দ্রপ্রভ ৯. সুবিধি ১০. শীতল ১১. শ্রেয়াংশ (=সেজ্জংস) ১২. বাসুপূজ্য ১৩. বিমল ১৪. অনন্ত ১৫. ধর্ম, ১৬. শান্তি ১৭. কুন্থু ১৮. অর ১৯. মল্লি (শ্বেতাম্বর মতে ইনি নারী, দিগম্বর মতে পুরুষ) ২০. মুনি সুব্রত ২১. নমি ২২. নেমি (অরিষ্টনেমি, জৈনমতে ইনি বাসুদেব কৃষ্ণের সমসাময়িক) এবং ২৩. পার্শ্ব] বর্তমান ছিলেন। মহাবীর চতুর্বিংশতিতম এবং সর্বশেষ তীর্থংকর।

মহাবীর বুদ্ধদেবের সমসাময়িক এবং বয়সে গৌতমবুদ্ধ হইতে বড়। বৌদ্ধগ্রন্থে 'নিগন্থ নাতপুত্ত' বলিয়া যে বিশিষ্ট ধর্মাচার্যের নাম পাওয়া যায়, তিনিই মহাবীর। 'জ্ঞাতৃ' বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম জ্ঞাতৃপুত্র (নাতপুত্ত)। মহাবীরের পিতার নাম সিদ্ধার্থ, মাতার নাম ত্রিশলা। মহাবীরের জন্ম-সম্ভাবনার

---

১. দ্রষ্টব্য—ভাষার ইতিবৃত্ত—ডঃ সুকুমার সেন।

২. 'তীর্থতে সংসার সমুদ্রাদনেনেতি তীর্থং তৎকরোতীতি তীর্থংকরঃ'—যিনি সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার তীর্থ (ঘাট) নির্মাণ করেন, তিনিই তীর্থংকর (হেমচন্দ্র টীকা)।

সময় হইতে বংশের বৈভব বৃদ্ধি পায় জন্য তাঁহার আর এক নাম 'বর্ধমান'।[১] সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি সন্ন্যাসী হন এবং কৃচ্ছ্রসাধনার পর পরেশনাথ পাহাড়ে এক শাল-বৃক্ষের নীচে বসিয়া 'কেবল জ্ঞান' লাভ করেন। তখন হইতে তিনি কেবলী, জিন (conqueror) নামে খ্যাতি লাভ করেন। মহাবীরের জন্ম বৈশালী নগরে, মৃত্যু পাটনার নিকটবর্তী 'পাবা'য়। তাঁহার জীবৎকাল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতক।

বর্তমান জৈনধর্মের প্রাণ-পুরুষ মহাবীর। তিনিই বিপুলকায় জৈনশাস্ত্রের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তিনি নিজদেশের ভাষায় (অর্ধমাগধী) ধর্ম-প্রচার করেন। প্রাচীনতম জৈনশাস্ত্র প্রাকৃত ভাষায় গ্রথিত।

আদৌ জৈনশাস্ত্র মুখে মুখে প্রচারিত ছিল। ইহার সংরক্ষণেরও কোন ব্যবস্থা ছিল না। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে মগধে বিখ্যাত জৈনাচার্য ছিলেন শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহু এবং স্থূলভদ্র। একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় ভদ্রবাহু তাঁহার দলবল সহ সুভিক্ষ কর্ণাট দেশে গমন করেন। স্থূলভদ্র মগধেই থাকিয়া যান। স্থূলভদ্রের শিষ্যগণ বস্ত্র পরিধান করিতে আরম্ভ করেন। মহাবীর ছিলেন নগ্ন। স্থূলভদ্র বস্ত্র গ্রহণ করায় পরবর্তীকালে তাঁহারা 'শ্বেতাম্বর' জৈন নামে পরিচিত হন। স্থূলভদ্রের নেতৃত্বে পাটলিপুত্রে একটি সভা আহূত হয় এবং এই সভায় এগারখানি 'অঙ্গ' এবং 'দৃষ্টিবাদ' (অধুনালুপ্ত) সংগৃহীত হয়। এই শাস্ত্রগুলি শ্বেতাম্বর জৈনশাস্ত্র নামে পরিচিত। কিন্তু গ্রন্থাকারে তখনও পর্যন্ত এই শাস্ত্র লিখিত হয় নাই।

ইহার কিছুদিন পরে শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুর দল কর্ণাট হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহারা নগ্ন ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের নাম হয় 'দিগম্বর' জৈন। ভদ্রবাহু ছিলেন জ্ঞান-বৃদ্ধ এবং চতুর্দশ 'পূর্বে' পারদর্শী। তাঁহার প্রভাবও ছিল অসাধারণ। ভদ্রবাহুর সম্প্রদায় স্থূলভদ্র-সংকলিত 'শাস্ত্রগুলির' কিছু অংশ প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিলেও উহাকে অসম্পূর্ণ বলিয়া ঘোষণা করেন।

এইভাবে জৈনসংঘে ভেদ সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তীকালে দুইটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। তাঁহাদের শাস্ত্রগ্রন্থও স্বতন্ত্র। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে বলভীর রাজা ধ্রুবসেনের সহায়তায় জৈনাচার্য দেবর্ধির নেতৃত্বে একটি সভা আহূত হয়। এই সভায় শ্বেতাম্বর জৈনশাস্ত্রগুলি সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হয়। এই শ্বেতাম্বর জৈন শাস্ত্রগুলিই সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। অঙ্গ, উবংগ (উপাঙ্গ), পইণ্ণ (প্রকীর্ণ), ছেয়সুত্ত (ছেদসুত্ত), মূলসুত্ত ও স্বতন্ত্র দুইটি গ্রন্থ ভেদে এই শাস্ত্র ছয়টি ভাগে বিভক্ত। ইহা ছাড়াও অঙ্গ-বাহ্য গ্রন্থ হিসাবে এই সম্প্রদায়ে পরবর্তীকালে নিজ্জুত্তি (ভাষ্যগ্রন্থ), চরিত ও কথা নামে বিশাল সাহিত্য পাওয়া যায়।

---

১. 'ইমেকুমারে তিশলাএ খত্তিয়াণিএ কুচ্ছিংস গব্ভে আহুএ ততোণং পভিতিং ইমং কুলং বিপুলেন হিরণ্ণেণং সংখসিলপ্পবালেণং অতীব পরিবড্ঢই তু হউ কুমারে বড্ঢ মাণে' (আ. সূ. ২.১৫)।

দিগম্বর জৈনগণ অঙ্গাদি গ্রন্থের কয়েকখানিকে মাত্র প্রামাণিক মনে করেন। তাঁহাদের শাস্ত্রগ্রন্থ 'চতুর্বেদ' (প্রথমানুযোগ, করণানুযোগ, দ্রব্যানুযোগ ও চরণানুযোগ)। ইহা ছাড়া ইঁহারা 'পুরাণ' নামধেয় কতকগুলি গ্রন্থকেও মানেন।

॥ অঙ্গাদি শাস্ত্র ॥

(i) **অঙ্গ** ঃ ইহাদের সংখ্যা এগার। ১. আয়রঙ্গসুত্ত (আচারাঙ্গসূত্র) ২. সুয়গড়ঙ্গ ৩. ঠানাঙ্গ ৪. সমবায়ঙ্গ ৫. ভগবতী বিয়াহ পণ্ণত্তি (ব্যাখ্যা প্রজ্ঞপ্তি) ৬. নায়াধম্মকহাও (জ্ঞাত-ধর্মকথাঃ) ৭. উবাসগদসাও (উপাসকদশাঃ) ৮. অংতগডদসাও (অন্তঃকৃদ্দশাঃ) ৯. অণুত্তরো ববাইয়দসাও (অনুত্তরোপপাদিকদশাঃ) ১০. পণ্হবাগরণাই (প্রশ্নব্যাকরণানি) ১১. বিবাগসুয় (বিপাকশ্রুতঃ)। এগুলি ছাড়া আর একটি গ্রন্থ 'দিট্ঠিবায়' (দৃষ্টিবাদ) অঙ্গশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ; কিন্তু সে গ্রন্থের অস্তিত্ব নাই।

অঙ্গ গ্রন্থগুলির ভিতর প্রথম দুইখানি অঙ্গই প্রাচীনতম ; তন্মধ্যে আয়রঙ্গসুত্ত জৈনশাস্ত্রের আদি ও সার। ইহার দুইটি খণ্ড। প্রথম খণ্ডের নাম 'সুয়কখন্দ' (সূত্রস্কন্ধ)। ইহাতে 'আটটি অজ্ঝয়ণ' (অধ্যয়ন)। অধ্যয়নগুলি কতকগুলি 'উদ্দেসয়' (উদ্দেশক=পাঠ) এর সমষ্টি। ইহার বক্তা মহাবীর-শিষ্য সুধর্ম। ইহার ভাষা প্রধানতঃ গদ্য, মাঝে মাঝে শ্লোব। সূচনা এই বাক্যটি লইয়া 'সুয়ং মে আউসং তেণ ভগবয়া এবং অক্খ্যায়ং' ['হে আবুস, আমি সেই ভগবানের এই কথা শুনিয়াছি] প্রত্যেকটি পাঠের শেষে 'ত্তি বেমি' [আমি এই বলি]—এই সমাপ্তি বাক্য। প্রথম খণ্ডের অধিকাংশই জৈনাচাবের কথা। ধর্মের মূল আদর্শগুলিও উহারই ভিতর বর্ণিত হইয়াছে, যেমন পদ্যময় এই সুক্তিটি ঃ

> কোহাইমাণং হনিয়া চ বীরে
> লোভসস পাসে নিরয়ং মহন্তং
> তম্হা হি বীরে বিরও বহাও
> ছিন্দেজ্জ সোয়ং লহুভূয়গামী। [আ. সু. ১. ৩. ২]

—বীর ক্রোধ ও অভিমানকে জয় করিবে ; লোভের পাশেই ভীষণ নরক। অতএব বীর বধ হইতে বিরত থাকিয়া ধীরে-সুস্থে স্রোতকে ছিন্ন করিবে।

জৈমধর্মের একটি মূল কথা কৃচ্ছ্রসাধনা (শরীর প্রত্যাখ্যান)। মহাবীরের জীবন ইহার জ্বলন্ত উদাহরণ। আয়রঙ্গসুত্তের প্রথম খণ্ডের অষ্টম অধ্যয়নে এই চরম সহিষ্ণুতার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর মহাবীর ভ্রমণ করিতে করিতে রাঢ়দেশে উপনীত হইয়াছেন ; বজ্রভূমি ও সুহ্মভূমির সেই অঞ্চল দুশ্চর ও রুক্ষ ; সেখানকার মানুষ 'ছু-ছু' শব্দে হিংসক কুকুরগুলিকে লেলাইয়া দিয়াছে ['চুচ্ছুক কারেন্তি আহন্তুং সমনং কুক্কুরা ডসন্তু ত্তি'] ঃ কিন্তু সম্বুদ্ধ ভগবান অহিংসভাবে সমস্ত কিছুই সহ্য করিয়াছেন ঃ

> নিহায় দণ্ডং পাণেহিং তং
> কায়ং বোসজ্জমণগারে

অহ গাম কণ্টএ ভগবং
তে অহিয়াসে অভিসমেচ্চা [আ. সু. ১. ৮. ৩]

—সেই প্রাণিদিগের প্রতি দণ্ড ত্যাগ করিয়া, দেহ-কষ্টের বিষয় গ্রাহ্য না করিয়া সেই অনাগার সম্বন্ধ ভগবান গ্রাম-কণ্টকে বিচরণ করিয়াছেন।

আয়রঙ্গ সুত্তের দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যয়নটি মহাবীরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং জৈনশাস্ত্রোক্ত মহাবীর-চরিতের আদি বীজাংকুর।

গল্পসাহিত্যের দিক হইতে ষষ্ঠ অঙ্গ 'নায়ধম্মকহাও' এবং সপ্তম অঙ্গ 'উবাসগদসাও' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'নায়ধর্মকথা' ধর্মমূলক আখ্যানের সমষ্টি। কতকগুলি আখ্যান রূপক শ্রেণীর। কতকগুলি আখ্যানে অভিযান, রূপকথা ও দস্যুকাহিনীর বর্ণনা। সংসার-বৈরাগ্যের কাহিনী হিসাবে তীর্থংকর 'মল্লী'র কাহিনী বিশিষ্টতার দাবি রাখে। দিগম্বর মতে 'মল্লী' ছিলেন পুরুষ, কিন্তু শ্বেতাম্বর মতে মল্লী নারী। ইনি ছিলেন মিথিলার রাজকন্যা, অপরূপ দেহশোভার অধিকারিণী। ছয়জন রাজপুত্র তাঁহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করেন। মল্লী তাঁহাদিগকে রাজপুরীতে আহ্বান করিয়া একটি 'মনোরম ঘরে' ('মোহনঘর') লইয়া যান। সেখানে তাঁহারা মল্লীর একটি প্রতিকৃতি দেখিতে পান। এমন সময় মল্লী স্বয়ং আসিয়া প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন। মুহূর্তে নগ্ন প্রতিকৃতির বীভৎসতা দেখিয়া রাজপুত্রগণ ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লন। তখন মল্লী তাঁহাদিগকে নারীদেহের এই বীভৎসতা ও নশ্বরতা সম্পর্কে উপদেশ প্রদানছলে পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। ফলে ছয় রাজপুত্র সংসারে বীতরাগ হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন [নায়ধম্মকহা. ১. ৮]

'উবাগসদসাও'—দশজন উপাসক মহাবীরের ধর্মে দীক্ষিত হইয়া দেবজন্ম লাভ করিয়াছিলেন ; উপাসক-দশ তাঁহাদেরই কাহিনী।

(ii) **উবংগ** (উপাঙ্গ)—ইহাদেরও সংখ্যা বার। উপাঙ্গগুলির প্রকৃতি সংস্কৃত পুরাণের অনুরূপ। ইহার আখ্যানগুলিও সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফলশ্রুতিমূলক। পুরাণের সর্গ-বর্ণনার মত এখানেও জৈন সৃষ্টিতত্ত্বের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। উপাঙ্গগুলি জৈন-দর্শনের মূল্যবান উপকরণ। কয়েকখানি উপাঙ্গে ('সুরপন্নত্তি'—সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি, 'জম্বুদ্দীবপন্নত্তি'=জম্বুদ্বীপ প্রজ্ঞপ্তি এবং চংদপন্নত্তি=চন্দ্র-প্রজ্ঞপ্তি) জ্যোতির্বিদ্যা, ভূবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

(iii) **পইন্ন** (প্রকীর্ণ)—এগুলির অধিকাংশই বিচ্ছিন্ন ছন্দোবন্ধ শ্লোক। ইহাতে আছে বিবিধ বিষয়ের আলোচনা। কোথাও সংঘের নিয়মাবলী, কোথাও বা খাদ্য সম্বন্ধীয় বিচার। ইহাদের সংখ্যা দশ ; তন্মধ্যে প্রথম প্রকীর্ণ 'চউসরণ' (চতুঃ শরণ) কতকগুলি স্তবস্তুতিমঙ্গল-এর সমষ্টি।

(iv) **ছেয়সুত্ত** (ছেদসূত্র)—সংখ্যায় ছয়টি : নিসীহ (নিশীথ বা নিষেধ) মহানিসীহ, ববহার (ব্যবহার), আয়ারদসাও (আচারদশাঃ), কপ্প ও পংচকপ্প। শেষ গ্রন্থখানি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে পঞ্চম ছেদসূত্র 'কল্প' সুপ্রাচীন। চতুর্থ ছেদসূত্র 'আচার দশাঃ' শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুর রচনা বলিয়া মনে করা হয় এবং

ইহার অষ্টম পরিচ্ছেদ 'ভদ্রবাহু কল্পসূত্র'। এই কল্পসূত্রের তিনটি অংশ ঃ জিন-চরিত্র, স্থবিরাবলী ও সামাচারী। প্রথম অংশের প্রথমেই মহাবীরচরিত। আচারাঙ্গ সূত্রের বহু অংশ হুবহু ইহাতে গৃহীত হইয়াছে। অন্যান্য জিন-চরিত্রের ভিতর বর্ণিত হইয়াছে, পার্শ্বনাথ, অরিষ্টনেমি ও ঋষভের জীবন। সুপ্রাচীন চরিত-সাহিত্য হিসাবে এই সকল জিন-চরিত্রের মূল্য অসাধারণ। ভদ্রবাহু কল্পসূত্রের দ্বিতীয় অংশ বিভিন্ন স্থবিরাবলীর গোত্র ও শাখার তালিকা; অবিকল পুরাণের বংশ বর্ণনার অনুরূপ। তৃতীয় অংশ ('সামাচারী')—পর্যুষণকালে (বর্ষাবাসের সময়) যতিদিগের পালনীয় নিয়মাবলীর বিবৃতি। এই অংশই প্রাচীনতম। বর্ষাকালে গৃহী উপাসকগণ নিজেদের গৃহ সংস্কার করিয়া থাকেন এবং গ্রামে গ্রামে বিচরণ করিলে প্রাণিবধের আশংকা থাকে বলিয়া জিন-গণধর-স্থবির-নিগ্রন্থগণ কোন একটি বিশেষ স্থানে অবস্থান করেন। ইহারাই নাম 'পজ্জুসন'।

(v) **মূলসুত্ত**—সংখ্যায় চারিখানি; উত্তরজ্ঝয়ণ, আবস্সয় (আবশ্যক), দসবেয়ালিয় (দশবৈকালিক) ও পিণ্ডনিজ্জুত্তি। 'নিজ্জুত্তি' (নির্যুক্তি) বলিতে বুঝায় ব্যাখ্যা বা নিরুক্তিজাতীয় গ্রন্থ। মূলসুত্তের চারিখানি গ্রন্থের ভিতর 'উত্তরজ্ঝয়ণ' (উত্তরাধ্যয়ন) প্রাচীনতম জৈনশাস্ত্রগুলির একটি। ইহার প্রকৃতি অনেকটা বৌদ্ধ 'সুত্তনিপাত' গ্রন্থখানির মত। প্রাচীন গাথা, প্রাচীন কথা এবং তাহার সহিত জৈনধর্মের মূল আদর্শ ইহার বর্ণনীয় বিষয়। টীকাকারগণ বলেন, 'উত্তর' মানে 'প্রধান' অর্থাৎ শীর্ষস্থানীয়; এই অর্থে উত্তরাধ্যয়ন জৈনশাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয়। এই সুত্তখানি ছত্রিশটি অধ্যয়নে বিভক্ত। প্রথম ছয়টি অধ্যয়নে অনাগার ভিক্ষুর কর্তব্য নির্দেশ। সূচনা এই বাক্যটি লইয়া—

সংজোগো বিপ্পমুক্কস্স অণগারস্স ভিক্খুণো।
বিণয়ং পাউ করিস্সামি আনুপুব্বিং সুণেহ মে ॥ ১. ১.

—বিপ্রমুক্ত, অনাগার ভিক্ষুর কর্তব্য আনুপূর্বিক ব্যাখ্যা করিব; আমার কথা শোন।

তাহার পর ধর্ম-বিনয়ের মূল নীতির ব্যাখ্যা। এ নীতি চিরকালের মানব-ধর্মনীতি ঃ

মুসং পরিহরে ভিক্খু ন য ওহারিণিং বএ।
ভাসাদোসং পরিহরে মায়ং চ বজ্জএ সয়া ॥ ১. ২৪.

—ভিক্ষু মৃষাবাদ পরিহার করিবে, অযথা ভবিষ্যদ্বাণী করিবে না; ভাষাদোষ পরিহার করিবে, আর সর্বদা ছলনা বর্জন করিবে।

ওজ্ঝত্থং সব্বত্ত সব্বং দিস্স পাণে পিয়ায়এ।
ন হনে পাণিণো পাণে ভয় বেরাও উবরএ ॥ ৬. ৬.

—সর্বত্র সকলে নিজের প্রাণকে প্রিয় জ্ঞান করে, উহা জানিয়া প্রাণীর প্রাণ হত্যা করিবে না; ভয় ও বৈর হইতে বিরত থাকিবে।

উত্তরাধ্যয়নের নীতিবাক্যগুলি যেমন মনোজ্ঞ, তেমনই মনোহর ইহার কাহিনী।

নবম অধ্যয়নে নমি রাজার প্রব্রজ্যার বৃত্তান্ত। নমিরাজা অভিনিষ্ক্রমণ করিতেছেন, মিথিলা আজ কোলাহলসংকুলা ['অজ্জ মিহিলা কোলাহলসংগুলা']। দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে চেষ্টা করিতেছেন নমিরাজাকে রাজ্যে ধরিয়া রাখিতে ঃ রাজ্য দগ্ধ হইতেছে, নমিরাজার উহা রক্ষা করা উচিত ; ক্ষাত্রিয়ের উচিত তস্কর-গ্রন্থিভেদককে দণ্ড দিয়া 'নগরস্স খেমং কাউণং'—নগরের মঙ্গলবিধান করা ; শুধু তাই নয়, ক্ষাত্রিয়ের উচিত বিদ্রোহী রাজাদের সংগ্রামে জয় করা। কিন্তু নির্বেদপ্রাপ্ত নমিরাজার উত্তর ঃ

জো সহস্সং সহস্সাণং সংগামে দুজ্জয়ে জিণে।
এগং জিণেজ্জ অপ্পাণং এস সে পরমো জউ ।। ৯. ৩৪.

—যে হাজার হাজার মানুষকে সংগ্রামে জয় করে, তাহার অপেক্ষা সে-ই পরম জয়ী, যে একমাত্র নিজেকেই জয় করে।

অন্যান্য কাহিনীগুলির ভিতর 'সোবাগকুলসংভূত' (চণ্ডালকুলে জাত) হরিকেশের কাহিনী (১২. অধ্যয়ন), চিত্র সম্ভূতির আখ্যান (১৩ অধ্যয়ন)[১], সমুদ্রপালের কাহিনী (২১ অধ্যয়ন) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য 'রথনেমীয়মধ্যয়নম্' (২২ অধ্যয়ন)। কাহিনীটির ভিতর বাসুদেবের উল্লেখ আছে, আর আছে 'রাইমই'র সতীত্ব ও সংসার-বিরাগের বর্ণনা। 'সোরিয়পুরে'র রাজপুত্র ছিলেন বসুদেব ; তাঁহার দুই রাণী—রোহিণী ও দেবকী ; তাঁহাদের পুত্র যথাক্রমে রাম ও কেশব (বাসুদেব)। সেই রাজ্যের আর এক রাজকুমার অরিষ্টনেমি। বাসুদেব অরিষ্টনেমির সহিত রাজকন্যা 'রাইমই'র বিবাহ প্রস্তাব করেন। রাইমই পরমা রূপসী —'সব্বলক্খণ সংপন্না বিজ্জুসোয়ামণিপ্পভা'। কুমার অরিষ্টনেমি মহা আড়ম্বরে বিবাহ-যাত্রা করিলেন। পথে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল বধার্থে আবদ্ধ কতকগুলি পশু। ইহা দেখিয়া দয়ার্দ্রহৃদয় অরিষ্টনেমি নির্বেদ প্রাপ্ত হন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। সংবাদ কন্যাপক্ষে ছড়াইয়া পড়ে—শুনিয়া সেই 'রায়বরকন্না' 'নীহাসা চ নিরানংদা'—

রাইমই বিচিন্তেই ধিগত্থু মম জীবিয়ং।
জা'হং তেণ পরিচ্চত্তা সেয়ং পব্বইউং মম ।। ২২. ২৯.

—রাইময়ী ভাবিলেন, আমার জীবনে ধিক ; আমি তাহা-কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছি, আমারও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা উচিত।

রাইমই প্রব্রজ্যা লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন বৃষ্টিতে ভিজিয়া 'রৈবতক' গিরির এক গুহায় আশ্রয় লইলেন এবং গাত্রবস্ত্র শুকাইবার অভিপ্রায়ে অঙ্গ হইতে বস্ত্র খুলিয়া ফেলিলেন। সেই গুহায় আশ্রয় লইয়াছিলেন রথনেমি, অরিষ্টনেমির ভ্রাতা, তিনি রাইমইর প্রতি আসক্ত। রাইমইকে তদবস্থ দেখিয়া তিনি পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে আসিলেন। রাইমই ভয়ে কম্পিত হইয়া গুম্ফার ('গোপ্ফং) বাহিরে

১. এই কাহিনীটির সহিত হিন্দু শ্রাদ্ধকল্পের 'সপ্ত ব্যাধা দশার্ণেষু মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ' মন্ত্র ও কাহিনীর আশ্চর্য মিল দৃষ্ট হয়।

আসিতে চেষ্টা করিলেন। রথনেমি বাধা দিয়া কহিলেন, ওগো ভদ্রে চারুহাসিনি, আমাকে দেখিয়া ভয় পাইতেছ কেন? আমি রথনেমি। এস, ভোগ্যবস্তু ভোগ করি। মনুষ্য জন্ম সুদুর্লভ। ভোগ শেষ হইলে পশ্চাৎ জিনমার্গে বিচরণ করা যাইবে।'

রাইমই ক্রুদ্ধস্বরে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন:

জইহসি রূবেণ বেসমণো ললিএণ নলকুবরো।
তহাবি তে ন ইচ্ছামি জইহসি সক্‌খং পুরন্দরো॥ ২২. ৪১

—ললিত রূপে যদি তুমি নলকুবেরের সমানও হও বা শত্রু পুরন্দরের মত হও, তথাপি আমি তোমাকে কামনা করি না।

অংকুশের আঘাতে হস্তী যেমন বশীভূত হয়, তেমনই প্রত্যাখ্যাত রথনেমি প্রব্রজ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

(vi) অঙ্গাদি শাস্ত্রের শেষ গ্রন্থ দুইখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ: নন্দী ও অনুওগদার (অনুযোগদ্বার)। গ্রন্থ দুইখানি গদ্যে রচিত, মাঝে মাঝে পদ্যশ্লোক। 'নন্দী' দেবর্ধির রচনা বলিয়া খ্যাত। দুইখানি গ্রন্থই জৈনধর্মের বিশ্বকোষ। উহাতে আছে চরিতাবলী (মহাবীর-চরিত, গণধরচরিত, স্থবিরাবলী-চরিত), আছে 'মিচ্ছাসুয়ং' (মিথ্যাসূত্র) মহাভারত, রামায়ণাদির কাহিনী। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, ঘোটকমুখের কামসূত্র, বৈশেষিক সূত্র, বুদ্ধ-শাসন, পুরাণ, ব্যাকরণ, গণিত, নাটক, কাব্যাদর্শ এবং সাঙ্গ বেদাদির আলোচনা সমস্ত কিছুই ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। জৈন শাস্ত্রাদির সমগ্র পরিচয় এই গ্রন্থদ্বয়ে পাওয়া যায়।

॥ অঙ্গবাহ্য জৈন শাস্ত্র ॥

কেবল অঙ্গাদি গ্রন্থের ভিতরেই জৈনশাস্ত্র সাহিত্য সীমাবদ্ধ নয়, জৈন শাস্ত্রের পরিধি আরও বৃহত্তর। প্রাকৃত, সংস্কৃত, অপভ্রংশ—এমন কি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাতেও জৈনগণ অঙ্গ-বহির্ভূত শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়ের দানই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। দিগম্বরগণ অঙ্গাদি শাস্ত্রগুলিকে প্রামাণিক বলিয়া মনে করেন এবং এগুলি ছাড়াও তাঁহারা স্বীকার করেন প্রথমানুযোগাদি নামক 'চতুর্বেদ'। এগুলিকে বলা যায় দিগম্বর জৈনধর্মের আগম ও মহাপুরাণ। ইহা ছাড়া আছে অঙ্গাদি গ্রন্থগুলির ভাষ্য ও টীকা—শ্বেতাম্বরদিগের 'নিজ্জুত্তি' (নির্যুক্তি) এবং দিগম্বর দিগের 'চুণী'।

(i) **নিজ্জুত্তি ও চুণি**—নিজ্জুত্তি বা নির্যুক্তি হইতেছে অঙ্গাদি গ্রন্থগুলির নিরুক্তি। ভদ্রবাহুই প্রাচীনতম নির্যুক্তিকার। ভদ্রবাহুর নির্যুক্তি সংক্ষিপ্ত এবং পদ্যাত্মক। পরবর্তীকালে আরও অনেক নির্যুক্তি রচিত হইয়াছে। এই নির্যুক্তিগুলির ভিত্তিতে রচিত হইয়াছে ধর্মশাস্ত্রের 'চূর্ণী' নামক বিস্তৃত গদ্য ভাষ্য। চূর্ণীগুলি দিগম্বর সম্প্রদায়ের রচনা; এই চূর্ণীগুলির ভিতর গুণধর প্রণীত 'কসায়পাহুড়চুন্নী' বহুবিখ্যাত। নির্যুক্তি ও চূর্ণীর তাত্ত্বিক মূল্য তো আছেই, ইহাদের সাহিত্যিক

আবেদন প্রধানতঃ গল্পের দিক হইতে। সুপ্রাচীন কত কথা, কত প্রাচীন জনশ্রুতি-মূলক কাহিনী যে ইহাতে বিবৃত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা কঠিন।

(ii) **জৈন রামায়ণ**—রামায়ণের রাম-রাবণ কাহিনী এদেশের জনমানসে অমর অক্ষরে মুদ্রিত। জৈনগণ এই কাহিনীকে অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, প্রচলিত রামায়ণকথা মিথ্যা-শ্রুত ['মিচ্ছাসুয়ং'] ; এই মিথ্যা-শ্রুত কাহিনীর একটি সত্য ব্যাখ্যা অর্থাৎ জৈন মতানুসারী ব্যাখ্যাই জৈন রামায়ণ। মূলতঃ রাম-রাবণের প্রচলিত কাহিনী অবলম্বিত হইলেও জৈন রামায়ণের সূচনা, চরিত্র-চিত্র ও ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র। ইহার পৌরাণিক পরিবেশ ও বিশ্বাসও জৈনমতের পরিপোষক।

জৈন রামায়ণের প্রাচীনতম কবি বিমলসূরি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের কবি। কাব্যের নাম 'পউম চরিয়' (পদ্মচরিত)। এই 'পউম' বা পদ্ম হইতেছেন রাম। কাব্যখানি মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে লিপিবন্ধ। ইহার ১১৮টি সর্গ। ১-৩৫ পর্যন্ত সর্গ-গুলির নাম 'উদ্দেশ্য', তৎপরবর্তী অধ্যায়গুলির নাম 'পেব্বং' (পর্ব)। ইহা 'সেনিয়' (শ্রেণিক) বিম্বিসারের প্রশ্নের উত্তরে মহাবীর শিষ্য 'গোয়ম' (গোতম) এর বিবৃতি। প্রকৃতপক্ষে কাব্যের সূচনা তৃতীয় উদ্দেশ্য হইতে পুরাণের ঢংয়ে সৃষ্টিতত্ত্ব লইয়া। তাহার পর রাবণ ও বানর বংশের পূর্বানুবৃত্তির বর্ণনা। রাবণ জৈন উপাসক। তাঁহার একটিই মুখ ; কিন্তু তাঁহার মাতা কণ্ঠে একটি বিচিত্র মুক্তামালা পরাইয়া দেওয়ায় তাহাতে নয়টি মুখ প্রতিবিম্বিত হইত ; এইজন্য তাঁহার নাম হয় 'দশমুখ'। দশমুখ তপোবলে দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি ইন্দ্রকে বন্দী করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্মফলে তাঁহাকে বানর ও রামের হস্তে মৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছিল। রাম-কাহিনীর আরম্ভ একবিংশতি উদ্দেশ্য হইতে। তাহার পর ঘটনা প্রচলিত রামায়ণের অনুরূপ হইলেও পার্থক্য অল্প নয়। রাম শেষ পর্যন্ত জৈন মত গ্রহণ করিয়া নির্বাণ লাভ করেন। রাবণের মহিমা এখানে উজ্জ্বলরেখায় চিত্রিত।

জৈন রামায়ণ আরও লেখা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা সংস্কৃতে। তাহাদের ভিতর রবিসেনের পদ্মচরিত ও হেমচন্দ্রের 'ত্রিষষ্টিশলাকা পুরুষ'-এর অন্তর্গত জৈন রামায়ণ বহুখ্যাত। সংস্কৃততেই হউক, আর প্রাকৃতেই হউক—জৈন রামায়ণের বক্তব্য সর্বত্রই এক প্রকার। এখানে বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রই জৈনপন্থী, রাক্ষসকুল জৈনভক্ত। রাবণ জিনউপাসক ও দুর্জয় শক্তিশালী। জৈনগণ মনে করেন, শান্তির একমাত্র পথ জিন-গণ প্রচারিত ধর্ম ও কর্মাদর্শ। সকলেই শেষ পর্যন্ত এই ধর্মে প্রবিষ্ট হইয়া নির্বাণ লাভ করিয়াছেন। ভক্তিবাদের দিক হইতে জৈন রামায়ণের মিল রহিয়াছে অধ্যাত্ম রামায়ণের সহিত।

(iii) **জৈন মহাভারত**—জৈন মহাভারত প্রচলিত মহাভারত হইতে ভিন্ন। ইহাতে প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে রাম (বলরাম), কেশব (কৃষ্ণ) ও অরিষ্টনেমির কাহিনী। প্রসঙ্গতঃ আসিয়াছে কৌরব-পাণ্ডবদের কথা। এই জন্য ইহার চলিত নাম 'হরিবংশ-পুরাণ'। প্রাকৃতে, সংস্কৃতে ও অপভ্রংশে এই ধরনের কয়েকখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

তন্মধ্যে প্রাচীনতম জিনসেন-রচিত হরিবংশপুরাণ (৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দ)। মহাবীর-শিষ্য গোতম ইহার প্রবক্তা এবং গ্রন্থখানি জৈনমতের বাহন। ইহার সূচনা আদি জিন ঋষভের কাহিনী লইয়া। সুযোগ উপস্থিত হইলেই গ্রন্থমধ্যে জৈনধর্মের প্রচার করা হইয়াছে। বিশিষ্ট প্রচারক তীর্থংকর অরিষ্টনেমি। কৌরবগণ শেষ পর্যন্ত জৈনধর্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং পাণ্ডবেরাও নির্বাণ মার্গে প্রবেশ করিয়াছে।

হরিবংশপুরাণের বীজ অঙ্গাদি গ্রন্থগুলির মধ্যেই নিহিত ছিল।

(iv) **পুরাণ বা চরিত**—সংস্কৃত পুরাণশ্রেণীর রচনা জৈন 'মহাপুরাণ'। দিগম্বর জৈনগণ ইহাকে বলেন 'পুরাণ', শ্বেতাম্বর জৈনগণ বলেন 'চরিত'। বস্তুতঃ ইহা ৬৩ জন মহাপুরুষের [২৪ জন তীর্থংকর, ১২ জন চক্রবর্তী রাজা এবং ২৭ জন বীর (৯ জন বলদেব, ৯ জন বাসুদেব এবং ৯ জন প্রতিবাসুদেব)] জীবন-কাহিনী। প্রসঙ্গতঃ বর্ণিত হইয়াছে সৃষ্টিতত্ত্ব, ঐতিহাসিক কথাকাব্য এবং জৈনধর্মের মূল আদর্শ। পুরাণ বা চরিত গ্রন্থগুলির ভিতর কোন কোনটি বিশিষ্ট কোন তীর্থংকর, কিংবা চক্রবর্তী রাজা কিংবা বীরের চরিত—কোন-কোনটি আবার ৬৩ মহাপুরুষের সমগ্র কাহিনী। ইহাদের ভিতর বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য দিগম্বর সম্প্রদায়ের জিনসেন গুণভদ্র-বিরচিত 'ত্রিষষ্টি লক্ষণ মহাপুরাণ' এবং শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের হেমচন্দ্র-বিরচিত 'ত্রিষষ্টি শলাকাপুরুষ চরিত'। ইহাদের কোনটিই প্রাকৃত রচনা নয়। পণ্ডিতগণ মনে করেন, এই ধরনের পুরাণ বা চরিতগুলির উৎস হইতেছে প্রাকৃতে রচিত 'চউপন্ন মহাপুরিসচরিয়' (শীলাচার্য) কিংবা 'বসুদেব হিণ্ডি' (সংঘদাস গণিন)।[1] কিন্তু মনে হয়, জৈন রামায়ণ হউক, মহাভারত হউক (হরিবংশ) কিংবা পুরাণ বা চরিত হউক—উহাদের মূল উৎস হইতেছে প্রাচীন অঙ্গাদি শাস্ত্র এবং অধুনালুপ্ত 'পূর্ব'। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে যাহার অংকুর, পরবর্তীকালে তাহাই বিটপিত হইয়াছে পুরাণ বা চরিত গ্রন্থগুলির ভিতর।

পুরাণ বা চরিত গ্রন্থগুলি জৈনধর্মের বিশ্বকোষ। জৈন ধর্মের যাবতীয় কথা —আচার-আচরণ, ধর্মতত্ত্ব, জিন-চরিত্র, উপাসক-চরিত্র, সৃষ্টি তত্ত্ব, জৈনদর্শন—সমস্ত কিছুই ইহার অন্তর্ভুক্ত। জাতকর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া জৈন-সংস্কারগুলিব বিবরণও ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সর্বোপরি এই চরিত গ্রন্থগুলির প্রধান আকর্ষণ বীরাত্বাভিযানমূলক রোমাঞ্চকর গল্প। এই গল্পগুলি জৈন কর্ম ও জন্মান্তরবাদের ভিত্তিতে রচিত হইলেও জীবনের স্বাদে পূর্ণ। কোন-কোন অংশ রীতিমত অলংকার-সমৃদ্ধ কাব্য।

(v) **ধর্মকথা বা কাব্য**—ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে জৈনগণ যে পুরাণ বা চরিত-সাহিত্যগুলি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেই কাব্য ও মহাকাব্যের বীজ নিহিত ছিল। কোন কোন বিচ্ছিন্ন অংশ মহাকাব্যেরই লক্ষণাক্রান্ত—কি কাহিনীর দিক

---

1. A History of Indian Lit.—Vol. II—Winternitz (Foot note I. P. 506)

হইতে, কি বর্ণনাভঙ্গির দিক হইতে। এগুলি ছাড়া জৈনদের ভিতর প্রাকৃতে ও অপভ্রংশে কাব্য ও মহাকাব্য ধরনের গ্রন্থ প্রচুর লেখা হইয়াছিল। এগুলিও প্রকারান্তরে চরিতসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। জৈনগণ এই সকল কাব্যকে বলেন 'ধর্মকথা' (ধম্মকহা)। মূলতঃ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হইলেও—কৌতূহলোদ্দীপক রোমাঞ্চকর কাহিনীর বর্ণনায় এবং রচনার পারিপাট্যে উহারা কাব্যের মতই আস্বাদ্য। কোন-কোন স্থলে রচনার কারুকার্য সংস্কৃত কাব্যের সমানধর্মা। এই ধরনের অসংখ্য রচনার ভিতর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হরিভদ্র সূরীর 'সমরাইচ্চকহা'।[১] গ্রন্থখানি মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে গদ্যে লিখিত ; মাঝে মাঝে আর্যাছন্দের পদ্য। ভূমিকার অংশ বাদে ইহা নয়টি 'ভব' অর্থাৎ অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলিকে 'ভব' নাম দেওয়ার কারণ, ইহাতে নায়ক-নায়িকাদের পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মফলহেতু বিভিন্ন যোনিতে জন্ম-গ্রহণের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। কর্মজন্য জন্মকেই জৈনগণ 'ভব' বলিয়া থাকেন। 'সমরাইচ্চকহা' এই কর্ম ও জন্মান্তরবাদের ভিত্তিতে রচিত 'ধম্মকহা' (ধর্মকথা)। এই ধরনের ধর্মকথা প্রাচীন অঙ্গাদি শাস্ত্রেও বিবৃত হইয়াছে (যেমন, নায়ধম্মকহাও)। 'সমরাইচ্চকহা'র সূচনা আদি তীর্থংকর ঋষভ-এর বন্দনা লইয়া।[২] ভূমিকাংশে গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীগুলির একটি সূচী আছে, এই সূচী প্রাচীন আচার্যগণের উক্তিরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাদ্বারা মনে হয়, 'সমরাইচ্চকহা'র উৎস প্রাচীন। নয়টি ভবে যথাক্রমে বিজয়সেন, অমরগুপ্ত, বিজয়সিংহ, যশোধর, সনৎকুমার, অর্হদত্ত, চন্দ্রা ও সুসঙ্গতার কথা এবং শেষভবে কয়েকটি নীতিমূলক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। রূপকথা, বীরত্ব-অভিযান ও প্রেমের কাহিনীরূপে উহাদের আবেদন অসামান্য। পঞ্চম ভবের সনৎকুমার-বিলাসবতীর উপাখ্যান একটি প্রেমেরই উপাখ্যান। অষ্টম ভবের সুসঙ্গতার কাহিনীটিও সুন্দর। সুসঙ্গতা জৈন সন্ন্যাসিনী। কিন্তু তাঁহাকেও জন্মজন্মান্তরের কর্মফল ভোগ করিতে হইয়াছে। পূর্বজন্মের সামান্য দুষ্কৃতির ফলে তাঁহাকে হস্তী, কপি, বিড়াল, চণ্ডাল, শবর-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। শবরীজন্মে শবরেরা তাঁহাকে গ্রাম হইতে বিতাড়িত করে। জনৈক সাধুর সেবা করিয়া তিনি পরজন্মে কোশলরাজের রাণী হন। কিন্তু এ জন্মেও তাঁহাকে দুর্গতি ভোগ করিতে হয়। এক যক্ষী রাণীর রূপ ধরিয়া রাজাকে কুহকমুগ্ধ করিয়া বুঝায় যে, সুসঙ্গতা এক যক্ষিণী। রাজা তাঁহাকে নির্বাসিত করেন। দুঃখে সুসঙ্গতা আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে এক সাধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহার নিকট সুসঙ্গতার পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। ইতিমধ্যে রাজা নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া সুসঙ্গতাকে খুঁজিয়া বাহির করেন এবং অবশেষে রাজা ও রাণী উভয়েই জৈনধর্ম গ্রহণ করেন। 'সমরাইচ্চকহা'য় লেখকের শিল্পকুশলতার

১. Edt. by H jacobi [Bibl. Ind. Vol. I]
২. পণমহ বিজয় সুদুজ্জয় নিজ্জিয় সুরমনুষ বিসমসরপরং।
তিহুয়ণ মংগল নিলয়ং বসহগইগয়ং জিনং উসহং ॥

পরিচয় যথেষ্ট আছে। রচনায় সংস্কৃত কাব্যের আলংকারিক রীতির প্রকাশ অতি স্পষ্ট।

অপভ্রংশ ভাষায় রচিত পুষ্পদন্তের 'জসহরচরিউ', ধনপালের 'ভবিসসত্ত কহা' প্রভৃতিও উৎকৃষ্ট কাব্য।

(vi) **ছোট গল্প বা কথানক**—জৈনশাস্ত্র কথার কল্পতরু। অঙ্গাদিশাস্ত্রে এবং অঙ্গবাহ্য নির্যুক্তি, চূর্ণি, পুরাণ, চরিত ও কাব্যে অসংখ্য কথার সমাবেশ। এইদিক হইতে ভারতীয় কথাসাহিত্যে জৈনদের দানই সর্বাগ্রগণ্য।

পুরাণ, চরিত বা ধর্মকথার কথাগুলি অনেকটা বড় গল্প বা উপন্যাসের সমধর্মী। কিন্তু নির্যুক্তি বা চূর্ণিতে পাওয়া যায় ছোট ছোট কথা। বৃহৎ কাহিনীগুলির মধ্যেও বহু ক্ষুদ্র কাহিনী স্থান লাভ করিয়াছে। জৈনসাহিত্যে এই ক্ষুদ্র কাহিনীগুলির নাম দেওয়া হইয়াছে 'কথানক' বা ছোট গল্প।

যদিও পরবর্তীকালে কথানকগুলির সংকলন পাওয়া যাইতেছে অপভ্রংশে বা সংস্কৃতে, তথাপি মূলে উহা যে প্রাকৃত ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। কথা সৃষ্টি হইয়াছে লোকমুখে এবং লোকমুখের ভাষায়। নির্যুক্তি বা চূর্ণিতেও যেখানে ভাষ্য-ব্যাখ্যা লেখা হইয়াছে সংস্কৃতে, সেখানেও কথার প্রসঙ্গ বিবৃত হইয়াছে প্রাকৃতে।

ধর্মসাহিত্যের অন্তর্গত প্রাকৃত 'কথানক' হিসাবে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য অজ্ঞাতনামা লেখকের 'কালকাচার্য কথানক'। ইহা গদ্যে-পদ্যে মিশানো। কল্পসূত্র পাঠান্তে ইহা আবৃত্তি করার নিয়ম। কালক নামক এক রাজপুত্র কিরূপে জৈনধর্ম গ্রহণ করিয়া মুখ্য আচার্যের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, তাহাই কথানকটির বর্ণনীয় বিষয়। নামে কথানক হইলেও ইহা একটি ছোটখাট কাব্য। কালকের ভগ্নী ছিলেন সরস্বতী। উজ্জয়িনীরাজ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যান। কালক উন্মাদের বেশে উজ্জয়িনীতে গিয়া প্রজাদিগকে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলেন এবং শকরাজাদের উজ্জয়িনীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অনুপ্রেরিত করেন।

সংস্কৃতে ও অপভ্রংশেও জৈনগণ কথানক রচনা করিয়াছিলেন। তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'উত্তম চরিত্র কথানক', 'চম্পকশ্রেষ্ঠি কথানক' ও 'পালগোপাল কথানক'।

পরবর্তীকালে কথার সংকলন করা হইয়াছে 'কথাকোষ' নামক কোষগ্রন্থগুলিতে। 'কথানককোষ'ও সংকলিত হইয়াছে।

৩. জৈন শাস্ত্র-সাহিত্যের মূল্য বিচার

বিপুলাকার জৈনশাস্ত্রের প্রধান লক্ষ্য জৈন ধর্মের আদর্শ প্রচার। প্রধানতঃ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে জৈন জীবন-দর্শন। বৌদ্ধধর্মের মত জৈনধর্মও নীতির ধর্ম, সর্বতোভাবে সৎ-জীবন যাপন করাই ইহার মূল লক্ষ্য। আস্তিক দর্শনমতে আত্মা অনাদি ও অপরিণামী। জৈনমতে আত্মা অনাদি হইলেও অপরিণামী নহে। এই আত্মা নির্লেপ, নির্গুণ বা নিষ্ক্রিয়ও নয়—ইহা ক্রিয়াশীল। আত্মা জন্মগ্রহণ করে, কর্মানুসারে স্বর্গ ও নরকাদি ভোগ করে, এই কর্ম বিনষ্ট হইলেই নির্বাণ বা

মোক্ষ। জৈনদর্শনে পুদ্গল, আকাশ, ধর্ম, অধর্ম ও কাল—এই পাঁচটি তত্ত্বকে স্বীকার করা হইয়াছে। ইহাদের সমষ্টি 'অজীব'। 'জীব' হইতেছে এই পাঁচটি ও উহাদের অতিরিক্ত চৈতন্যধর্মের সমষ্টি। জীবের মনোভাবের নাম 'লেস্সা'। যাহাদ্বারা জীব কর্মের সহিত যুক্ত হয়, তাহা 'আস্রব'। ক্রোধ, মান, মায়া (ছলনা) ও লোভ—এই চারিটি 'কষায়'। এই কষায়ের আবির্ভাব ও তিরোভাব দ্বারা আস্রবের স্থিতিকাল ও বিপাক নিরূপিত হয়। কষায়ের অধীন হইয়াই জীব কর্মযোগ্য 'পুদ্গল' গ্রহণ করে। ইহাই 'বন্ধ'। আস্রব নিরোধের নাম 'সংবর'; কর্মবন্ধের আংশিক ক্ষয়ের নাম 'নির্জরা', পূর্ণ কর্মক্ষয়ের নাম 'মোক্ষ'। মোক্ষ লাভের পূর্বে 'কেবল জ্ঞান' (সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বদর্শিত্ব) লাভ হয়, উহা সুখ ও বীর্যের পূর্ণাবস্থা ও মোক্ষের পূর্বাবস্থা।

জৈনদর্শনে এইভাবে যেমন আত্মার বন্ধনক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে, তেমনই বন্ধ-নিরোধের উপায়ও প্রদর্শিত হইয়াছে। এই উপায়গুলিই জৈনদের সাধনা, সংসার-বাসনা জয় করিয়া 'লেস্সাতিশায়ী' হওয়াই এই ধর্মের শেষ কথা। সেই স্তরে উপস্থিত হইবার জন্যই সাধনা। সাধনার অঙ্গ : সম্যগ্ দর্শন, সম্যগ্ জ্ঞান ও সম্যক চরিত্র। ইহাই জৈনদের 'ত্রিরত্ন'। এই ত্রিরত্নের অন্তর্গত পঞ্চব্রত ১. জীবহত্যা না করা (অহিংসা) ২. মিথ্যাকথা না বলা (সত্য) ৩. চুরি না করা (অস্তেয়) ৪. মৈথুন হইতে বিরত হওয়া ৫. লোভ বশতঃ কাহারও কিছু গ্রহণ না করা (অপরিগ্রহ)।

মহাবীর 'কেবল জ্ঞান' লাভ করিয়া এই পাঁচটি ব্রতের কথাই ঘোষণা করিয়া-ছিলেন—'ন'এব পাণাটিবায়ং করেজ্জা' [প্রাণিহত্যা করিও না], 'ন'এব মুসং ভাসেজ্জা' [মিথ্যা কথা বলিও না], 'ন'এব অদিন্নং গিণ্হেজ্জা' [অদত্ত বস্তু গ্রহণ করিও না], 'ন'এব মেহুণং গচ্ছে' [মৈথুন গমন করিও না], 'ন'এব পরিগ্গহং গেণ্হেজ্জা [পরিগ্রহ গ্রহণ করিও না]।[১]

জৈনধর্ম এই পঞ্চব্রতের কঠিন নিগড়ে বাঁধা। সর্বাপেক্ষা বড় কথা 'অহিংসা'। 'ন হনে পাণিণো পাণে'—কায়োমনোবাক্যে এই ব্রতের পালন জৈনধর্মের একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। আর একটি কঠোর সাধনা দেহকে উপেক্ষা করা (শরীর প্রত্যাখ্যান) অর্থাৎ কৃচ্ছ্রসাধনা। জিনপ্রবর মহাবীরের জীবন এই অহিংসা ও কৃচ্ছ্রসাধনার জ্বলন্ত উদাহরণ।

জৈন আদর্শ ও জৈন জীবন-দর্শন যেমন জৈন সাহিত্যের একদিক, উহার অপরদিকে সেই আদর্শে গঠিত মহাপুরুষ-চরিত। জৈনশাস্ত্র ধার্মিক মহাপুরুষ চরিত্রের ভাণ্ডার। বৌদ্ধসাহিত্যে এ ধরনের পূর্ণাঙ্গ চরিতালেখ্য নাই। ব্রাহ্মণ্য পুরাণে অবশ্য বংশানুচরিত এবং সেই প্রসঙ্গে অবতার ও অবতারকল্প জীবনের চিত্র আছে। তথাপি এ বিষয়ে জৈনসাহিত্যের দানই সর্বাগ্রগণ্য। জৈন পুরাণের আর এক

---

১. আয়রংগ সুত্ত দ্বিতীয় স্কন্ধ, ১৫ অজ্ঝয়ণ।

নামই 'মহাপুরিসচরিউ' বা 'উত্তমপুরিসচরিউ'। কাব্যাকারে এ ধরনের চরিত্র যে কত আছে তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। তাহাদের সাহিত্যিক মূল্যও অল্প নয়।

জৈনসাহিত্যের আর এক দিক 'ধর্মকথা'। এই ধর্মকথার লক্ষ্য জৈনধর্মের মহিমা প্রচার, কিন্তু ইহার ভিত্তি কোন-না-কোন মনোজ্ঞ কাহিনী। এই কাহিনী প্রকারান্তরে কাব্য। এগুলিতে মানবজীবনের প্রেম, বীরত্ব, ধর্মের আকুতি, সুখদুঃখ ও আশা কামনার বিচিত্র সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। ঠিক এই ধরনের ধর্মকথাকাব্য বৌদ্ধসাহিত্যে নাই। ব্রাহ্মণ্যসাহিত্যে কিছু কিছু আছে। কিন্তু জৈন সাহিত্যই এই প্রকারের ধর্মকথা বর্ণনায় শীর্ষস্থানীয়।

এই ধর্মকথার আর একটি দিক 'কথানক' বা ছোট গল্প।

কথাসাহিত্যের দিক হইতে জৈনশাস্ত্রসাহিত্য কথার রাজা। রূপক, রূপকথা, কিংবদন্তী, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক আখ্যায়িকা, নীতিকথা, প্রেম-বীর্য-অভিযানের কাহিনী—সব মিলিয়া যেন কথার মহামহোৎসব। কথার বৈচিত্র্য, চমৎকারিত্ব ও মাধুর্যের দিক হইতে ইহাদের মূল্য বৌদ্ধ জাতক বা অপদান, কিংবা বিষ্ণুশর্মা-কথিত পঞ্চতন্ত্র হইতেও অধিক আকর্ষণীয়। জৈন কথায় জীব-জন্তু কাহিনীর স্থান নিতান্ত গৌণ, মানব-কাহিনীর সংখ্যা অগণিত। এই কাহিনী কোথাও চরিতাকারে, কোথাও কাব্যাকারে (পদ্যে কিংবা গদ্যে), কোথাও মহাকাব্যাকারে, কোথাও বা কথানককাকারে বর্ণিত হইয়াছে। জৈন শাস্ত্রের সাহিত্যিক মূল্য বিচারে এই কথাগুলির দান উপেক্ষণীয় নয়।

জৈনশাস্ত্রসাহিত্যের আর একটি বিশিষ্টতা কাব্যময় প্রকাশভঙ্গি। যে কোন ভাবই হউক, হউক ধর্ম বা নীতি উপদেশ, কিংবা কোন কাহিনী—তাহার প্রকাশে দৃষ্টান্ত, রূপক বা ঔপম্যগর্ভ বাচনের ছড়াছড়ি। 'এবং মে সুয়ং' [এবং ময়া শ্রুতম্] বলিয়া যাঁহারা বাক্য আরম্ভ করিয়াছেন, এবং 'ত্তি বেমি' ['ইতি ব্রবীমি'] বলিয়া শেষ করিয়াছেন, তাঁহারা যেন স্বভাব কবি। অঙ্গ-বাহ্য গ্রন্থগুলিতে এই কবিত্ব আরও সুপ্রকট। জৈনশাস্ত্রের অলঙ্কারসমৃদ্ধ প্রকাশরীতি বহুলাংশে আলঙ্কারিক যুগের রচনা-রীতির স্মারক।

৪. জৈনধর্ম ও বাংলাসাহিত্য

খ্রীষ্টপূর্বযুগে বঙ্গদেশে জৈনধর্মের প্রসার ছিল। জৈনদের প্রাণপুরুষ মহাবীর রাঢ়াভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেদিন পরিব্রাজক মহাবীরের প্রতি সুহ্ম ও বজ্রভূমির লোকেরা ছুছুশব্দে কুকুর লেলাইয়া দিয়া যে দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন, আয়ারঙ্গ সূত্রে তাহার চিত্র রহিয়াছে। কিন্তু ইহার পরেই দেখা যায়, এদেশে জৈনধর্ম প্রচারিত হইতেছে। মহাবীরশিষ্য সুধর্ম ও প্রশিষ্য জম্বুস্বামী পৌণ্ড্ররাজ্যে ধর্মপ্রচার করেন।[১] শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুর জন্মস্থান পৌণ্ড্রবর্ধনে কোট্টপুরে। তিনি বিখ্যাত

---

১. গৌড়ের ইতিহাস—রজনীকান্ত চক্রবর্তী।

জৈন গণনায়ক। সুদূর কর্ণাট পর্যন্ত তিনি জৈনধর্ম প্রচার করেন। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন তাঁহার শিষ্য। ভদ্রবাহুকল্পসূত্রের স্থবিরাবলীর তালিকায় দেখা যায়, ভদ্রবাহুর চারিজন শিষ্য ছিলেন—গোদাস, অগ্নিদত্ত, জনদত্ত ও সোমদত্ত। গোদাস হইতে চারিটি শাখা প্রবর্তিত হয়—তাম্রলিপ্তিকা, কোটিবর্ষীয়া, পুণ্ড্রবর্ধনীয়া ও দাসীকর্বটিয়া। এই স্থানগুলি প্রাচীন বঙ্গের বিশিষ্ট স্থান।

খ্রীষ্টপর শতাব্দীতেও এদেশে জৈনধর্ম প্রচলিত ছিল। বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে অসংখ্য জৈনমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উত্তরবঙ্গ ছিল জৈনধর্মের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র। ১৫৯ গুপ্তাব্দে অর্থাৎ ৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে খোদিত পাহাড়পুরের একটি অনুশাসনে দেখা যায়, ব্রাহ্মণ নাথশর্মা ও তাঁহার পত্নী রামী বটগোহালীর একটি জৈন বিহারে অর্হৎদিগের গন্ধ, ধূপ, পুষ্প, দীপাদি উপচার নির্বাহের জন্য দেড়কুলব্যাপী ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন।[১] সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েনসাঙের বিবরণ হইতে জানা যায়, তখনও এদেশে জৈন বিহার ও জৈন শ্রমণের অসদ্ভাব ছিল না। পৌণ্ড্রবর্ধনে ও সমতটে দিগম্বর জৈনদের কেন্দ্র ছিল।

জৈনধর্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধধর্ম প্রসারের সহিত জৈনধর্ম ক্ষীণ হইয়া যায়। পুণ্ড্রবর্ধনে সম্রাট অশোকের ভ্রাতা বীতশোক নিহত হইলে জৈনদের উপর যে ভীষণ হত্যালীলার তাণ্ডব চলিয়াছিল, জনশ্রুতি ও বৌদ্ধ অবদান সাহিত্য তাহার সাক্ষ্য। গৌড়বঙ্গে পালরাজাদের সময় মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে। ইহার ফলে এদেশে জৈন প্রভাব স্তিমিত হইয়া আসে এবং জৈনধর্ম অবজ্ঞা ও তির্যককটাক্ষের বিষয়ীভূত হয়। সরহপাদের দোহায় জৈনদিগম্বরদেব প্রতি সুতীব্র শ্লেষ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে ঃ

জই নগ্গা বিঅ হোই মুত্তি তা শুনহ-শিআলহ।

—যদি নগ্ন থাকালই মুক্তি হয়, তাহা হইলে কুকুর-শিয়ালেরও মুক্তি হইবে।

অত্যাচারে ও অবজ্ঞায় এবং নগ্নতা অবলম্বন হেতু জৈন প্রভাব প্রায় লুপ্ত হইয়া যায় এবং খুব সম্ভব কিছু জৈন-সংস্কাব নিম্নশ্রেণীকে আশ্রয় করিয়া এদেশে টিকিয়া থাকে। এই সূত্রে খানিকটা জৈন-প্রভাব লোকলোচনের অন্তরালে এদেশের ধর্মকর্মে, সংস্কারে ও সাহিত্যে স্থান করিয়া লইয়াছে।

(1) অহিংসা পরমধর্ম এই নীতিবাক্য যদিও প্রায় সকল ধর্মেরই অন্যতম মূল সুর—তথাপি জৈন, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্মেরই ইহা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বাঙালীর হৃদযে ভগবান বুদ্ধ 'সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্' মূর্তিতে অমর আসনে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই অহিংসার অন্যতম প্রচারক জৈনগণ। চিন্তায় ও কর্মে অহিংসানীতির প্রয়োগ এবং এই নীতি লইয়া বাড়াবাড়ি জৈনদের ভিতর যেমন, তেমন অন্যত্র নয়। জৈনদের আহার-বিহারে সংযম, অঙ্গ-মালিন্য, নগ্নতা, পর্যুষণ (বর্ষাব্রত) সমস্ত

---

১. বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম খণ্ড)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিছুই প্রাণাতিপাতের ['প্রানাটিবায়ং'] প্রতিষেধক। মনে হয়, বাংলার অহিংস বৈষ্ণবধর্মে, যে ধর্মে অহিংসার প্রতীকরূপে 'কাটা-কুটা' কথাটিও নিষিদ্ধ তাহাতে জৈনদের 'মনসা বয়সা কায়সা' অহিংস নীতির প্রভাব বিদ্যমান। বৈষ্ণবদের 'চতুর্মাস্যা' ব্রতপালনেও জৈনদের পর্যুষণব্রতের প্রচ্ছন্ন প্রভাব আছে।

(ii) জৈনদের আর একটি বৈশিষ্ট্য 'শরীর প্রত্যাখ্যান' বা কৃচ্ছ্রসাধনা। উপবাস দ্বারা শরীর ক্ষয় করা, এমন কি উপবাসে দেহপাত বরণ করা (ইত্বর বা ইঙ্গিত মরণ) উহাদের বিশিষ্ট সাধনা।[১] জৈনশাস্ত্রে অসংখ্য কাহিনীতে বিশেষ করিয়া অঙ্গান্তর্গত 'অন্তগদদসাও' গ্রন্থে এই ধরনের কঠিন দেহচর্যার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। ভারতীয় হঠযোগে, নাথধর্মে এবং বাংলার ধর্মঠাকুরের উপাসনায় এই দেহ-ক্লেশকর আচরণের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। বাংলার ধর্মমঙ্গলে এই কৃচ্ছ্রসাধনার দৃষ্টান্ত চরমে উঠিয়াছে। রামদাস আদকের অনাদিমঙ্গলে বলা হইয়াছে 'প্রাণদণ্ড প্রভুর আরতি।' জীবন তুচ্ছ করিয়া এই আরতি করিয়াছেন রাণী রঞ্জাবতী 'চাঁপাই সেবনে' ; 'ঊর্ধ্বপদ অধতুণ্ডে' অনলশিখায় দুশ্চর তপস্যা, উচ্চমঞ্চ হইতে অর্ধচন্দ্র বাণে ঝাঁপ দেওয়া এবং সর্বোপরি 'শালেভর' জৈন 'ইত্বর' বা ইঙ্গিত মরণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। লাউসেনও এই ধরনের তপস্যা করিয়াছেন 'হাকন্দ সেবনে'। 'ধন ধর্ম হয় গো অনেক দুঃখ পেলে'— ইহাই দুশ্চর ধর্মসাধনার মূল কথা। এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ জৈন বিশ্বাসের অনুকূল। ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনায় ও ধর্মের উপাসনায় অনেক কালের অনেক সংস্কার আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে। কালক্রমে জৈন প্রভাবও ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে। জৈনধর্মের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র 'চম্পা'। ধর্মমঙ্গলের 'চম্পা', 'চম্পক' বা 'চাঁপাই'-এর সহিত উহার যোগ আছে বলিয়া মনে হয় ঃ কারণ এই চাঁপাই প্রসঙ্গে রূপরাম বলিতেছেন, 'তপ কর্যা এখানে মরিল কত মুনি।' ইহা যেন জৈন আচার্যগণের সাধনা দ্বারা দেহপাতের প্রতিধ্বনি। জৈন 'শরীর প্রত্যাখ্যানে'র জের ধর্ম বা শিবের মাধ্যমে গাজন উৎসবগুলির ভিতর আসিয়া ঠেকিয়াছে। ধর্মের নামে 'হত্যা' দেওয়ার ব্যাপারটিতেও জৈন প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়।

(iii) আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় বলেন, "বাংলায় অনেক শব্দের সঙ্গে জৈন শব্দের মিল দেখা যায়। জৈন-সাহিত্যে 'পল্লীগ্রাম' শব্দের রীতিমত ব্যবহার দেখা যায়। জৈন সাধুদের উত্তরীয়ের নাম 'পছেড়ী', রাঢ়ে উত্তরীয়কে প্রাচীনেরা বলিতেন 'পাছুড়ী', এই শব্দটি এখনও গ্রামে লুপ্ত হয় নাই। ধূলা ঝাড়িবার জন্য (রজোহরণার্থ) জৈন সাধুরা যে ঝাঁটা ব্যবহার করেন তাহাকে তাঁহারা 'পীছী' বলেন, পূর্ববঙ্গে ঝাঁটাকে বলে 'পিছা'।" [চিন্ময় বঙ্গ]

(iv) কয়েকটি দিক হইতে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গেও জৈন সাহিত্যের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এদেশের নাথধর্ম ও নাথসাহিত্য বহুল পরিমাণে জৈনভাবকে আত্মসাৎ

---

১. জৈনধর্মে ইহাকে বলে 'ভক্তপাণপ্রত্যাখ্যানমুক্তি' [AKARANGA Sutra— H. Jacobi].

করিয়া লইয়াছে। কঠোর ব্রহ্মচর্যপালন এবং কঠিন ব্রতে বিন্দুধারণ নাথধর্মের প্রধান আদেশ। এই আদেশটির সহিত মহাবীর প্রচারিত 'ণ এব মেহুণংগচ্ছে' নির্দেশের শুধু সঙ্গতি নয়, অন্তরঙ্গ যোগ আছে। যতি গোরক্ষনাথ জৈন তীর্থংকরদের মতই সুকঠিন ব্রহ্মচর্যে সংযত—'কাষ্ঠা সমতুল'। কেহ কেহ গোরক্ষনাথকে জৈনই বলিয়া থাকেন।

জৈনগণ 'নিঘৃ্ণ' অর্থাৎ ঘৃণার ঊর্ধ্বে। ইঁহাদের অনেকে চণ্ডালকুলে উৎপন্ন। উত্তরাধ্যয়নের [দ্বাদশ অধ্যয়ন] হরিকেশ ছিলেন 'সোপাগকুল'-সম্ভূত। একদিন ব্রাহ্মণগণ হুংকার করিয়া উঠিলেন, 'কয়বে আঅচ্ছই' ('কে আসে রে' !) তাঁহারা হরিকেশকে দেখিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইলেন। তখন ব্রাহ্মণ-পত্নী ভদ্রা বলিলেন, ইনি চণ্ডাল হইলেও সামান্য নহেন, ইনি উগ্রতপা জিতেন্দ্রিয় ['মণোগুত্তো বয়গুত্তো কায়গুত্তো জিইন্দিও'], ইনি নরেন্দ্র-দেবেন্দ্র-বন্দিত। ঠিক এই ধরনের প্রতিধ্বনি শুনি গোপীচন্দ্রের গানে। গোবিন্দচন্দ্র হাড়িসিদ্ধাকে সামান্য ডোম বলিয়া অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিলে রাণী ময়নামতী বলিয়াছিলেন, হাড়িপা সামান্য ব্যক্তি নহেন, 'হাড়িপা হাড়ের সিদ্ধা', স্বয়ং ইন্দ্র তাঁহাকে ব্যজন করেন, তিনি গুপ্তবেশে আছেন 'গুপ্তবেশে বাউলরূপে আছে এই ঠাঁই।' এই হাড়িপার অলৌকিক ক্ষমতা। তিনি যোগবলে নারিকেল বৃক্ষের ডাল নামাইয়া নারিকেল ছিঁড়িয়া লন ঃ

হেটমুণ্ড হইল গাছ লোটে ভূমিতল।
ছিণ্ডিয়া পুত্রের হাতে দিল নানা ফল ॥ [গোপীচন্দ্রের গান]

এই ধরনের একটি কাহিনী পাই জৈন সাহিত্যেও। এক ব্যক্তি ফল আহারে উদ্যত হইয়া নিজের মুণ্ডকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করে এবং ফল ভোজনান্তর মুণ্ড যথাপূর্ব নিজের দেহে সংলগ্ন করে।[১] গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্গে মিল দেখা যায় নমিরাজার সন্ন্যাসের।[২] নমিরাজার অভিনিষ্ক্রমণকালে মিথিলার প্রজাগণের ক্রন্দন-কোলাহল যেন গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে প্রজাগণের করুণ উতরোলের অনুরূপ ; সন্ন্যাসগ্রহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ গোপীচন্দ্রের কৈফিয়তগুলিও নমিরাজার উক্তির সদৃশ।

নাথধর্মে জৈন প্রভাব কল্পনা অনৈতিহাসিকও নয়। কারণ বহুদিন পর্যন্ত জৈনদের বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল উত্তরবঙ্গ। কোট্টপুর, সোমপুর প্রভৃতি স্থানে জৈন-বিহার ছিল। নাথ-সাহিত্যও পাওয়া যাইতেছে প্রধানতঃ উত্তরবঙ্গ হইতে।

বাংলা রামায়ণে রাবণ ভক্তরূপে চিত্রিত। অধ্যাত্ম রামায়ণের রাবণও ভক্ত। কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণ অপেক্ষা জৈন রামায়ণেই জিন-ভক্ত রাবণের চিত্র অতি উজ্জ্বল। মনে হয়, বাংলা রামায়ণের রাবণের সহিত জৈন রাবণের সাদৃশ্য বেশি। অদ্ভুত আচার্যের

১. দ্রষ্টব্য—ধর্মপরীক্ষা—অমিতগতি।
২. দ্রষ্টব্য উত্তরাধ্যয়ন (৯ম অধ্যায়)।

রামায়ণে জৈন রামায়ণের নিশ্চিত প্রভাব বিদ্যমান। জৈন রামায়ণে রাক্ষস ও কপিবংশের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে কাব্যের গোড়ার দিকে। অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণেও এই বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে আদিকাণ্ডে। শ্রীমনোমোহন ঘোষ মহাশয় মনে করেন, 'মাইকেল রাক্ষসদের চরিত্র নূতনভাবে এঁকে এমন কিছু অঘটন ঘটাননি' কারণ, জৈনতত্ত্বের গোঁড়াভক্তরূপে রাক্ষসচরিত্র জৈন রামায়ণেও চিত্রিত হইয়াছে'।[১]

ব্রতের অঙ্গরূপে 'কথা' বলার পদ্ধতি হিন্দু পুরাণেও পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রতের নিয়ম-নির্দেশ ও ফলশ্রুতির কথা বর্ণিত হইলেও প্রাচীন পুরাণগুলিতে ব্রতকথা নাই। ব্রতের অঙ্গরূপে 'ধর্মকথা' আবৃত্তি করার পদ্ধতি জৈন ব্রতের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। পর্যুষণ ব্রতান্তে পাঠ করা হয় 'কালকাচর্যকথানক', পঞ্চমীব্রতে পাঠ করা হয় 'ভবিসত্ত কহা'; সুবিখ্যাত 'সমরাইচ্চ কহা'ও ধর্মকথা। জৈন সাহিত্যে এই প্রকারের 'ধর্মকথা'র সংখ্যা অসংখ্য। বাংলাদেশে বিভিন্ন ব্রতোপলক্ষে যে বিচিত্র ব্রতকথার সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাতে হিন্দুপুরাণের প্রভাবের সহিত জৈন-কথার প্রভাব কল্পনা করা অসঙ্গত নয়। ব্রতকথার সূত্র ধরিয়া দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে এই ধর্মকহার প্রভাব 'বাংলা মঙ্গলকাব্যে'ও অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। জৈনধর্ম-কথার সহিত এই মঙ্গলকাব্যকাহিনীর আশ্চর্য সাদৃশ্যও লক্ষিত হয়। জন্মান্তরের কর্মফল ভোগ করিবার জন্য দেবলোক হইতে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ, প্রেম, বীরত্ব ও অভিযানমূলক জীবনযাত্রার ভিতর দিয়া ধর্ম-মহিমা প্রচার এবং ধর্ম প্রচারান্তে দেবলোকে জন্মগ্রহণ—এইগুলিই জৈন ধর্মকথার বর্ণনীয় বিষয়। ঠিক এই প্রকারের কাহিনীরই বিস্তার দেখা যায় বাংলা মঙ্গলকাব্যে। মনে হয়, প্রাকৃতে ও অপভ্রংশে জৈনদের ভিতর যে 'কথা' প্রচলিত ছিল, তাহারই ধারা প্রসৃত হইয়াছে বাংলার জনসাধারণের জীবনে এবং জৈনধর্ম বাংলাদেশ হইতে লুপ্ত হইলেও তাঁহাদের ধর্মভাব ও কাহিনী-সম্পদ এদেশ হইতে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। লোকজীবন হইতে উহা বাংলার লৌকিক সাহিত্যে স্থান করিয়া লইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে বাংলার কথাসাহিত্য—রূপকথা, ব্রতকথা ও রসকথার বিষয়ও স্মরণীয়। বাংলা কথাসাহিত্যের বহু উপকরণ জৈন কথাসাহিত্য হইতে সংগৃহীত। 'সমরাইচ্চ কহা'র সুসঙ্গতা-কাহিনীর সহিত কাঞ্চনমালা-কাঁকণমালা গল্পের মিল রহিয়াছে।

বাংলায় বৈষ্ণবগণই প্রথম মহাপুরুষ-জীবনী লইয়া চরিতকাব্য রচনা করেন। সংস্কৃতেও দুই একখানি চরিত-কাব্য আছে, যেমন হর্ষচরিত বা সাহসাঙ্ক চরিত। এগুলি ঐতিহাসিক চরিত্র। অবতার বা অবতারকল্প পুরুষের চরিত্র একখানি পাওয়া যায় বৌদ্ধ সাহিত্যে—তাহা বুদ্ধচরিত। মহাপুরুষ-চরিত রচনায় জৈন সাহিত্য শুধু সুসমৃদ্ধ নয়, একক। প্রাচীন বাংলার চরিত-কাব্য রচনার আদর্শ জৈন পুরাণ বা চরিত-কাব্য হইতে আসিয়াছে কি না, ভাবিবার বিষয়।

---

১. প্রাকৃত সাহিত্য—শ্রীমনোমোহন ঘোষ (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ)।

আর একটি দিক লইতে বাংলা কথকতার সহিত অঙ্গাদিশাস্ত্রের বর্ণনার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। জৈন শাস্ত্রে কোন কাহিনীর বিবরণ লিপিবন্ধ করিবার সময় কোন বিষয়ের বর্ণনার পরিবর্তে লেখা হয় 'বন্নঅ' (বর্ণক)। যেমন, চম্পানগরীর বর্ণনা করিতে হইবে, সেখানে চম্পার বর্ণনা না করিয়া শুধু লেখা 'বন্নঅ'। অর্থাৎ পূর্ববর্তী গ্রন্থাদিতে চম্পার যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাই এস্থলে বর্ণনা করিতে হইবে। এই বর্ণনাগুলি ছিল বাঁধা বর্ণনা। লেখকগণ সুযোগমত এই বাঁধা বর্ণনাগুলি রচনার ভিতর বসাইয়া দিতেন। বৌদ্ধ অবদান-সাহিত্য বা মূল পালিগ্রন্থেও এইরূপ বাঁধাধরা বর্ণনার প্রচুর সমাবেশ দেখা যায়। বর্ণনার অংশগুলির ভাষা অলংকারসমৃদ্ধ ও অক্ষর-ডম্বরে পূর্ণ। আচার্য Winternitz বলেন, "These descriptions (Vannaa, Varnaka) are composed in an ornate style characterised by the conglomeration of long compound words"[১] ; এগুলি গদ্যে গ্রথিত—কিন্তু অলংকারঝঙ্কারে শুনায় ঠিক পদ্যের মত। অর্থাৎ বর্ণনাগুলি ছন্দোবন্ধ গদ্য।

বাংলা কথকতাতেও ঠিক এই ধরনের 'বাঁধিগৎ'-এর সমাবেশ দেখা যায়। অনাথ কৃষ্ণ দেব বলেন, "কথকদিগের 'কথা'র সহিত কোন কোন বিষয়ে কতকগুলি বাঁধিগৎ থাকে। শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, নারদ প্রভৃতি দেবদেবী সম্বন্ধে ত আছেই, তদ্ব্যতীত নগর, রণক্ষেত্র, প্রভাত, মধ্যাহ্ন, রাত্রি এবং অন্যান্য বিষয়েও থাকে। কোন উপাখ্যান ব্যাখ্যা করিতে এই সকল বাঁধা বর্ণনা নিশ্চয়ই আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই সকল গৎ সমাসবহুল, যমক-অনুপ্রাসময়, সংস্কৃতাকার বাক্যাড়ম্বর—সুর করিয়া আওড়াইবার সময় শুনায় বড় চমৎকার। কিঞ্চিৎ উদাহরণ—রাত্রি—

ঘোরা যামিনী, নিবিড় গাঢ়তমস্বিনী, শান্তানলিনী, কুমুদগন্ধামোদিনী পৃথিব ঝিল্লিরবোন্মাদিনী, বিহগরব ক্ষণবিধ্বংসিনী, নক্ষত্রনিকরজালমালব্যাপ্তা যামিনী, সভয়চকিতনয়না কামিনী, মনোনায়ক-নিকটাভিসারিকা নায়িকাগণ ক্ষণ ক্ষণ দিগ্-ভ্রান্ত্যাদি জন্য স্থগিত-চকিত-গতি কষ্টে-সৃষ্টে গমন করিতেছে।"[২]

বাংলাদেশের ধর্মে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে ও সাহিত্যে জৈনপ্রভাব অন্তঃশীলা স্রোতের মত প্রবাহিত।

৫. প্রাকৃত রসসাহিত্য

সংস্কৃতের মত প্রাকৃতেও রসসাহিত্য রচিত হইয়াছে। তুলনায় তাহা সংস্কৃতের ন্যায় বিপুলকায় ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত না হইলেও কোন-কোন দিকে অভিনবত্ব দাবি করিতে পারে। প্রাকৃত মহাকাব্য, কাব্য ও নাটক নিঃসন্দেহে সংস্কৃতের অনুকরণ ; কিন্তু অনেকেই মনে করেন, কথাসাহিত্য, গান ও প্রেমকবিতা রচনায় প্রাকৃতই পথিকৃৎ।

---

১. A Hist. of Indian Lit. Vol II., Winternitz.
২. বঙ্গের কবিতা—অনাথকৃষ্ণ দেব।

প্রাকৃত সাহিত্য ঠিক গণ-সাহিত্য নয়। ইহার রচয়িতা অধিকাংশই সংস্কৃত পণ্ডিত। তবে এ সাহিত্যে জন-জীবনের স্বাদ অল্প নয়। নিম্নে প্রাকৃত সাহিত্যের প্রধান প্রধান শাখা ও কবি-কৃতির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

(i) কথা সাহিত্য

গল্প বা কথা অনাদিকালের। বৈদিক যুগ হইতে কথার ধারা চলিয়া আসিতেছে। রামায়ণে-মহাভারতে-পুরাণে, বৌদ্ধসাহিত্যে ও জৈন সাহিত্যে কথার অন্ত নাই। পঞ্চতন্ত্রও কথার একটি আকর গ্রন্থ। কিন্তু মনে হয়, কথা লোকজগতের সামগ্রী, ইহার পরিবেশনের ভাষাও লৌকিক। বৌদ্ধসাহিত্যে কথা পাওয়া যায় পালিতে; উহা প্রাকৃত ভাষারই একটি রূপভেদ। জৈনসাহিত্যে কথার ভাষা প্রাকৃত। এমনকি সংস্কৃতে নির্যুক্তি-ভাষ্য রচনা করিতে গিয়া জৈনগণ কথার অংশ পরিবেশন করিয়াছেন প্রাকৃতে। বাংলায় আমরা যে রূপকথাদি পাই, তাহারও ভাষা লোকমুখের ভাষা। এইদিক হইতে মনে হয়, প্রাকৃতই কথার মূল ভাণ্ডার।

জনশ্রুতি এই যে, প্রাকৃত ভাষার আদি কথাকার গুণাঢ্য। তিনি 'ভূত ভাষা' বা পৈশাচী ভাষায় 'বৃহৎকথা' রচনা করেন। গুণাঢ্যের গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। তাঁহার গ্রন্থের সংস্কৃত রূপান্তর পাওয়া যাইতেছে ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী' ও সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' গ্রন্থে। গুণাঢ্যের উল্লেখ করিয়াছেন সুবন্ধু, দণ্ডী, বাণভট্ট। গোবর্ধন আচার্য্যও আর্যাসপ্তশতীতে ব্যাস-বাল্মীকির সহিত গুণাঢ্যের বন্দনা করিয়াছেন।[১] গুণাঢ্য যে কত প্রাচীন, বলা দুস্কর। কেহ মনে করেন, তিনি খ্রীষ্টীয় ১ম শতকের (Buhler), কেহ মনে কবেন তিনি খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীর (Keith); গুণাঢ্য আজ কিংবদন্তীর কবি।

কথাসরিৎসাগরের 'কথাপীঠ' হইতে জানা যায়, গুণাঢ্য ছিলেন পূর্বজন্মে মাল্যবান নামক শিবানুচর। মহাদেবের অভিশাপে তিনি গুণাঢ্য নামে মর্তে জন্মগ্রহণ করেন এবং সাতবাহন রাজ্যের সভাপণ্ডিত হন। এই সভায় আর একজন পণ্ডিত ছিলেন, নাম শর্ববর্মাচার্য। রাজা সাতবাহন ভাল সংস্কৃত জানিতেন না। একদিন জলক্রীড়াকালে তাঁহার বিদুষী রাণী বলেন, 'মোদকৈঃ পরিতাড়য়'। রাণীর বক্তব্য, মা উদকৈঃ পরিতাড়য়, অর্থাৎ জল নিক্ষেপ করিও না। কিন্তু রাজা ভাবিলেন, রাণী মোদক (লাড়ু) চাহিতেছে। রাজাজ্ঞায় মোদক আনা হইল। রাণী হাসিয়া উঠিলেন। অপ্রতিভ রাজা বিষণ্ণ হইয়া মনের কথা সভাপণ্ডিতের নিকট জানাইলেন। গুণাঢ্য বলিলেন, তিনি ছয় বৎসরে রাজাকে সংস্কৃত শিখাইয়া দিতে পারেন। পণ্ডিত শর্ববর্মা কহিলেন, ছয়মাসে তিনি রাজাকে সংস্কৃতে পারদর্শী করিয়া তুলিবেন।

---

১. অতিদীর্ঘ জীবিদোষাদ্ ব্যাসেন যশোপহারিতং হন্ত।
কৈ র্নোচ্যতে গুণাঢ্যঃ স এব জন্মান্তরাপন্নঃ ।। [আর্যাসপ্ত, উপ. ৩৩]

গুণাঢ্য পণ করিলেন, শর্ববর্মা কৃতকার্য হইলে তিনি সংস্কৃতাদি যাবতীয় ভাষা ত্যাগ করিবেন। শর্ববর্মা কৃতকার্য হইলেন। গুণাঢ্য তখন মৌন অবলম্বনপূর্বক বিন্ধ্যারণ্যে প্রস্থান করিলেন। সেইখানে পিশাচ কাণভূতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কাণভূতি তাঁহাকে মহাদেবপ্রোক্ত সাতজন রাজচক্রবর্তী বিদ্যাধরের কাহিনী শুনাইলেন। অতি অপূর্ব সে কাহিনী। গুণাঢ্য সংস্কৃত পরিত্যাগ করিয়াছেন। কাজেই পৈশাচিক ভাষায় তিনি সেই কাহিনীগুলি সাতলক্ষ শ্লোকে লিপিবন্ধ করিলেন। লিখিবার মসী হইল গুণাঢ্যের দেহরক্ত। তিনি কাহিনীগুলির প্রচারার্থ সেই গ্রন্থ সাতবাহন নৃপতির নিকট প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রাজা শোণিতাক্ষরে পৈশাচী ভাষায় লিখিত দেখিয়া সে গ্রন্থ ফিরত পাঠাইলেন। দুঃখিত গুণাঢ্য তখন অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সেই মনোরম শ্লোকগুলি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অরণ্যমৃগকুল অশ্রুসিক্ত নয়নে সেই কাহিনী শুনিতে লাগিল। ইতিমধ্যে রাজা সাতবাহনের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় চিকিৎসকগণ বুঝিলেন, শুষ্ক মাংস আহার করার ফলে রাজা ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াছেন। মৃগমাংস নীরস হইল কেন? অনুসন্ধানে জানা গেল, গুণাঢ্যের শ্লোক শ্রবণ করিতে করিতে মৃগগণ আহারনিদ্রা ত্যাগ করায় বিশুষ্ক হইয়াছে। রাজার কৌতূহল হইল। তিনি অরণ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, গুণাঢ্য সেই শ্লোকগুলি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতেছেন। রাজা জানিলেন, গুণাঢ্য অভিশপ্ত গণাবতার। তিনি শ্লোকগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তখন ছয়লক্ষ শ্লোক অগ্নিদগ্ধ হইয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট মাত্র লক্ষ শ্লোকাত্মক নরবাহনদত্তের কাহিনী। রাজা তাহাই লইয়া রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং গুণাঢ্যের শিষ্য দ্বারা একটি কথাপীঠ রচনা করাইয়া সেই বিচিত্র রসশালিনী মহাকথা জগতে প্রচার করাইলেন। উহাই গুণাঢ্যের বৃহৎকথা।

কিন্তু পৈশাচীভাষার সেই মূল বৃহৎকথা আজ লুপ্ত। মাত্র লক্ষ শ্লোকের রূপান্তর মিলিতেছে সংস্কৃতে। মূল লুপ্ত লইলেও গুণাঢ্যের কীর্তি ম্লান হয় নাই। গুণাঢ্যের নিকট ঋণী প্রায় প্রত্যেক সংস্কৃত কবি—ভাস, সুবন্ধু, দণ্ডী, বাণভট্ট। জৈনদের ধর্মকথাও গুণাঢ্যের কথার সুরে বাঁধা। প্রেম, বীরত্ব, অভিযানমূলক গল্প হিসাবে ইহাদের আবেদন কালাতিশায়ী। এগুলি গল্পের গল্প, উপন্যাসের উপন্যাস। গল্প সাহিত্যের এ গৌরব প্রাকৃত 'ভূতভাষা'র।

(ii) মহাকাব্য

প্রাকৃতেও কয়েকখানি মহাকাব্য পাওয়া যায়। এই কাব্যগুলি সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রের অনুগামী এবং সংস্কৃত কাব্যের তুলনায় হীনপ্রভ। কায়া হইতে ছায়া সুন্দর হয় না। অনুকৃতির ভিতর প্রতিভা প্রকাশের সুযোগও অল্প। প্রতিভবান্ কবিরাই যে প্রাকৃত মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তীক্ষ্ণধী অভিনবগুপ্ত রচনা করেন 'বিষমবাণ লীলা' কাব্য। ধ্বন্যালোকের লোচনটীকায় এই

কাব্যের উদ্ধৃতি আছে। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথও 'কুবলয়াশ্বচরিত' রচনা করিয়াছিলেন।[১] কিন্তু এইসকল কাব্যের পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। এগুলি সংস্কৃত মহাকাব্যের গৌরবকেও ম্লান করিতে পারে নাই।

সেতুবন্ধ ঃ প্রাকৃতে রচিত মহাকাব্যগুলির ভিতর প্রবরসেন রচিত 'সেতুবন্ধ' বা 'রাবণবহো' (রাবণবধ) বিদ্বজ্জন কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। আচার্য দণ্ডী মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত প্রসঙ্গে এই কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন।[২] কবি বাণভট্ট হর্ষচরিতের সূচনায় ইহার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন,

কীর্তিঃ প্রবরসেনস্য প্রয়াতা কুমুদোজ্জ্বলা।
সাগরস্য পরং পারং কপিসেনেব সেতুনা॥ [হর্ষচ. ১.১৪]

—কপিসেনা সেতুদ্বারা যেমন সাগরের পরপারে গমন করিয়াছিল, প্রবরসেনের কীর্তিও তদ্রূপ সেতুবন্ধ কাব্য দ্বারা সাগরের পরপারে পৌঁছিয়াছিল।

সেতুবন্ধ কাব্যের প্রণেতা প্রবরসেন কাশ্মীর রাজ দ্বিতীয় প্রবরসেন। ইনি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের কবি। বিতস্তা নদীর উপর ইনি যে সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন, কেহ কেহ মনে করেন সেই উপলক্ষ্যে কাব্যখানি রচিত হয়। আবার কেহ মনে করেন, অন্যের দ্বারা কাব্য রচনা করাইয়া প্রবরসেন উহা নিজে প্রচার করেন।

সেতুবন্ধ বা রাবণবহো কাব্য ১৫টি আশ্বাসকে ('অচ্ছাসঅ'=সর্গ) বিভক্ত। সীতাহরণ হইতে শুরু করিয়া রাবণবধ পর্যন্ত রামায়ণের ঘটনাই ইহার বর্ণনীয় বিষয়। আচার্য Keith কৃত্রিম অলংকরণ ও দীর্ঘসমাসবন্ধ পদ প্রয়োগের ('Long compounds and artificial style') জন্য কাব্যখানির প্রশংসা করিতে পারেন নাই। কিন্তু ধ্বন্যালোক [দ্বিতীয় উদ্যোত] রসসৃষ্টিতে অভিনিবিষ্টমনা কবির অপৃথগ্‌যত্নে নির্বর্তিত অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত হিসাবে এই কাব্যের রামের মায়ামুণ্ড দর্শনে বিহ্বলা সীতার বর্ণনাটির উল্লেখ করা হইয়াছে। সেতুবন্ধ কাব্যের কবিত্ব অপ্রশংসনীয় নয়। অনেকস্থলেই বাচ্য ব্যঞ্জনাধর্মী হইয়া উঠিয়াছে।

গউড়বহো ঃ বাক্‌পতিরাজকৃত 'গউড়বহো' [গৌড়বধ] প্রাকৃতে রচিত আর একখানি বিখ্যাত কাব্য। কবি কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্মার সভাকবি ছিলেন। যশোবর্মা ছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা; তিনি চীনদেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন; একসময় তিনি সমগ্র উত্তরাপথ জয় করিতে উদ্যোগ করিয়াছিলেন। Sylvan Levi-র মতে যশোবর্মা ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। অতএব কবি বাক্‌পতির কাল অষ্টম শতাব্দী।

প্রায় সহস্রাধিক দুইশত শ্লোকের সমষ্টি 'গউড়বহো' কাব্য। কাব্যের প্রারম্ভে দেবদেবীর বন্দনা ও শেষাংশে কবির কাব্যরচনার ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। যশোবর্মাই

---

১. দ্রষ্টব্য সাহিত্যদর্পণ ৩য় পরিচ্ছেদ।

২. মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ।
সাগরঃসূক্তি রত্নানাং সেতুবন্ধাদি যন্ময়ম॥ [কাব্যাদর্শ. ১.৩৪]

কাব্যের নায়ক ; শৌর্যে-বীর্যে ও গুণে তিনি বিষ্ণুর সহিত তুলিত হইয়াছেন। কবি রাজার গুণবর্ণনায় অলংকারশাস্ত্রের নৈপুণ্যকে উজাড় করিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থনাম হইতে মনে হয়, যশোবর্মা কর্তৃক গৌড়রাজের নিধন কাব্যের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। কিন্তু সমগ্র কাব্যে মাত্র কতিপয় শ্লোকে [৩৬৫-৪১৭ শ্লোকগুলিতে] যশোবর্মার দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে মগধনাথ ও বঙ্গাধিপপরাজয় বিবৃত হইয়াছে। সেখানে দেখা যায়, যশোবর্মার বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করার সংবাদ পাইয়া মগধনাথ পলায়ন করিতেছেন, কিন্তু সামন্তগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। যশোবর্মা পলায়নপর মগধনাথকে নিহত করিয়া সমুদ্রতীরস্থ বঙ্গরাজ্যে আগমন করেন। অসংখ্য হস্তীর অধিপতি বঙ্গেশ্বর পরাজিত হইয়া যশোবর্মার অধীনতা স্বীকার করেন।

'গউড়বহো' কাব্য ইতিহাস নয়। ইতিহাসের উপাদানও ইহাতে অতি অল্প। যে মগধরাজ বা যে বঙ্গেশ্বরকে যশোবর্মা পরাজিত করেন, তাঁহাদের নাম পর্যন্ত কাব্যে উল্লেখিত হয় নাই ; এমন কি—কোথায় তাঁহাদের রাজধানী ছিল, তাহাও বলা হয় নাই। ঘটনাগুলি কল্পনা-রঞ্জিত। Keith সাহেব মনে করেন, কবি বাক্‌পতির কল্পনায় যে সুবৃহৎ কাব্য রচনার পরিকল্পনা ছিল, বর্তমান কাব্যখানি তাহার ভূমিকা।

এই কাব্যের রচনারীতি সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। ইহা সত্য যে, সংস্কৃতের আদর্শে সাহিত্যিক মহাকাব্য রচনা করিতে গিয়া প্রাকৃত কাব্যের কবিগণ যে কৃত্রিম রচনা-রীতির অনুসরণ করিয়াছেন, তাহাতে কোন রচনাই তেমন কাব্যোৎকর্ষ লাভ করে নাই। সুদীর্ঘ সমাসবন্ধ পদের ভার, অলংকার প্রয়োগের আতিশয্য যেমন সংস্কৃত, তেমনই প্রাকৃত কাব্যকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। সংস্কৃত কাব্যে তথাপি মাঝে মাঝে যে স্বাভাবিকতার স্বাদ পাওয়া যায়, প্রাকৃত কাব্যে তাহাও অনুপস্থিত। ইহার ভাষা ও অলংকার—সবই কৃত্রিম, কবি-কল্পনাও সংস্কৃতের ঋণ-ভারে জর্জরিত। তথাপি 'গউড়বহো' কাব্যের কোন-কোন অংশ কাব্যগুণ-সমৃদ্ধ। যেমন রক্তস্রোত প্লাবিত রণস্থলের শব্দাড়ম্বরপূর্ণ এই বর্ণনা ঃ

অগ্ঘই তথ রণারম্ভভিন্ন-ভড সোণিঅ-চ্ছড়ায়ম্বং।
ধারা যট্‌ঠিয় পহুত্থ-বিজ্জুবলয়ং কর্মাহিবেঢ়ং ॥ [গৌড়. ৪১৫]

—সেই সংগ্রামে ছিন্ন দেহের তাম্রাভ শোণিত ছটায় বিদ্যুদ্বলয়ের ন্যায় মহীপীঠ শোভা পাইতে লাগিল।

গৌড়বহো কাব্যের বিষয়-বিন্যাসও প্রচলিত মহাকাব্য হইতে স্বতন্ত্র। ইহা সর্গবন্ধ কাব্য নয়। প্রথম ৬১টি শ্লোকে ২১ জন দেবতার মঙ্গলাচরণ, তাহার পর ৩৭টি শ্লোকে [৬২-৯৮] মহাকবিলক্ষণ, সামান্য কবি ও কবীন্দ্রের ভেদ, প্রাকৃত প্রশংসা প্রভৃতি। তাহার পর মূল কাব্যের সূচনা [৯৯ নং শ্লোক হইতে] এবং কাব্যশেষে [৭৯৭-১২০৯ শ্লোক] কবির ব্যক্তিগত পরিচয় ও কাব্যোৎপত্তির ইতিহাস। এই কাব্যখানি রাজসভায় গান করা হইয়াছিল।

কবি বাক্‌পতি প্রাকৃত ভাষার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। প্রাকৃত সম্পর্কে

কবি সাংখ্যের প্রকৃতি-প্রধানবাদে বিশ্বাসী। সাংখ্যে যেমন প্রকৃতিই সৃষ্টির মূল, আবার প্রকৃতিতেই সৃষ্টির বিশ্রাম, কবিও তেমনই মনে করেন,

সঅলাওঁ ইমং বায়া বিসন্তি এত্তো যণেন্তি বায়াও।
এন্তি সমুদ্দংচিয় ণেন্তি সায়রাওচ্চিয় জলাইং ॥ [গৌড়. ৯৩]

—সকল ভাষা প্রাকৃতেই প্রবেশ করে এবং প্রাকৃত হইতেই সকল ভাষা আসে। যেমন সকল জল সমুদ্রেই প্রবেশ করে ও সমুদ্র হইতেই উৎপন্ন হয়।

বাক্‌পতির কয়েকটি সূক্তিও অতি সুন্দর।

(iii) প্রাকৃত নাটক ও সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃত অংশ

আগাগোড়া প্রাকৃতে রচিত নাটক হিসাবে বহুবিখ্যাত রাজশেখরের 'কপূর্র-মঞ্জরী'। ইহাকে নাটক না বলিয়া বলা হয় 'সট্টক'। কবির পৃষ্ঠপোষক রাজা মহীপালের মহিষী অবন্তীদেবীর চিত্তবিনোদনের জন্য নাটকখানি রচিত। ইহার বিষয়বস্তু ও ঘটনাবিন্যাস হুবহু সংস্কৃত নাটিকার অনুরূপ। চারি অঙ্কের এই নাটিকায় নাট্যকার রাজা চন্দ্রপালের সহিত রাজকুমারী কপূর্মঞ্জরীর প্রণয় ও মিলনের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। সংস্কৃত নাটকের মতই এই নাটকেও প্রতিকুলতা সৃষ্টি করিয়াছেন পাটমহিষী। শেষ পর্যন্ত অবশ্য জয় হইয়াছে নবীন মদনের। গতানুগতিক কাহিনী ও চরিত্রগুলির ভিতর ইহাতে কৌতুক ও সজীবতা সৃষ্টি করিয়াছে সিদ্ধ-পুরুষ ভৈরবানন্দ চরিত্র। তিনি কৌল সাধক। কুলমার্গসম্মত সাধনার কথাই তিনি বলেন, কিন্তু তাহাতে সৃষ্টি হয় সরস কৌতুকহাস্য। যেমন ১ম জবনিকান্তরের (অঙ্কের) এই দৃশ্যাংশটি ঃ

বিদূষক। আসণং আসণং
রাজা। কিং তেণ।
বিদূ। ভইরবাণংদো দুআরে চিট্‌ঠদ।
দেবী। কিং সো জো জণবঅনাদো অচ্চব্‌ভুদসিদ্ধী সুনীঅদি।
বিদূ। অধ কিং।
রাজা। পবেসঅ।

(বিদূষকো নিষ্ক্রম্য তেনৈব সহ প্রবিশতি)

ভৈরবানন্দ। (কিঞ্চিন্মদমভিনীয়)

মন্তো ণ তন্তো ণ অ কিংপি জাণে
ঝাণং চ ণ কিংপি গুরুপ্পসাদা।
মজ্জং পিবামো মহিলং রমামো
মোক্‌খং চ জামো কুলমগ্‌গলগ্‌গা ॥

বিদূষক। আসন আন, আসন।
রাজা। কি হইবে ?
বিদূ। দ্বারে ভৈরবানন্দ সমাগত।

দেবী। ইনিই কি সেই, লোকে যাঁকে বলে অদ্ভুত সিদ্ধিসম্পন্ন ?
বিদূ। হাঁ, তাই বটে।
রাজা। তাঁকে প্রবেশ করাও।
(বিদূষক প্রস্থান করিয়া তাঁহাকে লইয়া প্রবেশ করিলেন)

ভৈরবানন্দ। (কিঞ্চিৎ মত্ততার অভিনয় করিয়া) মন্ত্রও জানি না, তন্ত্রও কিছু জানি না। ধ্যানও তথৈবচ। গুরুর কৃপায়—মদ্য পান, মহিলাসঙ্গ করিব, আর তাহাতেই লাভ করিব কুলমার্গসম্মত মোক্ষ।

পূর্ণাঙ্গ প্রাকৃত নাটক অপেক্ষা সাহিত্য হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃত অংশ। এগুলি প্রাকৃত সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রে, নাটকীয় সংলাপে কোন্ শ্রেণীর পাত্র-পাত্রী কিরূপ ভাষায় কথা বলিবে, তাহার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সাহিত্যদর্পণে বলা হইয়াছে, উত্তম বিদ্বান পুরুষগণের ভাষা হইবে সংস্কৃত, আর মহিলাদের ভাষা হইবে শৌরসেনী।[১] কোন কোন আচার্যের মতে—সন্ন্যাসিনী, দেবী, মন্ত্রিকন্যা ও বিদগ্ধা বারাঙ্গনার ভাষা সংস্কৃতও হইতে পারে। রাজ-অন্তঃপুরচারী মাগধী, চেট-রাজপুত্র-শ্রেষ্ঠী অর্ধমাগধী, বিদূষক প্রাচ্যা, ধূর্ত অবন্তিকা, যোদ্ধা ও নাগরিক দাক্ষিণাত্যা, শ-কার (রাজশ্যালক) শাকারী, দিব্যগণ (দ্যূতক্রীড়কগণ) বাহ্লীক, দ্রাবিড়গণ দ্রাবিড়ী, আভীর ও তক্ষক (কাষ্ঠোপজীবী) আভীরী, পুক্কসগণ চাণ্ডালী, পত্রোপজীবী ও অঙ্গারকার (কর্মকার) শাবরী, পিশাচগণ পৈশাচী, উত্তম চেটী ও দৈবজ্ঞগণ শৌরসেনী বা সংস্কৃত এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন, অভিজাত দারিদ্র্যোপহত জৈন-বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রাকৃত ভাষায় কথা বলিবেন। এক কথায়—বিদ্বান পাত্রগণ ব্যতীত প্রায় অপর সকলেই স্থান-পাত্র অনুসারে তত্তদ্দেশীয় আঞ্চলিক প্রাকৃত ব্যবহার করিবেন। ইহার ফলে, সংস্কৃত নাটকের একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করিয়া আছে প্রাকৃত।

সংস্কৃত নাটকের সংস্কৃত সংলাপ নিঃসন্দেহে কবিত্বপূর্ণ। কিন্তু অহেতুক উচ্ছ্বাস ও সুদীর্ঘ সৌন্দর্যবর্ণনায় তাহা ভারাক্রান্ত। কবিত্ব কাব্যের সম্পদ হইতে পারে, কিন্তু তাহা নাটকীয় গতিসৃষ্টির পক্ষে প্রচণ্ড বাধা। তাহা ছাড়া, তাহাতে জীবনের অন্তরঙ্গ স্পর্শও অল্প। সংস্কৃত-বলা কুশীলবগণ সমাজের উচ্চস্তরের মানুষ। নায়ক স্পর্শকাতর প্রেমিক, মন্ত্রী-সেনাপতির ভূমিকা নিতান্ত নগণ্য। তাই তাঁহাদের সংলাপে জীবনকে বুঝিবার সুযোগ খুবই কম। কিন্তু সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃত অংশগুলি ইহার ব্যতিক্রম। প্রাকৃত অংশে আসিলেই দর্শক বা শ্রোতা যেন বদ্ধ জীবনের আগলমুক্ত হইয়া মুক্ত জীবনাঙ্গনে প্রবেশ করেন।

প্রাকৃত অংশে প্রথমতঃ পাওয়া যায় বিচিত্র জীবন যাত্রার পরিচয়। জুয়াড়ী, জেলে, শকটচালক, ঘাতক, পটজীবী, আহিতুণ্ডিক (সাপুড়ে), ঐন্দ্রজালিক প্রভৃতি

---

১. পুরুষাণামনীচানাং সংস্কৃতঃ স্যাৎ কৃতাত্মনাম্। শৌরসেনী প্রযোক্তব্যা তাদৃশীনাঞ্চ যোষিতাম্ ॥

কত যে সাধারণ চরিত্র, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহারা নাটকের ভিতর কোথাও বৃহৎ স্থান অধিকার করিয়া নাই। অতি অল্প বর্ণে, অতি অল্প রেখায় নাট্যকার ইহাদিগকে অংকন করেন। তথাপি চিত্রগুলি উজ্জ্বল।

দ্বিতীয়তঃ নায়িকাচরিত্র মাত্রই প্রাকৃতভাষিণী। রমণীহৃদয়ের প্রেম, বেদনা ও আশা-কামনার কথা প্রাকৃত ভাষাতেই প্রকাশিত। নারী-মনস্তত্ত্বের আলেখ্য হিসাবে উহা অতি উপাদেয়। সখী চরিত্রগুলিও অনুপম। ইহাদের ভূমিকা লীলাবিস্তারিকা সখীদের মতই বহুবিচিত্র। সখীর সুখের জন্য, নায়কের সহিত সখীর মিলন ঘটাইবার জন্য ইঁহাদের উদ্যোগ, সখীর সুখে সুখ, দুঃখে সমব্যথী ভাব নিবিড় আন্তরিকতার পরিচয় বহন করে। এই প্রসঙ্গে প্রতিনায়িকা পট্ট মহিষীদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। প্রেমের রাজ্যে ঈর্ষ্যার কুটিলতা এবং ত্যাগের দুর্লভ মাহাত্ম্য কতদূর পেঁৗছিতে পারে, প্রতিনায়িকার চরিত্রগুলি তাহার দৃষ্টান্ত। প্রাকৃত অংশের অন্যতম আকর্ষণ এই নারীজীবনবিচিত্রা। ইহাতে সুভগা ও দুর্ভগা, বরাঙ্গনা ও বারাঙ্গনা, পরিব্রাজিকা ও কুট্টনী প্রভৃতি বহুবিধ চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃত অংশ ভারতীয় নারী-চরিত্রের চিত্রশালা।

তৃতীয়তঃ নাটকের কৌতুকোজ্জ্বল অংশগুলিও প্রাকৃতাংশেরই সম্পদ। সংস্কৃত নাটকের উদরসর্বস্ব, হাস্যরসিক বয়স্য বিদূষক প্রাকৃতভাষী। নাটকের অন্যতম আকর্ষণ এই বিদূষক চরিত্র; বিশ্রম্ভালাপে বা বিপৎকালে মাধব্যই একমাত্র ভরসা। নাটকে এই চরিত্র কেবল গৌণাংশ হইয়া থাকে নাই, কেবল লঘু কৌতুকের রসদ যোগায় নাই, অনেক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। মৃচ্ছকটিক নাটকের চারুদত্ত-সখা বিদূষক মৈত্রেয় হাস্যোজ্জ্বল অথচ করুণ-মধুর।

চতুর্থতঃ সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃত গান। এই গান কোথাও মঞ্চস্থ হইয়া, কোথাও বা নেপথ্যচারী হইয়া গীতরসপিপাসা নিবৃত্ত করিয়াছে। শুধু গানের উদ্দেশ্যেই গান নয়, উহাদের নাটকীয় উপযোগিতাও অসামান্য। অধিকাংশ গান প্রণয়গীতি। এই প্রণয় বহুস্থলে প্রকৃতির পশুপক্ষী বা বৃক্ষলতা পুষ্পে আরোপিত। প্রাকৃতিক উপমেয় মানব প্রেমের উপমান হইয়া যে সুগভীর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করিয়াছে, প্রত্যক্ষ বর্ণনা হইতেও তাহা হৃদয়গ্রাহী। এই গানগুলিতে একদিকে পাওয়া যায় প্রকৃতির নিখুঁত চিত্র, অপরদিকে পাওয়া যায় জীবন-দৃষ্টির অতি সূক্ষ্ম পরিচয়।

নিম্নে নাটকের প্রাকৃত অংশ হইতে কতিপয় দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইতেছে।

মহাকবি ভাসের নাটকে সাধারণ চরিত্রের অসদ্ভাব নাই। বালচরিতের দামক, বৃদ্ধ গোপাল ও গোপকন্যাগণ—'প্রতিজ্ঞা' নাটকের ভট ও গাত্রসেবক মাহূত—'স্বপ্ন-বাসবদত্তা'র বনতাপসী প্রভৃতি চরিত্র সাধারণ জীবনের সুন্দর প্রতিচ্ছবি। 'প্রতিমা' নাটকের তৃতীয় অঙ্কে প্রতিমাগৃহের ঝাড়ুদারের চিত্রটিও মনোরম। প্রতিমাগৃহের (ছবিঘরের) রক্ষক ভট ঝাড়ুদার সুধাকারকে গৃহ পরিষ্কার করিতে নির্দেশ দিয়াছে। বেচারা সুধাকার সারাদিন পরিশ্রম করে, ঘুমাইবার সময় পায় না ঃ

[ততঃ প্রবিশতি সুধাকারঃ]

সুধাকারঃ—(সম্মার্জনাদি কৃত্বা) ভোদু দাণিং কিদং এত্য কয়যম্ অয়্য সম্ভবঅস্স আণত্তম্। জাব মুহুত্তং সুবিস্সং (স্বপিতি)।

(প্রবিশ্য) ভটঃ—(চেটমুপগম্য তাড়য়িত্বা) অন্ধো দাসীএ পুত্ত ! কিং দাণিং কম্ম ণ করেসি। (তাড়য়তি)।

সুধাকারঃ—(বুদ্ধা) তালেহি মং তালেহি মং।

ভটঃ—আড়িদু তুবং কিং করিস্সসি।

সুধা—অহণ্ণস্স মম কত্তবীঅস্স বিঅ বাহুসহস্সং ণত্থি।

ভটঃ—বাহুসহস্সেন কিং কয্যং।

সুধা—তুবং হণিস্সং।

ভটঃ—এহি দাসীএ পুত্তো ! মিদে মুণ্ডিস্সম্। (পুনরপি তাড়য়তি)

সুধা—(রুদিত্বা) সঙ্কং দাণিং ভট্টো মে আবরাহং জাণিদুং।

ভটঃ—ণত্থি কিল অবরাহো ণত্থি। ণং মএ সন্দিট্টো ভট্টিদারিঅস্স রামস্স রজ্জ বিব্ভট্ট কিদ সংদাবেণ সগ্গং গদস্স ভট্টিণো দসরহস্স পড়িমাগেহং দেট্ঠুম্ অজ্জ কোসল্লাপুরোএহি সব্বেহি অংতউরেহি ইহ আঅন্তব্বম্ ত্তি। এত্থ দাণিং তুএ কিং কিদং।

সুধা—পেক্খদু ভট্টা অবণীদক বোদ সংদাণঅং দাব গব্ভগিহং। সোহবণ্ণঅদত্ত চংদন পঞ্চাঙ্গুলা ভিত্তীএ। ওসঔমাল্লদাম সোহিণি দুবারাণি। পাইণ্ণা বালুআ। এত্থ দাণিং ময়া কিং ণ কিদং।

ভটঃ—জই এবং বিস্সত্থো গচ্ছ। জাব অহং বি সব্ব কিদং ত্তি অমচ্চস্স ণিবেদেমি ! [নিষ্ক্রান্তৌ]

[তাহার পর সুধাকার প্রবেশ করিল]

সুধা—(গৃহের মার্জনাদি ক্রিয়া করিয়া) যাক্, এখন আর্য সম্ভবকের আজ্ঞামত কাজ করা হইয়াছে। এইবার একটু ঘুমাইয়া লই। (নিদ্রা)

(প্রবেশপূর্বক) ভট—ব্যাটা দাসীর পুত্র, এখনও কাজ করিতেছিস না ? (প্রহার)

সুধা—(জাগিয়া) মারিবেন না, মারিবেন না।

ভট—মারিলেই তুই কি করিবি ?

সুধা—আমার মত হতভাগ্যের কার্তবীর্যের মত হাজার হাত নাই।

ভট—হাজার হাতে কি করিতি ?

সুধা—আপনাকে মারিয়া ফেলিতাম।

ভট—আরে দাসীপুত্র, তোকে মারিয়া ছাড়িব। (পুনরায় প্রহার)

সুধা—(কাঁদিতে কাঁদিতে) কি অপরাধে আমাকে মারিতেছেন, জানিতে চাই।

ভট—না, কোন অপরাধ নাই। তোকে বলিয়াছিলাম, রাজকুমার রামচন্দ্রের রাজ্য ত্যাগের শোকে রাজা দশরথ স্বর্গে গিয়াছেন, তাঁহার প্রতিমা (চিত্র) দেখিবার জন্য কৌশল্যা প্রমুখ অন্তঃপুরিকাগণ এখানে আসিবেন। তুই তাহার কি করিয়াছিস্ ?

সূধা—কর্ত্তা দেখুন, গর্ভগৃহ হইতে কবুতর ধরার জাল সরাইয়া দিয়াছি। দুয়ারে মাল্যসমূহ ঝুলাইয়া দিয়াছি। বালু ছড়াইয়া দিয়াছি। তাহা হইলে কি করি নাই !

ভট—যদি তাই করিয়া থাকিস্, তাহা হইলে নির্ভয়ে চলিয়া যা। আমিও অমাত্যদের খবর দেই যে সবই করা হইয়াছে। [উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

সাধারণ মানুষের বিচিত্র চরিত্র সর্বাপেক্ষা বেশি ভিড় করিয়াছে শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে। ইহাতে শৌরসেনী, আবন্তী, প্রাচ্যা, মাগধী প্রভৃতি প্রাকৃতের নিদর্শন পাওয়া যায়। চরিত্রগুলিও বিচিত্র। রাজশ্যালক শ-কার গণ্ডমূর্খ, সে আবার বারাঙ্গনা বসন্তসেনার রূপভিখারী। বসন্তসেনা রাজপথে বাহির হইয়াছে, তাহাকে অনুসরণ করিতে করিতে শ-কার বলিতেছে ঃ

চিষ্ঠ বসন্তশেণিএ চিষ্ঠ।
কিং যাশি ধাবশি পলাঅশি পক্খলন্তী
বাশু পশীদ ণ মলিশ্শশি চিষ্ঠ দাব।
কামেণ ডজ্ঝদি হমে হড়কে তবশ্শী
অঙ্গাললাশি পড়িদে মংশখণ্ডে ॥ [প্রথম অংক]

—দাঁড়াও গো বসন্তসেনা, একটু দাঁড়াও।

কোথা যাও, কোথা যাও
পালাও কোথায় বালা স্খলিত চরণে
ভয় নাই, ভয় নাই
মাথা খাও. মাথা খাও দাঁড়াও ললনে।
কামের দহনে দহে হৃদি অসহায়
অঙ্গার রাশির মাঝে মাংসখণ্ড প্রায়।[১]

দ্বিতীয় অংকে জুয়াড়ীর চিত্রটিও অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। জুয়াড়ী সংবাহক জুয়া খেলায় হারিয়া গিয়াছে। তাহাকে দশ সুবর্ণমুদ্রা দিতে হইবে ভয়ে সে আড্ডা হইতে পলায়ন করিয়াছে। তাহাকে ধরিবার জন্য দুইজন আড্ডাধারী তাড়া করিয়াছে। নিজেকে লুকাইবার অভিপ্রায়ে সংবাহক উল্টাপায়ে হাঁটিয়া একটি শূন্য মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবী সাজিয়া দাড়াইয়া রহিল। মাতাল আড্ডাধারী মাথুর ও আর একজন জুয়াড়ী সংবাহককে খুঁজিতে খুঁজিতে সেখানে আসিল ঃ

দ্যূতকর ঃ—(পদং বীক্ষ্য) এসো বজ্জদি। ইঅং পণষ্টা পদবী।

মাথুরঃ—(আলোক্য সবিতর্কং) আলে বিপ্পদীবু পাদু। পদিমাসুন্ন দেউল। (বিচিন্ত্য) ধুত্তু জুদকরু বিপ্পদীবেহিং পাদেহিং দেউলং পবিট্ঠো।

দ্যূতকরঃ—তা অনসরেংহ।

মাথুরঃ—এবং ভোদু।

---

১. অনুবাদ—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দ্যূতকরঃ—কথং কট্ঠময়ী পাদিমা।

মাথুরঃ—অলে নহু নহু শৈলপাদিমা (ইতি শিরশ্চালয়তি সংজ্ঞাপ্য চ) এবং ভোদু এহি জুদং কিলেংহ।

(ইতি বহুবিধং দ্যূতং ক্রীড়তি)

সংবাহকঃ—(দ্যূতেচ্ছাবিকার সংবরণং বহুবিধং কৃত্বা স্বগতম্) অলে কত্তা শব্দে ণিণ্ণঅশ্শ হলই হড়কং মণুশ্শশ্শ। ঢক্কাশব্দে ব্ব ণলাধিবশ্শ পব্ভশ্টলজ্জশ্শ। জাণামি ণ কিলিশ্শং শুমেলুশিহলপড়ণ শণ্ণিহং জুঅং তহ বি হু কোঅিলমহুলে কত্তাশব্দে মণং হলদি।

দ্যূতকরঃ—মম পাঠে মম পাঠে।

মাথুরঃ—ণ হু। মম পাঠে।

সংবাহকঃ—(অন্যতঃ, সহসোপসৃত্য) ণং মম পাঠে।

দ্যূতকরঃ—লদ্ধে গোহে।

মাথুরঃ—(গৃহীত্বা) অলে পেদণ্ডআ গহীদো সি। পঅচ্ছ তং দশ সুবণ্ণং।

জুয়াড়ী—(পদচিহ্ন দেখিয়া) এই পথ দিয়া গিয়াছে। এই পায়ের চিহ্ন।

মাথুর—(দেখিয়া চিন্তিতভাবে) ওরে, এখানে যে পায়ের উল্টা চিহ্ন। মন্দিরও প্রতিমাশূন্য। (চিন্তা করিয়া) ধূর্ত উল্টা পা ফেলিয়া মন্দিরে ঢুকিয়াছে।

জুয়াড়ী—এস, অনুসরণ করি।

মাথুর—বেশ, তাহাই হউক।

জুয়াড়ী—আরে এ যে কাষ্ঠময়ী প্রতিমা।

মাথুর—নারে না, শৈলময়ী প্রতিমা (বহুপ্রকারে মাথা নাড়াইয়া সংকেত করণ) আচ্ছা, এস এইখানে বসিয়া জুয়া খেলি।

(বহুপ্রকারে দ্যূতক্রীড়া করিতে লাগিল)

সংবাহক—(দ্যূতেচ্ছা সংবরণ করিয়া স্বগত) হায়! কত্তা শব্দে [পাশার দান ফেলার শব্দ] নির্ধন মানুষের হৃদয় হরণ করে, যেমন ঢক্কাশব্দে ভ্রষ্টরাজ্য রাজা চঞ্চল হন। জানি জুয়াখেলা সুমেরুশিখর হইতে পতনের মত। তবু ইহার কোকিলমধুর 'কত্তারব' মনকে টানে।

দ্যূতকর—আমার দানে, আমার দানে।

মাথুর—না না, আমার দানে, আমার দানে।

সংবাহক—(সহসা অন্যদিক হইতে আসিয়া) না, আমার দানে।

দ্যূতকর—এই যে বদমায়েসটা ধরা পড়িয়াছে।

মাথুর—ওরে পাজি, তোকে ধরিয়াছি। ফেল্ সেই দশ স্বর্ণমুদ্রা।

মৃচ্ছকটিক নাটকে এইরূপ জনজীবনের ছবি অনেক। শকটচালক স্থাবরক ও বর্ধমানক, নগররক্ষী চন্দনক ও বীরক, ভিক্ষু সংবাহক, শোধনক, চণ্ডালঘাতক সবগুলি চিত্রই স্বল্পরেখায় জীবন্ত। ষষ্ঠ অঙ্কে স্থাবরক চেট চলিয়াছে শ-কারের গাড়ী চালাইয়া। ঠিক যেন গ্রাম্যপথের গাড়োয়ান—

স্থাবরশ্চেটঃ। বহধ বইল্লা! বহধ। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) কধং গাম শঅলেহিং লুন্ধে মগ্গে। কিং দাণিং এথ্থ কলইশ্শং (সাটোপম) অলেলে ওশলধ (আকর্ণ্য) কিং ভণাধ—এশে কশ্শকেলকে পবহণে ত্তি। এশে লাঅশালঅ শংঠাণকেলকে পবহণে ত্তি। তা সিগ্ঘং ওশলধ।

—চল্‌রে বয়েল, চল্‌। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) গ্রামের গরুর গাড়ীতে পথটা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। এখন কি করি? (সগর্বে) ওরে! সরে' যারে সরে' যা! কি বলছিস্‌? কার গাড়ী?—এটি রাজার শালা সংস্থানকের গাড়ী। শীঘ্র সরে যা বলছি।

'মৃচ্ছকটিক' সত্যই গণজীবনের চিত্রবিচিত্রা।

কালিদাসের নাটকে অতি সাধারণ জনচরিত্রের সংখ্যা অল্প। তিনি রাজসভার কবি। তাঁহার তিনটি নাটকই রাজ-চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া রচিত। তথাপি প্রাকৃত চিত্র হিসাবে শুদ্ধান্তের চিত্রগুলি কালিদাসে উজ্জ্বল। সেকালে রাজারা বহু বিবাহ করিতেন। একদিনের নবীনা প্রিয়া দুইদিন পরে পুরাতন হইয়া যাইতেন। রাজ অন্তপুরিকাদের মধ্যে ঈর্ষ্যা, প্রণয়-কলহের অভাব ছিল না; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অতিরিক্ত মদ্যপানও করিতেন। এইরূপ একটি চরিত্র 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র প্রতিনায়িকা ইরাবতী। ইরাবতী জানেন না, তাঁহার দয়িত রাজা অগ্নিমিত্র আজ নূতন প্রেমে আসক্ত হইয়াছেন। তিনি 'দোলাঘরে' আসিয়াছেন রাজার সহিত মিলিত হইতে। মদবিহ্বলা, স্খলিতচরণা ইরাবতী, কিন্তু হৃদয়ে প্রিয়-মিলনের আকাঙ্ক্ষা—

[ততঃ প্রবিশতি যুক্তমদা ইরাবতী চেটী চ]

ইরা—(অবস্থাসদৃশংপরিক্রম্য) হঞ্জে মদেণ গিলাঅমাণং অত্তাণং অজ্জউত্তস্স দংসণে হিঅঅং তুঅরাবেদি চলণা উণ ণ আেসলন্তি।

নিপু—ণং সম্পত্তম্ম দোলাঅঘরং।

ইরা—ণিউণিএ অজ্জউত্তো এথ্থ ন দীসদি।

[অনন্তর মদস্খলিতচরণা ইরাবতী ও চেটী প্রবেশ করিলেন]

ইরা—(মদবিহ্বল চরণে চলিতে চলিতে) ওলো, মদের ঝোঁকে আর্যপুত্রকে দেখিবার জন্য মন ব্যাকুল, কিন্তু পা যে চলিতেছে না।

নিপু—এই যে দোলাঘরে আসিয়া গিয়াছি।

ইরা—নিপুণিকে, কই আর্যপুত্রকে তো এখানে দেখিতেছি না।

কিন্তু আর্যপুত্র যে তখন নূতন নায়িকা মালবিকার প্রতি আসক্ত হইয়া অশোক-তরুর অদূরে দাঁড়াইয়া নবীনা প্রণয়িনীর রূপসুধা পান করিতেছেন, তাহা অবিলম্বেই ইরাবতী বুঝিতে পারিয়াছিলেন: ইরাবতীর সে অবস্থার উক্তি সত্যই মর্মভেদী:

অবিসসণীআ পুরীসা। অস্তণো বঞ্চণবঅণং পমাণী করিঅ অহিকখিত্তাএ বাহজণ-গীদগিহীদ চিত্তাএ হরিণীএ বিঅ এদং ণ বিন্নাদম্‌।

—পুরুষজাতি অবিশ্বাস্য। ব্যাধের গীতে গৃহীতচিত্ত হরিণীর মত আমিও যে বঞ্চনা-বচনে প্রবঞ্চিত হইয়াছি, তাহা পূর্বে বুঝিতে পারি নাই।

এই ধরনের 'নাগরিক-বৃত্তি' যে রাজঅন্তঃপুরে প্রতিনিয়তই অনুষ্ঠিত হইত, 'শকুন্তলা' নাটকের পঞ্চম অংকে হংসপদিকার প্রাকৃত-গানটি তাহার আর এক প্রমাণ। রাজ-অন্তঃপুরে এই প্রকারের ব্যাপারে পাটমহিষীগণ প্রায়ই ঈর্ষ্যান্বিতা হইয়া নূতন প্রণয়িণীকে কারারুদ্ধ করিতেন, কোথাও আবার বুদ্ধিমতী দেবীরা 'পতিপ্রসাদনব্রত' উপলক্ষ্যে নায়িকাকে রাজার হস্তে অর্পণ করিয়া উভয়দিক রক্ষা করিতেন। 'বিক্রমোর্বশী' নাটকে এই পতিপ্রসাদনব্রতের উল্লেখ রহিয়াছে। দেবী যখন দেখিলেন, রাজা উর্বশীর প্রতি আসক্ত, তখন তিনি এই ব্রতছলে উর্বশীকে রাজহস্তে সমর্পণ করিলেন ঃ

দেবী—(রাজ্ঞঃ পূজামভিনীয় প্রাঞ্জলিঃ প্রণম্য চ) এসা দেবদামিহুণং রোহিণী মিঅলঞ্ছণ সক্খীকরিঅ অজ্জউত্তং অনুপ্পসাদেমি। অজ্জপহুদি অজ্জউত্তো জং ইত্থিঅং কামেদি, জা অজ্জউত্তসমাগমপণইণী তাএ সহ অপ্পদিবন্ধেন বত্তিদব্বম্।

—(রাজাকে পূজা পূর্বক যুক্তকরে প্রণাম করিয়া) ওই দেবতামিথুন রোহিণী ও মৃগলাঞ্ছনকে সাক্ষী করিয়া আমি আর্যপুত্রের প্রসাদন করিতেছি—আজ হইতে আর্যপুত্র যাঁহাকে পত্নীরূপে কামনা করিবেন, কিংবা যে নারী আর্যপুত্রের মিলন-প্রার্থী প্রণয়িণী হইবেন, আমি নির্বিরোধে তাঁহার সহিত কালাতিপাত করিব।

কালিদাসের আর একখানি অমর আলেখ্য শকুন্তলা নাটকের ধীবর। ধীবর জালে মাছ ধরিয়া জীবিকা অর্জন করে। ঘটনাচক্রে তাহারই জালে ধরা পড়িয়াছিল একটি রোহিত মৎস্য। সেই রোহিতের উদরে রাজার নামাঙ্কিত 'লদণভাশুলং অঙ্গুলীয়কং' [রত্নপ্রভ অঙ্গুরী]। চুরির দায়ে রক্ষিদ্বয় তাহাকে তাড়না করিতেছে। কিন্তু সভয়ে সে বলিতেছে, 'পশীদন্তে, ভাবমিশ্শে! অহকে ণ এরিশকম্মকালী (হুজুরগণ, প্রসন্ন হউন। আমি এরূপ কর্ম করি না)। রক্ষীরা উপহাস করিয়া বলিয়া উঠিল, না চুরি করিবে কেন? সদ্ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজাই তোমাকে আংটি দিয়াছেন। কিন্তু এই রক্ষীরাই শেষে অবাক বিস্ময়ে বলিয়াছে, 'এশে জমশদনং পবিশিঅ পড়িনিউত্তে' (উঃ, লোকটা যমের বাড়ী ঢুকিয়া ফিরিয়া আসিল)। রাজ-প্রদত্ত অর্থের অর্ধেক দিয়া সকলকে লইয়া 'কাদম্বরী' (মদ্য) সেবনের উদ্দেশ্যে 'সোণ্ডি-আপণং এব্ব গচ্ছামো' প্রস্তাবটিও এই ধরনের চরিত্রের উপযোগী।

শ্রীহর্ষের রত্নাবলী নাটকের ঐন্দ্রজালিকের চিত্রটিও উপভোগ্য। ইন্দ্রজালদণ্ড 'পিচ্ছিকা' সঞ্চালন করিতে করিতে ঐন্দ্রজালিক প্রবেশ করিল ঃ

ঐন্দ্র। (উপসৃত্য) জয়দু জয়দু ভট্টা। (পিচ্ছিকাং ভ্রাময়িত্বা বহুধা হাস্যং কৃত্বা)।

পণমহ চলণে ইন্দস্স ইন্দজালিঅ ত্তি লদ্ধণামস্স।
তহ জ্ঞেব অজ্জ সম্বরস্স মায়াসুর পরিট্ঠিদ জসস্স ॥

দেব কিম্

ধরণীএ মিঅংকো আআসে মহিঅরো জলে জলণো।
মজ্ঝহ্ণম্মি পওসো দাব সিজ্জউ দেহি আণ্ণত্তিং ॥

ঐন্দ্রজালিক। (আসিয়া) জয় হউক, জয় হউক মহারাজ। (পিছা ঘুরাইয়া ও

হাস্য করিয়া) ঃ ইন্দ্রজালিক বলিয়া স্বনামখ্যাত ইন্দ্রের চরণে প্রণাম। তিনি সম্বর-মায়ায় সুপ্রতিষ্ঠযশা।

বলুন দেব, আজ্ঞা করুন, পৃথিবীতে চাঁদ নামানো, আকাশে পর্বত উঠানো, জলে আগুন জ্বালানো অথবা মধ্যাহ্নে সন্ধ্যার অবতারণা সবই করিতে পারি।

ঠিক এই ধরনেরই চরিত্র পাওয়া যায় মুদ্রারাক্ষস নাটকে। তখনকার দিনে নিপুণ গুপ্তচরগণ বিবিধ উপায়ে বিবিধ বেশ ধারণ করিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিত। চাণক্যের নিযুক্ত গুপ্তচর 'যমপট'-প্রদর্শনকারী। চন্দ্রগুপ্তের শত্রু কে, তাহাই জানিবার জন্য কৌটিল্য চাণক্য গুপ্তচর নিয়োগ করিয়াছিলেন। চর যমের মূর্তিযুক্ত পট প্রদর্শন ছলে সংবাদ জানিয়া চাণক্যের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছে ঃ

(ততঃ প্রবিশতি যমপটেন চরঃ)

চরঃ—পণমহ জমস্স চলণে কিং কজ্জং দেবএহি অণ্ণেহিং।
এসো খু অণ্ণভত্তাণং হরই জীঅং চড়পড়ন্তং ॥

অবি চ

পুরিসস্স জীবিদব্বং বিসমাদো হোই ভত্তিগাহিআদো।
মারেই সব্বলোঅং জো তেণ জমেণ জীআমো ॥

জাব এদং গেহং পবিসিঅ জমপড়ং দংসঅংতো গীআইং গাআমি (ইতি পরিক্রামতি)

(তারপর যমপটসহ চরের প্রবেশ)

চর—যমের চরণে প্রণাম কর। অন্য দেবতাদের ভজনা করিয়া লাভ নাই। কারণ, ইনি (যম) অন্যদেবতার ভক্তদের জীবন চট্পট্ হরণ করেন।

অপিচ (আরও), ভয়ংকরকে ভক্তি-বশ করিয়াই মানুষকে বাঁচিতে হয়। যিনি সর্বলোকের মারণকর্তা, সেই যমের জন্যই আমরা জীবিত আছি। এখন এই গৃহে প্রবেশ করিয়া যমপট দেখাইয়া গান করিব (পরিক্রমণ) [মুদ্রা. ১ম অংক]

রাক্ষস-প্রেরিত সাপুড়ে বিরাধগুপ্তের চিত্রটিও কৌতূহলোদ্দীপক ঃ

(ততঃ প্রবিশতি আহিতুণ্ডিকঃ)

আহিতুণ্ডিকঃ—(আকাশে) অজ্জ কিং তুমং ভণাসি—কো তুমং ত্তি। অজ্জ অহং ক্খু আহিতুণ্ডিও জিণ্ণবিসো নাম। কি ভণাসি—অহংবি অহিণা খেলিদুং ইচ্ছামি ত্তি। অহ কদবং উণ অজ্জো বিত্তিং উবজীবদি। কিং ভণাসি—রাঅকুল সেবকোহ্মি ত্তি। ণং খেলদি এব্ব অজ্জো অহিণা। কহং বিঅ। অমংতোসহিকুসলো বালগ্গাহি মত্তমতংগআরোহি লদ্ধাহিআরো জিদকাসী রাঅসেবওত্তি। এদে তিণি বি বিণাস-মনুহোংতি। কহং দিট্ঠমেত্তো অদিককংতো এসো। (পুনরাকাশে) অজ্জ কিং তুমং ভণাসি। কিং এদেসু পেড়াল সমুগ্গএসু ত্তি। অজ্জ জীবিআএ সংপাদআ সপ্পা। কিং ভণাসি (পেক্খিদুমিচ্ছামিত্তি) পসীদতু অজ্জো। অট্ঠাণং ক্খু এদং। তা জই কোদূহলং এহি এদসিসং আবাসে দংসেমি। [মুদ্রা, ২য় অংক]

(তারপর আহিতুণ্ডিকের প্রবেশ)

আহিতুণ্ডিক—(আকাশে) আর্য, আপনি কি বলিতেছেন ? তুমি কে ? আর্য,

আমি জীর্ণবিষ নামা সাপুড়ে। কি বলিলেন ? আমিও সাপের সহিত খেলিতে ইচ্ছা করি ? মহাশয়, আপনার উপজীবিকার বৃত্তি কি ? কি বলিলেন ? আমি রাজকুল-সেবক। তাহা হইলে আপনি নিশ্চয় সাপের সঙ্গে খেলা করেন। কেমন করিয়া ? মন্ত্রৌষধিজ্ঞানহীন সর্পজীবী, মত্তমাতংগআরোহী এবং লব্ধাধিকার রাজসেবী—এ তিনই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। একি, দৃষ্টিমাত্র ইনি অদৃশ্য হইলেন। (পুনরায় আকাশে) মহাশয়, আপনি কি বলিতেছেন ? আমার এই পেঁটরায় কি আছে ? ইহাতে আছে জীবিকাসম্পাদনের উপায় সাপ। কি বলিলেন ? আমি উহা দেখিতে ইচ্ছা করি ? মাপ করিবেন। ইহা উপযুক্ত স্থান নয়। যদি কৌতূহল থাকে, এই গৃহে আসুন, এইখানে দেখাইব।

(iv) গান ও চূর্ণ কবিতা

প্রাকৃত রসসাহিত্য সংস্কৃতেরই অনুকরণ—কি কাব্য, কি মহাকাব্য, কি নাটক। কথাসাহিত্যে প্রাকৃতের দাবী অগ্রগণ্য হইতে পারিত, কিন্তু আদি কথাকার গুণাঢ্যের মূল কাব্য আজিও অনাবিষ্কৃত। সাহিত্যের একটি শাখা প্রাকৃতের নিজস্ব—তাহা গান ও চূর্ণ কবিতা।

প্রাকৃত গান চূর্ণ কবিতার আকারেই লেখা। লঘুগুরু অক্ষরের নিয়মিত বিন্যাসে ইহা ছন্দ-বিলসিত কবিতা হইতে অভিন্ন। জীবনে উহাদের প্রয়োগ কিরূপ ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। উহাদের প্রয়োগ বিশেষভাবে দেখা যায় নাটকে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে [৩২ অধ্যায়] উদ্ধৃত 'ধ্রুবা' গানগুলিই প্রাকৃত সঙ্গীতের প্রাচীনতম নিদর্শন। উপযুক্ত সুর, তাল ও লয় সংযোগে এই গানগুলি গীত হইত। গানগুলি নাটকের পাত্র-পাত্রীর মনোগত বিশেষ অবস্থা ও ভাবের দ্যোতনা করিত। বিচ্ছিন্নভাবে ধ্রুবা গানগুলিকে বলা যায় নিখুঁত নিসর্গ কবিতা। ইহার বর্ণনীয় বিষয় প্রধানতঃ প্রকৃতি। বর্ণনা প্রকৃতির, দ্যোতনা হৃদয়ভাবের। নাট্যশাস্ত্রে ধ্রুবাকে বলা হইয়াছে 'ঔপম্যসংশ্রয়া' বা 'ঔপম্যগুণসম্ভবা' অর্থাৎ প্রকৃতির উপমান দ্বারা ইহা হৃদ্‌গত শৃঙ্গার, করুণ, হর্ষ, উদ্বেগ প্রভৃতি ভাব ও রসসঞ্চারে সহায়তা করিত। এইদিক হইতে রস বা ভাবসৃষ্টিতে এই গানগুলির মূল্য ছিল অসাধারণ।

নাট্যশাস্ত্রে অক্ষর-দৈর্ঘ্য অনুসারে অনেকগুলি ধ্রুবার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। প্রথমেই শূলপাণি শংকরের উদ্দেশ্যে একটি রক্ষা প্রার্থনা। ঋতুর বর্ণনা পাওয়া যায় অনেকগুলি ধ্রুবায়। যেমন, এই বর্ষা বর্ণনা,—

এএ গজ্জন্তা তোয়ং মুঞ্চন্তা। লোঅং ছাদন্তা সংপণ্ণা মেহা ॥ ৩২.৬৭

—গর্জনে বর্ষণে ত্রিলোক আচ্ছন্ন করিয়াছে এই পরিপূর্ণ মেঘ।

গজ্জন্তে জলদা ণচ্চন্তে সিহিণো। গাঅন্তে ভমরা রম্মে পাউসএ ॥ ৩২.৮৯

—রমণীয় প্রাবৃট্‌কালে মেঘ গর্জন করিতেছে, শিখীগণ নৃত্য করিতেছে আর ভ্রমর গান করিতেছে।

শরৎ, শিশির ও বসন্তের বর্ণনাগুলিও সুন্দর। চিত্রগুলি একান্তভাবে বস্তুনিষ্ঠ। যেমন, বসন্তাগমে বিকশিত কুসুমবৃক্ষের এই ছবি—

পবণা হতকা তরুণা তরবো। কুসুমাগমএ বিহসন্তি বিঅ ॥ ১০১

—বাতাসে আন্দোলিত তরুণ তরুগুলি কুসুম-বিকাশে হাসিতেছে।

কুসুমগন্ধবাহী সলিলরেণু পুণ্ণো। রমণি বাদি বাদো মণসিজং জণন্তে ॥ ১২৪

—কুসুমগন্ধ বহন করিয়া সলিলকণাপূর্ণ বাতাস বহিতেছে। মনে জাগিতেছেন মনসিজ মদন।

গান যেমন প্রাকৃতের নিজস্ব সম্পদ, তেমনই আর একটি মহামূল্য সম্পদ চূর্ণ কবিতা। এই কবিতায় জীবনের বহুবিচিত্র সুর ধ্বনিত হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃত অংশেও এই রূপ প্রাত্যহিক ধূলিমলিন জীবনের চিত্র পাওয়া যায়। প্রাকৃত প্রকৃতিসন্তানের ভাষা বলিয়াই এখানে পরিচিত জীবনের এত ছড়াছড়ি। প্রাকৃত চূর্ণ কবিতাগুলিও জনজীবনমন্থনোদ্ভূত অমৃত। পল্লীর সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনার ঝংকারে ইহা প্রাণময়। ভাষাও সহজ, সরল, স্বচ্ছন্দ ও ভারহীন। মনে হয়, প্রাকৃত প্রকীর্ণ কবিতাগুলি স্বভাবজাত বনফুল। তাহাদের জৌলুষ নাই, আছে স্নিগ্ধ সৌরভ।

এই চূর্ণ কবিতার প্রধান বিষয় প্রেম ['কামসূস তত্ত']। প্রাকৃত কবিদের দাবি,

অমিঅং পাউঅ-কব্বং পঢ়িউং সোউং ও জে ণ আণন্তি।
কামসূস তত্ত-তন্তিং কুণন্তি তে কহ ণ লজ্জন্তি ॥ [হাল]

—অমৃতময় প্রাকৃত কাব্য যাঁহারা পড়িতে বা শুনিতে না জানেন, কামতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহারা কেন লজ্জাবোধ করেন না।

এই দাবির যাথার্থ্য বিচার করা প্রয়োজন। প্রেমকবিতা সংস্কৃতেও আছে। অমরু, ভর্তৃহরি, গোবর্ধন আচার্যের প্রেম কবিতার কথা আমরা শুনিয়াছি, প্রেমের কবি হিসাবে কালিদাসের শ্রেষ্ঠত্বের কথাও বলা হইয়াছে। তাহা হইলে প্রাকৃত কবির এ দাবি কেন? হইতে পারে, প্রেমের প্রধান আলম্বন বিভাব নায়িকা। আর এই নায়িকা প্রাকৃত-ভাষিণী। দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃতে কাম বা প্রেমকে দেখা হইয়াছে ধর্ম ও মোক্ষের বন্ধনীতে। ঐহিক প্রণয়, শাস্ত্রকারদের মতে প্রাকৃতজনেরই সেব্য। এই সূত্রেও কামতত্ত্ব প্রাকৃত জগতের সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকিবে। বস্তুতঃ ধর্মজীবনের বাহিরেও যে প্রেমের একটি স্থান আছে এবং তাহার গৌরব ও মহিমা কোনদিক হইতেই তুচ্ছ নয়, এ সত্য প্রাকৃত প্রেমকবিতায় স্বীকৃত। প্রেমের অনিরুদ্ধ বাধাবন্ধহারা গতি ও বিধিনিষেধহীন স্বাধীন প্রবৃত্তি এবং সেই সঙ্গে প্রেমের একনিষ্ঠ বলিষ্ঠতা ও প্রগাঢ় তন্ময়তাও তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন। এইজন্য প্রেমের সার্বিক রূপটি প্রাকৃত কবিতাতেই সমধিক প্রস্ফুট। মনে হয়, প্রেমচিন্তায় সংস্কৃত কবিগণ প্রাকৃতেরই অধমর্ণ। 'আর্যা সপ্তশতী' রচনা করিতে গিয়া গোবর্ধন আচার্য এ ঋণের কথা

স্বীকার করিয়াছেন, এবং 'প্রাকৃতসমুচিত' রসকে সংস্কৃতে পরিবর্তিত করার জন্য গর্বও প্রকাশ করিয়াছেন।[১]

এই প্রেমকবিতা লোকের মুখে-মুখে রচিত হইত এবং মুখে মুখেই প্রচলিত ছিল। উহাদের কিছু কিছু উদ্ধৃতি পাওয়া যায় সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে। প্রাকৃত প্রেমকবিতার বিখ্যাত সংকলন হালের 'গাহাসত্তসঈ'। কোটি কোটি গাথার মধ্যে 'কই বচ্ছল' (কবিবৎসল) হাল মাত্র সাতশত গাথা সংকলন করিয়াছেন।[২] সেইজন্যই গ্রন্থের নাম গাথাসপ্তশতী। কিন্তু সংকলনভেদে গাথার সংখ্যার তারতম্য দেখা যায়।

হালের পরিচয় ও কাল বিতর্কিত। বাণভট্টের হর্ষচরিতের উপক্রমণিকায়, সাতবাহন হাল যে সুভাষিত দ্বারা একটি কোষ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ আছে। গাথা সপ্তশতীর একটি গাথায় [৫.৬৭] 'সালাহণনরিন্দো'র (শালিবাহন নরেন্দ্রের) প্রশস্তি আছে। হাল ছিলেন সাতবাহন বংশীয় নরপতি। সাতবাহন রাজাদের কাল খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতক। গাথা সপ্তশতীর ভাষা এতটা প্রাচীনত্বের স্বাক্ষর বহন করে না। গাথা সপ্তশতীতে প্রবরসেন (৬ষ্ঠ শতক) ও বাক্‌পতিরাজের (সপ্তম শতক) কবিতাও উদ্ধৃত হইয়াছে। তবে এই উদ্ধৃতিগুলি পরবর্তীকালের যোজনাও হইতে পারে। হালের সংকলনখানি সপ্তমশতকেই খ্যাতি-সম্পন্ন হইয়াছিল।

সপ্তশতী সাতটি শতকে বিভক্ত। প্রায় প্রত্যেক শতকের শেষে এইরূপ ভণিতা,—

রসিঅজণ-হিঅঅ-দইএ কইবচ্ছল পমুহ সুকই নিম্মইএ।
সত্তসঅম্মি সমত্তং পঢ়মং গাহাসঅং এঅং॥ [১.১০১]

—রসিকজনের হৃদয়-দয়িত কবিবৎসল প্রমুখ সুকবিনির্মিত সপ্তশতের ভিতর এই প্রথম গাথাশতক সমাপ্ত হইল।

[প্রথম, দ্বিতীয় শতকভেদে 'পঢ়মং', 'বীঅং' প্রভৃতি উল্লেখিত হইয়াছে]

শতকবিন্যাসে কোন বৈশিষ্ট্য নাই। ভাবের দিক হইতে বা কবি-ক্রমের দিক হইতেও কোন শৃংখলা নাই। একভাবের শ্লোকের পরই অন্য ভাবের শ্লোক। প্রত্যেকটি শ্লোক স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং অন্যোন্য নিরক্ষেপ। অন্যোন্য নিরপেক্ষতাই চূর্ণ কবিতার বিশেষত্ব। এ যেন মহাকাশের অসংখ্যেয় প্রদীপ্ত নক্ষত্র—একক, স্বতন্ত্র ও হীরকের মত উজ্জ্বল।

গাথা সপ্তশতী চিরন্তন প্রেমের গাথা। সংস্কৃত প্রেমকবিতার মতই ইহাতে প্রেমের বিচিত্র ভাব, শৃঙ্গারের বিভিন্ন অবস্থায় নায়ক-নায়িকার মনোভাব, বিশেষতঃ নায়িকার পূর্বরাগ, অভিসার, মান, মিলনের আকুতি ও বিরহের নিঃসীম ক্রন্দন রূপায়িত

---

১. বাণী প্রাকৃত সমুচিতরসা বলেনৈব সংস্কৃতিং নীতা।
নিম্নানুরূপনীরা কলিন্দকন্যেব গগনতলম্॥ [আর্যাস. উপ. ৫২]

২. সত্ত সআইং কই-বচ্ছলেন কোডীঅ মজ্ঝআরম্মি।
হালেন বিরইআইং সালংকারাণ গাহাণং॥ [গাথাস. ১. ৩]

হইয়াছে। অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত নায়িকার অষ্ট অবস্থা—অভিসারিকা, কলহান্তরিতা, বাসকসজ্জিকা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকা চিত্রের সংখ্যা অসংখ্য। নায়িকা স্বকীয়া আছেন, পরকীয়া আছেন, অনূঢ়া আছেন, পথিকবধূও আছেন। প্রেমের জাতিবিচার নাই, বন্ধনও নাই। বন্ধনহীন অবৈধী প্রেমেই দুঃখ-বেদনা, শঙ্কা ও ব্যাকুলতা অধিক। ইহার আবেদনও তুলনায় গভীর ও নিবিড়। গাথা সপ্তশতীতে এই অবৈধী প্রেমচিত্রেরই সংখ্যাধিক্য। সংস্কৃতের সপ্তপদী গমনের বন্ধন ইহাতে অল্প। শুধু তাই নয়, সংস্কৃত প্রেমকবিতায় আছে প্রখর দীপ্তি —প্রাকৃত প্রেম কবিতায় আছে স্নিগ্ধ মাধুর্য ; সংস্কৃত কবিতার প্রকাশ অলঙ্কারাঢ্য ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে সমুজ্জ্বল—প্রাকৃত কবিতার প্রকাশ সহজ ও অনাড়ম্বর। নিবিড় প্রেমে ঔজ্জ্বল্য থাকে না, ঘটা থাকে না, সে প্রেম হৃদয়কে পেষণ করিয়া নির্মল করিয়া দেয়। অনুভূতির তীব্রতা বচন-রচন কৌশলও জানে না। অধিকাংশ কবিতা নারী-হৃদয়ের নিবিড় অনুভূতির প্রকাশ। তাই প্রকাশও নারীজনোচিত কোমলতা ও মৃদুতায় পূর্ণ।

একথা ঠিক, সপ্তশতীর প্রেমের পরিবেশ দক্ষিণ ভারতের পরিবেশ। বিন্ধ্যারণ্যের শ্যামল বনশ্রী ও জম্বুবনের নীলাঞ্জন ছায়ায় এই প্রেমের লীলা। রেবা-তাপ্তি-গোদাবরীর সলিল-শীকরের স্পর্শ বহু কবিতায় ছড়ানো। কিন্তু পরিবেশ আঞ্চলিক হইলেও এখানে চিরন্তন পার্থিব কামনার সুর চিরকালের সূক্ষ্মতার অনন্তসীমা স্পর্শ করিয়াছে। প্রেম যেখানকারই হউক বা যে জাতীয়ই হউক, উহার ভিতর একটি চিরত্ব আছে। অকৃত্রিম প্রেমের ভাব ও ভাষাও সর্বদেশে ও সর্বকালে প্রায় একপ্রকার। সপ্তশতীর প্রেমকবিতা প্রেমের এই শাশ্বত সুরে বাঁধা।

পঞ্চশরকে প্রণাম করিয়া কবি বলিতেছেন, 'ণমো ণমো মঅণ বাণাণং'—মদনের বাণকে নমস্কার ঃ এই বাণ যেমন দুঃখ দেয়, তেমনই আনন্দও দেয়—'দুক্খেন্তি দেন্তি সোক্‌খং কুণন্তি অনুরাঅং রমাবেন্তি' [৪.২৫] ; কুসুমময় হইলেও এই বাণ অতিশয় প্রখর—'কুসুমমআবি অই খরা' ; ইহার লক্ষ্য অলক্ষ্য, কিন্তু প্রতাপ বড় দুঃসহ—'অলক্‌খফংসা বি দুসহ পহাবা' [৪.২৬] ঃ প্রেমের গুণ বহুপ্রকার—

ঈসং জণেন্তি দীবেন্তি মম্মহং বিপ্পিঅং সহাবেন্তি।
বিরহে ণ দেন্তি মরিউং অহো গুণা তস্‌সা বহুমগ্‌গো ॥ [৪.২৭]

—ইহা ঈর্ষ্যার জন্ম দেয়, মন্মথকে উদ্দীপিত করে, বিপ্রিয় আচরণ সহ্য করিতে শিখায়, বিরহেও মরণের অবকাশ দেয় না।

কিন্তু এই প্রেম সহজলভ্য নয়, 'পুণ্ণেহিং জণো পিও হোই'—বহুপুণ্যে প্রিয় মানুষ লাভ করা যায় [২.৭৪]। আর একটি গাথায় বলা হইতেছে—

কইঅব রহিঅং পেম্মং ণত্থি ব্বিঅ মামি মাণুসে লোএ।
অহ হোই কস্‌স বিরহো বিরহে হোত্তম্মি কো জিঅই ॥ [২.২৪]

—ওগো মামি, কৈতবরহিত প্রেম মনুষ্যলোকে নাই ; যদি এরূপ প্রেম হয়, তাহা হইলে তাহার বিরহে কি কেউ বাঁচে ?

বস্তুতঃ নির্মল প্রেম মনুষ্যলোকে দুর্লভ। কবি বলিতেছেন,

সব্বাঅরেণ মগগহ পিয়ংজণং জই সুহেণ বো কজ্জং।
জং জস্স হিঅঅদইঅং তং ণ সুহং জং তহিং ণত্থি ॥ [৭.৫০]

—যদি সুখে স্পৃহা থাকে সর্বপ্রযত্নে প্রিয়জনকে লাভ করিতে চেষ্টা কর। যে যাহার হৃদয়-দয়িত, তাহার মধ্যে এমন সুখ নাই, যা না আছে।

দীসন্তো দিট্ঠসুহো চিন্তিজ্জন্তো মণবল্লহো অত্তা।
উল্লাবন্তো সুইসুহো পিওজণো ণিচ্চরমণিজ্জো ॥ [৭.৫১]

—হে অত্তা (আর্য্যা), প্রিয়জন নিত্য রমণীয়ঃ তাহার দর্শনে সুখ, চিন্তায় আনন্দ, আলাপন শ্রুতিসুখকর।

দুখং দেন্তো বি সুহং জণেই জো জস্স বল্লহো হোই [১.১০০]

—প্রিয়জন যে দুঃখ দেয়, তাহাও সুখ উৎপাদন করে।

শুধু কি তাই—লবণযুক্ত হইয়াও যেমন এক ফোঁটা স্নেহের অভাবে ব্যঞ্জন বিস্বাদ, তেমনই—পিঅরহিউ উণ পুহবিং বি পাবিউণ দুগ্গও চ্চেঅ [৬.১৫]—পৃথিবীপতি হইয়াও যে প্রিয়রহিত, সে দুর্গত।

প্রেম ও প্রিয়জন সম্পর্কে এইরূপ অসংখ্য সূক্তি গাথাসপ্তশতীতে আছে। প্রেমের রাজত্ব যে কণ্টকশূন্য নয়, তাহাও গাথাকার লক্ষ্য করিয়াছেন। খল ও সুজন—প্রেমরাজ্যের দুই নায়ক; একজন প্রেমের অভিনেতা, অন্যজন খাঁটি প্রেমিক। আকারে দুই এক হইলেও, প্রকারে একান্ত পৃথক। খলের প্রেম ক্ষণভঙ্গুর, সুজনের প্রেম স্থির ঃ

কীরন্তী ব্বিঅ ণাসই উঅএ রেহব্ব খলজণে মেত্তী।
সা উণ সুঅণম্মি কআ অণহা পাহাণ রেহব্ব ॥ [৩.৭২]

—খলজনে নিবন্ধ মৈত্রী জলের আলপনার মত নষ্ট হয়, আর সুজনের প্রতি প্রীতি পাষাণরেখার মত অনাহত থাকে।

তুঙ্গ চ্চিঅ হোই মণো মণসিংণো অন্তিমাবি দসাসু।
অত্থমণম্মি বি রইণো কিরণা উদ্ধংচিঅ ফুরন্তি ॥ [৩.৮৪]

অস্তগমনকালেও রবির কিরণ যেমন উর্দ্ধে স্ফুরিত হয়, তেমনই অন্তিম দশাতেও মনস্বিগণের মন উন্নত থাকে।

বসণম্মি অণুব্বিগ্গা বিহবম্মি অগব্বিআ ভএ ধীরা।
হোন্তি অহিন্নসহাবা সমেসু বিসমেসু সপ্পুরিসা ॥ [৪.৮০]

—সৎপুরুষ ব্যসনে অনুদ্বিগ্ন, বিভবে অগর্বিত, ভয়ে ধীর, উন্নত বা অবনত অবস্থায় অভিন্ন স্বভাব।

গভীর প্রেমে যেমন নিবিড় আশ্বাস, তেমনই আশঙ্কাও উহাতে প্রবল। আশঙ্কা এই, পাছে এ প্রেম ভাঙ্গিয়া যায়। 'বালবালুঙ্কি তন্তু কুডিলাণং পেম্মাণং' [১.১০]—প্রেমের গতি শিশু কর্কটিকার তন্তুর ন্যায় কুটিল। নায়ক বহুবল্লভ হইতে পারে; বক্র ও সরলের প্রেমও চিরস্থায়ী হয় না—'বংকস্স উজুঅস্স অ সংবন্ধো

কিং চিরং হোই' [৫.২৪]; অতিদুঃখে লাভ করা হৃদয়ধন মনের মত নাও হইতে পারে ঃ

দুক্‌খেহিং লব্‌ভই পিও লদ্ধো দুক্‌খেহিং হোই সাহীণো।
লদ্ধো বি অলদ্ধো চ্চিঅ জই জহ হিঅঅং তহ ণ হোই ॥ [৪.৫]

—দুঃখদ্বারা প্রিয়কে লাভ করা গেল, অতি কষ্টে সেই প্রিয়কে বশও করা হইল, কিন্তু যদি মনের মত না হয়, তাহা হইলে পাওয়া হইলেও তাহাকে তো পাওয়া হইল না।

প্রেমভঙ্গও নানাপ্রকারে হইতে পারে ঃ

অদংসণেণ পেম্মং অবেই অইদংসণেণ বি অবেই।
পিসুণজণ জম্পিএণ বি অবেই এমেঅ বি অবেই ॥ [১.৮১]

—অদর্শনে প্রেম চলিয়া যায়, অতিদর্শনেও প্রেম ভঙ্গ হইয়া যায়, দুষ্ট লোকের কথাতেও প্রেম ভাঙ্গে, আবার এমনিও ভাঙ্গে।

প্রেমভঙ্গের বেদনা নিদারুণ। ভগ্নপ্রেম সহজে জোড়া লাগে না। প্রেমভঙ্গের পর পুনর্মিলন হইলেও সুখ নাই ; উহা শীতলীভূত উষ্ণজলের ন্যায় স্বাদহীন [১.৫৩]।

গাথা সপ্তশতীতে কতকগুলি প্রকৃতিচিত্র আছে। কিন্তু এই সকল চিত্রও প্রেমেরই উদ্দীপন বিভাব মাত্র। প্রকৃতির চিত্র কোথাও মানুষী প্রেমের প্রতিচিত্র, কোথাও প্রকৃতি-ব্যপদেশে প্রেমার্থান্তরের ব্যঞ্জনা। যথা,

রোবন্তি ব্ব অরণ্ণে দূসহ রইকিরণফংস সংতত্তা।
অই তার ঝিল্লি বিরুএহিঁ পাঅবা গিম্হ মজ্‌ঝণ্‌হে ॥ [৫৭৪]

—গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে রবিকিরণস্পর্শে সন্তপ্ত পাদপ অতি উচ্চ ঝিল্লিরব ছলে অরণ্যে রোদন করিতেছে।

[প্রখর গ্রীষ্মে পতিকে প্রবাস গমনে নিষেধ করিয়া নায়িকার গ্রীষ্ম বর্ণনা]

পচ্চুসাগঅ রঞ্জিত দেহ পিআ লোঅ লোঅণানন্দ !
অন্নত্ত খবিঅ-সব্বরি ণহ-ভূসণ দিণবই নমো দে ॥ [৭.৫৩]

—রঞ্জিত দেহ, প্রিয়জনের লোচনানন্দ, রজনীতে অন্যত্র বাসকারী, প্রত্যুষাগত নভোভূষণ দিনপতি সূর্য, তোমাকে নমস্কার।

[প্রভাতসূর্য বন্দনাছলে প্রত্যুষাগত নায়কের প্রতি নায়িকার উক্তি]

সপ্তশতীতে কৃষ্ণলীলার প্রসঙ্গও দুর্লভ নয়। একটি পদে দেখি যশোদা যখন দামোদরের ব্যলকত্ব ঘোষণা করিতেছেন, তখন কৃষ্ণেব দিকে তাকাইয়া ব্রজগোপীগণ হাস্য করিতেছেন [২.১২]। আর একটি পদে রাধার উল্লেখ রহিয়াছে—

মুহমারুএণ তং কহ্ন গোরঅং রাহিআএ অবণেন্তো।
এতাণ বলবীণং অন্নাণ বি গোরঅং হরসি ॥ [১.৮৯]

—মুখমারুতদ্বারা রাধিকার চক্ষের ধূলি অপনয়ন করিয়া, হে কৃষ্ণ, তুমি এই অন্যান্য বল্লবী (গোপী) গণের গৌরব হ্রাস করিতেছ।

গাথা সপ্তশতীর অনুকরণে আরও দুই-একটি প্রাকৃত কবিতার কোষগ্রন্থ পাওয়া যায়, তম্মধ্যে 'বজ্জালগ্গ' উল্লেখযোগ্য। হাল-বিরচিত গ্রন্থ হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, এখানে শ্লোকগুলি বিষয়ানুক্রমে সজ্জিত। এখানে শুধু প্রেমের কবিতাই নয়, অন্যান্য বিবিধ বিষয়ের কবিতাও সংকলিত হইয়াছে। প্রাকৃত ভাষা সম্পর্কে কবির উক্তিগুলি বিশেষত্বের দাবি রাখে। যেমন এই উক্তিটি—

ললিএ মহুরকখরএ জুবঈজণ বল্লহে সসিংগারে।
সন্তে পাউঅকব্বে কো সক্কই সক্কঅং পঢ়িউং ॥

যুবতীজনের প্রিয়—শৃঙ্গারযুক্ত ললিতমধুরাক্ষর প্রাকৃত কাব্য থাকিতে কে সংস্কৃত পড়িতে ইচ্ছা করে?

৬. বাংলা সাহিত্যের সহিত প্রাকৃত সাহিত্যের সম্পর্ক

প্রাকৃত রসসাহিত্যর সহিত উচ্চতর বাংলা সাহিত্যের প্রত্যক্ষ যোগ নাই। একদিন নিশ্চয়ই এদেশে প্রাকৃত ভাষাই ব্যবহৃত হইত। পণ্ডিতগণের মতে সে ভাষার নাম প্রাচ্য বা পূর্বী প্রাকৃত। পরবর্তীকালে তাহাকে মাগধী প্রাকৃতও বলা হইয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত নাটকের কিছু কিছু প্রাকৃত অংশ [যেমন, শকুন্তলার ধীবরের উক্তি কিংবা মৃচ্ছকটিক নাটকের শ-কারের উক্তি প্রভৃতি] ব্যতীত এই প্রাকৃতের কোন পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যিক নিদর্শন নাই। কয়েকটি শব্দসম্পদ ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে এই প্রাকৃতের কোন দায়ভাগও এদেশে রক্ষিত হয় নাই।

(i) তথাপি সর্বভারতীয় প্রাকৃত সাহিত্যের সহিত এদেশের পরিচিতি ছিল না. ইহা নির্দ্বিধায় স্বীকার করা যায় না। একটি প্রাকৃত মহাকাব্যের রচনা-পদ্ধতির সহিত বাংলা মঙ্গলকাব্যের আশ্চর্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তাহা বাক্‌পতিরাজকৃত 'গৌড়বহো' কাব্য। কাব্যরচনায় 'সর্গবন্ধ' সংস্কৃত কাব্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। গৌড়বহো কাব্যে এই সর্গবন্ধের বন্ধন নাই। বাংলা মঙ্গলকাব্যও সর্গবন্ধ কাব্য নয়। কাব্যের সূচনায় বিভিন্ন দেব-দেবীর বিস্তৃত বন্দনা কোন সংস্কৃত কাব্যে নাই। গৌড়বহো কাব্যে দেখি, প্রথমেই ২১ জন দেবদেবীর বন্দনা [ব্রহ্মদেবস্য, হরেঃ, নৃসিংহস্য, মহাবরাহস্য, বামনস্য, কূর্মস্য, হরেঃ মোহিনী রূপস্য, কৃষ্ণস্য, বলভদ্রস্য, বলকৃষ্ণয়োঃ, মধুমথঃ, শিবস্য, গৌর্য্যা,[১] সরস্বত্যাঃ, চন্দ্রস্য, সূর্যস্য. অহিবরাহস্য, গণপতেঃ, লক্ষ্ম্যাঃ, কামস্য, গঙ্গায়াঃ]। বাংলা মঙ্গলকাব্যেরও সূচনা এই ধরনের বহু দেব-দেবীর বন্দনা লইয়া। বিশেষতঃ গণপতি, গৌরী, সরস্বতী ও লক্ষ্মীর বন্দনা প্রায় প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেই রহিয়াছে। উপরন্তু গৌড়বহো কাব্যে আছে কাব্যোৎপত্তির বিস্তৃত বিবরণ। দুই-একটি সংস্কৃত কাব্যে [যেমন, হর্ষচরিত]

১. গৌড়বহো কাব্যে গৌরী-বন্দনা অংশে 'ণমহ কালীএ' বলিয়া বন্দিতা হইয়াছেন কপালিনী কালী।

বিস্তৃত কবি-পরিচিত থাকিলেও কাব্যোৎপত্তির বিবরণ নাই। এদিক হইতেও বাংলা মঙ্গলকাব্যের কাব্যোৎপত্তির বিস্তৃত বর্ণনার সহিত গৌড়বহো কাব্যের সাদৃশ্য আছে। মঙ্গলকাব্য যেমন গীত হয়, গৌড়বহো কাব্যখানিও তেমনই গান করা হইয়াছিল।

(ii) নাটকের প্রাকৃত সংলাপের অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায় দীনবন্ধুর নাটকে। এ সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমত, 'সংস্কৃত নাটকে চরিত্রের সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী ও নরনারীভেদে যে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ভেদ দেখা যায়, তাহারই অনুরূপ একটা পার্থক্য দীনবন্ধু নিজ নাটকে অনুসরণ করিয়াছেন।' [বাংলাসাহিত্যের বিকাশের ধারা]। নাটকের প্রাকৃত সংলাপের এই অনুবর্তন পরবর্তী বাংলা নাটক ও যাত্রায়ও লক্ষিত হয়, ব্যাধ-কিরাতাদির ভাষায় আধভাঙ্গা হিন্দী-মিশ্রিত বাংলা সংলাপযোজনায়।

(iii) বাংলা প্রেমকবিতার স্পষ্ট যোগ রহিয়াছে প্রাকৃত প্রেমকবিতার সহিত। এদেশের উচ্চতর সাহিত্যের কবিগণ প্রাকৃত চূর্ণ কবিতার সহিত পরিচিত ছিলেন। গোবর্ধন আচার্য আর্যাসপ্তশতী রচনায় যে হালের সপ্তশতী দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাহা বলা হইয়াছে। হালের 'কইঅঅ রহিঅ পেম্মং' শ্লোকটি হুবহু উদ্ধৃত হইয়াছে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে [মধ্য. ২য় পরিঃ.], যদিও উদ্ধৃতিটি সেখানে গৃহীত হইয়াছে 'তোষণীকৃত ব্যাখ্যা' হইতে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে পাই, শ্রীমন্ত বিদ্যারম্ভে 'পড়ে দুই সপ্তশতী' ; এই দুই সপ্তশতী বলিতে হালের ও গোবর্ধন আচার্যের সপ্তশতীই বুঝায়।

এই সূত্রে উচ্চতর সাহিত্যে, বিশেষতঃ বাংলার বৈষ্ণব পদাবলীতে গাথাসপ্তশতীর ভাবচিত্র দুর্লক্ষ্য নয়। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে কতকগুলি সাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, যেমন, গোবিন্দদাস কবিরাজের 'কন্টক গাড়ি কমলসমপদতল-মঞ্জীর চীবহি ঝাঁপি' পদটির সহিত গাথাসপ্তশতীর,

অজ্জা মএ গন্তব্বং ঘণন্ধআরে বি তস্স সুহঅস্স।
অজ্জা ণিমীলিঅচ্ছী পঅপরিবাডিং ঘরে কুণই ॥ [৩.৪৯]

—আজ ঘন অন্ধকারে আমাকে সেই সুভগের অভিসারে যাত্রা করিতে হইবে, এই ভাবিয়া তিনি অক্ষি নিমীলিত করিয়া গৃহেই গমন-পরিপাটি অভ্যাস করিতেছেন।

কিংবা কলহান্তরিতা রাধার প্রতি সখীদের এই উক্তি ঃ

পঅ পডিও ন গণিও পিয়ং ভণন্ত বি অপ্পিয়ং ভণিও।
বচ্চন্তো বি ণ রুদ্ধো ভণ কস্স কএ কও মাণো ॥ [৫.৩২]

—পাদপতিত হইলেও তাহাকে গণনা কর নাই, প্রিয় বচন বলা সত্ত্বেও তুমি তাহাকে অপ্রিয় বচন বলিয়াছ, তাহার গমন-পথেও বাধা দাও নাই—বল, কাহার প্রতি এই মান ?

[তুলনীয় ঃ মানিনি কিয়ে কঠিন তুয়া মান।
ছলেবলে দিঠিজলে তোহে কত সাধল
পালটি না হেরলি কান ॥ গোবিন্দদাস]

(iv) কিন্তু উচ্চতর সাহিত্যে, এমন কি বৈষ্ণব পদাবলীতেও প্রেমের সূক্ষ্ম চেতনা প্রবিষ্ট হইয়াছে সংস্কৃত প্রেমকবিতার পথ বাহিয়া। উহাদের সহিত প্রাকৃত কবিতার সাদৃশ্যও সংস্কৃত-জানা কবিদের মধ্যস্থতায়। তাহাতে প্রেমের দীপ্তি যত প্রকট, নিবিড়তা ততটা নয়। তাহাতে আছে প্রেমের আড়ম্বর, শোভাযাত্রা ও অহং-এর প্রকাশ। কিন্তু প্রাকৃত কবিতার প্রেমে কোথায় যেন আছে চন্দ্রকান্তমণিতে চন্দ্র-কৌমুদীর স্পর্শ, যাহা হৃদয়কে নমিত করে, স্নিগ্ধ করে, বিগলিত করে। তাহাতে ঔজ্জ্বল্য অপেক্ষা কমনীয়তা, বিলাস অপেক্ষা প্রেমের ত্যাগদীপ্ত মহিমার প্রকাশ। প্রাকৃত কবিতার এই বিশিষ্টতার সহিত বাংলার লোক-সাহিত্যের প্রেমের নাড়ীর যোগ আছে—চণ্ডীদাসের পদাবলীতে, পল্লীগীতিকার পল্লীবালাদের প্রণয়ে এবং বাউলদের প্রেম-চেতনায়।

প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে চণ্ডীদাসের প্রেম-পদাবলী। চণ্ডীদাস আর দশজন বৈষ্ণব পদকর্তা হইতে স্বতন্ত্র ঃ প্রেম-চেতনায় তিনি সহজিয়া ও প্রাকৃত কবিদের সগোত্র। তাঁহার পদগানে নিবিড় অনুভূতির স্পর্শ। চণ্ডীদাসের প্রেম অলঙ্কার-শাস্ত্রের আনুগত্য স্বীকার করে না ; প্রত্যক্ষ অনুভবের স্পর্শে উহা প্রাণময়, স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ। চণ্ডীদাসের পিরীতি স্বর্গের অধরা প্রেমও নয়, মাটির ছোঁয়ায় উহা মেদুর। প্রাকৃত প্রেম-কবিতার সহিত উহার মিল স্বভাবগত।

(ক) গাথাসপ্তশতীতে দেখি, নায়িকা বলিতেছেন, তাহাকে দেখিলে দুই হাতে আঁখি না হয় ঢাকিয়া রাখিলাম, কিন্তু কদমফুলের মত 'পুলইঅং' (পুলক-রোমাঞ্চ) কি করিয়া ঢাকিব ঃ

> অচ্ছীইঁ তা থইস্সং দোহিঁ বি হত্থেহিঁ বৈ তস্সিং দিট্ঠে।
> অঙ্গং কলম্বকুসুমং ব পুলইঅং কহঁ ণু ঢক্কিস্সম্ ।। [৪.১৪]

ঠিক এই সুরের পদ পাই চণ্ডীদাসে,

> গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
> পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া ।।
> পুলকে পুরয়ে অঙ্গ আঁখি ভরে জল।
> তাহা নিবারিতে আমি হইয়ে বিকল ।।

(খ) চণ্ডীদাস নব অনুরাগিণী রাধার চিত্র উদ্ঘাটন করিয়াছেন ঃ

> রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
> বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
> না শুনে কাহারো কথা ।। * * *
> হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে
> কি কহে দুহাত তুলি।

ঠিকই ইহারই একটি প্রতিলিপি পাওয়া যায় গাথাসপ্তশতীতে ঃ

> পেচ্ছই অলদ্ধলক্খং দীহং ণীসসই সুণ্ণঅং হসই।
> জহ জম্পই অফুডত্থং তহ সে হিঅঅট্ঠিঅং কিংপি ।। [৩.৯৬]

—অলব্ধ-লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি, দীর্ঘ নিঃশ্বাস, শূন্যে তাকাইয়া হাস্য ও অস্পষ্ট ভাবে কি যেন আলাপ—এইগুলি দ্বারা সুস্পষ্ট, তাহার হৃদয়ে কি যেন হইয়াছে।

(গ) প্রত্যূষাগত অন্য নায়িকার সম্ভোগচিহ্নধারী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধার বাক্য,

অধরের তাম্বূল বয়ানে লেগেছে
ঘুমে ঢুলুঢুলু আঁখি।
আমা পানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও
নয়ন ভরিয়া দেখি ॥

ইহার সহিত মিল রহিয়াছে সপ্তশতীর খণ্ডিতা নায়িকার 'পচ্চুসাগঅ রঞ্জিত দেহ পিআ লোঅ লোঅণানন্দ' [৭.৫৩] উক্তির।

(ঘ) প্রাকৃত কবিতার কতকগুলি শ্লোকের সহিত চণ্ডীদাসের এই বহিরঙ্গ সাদৃশ্য বড় কথা নয়; মনে ও মেজাজে চণ্ডীদাস প্রাকৃত প্রেমের সাধক। প্রাকৃত কবিতায় শুধু প্রেমের বিভাবের বর্ণনা নাই, আছে প্রেম-মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ। চণ্ডীদাসও প্রেম-মনস্তত্ত্বের ভাষ্যকার। 'পিরীতি'-লক্ষণ বর্ণনায় প্রাচীন বাংলাকাব্যে চণ্ডীদাস অদ্বিতীয়। তাঁহার মতে 'পিরীতি' রসের সাগরমন্থনোদ্ভূত 'অমিয়া'—'সকল সুখের এ তিন আখর'; মনের সহিত মনের মিলনেই ইহার উদ্ভব—'দুই মন এক করিতে পারিলে তবে সে পিরীতি হয়,' 'যাহার সহিত যাহার পিরীতি সেই সে মরম জানে'। এই পিরীতি শুধু সুখ নয়—ইহাতে আছে দুঃখের আঘাত, বিষের স্পর্শ, অনল-দহন যাতনা—ইহা 'তুষের অনল', মরণ সমান'। তবুও পিরীতি সুখ—'যেন মলয়জ চন্দন শীতল ঘষিতে সৌরভময়'। চণ্ডীদাস-বর্ণিত প্রেমের এই ভাবস্থির লক্ষণগুলি প্রাকৃত কবিতার 'কামতত্ত্বে'র সগোত্র।

প্রাকৃত কবিতার এই 'থির পেম্মা' (ভাবস্থির সুদৃঢ় প্রেম) লোকজীবনের খাত ধরিয়া প্রবাহিত হইয়াছে বাংলার পল্লীগীতিকার প্রেমে। প্রাকৃত কবিতায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্ণিত হইয়াছে গ্রাম্য রমণীর হৃদয়াকুতি। গ্রামবাসিনী যুবতীই এই প্রেমের অগ্র-নায়িকা; নায়িকা কোথাও হালিক-পত্নী, কোথাও গ্রামনী-নন্দিনী। কৃষি-প্রধান পল্লীর কোমল মাটির মতই অতি কোমল তাহাদের মন। তাহাদের প্রেমও নরম মাটির মত কমনীয়, কিন্তু পাষাণ-রেখাব মত অটুট। এ প্রেমে সূর্যের খরদীপ্তি নাই, আছে চন্দ্রিকার স্নিগ্ধ ভাতি। অনুরাগ-রাগিণী সরলা পল্লীবালার সরল, অনাড়ম্বর, প্রাণময় আত্মভাষণে অনুভূতির স্পর্শ অতি নিবিড়। ঠিক এই প্রেমেরই প্রকাশ দেখা যায় বাংলার পল্লীগীতিকায়। এখানেও অধিকাংশ পালায় প্রধান হইয়া উঠিয়াছে মহুয়া, মলুয়া, ভেলুয়া, চন্দ্রাবতী, নুরন্নেহা, বগুলা প্রভৃতি পল্লীবালার সুগভীর প্রেম। পূর্বরাগে, অনুরাগে, প্রেমবৈচিত্ত্যে ও বিরহে, এ প্রেমচিত্র প্রাকৃত প্রেমেরই প্রতিলিপি। ধ্বনিগুলিও প্রাকৃত কবিতারই ধ্বনি; যথা,—

(ক) প্রথম প্রণয়ের অগাধ রূপতৃষ্ণা—রূপ দেখিয়াও দেখার সাধ মিটে না। গাথার নায়িকা বলেন।

অবিঅণ্হ-পেক্খণিজ্জেণ তক্খণং মামি তেণ দিট্ঠেণ।
সিবিণয়-পীএণ ব পাণিএণ তণ্হ শ্বিঅ ণ ফিট্টা॥ ১.৯৩

—ওগো মামি, অতৃপ্ত নয়নে তাহাকে দেখিয়াও তৃষ্ণা মিটে নাই, স্বপ্নে জলপান করার মত এ তৃষ্ণা দুরপনেয়।

পল্লীগীতিকার নায়িকা সেখানে বলেন,

পরথম পরীতি যেমন তিয়াসীর পানি।
শয়ন স্বপনর মাঝে পড়ে টানাটানি॥ [নুরন্নেহা পালা]

(খ) অসম প্রেমের বেদনা চিরকালের। গাথার নায়িকা বলেন,

অপ্পচ্ছন্দ পহাবির দুল্লহলম্ভং জণং বিমগ্গন্ত।
আআস-পহেহি ভমন্ত হিঅঅ কইআবি ভজ্জিহিসি॥ ৩.২

—দুর্লভজনের প্রতি প্রেম করিয়া তুমি আকাশে উঠিয়াছ, ওগো হৃদয়, কখন যেন তুমি ভাঙ্গিয়া পড়।

পল্লীগীতিকাতেও বিষম প্রেমের প্রতি এই সাবধানী বাণী ঃ

বড়র সঙ্গে ছোটর পিরীতি হয় অগঠন।
উচা গাছে উঠলে যেমন পড়িয়া মরণ॥ [ধোপার পাট]

(গ) গাথা সপ্তশতীতে নারীর যৌবনকে তুলনা করা হইয়াছে ভরা নদীর সহিত ['নইউর সচ্ছহে জোব্বণম্মি' ১.৪৩]; পল্লীগীতিকার একাধিক পালায় শুনা যায় একই সুর ঃ

নারীর যৈবন জাইন্য জোয়ারের পানি।
কুলে কুলে ভরে আবার ভাডাৎ টানাটানি॥ [নছরমালুম]

(ঘ) গাথার কতকগুলি শ্লোকে বর্ষায় বিরহিণী নারীর অন্তর্বেদনাকে রূপ দেওয়া হইয়াছে ; একটি শ্লোকে মেঘগর্জন শ্রবণে নারী-হৃদয়ের দুঃখ উদ্ঘাটিত হইয়াছে ঃ

অজ্জ মএ তেণ বিণা অণুহূঅ-সুহাই সংভরন্তীএ।
অহিণব মেহাণ রবো নিসামিও বজ্ঝ-পডহো শ্ব॥ ১.২৯

—আজ তাহার অভাবে পূর্বের সুখ স্মরণ করিয়া নবমেঘ গর্জনকে বধ্যপটহের মত শ্রবণ করিতেছি।

পল্লীগীতিকাতেও সেই একই কথা,

দেবায় ডাকে হারুম-ধুরুম আছমান ভাঙ্গি পড়ে।
এশ্নিকালে একলা আমি কেমনে থাকি ঘরে॥ [নছরমালুম]

এইরূপ বহু উদাহরণ দ্বারা গাথাসপ্তশতী ও বাংলা গ্রাম্যগীতির ভিতর মিল দেখানো যাইতে পারে। এই মিল যে প্রত্যক্ষভাবে প্রাকৃত কবিতা হইতেই আসিয়াছে, তাহা নাও হইতে পারে। সকলদেশে সকলকালে প্রেমের লক্ষণ ও আকৃতি প্রায় সমান। তবে লোকজগতের প্রেমে লোকজগতেরই অধিকার ঃ এই সূত্রে পল্লীগীতিকায় প্রাকৃত প্রেমকবিতার প্রভাবচিহ্ন থাকা অস্বাভাবিক নয়।

হয়তো এই সূত্রেই বাংলার বাউল গানেও যুগাতিশায়ী প্রাকৃত প্রেমকবিতার

সুরের রেশ পাওয়া যায়। অবশ্য বাউলিয়া প্রেমের আধ্যাত্মিকতা ও রহস্যময়তা প্রাকৃত প্রেমকবিতায় নাই। কিন্তু প্রেমিক-লক্ষণ উভয় কবিতাতেই এক। বাউল 'অধরা' মনের মানুষের প্রেমে পাগল। এই মনের মানুষকে ধরিয়া দিতে পারেন মর্ত্যের প্রেমিক গুরুরূপী সুজন। গাথাসপ্তশতীতে এই সুজন ও কুজন প্রসঙ্গে যে সকল উক্তি করা হইয়াছে, বাউল গানেও তাহার প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে। গাথার নায়িকা বলেন, সুজন নিমেষহীন নয়নে দর্শনীয় ['অবিইণ্‌হ পেচ্ছণিজ্জং]—সুখে বা দুখে তিনি সমভাবাপন্ন ['সম সুহ-দুক্‌খং'], তিনি প্রেম বিতরণে অকৃপণ ['বিইণ্ণ সব্‌ভাবং'], —তিনি সত্যকারের মর্মজ্ঞ ['হিঅঅণ্ণ' = হৃদয়জ্ঞ], সদ্ভাবে ও স্নেহে পরিপূর্ণ ['সব্‌ভাবণেহ-ভরিএ']। বাউল বলেন,

মহাভাবের মানুষ হয়রে যে জনা
তারে দেখলে যায় চেনা।
ও তার নয়নদুটি ছলছল রে
মুখে মৃদু হাসি বদনখানা॥
হেতু সম্বন্ধ নাইরে ও তার
করে নিহেতু প্রেম বেচা কেনা।
ফলে আশা করে না সে, সেই রসিকজনা॥[১]

সহজ-সরল, অনাড়ম্বর লোকজগতের এই প্রেম চণ্ডীদাস, বৈষ্ণব সহজিয়া, পল্লীগীতি ও বাউল গানের 'সোতা' বাহিয়া বাংলার লোক-গীতিকে এক দুর্লক্ষ্য ধারায় মধুর করিয়া তুলিয়াছে। উচ্চতর সাহিত্যের প্রেমোচ্ছ্বাসে তাহার কমনীয় মধুর মূর্তিখানি যবনিকার আড়ালে আত্মগোপন করিয়াছে, কিন্তু পল্লীর বুকে বা লৌকিক জগতে তাহা তাহার মাধুর্যকে অনাবৃত রাখে নাই। এই প্রেম ধারারই পুনরুজ্জীবন লক্ষ্য করা যায় নিধুর টপ্পায় ও রামবসুর প্রণয়-সঙ্গীতে। রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু বাংলাদেশে বৈঠকী 'আখড়াই' গানের প্রবর্তক। এই গানের প্রণয়-গীতির অংশগুলি অতি নিবিড় ও ভাবতন্ময়। উহাতে অধিকাংশক্ষেত্রে সংস্কৃত প্রেম-কবিতার রূপকল্প (যথা, চাঁদ-চকোর, চাতক-ধারাজল, সূর্য-পদ্মিনী, চন্দ্র-কুমুদিনী) গৃহীত হইলেও, উহা লৌকিক প্রণয় গীতির কোমল মাধুর্যে ভরপুর এবং প্রগাঢ় অনুভূতিময়। নিধুবাবুর 'সুজন সহিত প্রেম কি পরমাধিক সুখ, যে করেছে সেই জানে'—প্রাকৃত কবিতার 'হিঅঅণ্ণএহি' সমঅং···জহ সুহাবেন্তি' [হৃদয়জ্ঞ ব্যক্তির সহিত মিলনে যে সুখ—১.৬১], 'সাধিলে করিব নাম কত মনে করি, দেখিলে তাহার মুখ তখনি পাসরি'—প্রাকৃত কবিতার 'স মাণো চোরিঅ-কামুক ব্ব দিট্‌ঠে পিএ ণট্‌ঠো' [প্রিয়ের দর্শনে সেই নাম চোর-কামুকের মত পলায়ন করে ২.৪৪], কিংবা,

মুকুরে আপন মুখ হেরিলে যে হই সুখী।
নয়নে আমার, বাস হে তোমার
সেই সে কারণে দেখি॥

১. হারামণি—মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন।

গাথাসপ্তশতীর—তুজ্ঝ বসই ত্তি হিঅঅং ইমেহি' দিট্ঠো তুমং তি অচ্ছীইং।
তুহ বিরহে কিসিআইং তি তীএ' অঙ্গাই' বি পিআইং ॥ ১.৪০

—বিরহে কৃশা তাহার নিকট তাহার হৃদয় ও নয়ন বড় প্রিয়, কারণ, তাহার হৃদয় তোমার বাসস্থান ও তাহার নয়ন দ্বারা তুমিই দৃষ্ট হও।

প্রাকৃত প্রেম-কবিতার সুরে সাধা, বাংলার মাটির মায়া দিয়া ঘেরা, সরল ভাষায় হৃদয়ের এই প্রেমের গান নিধুর টপ্পা ও রামবসুর প্রণয়-বিরহ সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। ঊনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যে আসিয়াছে পাশ্চাত্ত্য প্রণয়-রীতি, পাশ্চাত্ত্য প্রণয়-গীতি। তাহারই সুউচ্চ নাদে এদেশের হৃদয়-ভাবের নিবিড়তায় ভরা লোক-জগতের মধুর ঝঙ্কারগুলি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। হয়তো গ্রামে-ঘরে গ্রাম্য কবির মুখে মুখে সে গান গুঞ্জরিত হইত, হয়তো পল্লীবালার কণ্ঠে সে গান গোপনে গুন্‌গুন্‌ করিত। কিন্তু সাহিত্যে তাহাদের কোন চিহ্ন রক্ষিত হয় নাই। সহসা ঊনবিংশ শতাব্দের শেষের দিকে কবি বিহারীলালের কণ্ঠে সেই খোলা মনের খোলা সুর আবার ঝংকৃত হইল—সেই দেশজ মৃত্তিকার নিজহৃদয়ের প্রেমের গান—সরল, আনড়ম্বর অথচ মন্ময়।

একথা ঠিক, বিহারীলাল কাব্যমধ্যে সংস্কৃত কবিদের প্রেম-মূলক শ্লোকেরই উদ্ধৃতি দিয়াছেন—ভর্তৃহরি, কালিদাস, ভবভূতির এবং দেখা গিয়াছে সংস্কৃত প্রণয়-কবিতার সূক্ষ্মতা ও নিবিড়তার প্রতিই তাঁহার আকর্ষণ, বিশষতঃ ভবভূতির সুসূক্ষ্ম, স্পর্শকাতর, অনুভূতি সর্বস্ব প্রেম-চেতনার প্রতি। কিন্তু তাহা হইতেও বড় কথা, বিহারীলাল এদেশের লৌকিক সহজিয়া ও বাউলদের মর্মসঙ্গী। বাউলের মহাভাবের মানুষের সঙ্গে তাঁহার নাড়ীর পরিচয়। 'বাউল বিংশতির' একটি গানে তিনি এই প্রেমের মানুষের ছবি আঁকিয়াছেন,

প্রেমের মানুষ চেনা যায়।
তার হাসি হাসি মুখশশী খুসী ফোটে চেহারায়।
সদাশিব, সদানন্দ, সরল অন্তর,
কেহ নাহি আপন পর,
সে জানে না দুনিয়াদারী, ভালবাসে দুনিয়ায়।

ইহা পূর্বে উদ্ধৃত একটি বাউল গানেরই ['মহাভাবের মানুষ হয়রে যে জনা, তারে দেখলে যায় চেনা।'] প্রতিধ্বনি, তথা প্রাকৃত কবিতার সুজনের একটি নিখুঁত প্রতিলিপি—যে সুজনের 'বিইন্ন সব্ভাবং' (সদ্ভাব সর্বত্র বিকীর্ণ)। এই প্রেমিকেরই বিরহ-বিদীর্ণ হৃদয় চিত্রিত করিয়া কবি ধৈর্যধারণের একটি উপমা দিয়াছেন,

অস্তাচলে চলে রবি,
কেমন প্রশান্ত ছবি!
তখনো কেমন আহা উদার বিভূতি। সারদামঙ্গল [২.২১],

ইহা 'তুঙ্গ চ্চিঅ হোই মণো মণসিংণো অন্তিমা বি দসাসু' [৩.৮৪] এই প্রাকৃত শ্লোকটিরই প্রতিধ্বনি।

কিন্তু দূরাগত এই ধ্বনি-প্রতিধ্বনির কথা নয়, বিহারীলালের প্রেমের গানে সহজ মাটির সহজ সুর। এই দিক হইতে তিনি লৌকিক প্রেম-কবিতার উত্তরসাধক। প্রাকৃত প্রেমের সুগভীর অনুভূতি তাঁহার অনুভবের নিত্য সঙ্গী। যেন দুই হাজার বছর পূর্বেকার সেই অনুভূতি চণ্ডীদাস, সহজিয়া বৈষ্ণব, বাউল ও পল্লীগীতিকার মর্ম স্পর্শ করিয়া বিহারীলালের প্রাণের তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলিয়াছে। তাঁহার সঙ্গীতশতক, বাউলবিংশতি ও সারদাপ্রীতি সেই প্রণয়ের সুরে অনুরণিত। নব্য বাংলায় প্রাকৃত প্রেমের 'ভোরের পাখী'ও বিহারীলাল, আবার সেই প্রেমের সাঁঝের বিহগও বিহারীলাল। বিহারীলাল এযুগে লোকজগতের সহজ প্রেমানুভবের শেষ বাউল।

(v) বাংলার লোক-সঙ্গীতের একটি অংশ 'পটুয়া সঙ্গীত'। পটুয়া বা চিত্রকর বহুচিত্র সম্বলিত 'দীঘল পট' দেখাইয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া গান করে। এই গানের বিষয় লোক-জগতে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণলীলা ও শিব-পার্ব্বতী কাহিনী। ইহাদের ভিতর যমরাজার পট ও যমরাজার গানও আছে ঃ

রবির পুত্র যমরাজা যম নাম ধরে।
বিনা অপরাধে যম কারু দণ্ড নাই করে ॥
চিত্রগুপ্ত মহুরী তারা দিবারাত্র লেখে।
যমদূত কালদূত পহরাতে থাকে ॥
কেউ ধরে চুলের মুষ্টি কেউ ধরে পায় ॥
পাপীলোক হলে শীঘ্র যমালয় পাঠায় ॥ [পটুয়া সঙ্গীত]

শ্রী গুরুসদয় দত্ত মনে করেন, 'হর্ষচরিত ও মুদ্রারাক্ষসে যে যমপট্টিক অর্থাৎ যমপটব্যবসায়ীর উল্লেখ আছে, তাহারা সুদীর্ঘ পটের উপর ধর্মরাজ যমের মূর্তি এবং যমালয়ের নানা ভয়ংকর দৃশ্য লিখিয়া গীতি সহযোগে গৃহস্থ বাড়ীতে সেই পট দেখাইতেন।...বাংলার পটুয়ারা অদ্যাপি এইরূপ যমপট দেখাইয়া থাকে।'[১]

মনে হয়, লোক-জগতের কোন অববাহিকা বাহিয়া এই ধারা বাংলার পটুয়া সঙ্গীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

---

১. গুরুসদয় দত্ত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত পটুয়া সঙ্গীত)।

॥ অপভ্রংশ ভাষা ও সাহিত্য ॥

১. অপভ্রংশ ভাষার কথা

মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার শেষ স্তর 'অপভ্রংশ'। অপভ্রংশ হইতেই নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলি স্ব স্ব রূপ লাভ করিয়াছে। অর্থাৎ শৌরসনী প্রাকৃত হইতে শৌরসেনী অপভ্রংশের মধ্য দিয়া আধুনিক হিন্দী, ব্রজভাখা প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে ; তেমনই মাগধী প্রাকৃত হইতে মাগধী অপভ্রংশের ভিতর দিয়া মগহী, মৈথিলী, বাংলা ও আসামী প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। অপভ্রংশ ভাষার নমুনা রূপে শৌরসেনী অপভ্রংশেরই ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। একদিন সমগ্র উত্তরাপথে এই ভাষাই জনসাধারণের সাহিত্য-রচনার বাহন হইয়া উঠিয়াছিল। অন্যান্য অপভ্রংশের রচনা নগণ্য, কোথাও বা একেবারেই শূন্য। তথাপি সাদৃশ্য সূত্রে পণ্ডিতগণ মনে করেন, অন্যান্য প্রাকৃতেরও অপভ্রংশ স্তর ছিল। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ হইতে দশম শতক পর্যন্ত এই অপভ্রংশের যুগ।

কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয়, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রচিত পতঞ্জলির মহাভাষ্যে 'অপভ্রংশ' ভাষার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি 'অপভ্রংশ'কে জনগণের কথ্যভাষা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে রচিত কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকেও অপভ্রংশে রচিত কতকগুলি গান পাওয়া যাইতেছে। তাহা হইলে অপভ্রংশের উৎপত্তিকাল কি আরও প্রাচীন ?

এ সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের সিদ্ধান্তটি বিচার্য্য। তিনি অপভ্রংশের দুইটি রূপের কথা স্বীকার করিতেছেন—১. প্রাচীন অপভ্রংশ [বৈয়াকরণ কথিত অ-শিষ্ট লোকের ভাষা] এবং ২. অর্বাচীন অপভ্রংশ [লৌকিক বা অবহট্‌ঠ] ঃ 'মধ্য ভারতীয় আর্য্যের যে সর্বজনীন রূপটি অ-শিষ্ট লোকসাহিত্যের বাহক হইয়া উঠিয়াছিল তাহাই প্রাচীন অপভ্রংশ এবং প্রাচীন অপভ্রংশের যে অর্বাচীন রূপটি আধুনিক ভারতীয় আর্য্যের (vernacular) অব্যবহিত পূর্ব অবস্থা তাহাই অর্বাচীন অপভ্রংশ বা 'লৌকিক' বা 'অবহট্‌ঠ'।[১]

২. অপভ্রংশ ভাষার বিশেষত্ব

পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে 'অপভ্রংশ'কে শাস্ত্রহীনের ভাষা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ অপভ্রংশ অশিক্ষিত জনগণের মুখের ভাষা এবং ইহা বহুল পরিমাণে আর্যেতর ভাষার ভঙ্গিদ্বারা প্রভাবান্বিত। মুখের ভাষা সর্বদাই সহজ সরল এবং অবান্তর ভারমুক্ত। অপভ্রংশ ভাষারও প্রধান বিশেষত্ব সহজ সরলতা। উহা নিতান্তই আটপৌরে। প্রাকৃত ভাষা হইতেও ইহা সরলতর। প্রাকৃত ভাষাও বেশির

---

১. ভাষার ইতিবৃত্ত (নবম অধ্যায়)—ডঃ সুকুমার সেন।

ভাগ ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের মুখাপেক্ষী, কিন্তু অপভ্রংশ এ ব্যাপারে নিরঙ্কুশ। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাই বলিয়াছেন, 'প্রাকৃত ব্যাকরণে যে ভাষা কুলায় না, তাহাকে অপভ্রংশ বলে।' কিন্তু তাই বলিয়া ইহা স্বেচ্ছাচারের ভাষাও নয়। কঠিন ব্যঞ্জনধ্বনিকে ইহা যথাসম্ভব সহজ-উচ্চার্য করিয়া ফেলে এবং অনেক ক্ষেত্রেই স্বরধ্বনি দ্বারা ব্যঞ্জনের স্থান পূর্ণ করিয়া লয়। তাহা ছাড়া শব্দরূপে বা ধাতুরূপে কিংবা লিঙ্গবিষয়ে অপভ্রংশ অতি উদার। সকল দিক হইতেই অপভ্রংশ সরল ও মিষ্ট। খুব সম্ভব এই মিষ্টতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বিদ্যাপতি দেশীভাষার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন, 'দেসিল বয়ণা সবজন মিট্‌ঠা।'

অপভ্রংশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছন্দ-বৈচিত্র্য। প্রাকৃতের প্রধান ছন্দ 'গাহা'—উহা মাত্রাছন্দের আধারে দুই চরণবিশিষ্ট মিলহীন ছন্দ। অপভ্রংশের ছন্দও 'মাত্রাবৃত্ত', কিন্তু বৈচিত্র্য অসাধারণ। প্রাকৃতের 'গাহা' ও 'দোহা' তো আছেই উপরন্তু ইহাতে আছে বিবিধ চতুষ্পদী ছন্দ: এই ছন্দগুলির মধ্যে প্রতিপদে ১২ মাত্রার ছন্দ 'জগতী', প্রতিপদে ১৪ মাত্রার ছন্দ 'শক্করী' এবং প্রতিপদে ১৬ মাত্রার ছন্দ 'পাদাকুলক' বিখ্যাত। অপভ্রংশ ছন্দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য চরণান্তিক অন্ত্যানুপ্রাস। দ্বি-চরণের ছন্দে যেমন প্রথমে-দ্বিতীয়ে মিল, তেমনই চৌপদী ছন্দে প্রথমে-দ্বিতীয়ে ও তৃতীয়ে-চতুর্থে, কিংবা প্রথমে-তৃতীয়ে ও দ্বিতীয়ে-চতুর্থে মিল থাকে।

৩. অপভ্রংশ সাহিত্যের পরিচয়

অপভ্রংশের ভাষারূপ অশুদ্ধ বলিয়া পতঞ্জলি এ ভাষাকে অপাংক্তেয় বলিয়াছেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রগ্রন্থ রচনায় এ ভাষা যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। কিন্তু এই ভাষা যাঁহাদের ভিতর প্রচলিত, তাঁহাদের নিকট এই ভাষা অন্তরের ভাষা। অযজ্ঞা বা অব্রতা জনসাধারণেরও ধর্ম আছে, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আছে, রসের কথা আছে। অপভ্রংশ সাহিত্য সেই ধর্মবোধ ও হৃদয়াকুতির প্রতিলিপি।

॥ প্রাচীন অপভ্রংশ ॥

(বিক্রমোর্বশী নাটকের গান)

প্রাচীন অপভ্রংশের নিদর্শন হিসাবে পাওয়া যায় কতকগুলি দ্বিপদা গান। এই ধরনের কিছু গান কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনেকে এই গানগুলিকে পরবর্তী কালের যোজনা বলিয়া মনে করেন, কারণ, কোন কোন হস্তলিখিত পুঁথিতে এই গান পাওয়া যায় না। কিন্তু এই গান ওই নাটকের চতুর্থ অঙ্কের প্রাণস্বরূপ। নায়কের হৃদয়ভাবের অভিব্যক্তি হিসাবে গানগুলি অপরিহার্য। বিশেষ নাটকীয় মুহূর্তকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই ইহার প্রয়োগ। রাজা পুরূরবা প্রিয়তমা উর্বশীকে লইয়া কৈলাসের গন্ধমাদন পর্বতে বিহার করিতে আসিয়াছেন। সেখানে মন্দাকিনীতীরে বালির পাহাড় নির্মাণ করিয়া ক্রীড়া করিতে-

ছিলেন উদয়বতী নামে এক গন্ধর্বকন্যা। রাজা পুরূরবা মুগ্ধচিত্তে তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। উর্বশী ইহাতে ক্রুদ্ধা হইলেন এবং কুপিতা ['কুবিদা'] মানিনী ক্রোধবশে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া 'কুমারবনে' প্রবেশ করিলেন। এই বনের নিয়ম, এখানে কোন স্ত্রীলোক প্রবেশ করিতে পারিবে না, করিলে লতায় পরিণত হইবে। উর্বশীও মুহূর্তে লতায় পরিণত হইলেন ['লদাভাবেণ পরিণতং সে রূবম্']। উর্বশী-বিরহে রাজার তখন প্রমত্ত অবস্থা। তিনি পাগলের মত উর্বশীকে অন্বেষণ করিতেছেন। জড়ে ও চেতনে ভেদ ঘুচিয়া গিয়াছে। মেঘ, নীলকণ্ঠপাখী, হরিণ, চক্রবাক ও বনপ্রকৃতিকে উদ্দেশ্য করিয়া রাজা উর্বশীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কখনও ক্রোধে কাঁপিতেছেন, কখনও আশায় উল্লসিত হইতেছেন, কখনও গভীর নৈরাশ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছেন। রাজার এই বিরহোন্মত্ত অবস্থাকে সুস্পষ্ট করিবার জন্য গানগুলি আবহ সঙ্গীতের কাজ করিয়াছে। নেপথ্যে সুললিত অপভ্রংশে 'জম্ভালিকা', 'দ্বিপদিকা', 'খণ্ডধারা', 'চর্চরী' প্রভৃতি সঙ্গীত, আর এদিকে প্রকাশ্য মঞ্চে রাজার আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয়। সঙ্গীত এখানে নায়কেরই হৃদয়ভাবের সুরেলা প্রকাশ। গানগুলির সাহিত্যিক মূল্যও অসাধারণ। সুরস্পন্দন শুধু স্পন্দিত করে না, চিত্রাত্মক কবিতার মত কতকগুলি ছবি আঁকিয়া যায়। যেমন,—

ময়ূরকে উদ্দেশ করিয়া এই গান।

> বরহিণ পব্ভ পইং অব্ভর্থেমি আক্‌খহি মে তা।
> এথ অরণ্ণে ভমন্তে জই পই দিট্‌ঠা সা মহু কন্তা॥
> ণিসমই মিঅংকসরিসবঅণা হংসগঈ।
> এ চিণ্‌হে জাণীহিসী আঅক্‌খিঅ তুজ্‌ঝ মঈ॥

—ওগো ময়ূররাজ, তোমাকে অভ্যর্থনা করিতেছি, আমাকে বল, তুমি কি এই অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে আমার কান্তাকে দেখিয়াছ? শোন, তোমাকে বলিতেছি, তাহার বদন মৃগাঙ্ক সদৃশ তাহার গতি হংসের মত—এই চিহ্নে তাহাকে জানিতে পারিবে।

কখনও বা চক্রবাকের উদ্দেশ্যে ঃ

> গোরঅণা কুংকুমবণ্ণা চক্কা ভণই মই।
> মহুবাসর কীলন্তী ধণি আ ণ দিট্‌ঠী পই॥

—ওগো গোরচনা কুংকুমবর্ণা চক্রবাক্, আমাকে বল, মধুবাসরে ক্রীড়ারতা ধনীকে কি তুমি দেখ নাই?

বিরহোন্মত্ত প্রেমিকের এই ধরনের রুতরোল সাহিত্য জগতের দুর্লভ রত্ন। এই গানগুলি রামায়ণের রামোন্মাদ ও ভাগবতের কৃষ্ণবিরহ-বিধুরা ব্রজগোপীদের শ্লোকাবলী স্মরণ করাইয়া দেয়।

॥ অপ্রাচীন অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ ॥

পরবর্তীকালে অপভ্রংশের যাবতীয় সাহিত্য-কৃতি পাওয়া যাইতেছে অপ্রাচীন অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ ভাষায়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দী হইতে এই ভাষা সমগ্র উত্তরাপথে জনগণের সাধারণ ভাষারূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। জৈনগণ, বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ এবং লৌকিক জগতের কবিগণ এই অপভ্রংশ ভাষাতেই কাব্য, দোহা ও বিবিধ কবিতা রচনা করেন।

(i) কাব্য বা ধর্মকথা

অবহট্‌ঠ ভাষায় পূর্ণাঙ্গ কাব্য অধিকাংশই জৈনদের রচনা। তাঁহাদের 'ধম্মকহা'র (ধর্মকথার) অঙ্গরূপে এই কাব্যগুলি রচিত। প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হইলেও এই ধর্মকথাগুলির কাহিনীগত আকর্ষণ অপরিসীম। অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনা, বীরত্ব-পূর্ণ অভিযান এবং প্রেমের রোমাঞ্চকর কাহিনী মনকে রূপকথার রাজ্যে টানিয়া লইয়া যায়। গল্পগুলির প্রকাশ-নৈপুণ্যও সুউচ্চ কবিধর্মের স্বাক্ষর।

জৈন সাহিত্যে এই ধরনের অসংখ্য কাব্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পুষ্পদন্ত রচিত 'জসহরচরিউ' ও 'ণায়কুমারচরিউ'। পুষ্পদন্ত ছিলেন বহুখ্যাত জৈনপণ্ডিত। তাঁহার আবির্ভাবকাল দশমশতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। যশোধর ছিলেন জৈনদের কীর্তিমান রাজা। 'জসহরচরিউ' এই রাজার কীর্তি-কাহিনী। কাব্যখানি চারিটি সন্ধি বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত এবং গাহাছন্দে রচিত এই চরিতকথাকে পুষ্পদন্ত বলিয়াছেন 'মহাকব্ব' (মহাকাব্য) এবং নিজেকে বলিয়াছেন মহাকবি ['মহাকই পুপ্‌ফয়ংত']। এই কাব্যে মহাকাব্যসুলভ বর্ণনা ও অলংকরণ-চাতুর্য লক্ষ্য করিবার মত।

পুষ্পদন্তের অপর কাব্য 'ণায়কুমারচরিউ'—নাগকুমারচরিত। নাগকুমার হইলেন প্রসিদ্ধ ২৪ জন কামদেবের ভিতর অন্যতম কামদেব। তিনি রূপবান। জন্মান্তরের শ্রীপঞ্চমীব্রতের ফলস্বরূপ তিনি এই সুন্দর দেহের অধিকারী হইয়াছিলেন। নাগ-কুমারচরিত একটি ব্রতকথা, কিন্তু ইহাতে বিস্তৃত হইয়াছে রূপকথার কম-কল্পনা।

ধনপালের 'ভবিসত্তকহা'ও একখানি ব্রতকথা জাতীয় ধর্মকথা। পঞ্চমীব্রতের মহিমা কীর্তন উপলক্ষ্যে এই কথা রচিত। কাব্যের নায়ক 'ভবিসত্ত'। বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ষড়যন্ত্রে তিনি একটি দ্বীপে নির্বাসিত হন। এই দ্বীপের রাজকন্যার প্রণয়াকৃষ্ট হইয়া তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং দশবৎসর পরে দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করেন। যে জলযানে তিনি যাত্রা করেন, তাহা ছিল তাঁহার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের। বৈমাত্রেয় ভাই তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া রাজকন্যাকে লইয়া পলায়ন করে। পরে ভবিসত্ত এক যক্ষের কৃপায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং নিজ পত্নীকে উদ্ধার করেন। কাব্যখানি যেন একটি রমন্যাস।

কনকামর মুনি রচিত 'করণ্ডকচরিউ' আর একখানি বিখ্যাত কাব্য। করণ্ডক ছিলেন একজন সাধু মহাপুরুষ। তিনি চম্পারাজ দধিবাহনের পুত্র। কিন্তু দৈববশে

তাঁহার জন্ম হয় শ্মশানে। তাঁহার দেহে রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ। দণ্ডিপুরের রাজহস্তী তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া যায় এবং তিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হন। চিত্রপটে রাজকুমারী মদনাবলীর চিত্রদর্শনে তিনি প্রণয়াকৃষ্ট হন এবং উভয়ের বিবাহ হয়। ইহার পর তিনি পিতার সহিত মিলিত হন। সে এক রহস্যময় ঘটনা। পিতা পুত্রকে চিনেন না, পুত্রও পিতাকে নয়। বৈরবেশে তাঁহারা আসিয়াছেন যুদ্ধক্ষেত্রে। এই অবস্থায় পিতাপুত্রের মিলন। চম্পারাজ পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। অতঃপর করণ্ডকের দক্ষিণপাটন যাত্রার কাহিনী। পথিমধ্যে মদনাবলী নিরুদ্দিষ্ট হন। এক বিদ্যাধর শোকোপনোদন উদ্দেশ্যে তাঁহাকে নরবাহন দত্তের কাহিনী শুনাইতে থাকেন। ইতিমধ্যে করণ্ডক সিংহলে উপস্থিত হন। সিংহলরাজ, তাঁহার বীর্যবত্তায় মুগ্ধ হইয়া স্বীয় কন্যা রতিবেগাকে অর্পণ করেন। স্বদেশে ফিরিবার পথে তিনি রতিবেগা হইতে বিয়োজিত হন। রতিবেগা স্বামীর শোকে অস্থির হইলে দেবী পদ্মা তাঁহাকে দর্শন দেন এবং বলেন, শীঘ্রই সে স্বামীর সহিত মিলিত হইবে। দেবতার বরে স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন হইল এবং বিজয়ী করণ্ডক পূর্বপত্নী মদনাবলীকেও লাভ করিলেন। সংসার অন্তে করণ্ডক সন্ন্যাস ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

করণ্ডক-চরিত্র অন্যান্য ধর্মকথার মতই প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হইলেও অপূর্ব কথাকাব্য। কাহিনীর মূল গুণাঢ্যের বৃহৎকথা হইতে সংগৃহীত। রচনা-রীতিতে আলঙ্কারিক রীতির চিহ্ন সুস্পষ্ট।

(ii) সহজিয়া বৌদ্ধ দোহা

অপ্রাচীন অপভ্রংশে রচিত সহজপন্থী বৌদ্ধাচার্যদের রচিত দোহাগুলিও অমূল্য সম্পদ। এগুলি একদিকে যেমন প্রাচীনতম বাংলাসাহিত্যপ্রবেশের দ্বার, তেমনই বৌদ্ধধর্মবিবর্তনের ঐতিহাসিক সাক্ষ্য। পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল হইতে এই দোহা সংগ্রহ করিয়া সর্বপ্রথমে প্রকাশ করেন। দোহার ভাব ও সাধনপদ্ধতি যে একদিন তিব্বত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তিব্বতী ভাষায় অনূদিত ও সংরক্ষিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। শাস্ত্রীমহাশয় সরহ ও কাহ্নপাদের দোহা প্রকাশ করিয়াছেন। তিল্লোপাদেরও সম্পূর্ণ দোহা পাওয়া গিয়াছে। ইঁহারা সকলেই সহজিয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য এবং ইঁহাদের রচিত বাংলাগানও পাওয়া গিয়াছে। মনে হয়, এই সকল দোহা খ্রীষ্টীয় অষ্টম-দশম শতকের রচনা।

দোহাকোষের বর্ণনীয় বিষয় বৌদ্ধ সহজপন্থদের সাধ' ও সাধনকথা। মূল বৌদ্ধধর্ম একদিন মহাযানের মাধ্যমে বিচিত্র তন্ত্রাচার ও যোগাচারের স্তর অতিক্রম করিয়া সহজমার্গে প্রবেশ করিয়াছিল। সহজিয়া বৌদ্ধদের শেষ লক্ষ্য নির্মল, অত্যন্ত দৃঢ়, সারযুক্ত, নির্বিকল্প মহাসুখে অবস্থান। ইহা করুণা ও শূন্যতার মিলনে স্থির স্বভাব বোধিচিত্তের এক মহা আনন্দঘন অবস্থা। এই অবস্থায় জন্ম-মৃত্যু রুদ্ধ হয়, চিত্ত অবিচলিত থাকে, অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম অসার জ্ঞান হয়। এই অবস্থায় পেঁছাইবার

উপায় রহস্যময় গুহ্য যোগ [বজ্রাব্জ বা কুলিশকমল বা বোল-কোক্কল যোগ]। এই যোগ একান্তই গুরুগম্য। বৌদ্ধ দোহাকোষ এই গুহ্য রহস্যময় সাধনা ও তাহার প্রাপ্তির কথায় পূর্ণ।

সরহপাদের দোহা—সরহপাদ সুবিখ্যাত সহজপন্থ বৌদ্ধ। তিনি তাঁহার দোহায় এই সহজসাধনার গূঢ় তাৎপর্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। নির্বিকল্প অদ্বয়রূপ সহজজ্ঞান ও সহজ আনন্দ তাঁহাদের কাম্য, বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান তাঁহাদের নিকট নিতান্ত তুচ্ছ। সরহপাদ এই আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের প্রতি তির্যক শ্লেষ নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং বৈদিক যাগযজ্ঞের নিষ্ফলত্ব ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন,

কজ্জে বিরহিঅ হুঅবহ হোমে।
অক্খি উবাহিঅ কডুএঁ ধূমেঁ ॥

—অকারণে যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়, তাহাতে কটুধূমে চক্ষুপীড়াই জন্মে। দেহে ভস্মলেপন, মস্তকে জটাধারণ, গৃহে বসিয়া প্রদীপ জ্বালানো বা ঘণ্টা বাজানো, কিংবা স্থিরনেত্র হইয়া আসন করা বা কর্ণে মন্ত্র প্রদান প্রভৃতি কর্মও নিন্দিত হইয়াছে। শুধু তাই নয়, জৈন তীর্থঙ্করদের নগ্নতা সম্পর্কে অতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে ঃ

জই ণগ্গা বিঅ হোই মুত্তি তা শুণহ শিআলহ।
লোমুপাডণেঁ হোই সিদ্ধি ত জুবই ণিঅম্বহ ॥

—নগ্ন হইলেই যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে শৃগালও মুক্তি লাভ করিতে পারে; যদি শ্মশ্রু উৎপাটন দ্বারা সিদ্ধি হয়, তবে যুবতী নিতম্বিনীরাও সিদ্ধ।

সরহপাদের এই তির্যক উক্তিগুলি উপভোগ্য। তিনি কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, ক্ষপণক, ভিক্ষু, শ্রাবক—কাহাকেও ছাড়িয়া কথা বলেন নাই। তাঁহার মতে তন্ত্র-মন্ত্র সকলই মিথ্যা বিভ্রান্তি। সত্য একমাত্র 'সহজ স্বভাব'—ইহা এক নিবাত নিষ্কম্প 'পরমহমাসুহ'-এর অবস্থা। মিথ্যা জ্ঞানাভিমানী কিংবা বালবুদ্ধি তীর্থিক এই 'সহজস্বভাব'কে জানে না। সদ্গুরুর উপদেশে সরহ এই সহজকে জানিয়াছেন!

সরহপাদের দোহাকোষে এই সহজ অবস্থা প্রাপ্তির উপায়ও নির্দেশিত হইয়াছে। গুরুর বচনে এ পথে যাওয়া যায়। এ পথে যাইতে দেহকেই সর্বস্ব জ্ঞান করিতে হয়। এই দেহেই সব আছে ঃ

এত্থুসে সুরসরি জমুণা এত্থুসে গঙ্গাসাঅরু।
এত্থু পআগ বণারসি এত্থুসে চন্দ দিবাঅরু ॥

—এইখানেই আছে সুরসরিৎ যমুনা, এখানেই গঙ্গাসাগর, এইখানেই প্রয়াগ-বারাণসী, এইখানে চন্দ্র-সূর্য।

দেহ-সাধনের কথা অতি গোপনীয়, তাই রহস্যময়। কিন্তু ইহারই প্রাপ্তি চিত্তরূপ অদ্বয়তরুর করুণা ফুল, আর পরউপকার রূপ ফল ঃ

অদ্বয়চিত্ত তরুঅরহ গউ তিহুবণে বিত্থার।
করুণা ফুল্লীফল ধরই ণাউ পরত্ত উআর ॥

—অদ্বয়চিত্ত তরুবর ত্রিভুবনে বিস্তৃত হইয়াছে, ইহাতে ধরে করুণার ফুল-ফল। ইহার পরে আর কিছু নাই।

কাহ্নপাদের দোহা—কাহ্নপাদের দোহাকোষও বৌদ্ধ সহজপন্থদের অপূর্ব সামগ্রী। ইহা ৩১টি দোহার সমষ্টি। পণ্ডিত অদ্বয়বজ্র সংস্কৃত ভাষায় এই দোহা-গুলির যে টীকা রচনা করেন, তাহার নাম 'মেখলা টীকা'। এই টীকার সাহায্যে সহজিয়া বৌদ্ধদের দুরূহ সাধনতত্ত্বের মর্ম অনুধাবন করা যায়। কাহ্নপাদের দোহায় দুর্ভেদ্য রহস্যময় সাধন-যোগের কথাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। তিনি বলেন,

> লোঅহ গব্ব সমুব্বহই হউঁ পরমত্থ পবিণ।
> কোডিহ মাহ এক্কু ণহি হোই ণিরংজণ-লীণ॥

—লোকে পরমার্থ সত্যাভিমান করিয়া থাকে, কিন্তু কোটির মধ্যে একজনও নিরঞ্জন-লীন হয় না।

নিরঞ্জন বোধিচিত্ত সুখস্বভাবে স্থিত। উহার অবস্থান এই দেহেই। উহা মধুকরের মত প্রস্ফুটিত কমলের রস পান করিয়া মহারাগ সুখে অবস্থান করে। প্রজ্ঞোপায়-যোগেই অনবচ্ছিন্ন সুরত মহারাগ লাভ করা সম্ভব। বালযোগী ইহাকে জানেও না, পায়ও না। কুলিশাব্জ যোগেই সহজভাব অহরহ পরিস্ফুরিত হয় ['অহরহ সহজ ফরন্ত'—১৬]। ইহা এক নিশ্চল নির্বিকার ['ণিচ্চল ণিব্বিআর'], সামরস্যে নিমগ্ন ['সমরসে ণিঅমণ'] অবস্থা। বজ্রগুরুর উপদেশে গুহ্য যোগের পথে ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। কাহ্নপাদ বলেন, মন্ত্রেও ফল নাই, তন্ত্রেও ফল নাই ['এক ণ কিজ্জই মন্ত ণ তন্ত'], বাহ্য জপ-হোম-মণ্ডল কর্মও নিষ্ফল। জ্ঞানরূপিণী গৃহিণীকে লইয়া সমরসে মগ্ন হওয়াই পরমার্থ।

সহজপন্থের যোগ অতিশয় গুহ্য। এইজন্য ইহার ইঙ্গিতগুলিও গভীর তাৎপর্য-পূর্ণ। কাহ্নপাদের দোহায় এই রহস্যময় সাধন-সংকেত।

(iii) প্রকীর্ণ কবিতাবলী

অপভ্রংশ লৌকিক ভাষা। জনসাধারণই এই ভাষায় কথা বলিতেন এবং নিজেদের হৃদয়ভাবের কথাগুলি এই ভাষায় ধরিয়া রাখিতেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁহাদের রচনা সংক্ষিপ্ত, অন্যোন্য নিরপেক্ষ কবিতার আকারে প্রকাশিত। মনে রাখিবার পক্ষেও ইহা উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইত। অপভ্রংশ সাহিত্যের একটি বৃহৎ অংশ তাই চূর্ণ কবিতা।

এই ধরনের কিছু প্রকীর্ণ অপভ্রংশ কবিতা পাওয়া যায় সিদ্ধসূরী জৈন হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণে। অধিকাংশই নীতিকবিতা, যেমন,

> বাসু মহারিসি এউ ভণই জই সুইসত্থ পমাণু।
> মাঅহ চলণ ণবন্তাহং দিবি দিবি গঙ্গাণহাণু॥

—মহর্ষি ব্যাস বলেন, যদি শ্রুতিশাস্ত্রোক্ত প্রমাণ মানা যায়, তবে মায়ের চরণে প্রণামই প্রতিদিনের গঙ্গাস্নান।

কির খাই ণ পিঅই ণ বিদ্দবই ধম্মে ণ বেচ্চই রূঅডউ।
ইহ কিবণু ণ জানই জহ জমহো খণেণ পহুবচ্চই দুঅডউ ॥

—কৃপণ তাহার টাকা খায় না, পান করে না, বিতরণ করে না, ধর্মের জন্যও ব্যয় করে না। সে জানে না যে, যমের দূত যে কোন ক্ষণেই তাহার কাছে আসিতে পারে।

কিন্তু নীতি-উপদেশ মাত্র নয়, এই সকল কবিতায় লোকজীবনের আরও বহু-বিচিত্র সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছে ঃ

ভল্লা হুআ জু মারিআ বহিণি মহারা কন্ত।
লজ্জেজ্জন্তু বঅংসিঅহু জই ভগ্গা ঘরু এন্তু ॥

—বোন, ভালই হইয়াছে যে আমার কান্ত মরিয়াছেন। যদি পলাইয়া তিনি ঘরে আসিতেন, তবে সখিদের নিকট লজ্জা পাইতাম।

সম্মুখরণে পতির মৃত্যুবরণে নারীর এই গর্ব জাতীয়-গৌরবের পরিচায়ক। এ দেশে বীরত্ব একদিন এমনি আদরণীয় ছিল।

‘প্রাকৃত পৈঙ্গল’ গ্রন্থের অপভ্রংশ

সাধারণ জীবনেব বহুবিচিত্র আশা-আকাঙ্কা, রীতি-নীতি ও ধর্মকর্মের পরিচয় রহিয়াছে ‘প্রাকৃত পৈঙ্গল’ নামক ছন্দবিষয়ক গ্রন্থের অপভ্রংশ অংশগুলিতে। মনে হয়, এই গ্রন্থখানি খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সংকলিত। কাবণ, মুসলমান সৈন্যের সহিত যুদ্ধবিগ্রহের কথাও কয়েকটি কবিতায় স্থান লাভ করিয়াছে। যথা,

হম্মীর কজ্জ উজ্জল ভণহ
কোহাণল মহ মহ জলউ।
সুলতাণ সীস করবাল দেই
তেজ্জি কলেবর দিঅ চলউ ॥

—বল, হম্মীরের কার্য উজ্জ্বল; ক্রোধানল মুহুর্মুহু প্রজ্বলিত হউক। সুলতানের মস্তকে খড়্গাঘাত করিয়া দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে চল।

হম্মীরের বীরত্বও অসাধারণ ঃ

চলিঅ বীর হম্মীর পাঅভর মেইনি কম্পই।
দিগমগ ণহ অংধার ধূলি সূরহ রহ ঝম্পই ॥

—বীর হাম্বির চলিলেন, পদভরে মেদিনী কম্পিত হইল; ধূলিতে দিগ্‌মার্গ ও আকাশ অন্ধকার হইল ও সূর্যরশ্মি আচ্ছন্ন হইল।

রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক কয়েকটি কবিতা ‘প্রাকৃত পৈঙ্গলে’ স্থান পাইয়াছে। ইহা হইতে কৃষ্ণলীলা বিষয়ে দেশ-প্রচলিত ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন, নৌকা-বিলাসের এই কবিতাটি ঃ

অরেরে বাহহি কাণ্হ ণাব
ছোড়ি ডগমগ কুগতি ণ দেহি।

তই ইঁথি ণইহি সংতার দেই
জো চাহহি সো লেহি।

—ওহে কৃষ্ণ, নৌকা বাও, টালবাহানা ছাড়, কুগতি দিও না। এই নদী পাড়ি দাও, তারপরে যাহা চাও, তাহা লও।

কয়েকটি কবিতা হইতে হরগৌরী বিষয়ে লোকপ্রচলিত ধারণারও পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমে বিষকণ্ঠ, দিগ্‌বসন, চন্দ্রমৌলি, গঙ্গাধর অর্ধনারীশ্বরের নান্দী ঃ

জসু সীসই গংগা গোরি অধংগা
গিব হরিঅ ফণি হারা।
কংঠট্‌ঠিঅ বিসা পিংধণ দীসা
সংতারিঅ সংহারা॥
কিরণাবলিকংদা বংদিঅচংদা
ণঅণহি অণ ফুরংতা।
সো সংপঅ দিজ্জউ বহুসুহ কিজ্জউ
তম্হ ভবানীকংতা॥

—যাঁহার মস্তকে গংগা, অর্ধাঙ্গে গৌরী, গলায় ফণীহার, কণ্ঠে বিষ, পরিধানে দিগ্‌বসন—যিনি সংসারের ত্রাতা—কিরণকন্দ চন্দ্র যাঁহার ললাটে, নয়নে অনল—সেই ভবানীপতি তোমাকে সম্পদ দান করুন ও বহুসুখ বিধান করুন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার এই শিব সম্পর্কে শ্লেষাত্মক অভিযোগ ঃ

জই মিত্ত ধণেসা সসুর গিরীসা
তহবিবহু পিংধন দীস।
জই অমিহকংদা ণিঅলহ চংদা
তহবিহ ভোঅণ বিস॥
জই কণঅসুরংগা গোরি অধংগা
তহবিহ ডাকিণি সংগা
জো জসুহি দিবাবা দেব সহাবা
কবহু ণ হো অসু ভংগা॥

—যদিও কুবের মিত্র, শ্বশুর গিরীশ—তথাপি পিন্ধন দিগ্‌বাস; যদিও অমৃতকন্দ চন্দ্র নিকটে, তথাপি ভোজন বিষ; যদিও কনকাঙ্গী গৌরী অর্ধাঙ্গ, তবু সঙ্গে ডাকিনীঃ দৈব যাহাকে যে স্বভাব দেয়, তাহার সে স্বভাব যায় না।

এইরূপ দরিদ্র স্বামীর সংসারে যে কি দুঃখ, পার্বতীর একটি উক্তিতে তাহা বড় করুণ সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে ঃ

বালকুমারো ছঅ মুণ্ডধারী।
উবাঅহীণা মুই এক্ক ণারী॥
অহংণিসং খাই বিসং ভিখারী।
গই ভবিত্তি কিল কা হামারি॥

—শিশু ছেলেটির ছয়টি মুখ, ভিখারী স্বামী সারাদিন বিষ খায়। আমি উপায়হীনা নারী—বল, আমার গতি কি হইবে ?

(iv) বিদ্যাপতির কীর্তিলতা

অবহট্‌ঠ ভাষায় কাব্য রচনার প্রথা পঞ্চদশ শতকেও শেষ হইয়া যায় নাই। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি অবহট্‌ঠে 'কীর্তিলতা' কাব্যখানি রচনা করেন। ইহা মিথিলার রাজা কীর্তিসিংহের বীর্যবত্তার কাহিনী। গ্রন্থারম্ভে কবি সুজন ও কুজনের পার্থক্য নির্দেশ করিয়া অবহট্‌ঠ ভাষায় কাব্য রচনার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন.

সুঅণ পসংসই কব্ব মঝু দুজ্জন বোলই মন্দ।
অবসও বিসহর বিস বমই অমিআঁ বিমুক্কই চন্দ ॥

—সুজন আমার কাব্যের প্রশংসা করে, দুর্জনে বলে মন্দ, অবশ্য বিষধর বিষই বমন করে, বালচন্দ্র বর্ষণ করে অমৃত।

বিদ্যাপতির ভাষা বালচন্দ্রের মত ['বালচন্দ বিজ্জাবই ভাষা']। তিনি অবহট্‌ঠে কাব্য রচনা করিয়াছেন এইজন্য যে, সংস্কৃত পণ্ডিতগণের ভাষা—আর প্রাকৃত কাব্যের রস আস্বাদন করা দুরূহ, কিন্তু—

দেসিল বঅণা সবজন মিট্‌ঠা।
তেঁ তৈসন জম্পওঁ অবহট্‌ঠা ॥

—দেশী ভাষা সকলের কাছেই মিষ্ট ; তাই আমি অবহট্‌ঠ জল্পনা করিতেছি।

৪. বাংলাসাহিত্যে অপভ্রংশের প্রভাব

প্রাচীন বাংলার ভাষা ও সাহিত্যের সহিত অপ্রাচীন অপভ্রংশের যোগ অতি নিবিড়। বাংলা ভাষা মগধাঞ্চলে প্রচলিত অপভ্রংশের সাক্ষাৎ বংশধর। প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ সঙ্গীত চর্যাগানে অপভ্রংশের প্রচুর শব্দ ও ভাষারীতি রক্ষিত হইয়াছে। চর্যাগান একদিন বাংলাদেশ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু উহার ধারা অব্যাহত ছিল নেপালে। সম্প্রতি ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত চর্যাগানের অনুরূপ যে গানগুলি নেপাল হইতে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশিত হইলে এ বিষয়ে আরও অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইত। অবহট্‌ঠ ভাষার সাক্ষাৎ প্রভাব যে বাংলাভাষায় পড়িয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় এদেশে প্রচলিত শুভংকরের আর্যায় এবং ডাক ও খনার বচনে। যেমন,

(i) কুড়্‌বা কুড়্‌বা কুড়্‌বা লিজ্জে।
কাঠায় কুড়্‌বা কাঠায় লিজ্জে ॥ [শুভংকরের আর্যা]

(ii) নিয়ড় পোখরি দূরকে যায়।
পথিক দেখিয়া আড়কে চায় ॥ [খনার বচন]

(iii) অবুতবু গিরিসুতা।
মায় বোলে পড় পুতা ॥
পড়িলে পাবা দুধুভাতা।
না পড়িলে ঠেঙ্গার গুতা ॥ [ডাকের বচন][১]

এই সমস্ত আর্যা ও ছড়ায় অবহট্‌ঠের প্রভাব অতি স্পষ্ট। বাংলায় রাধাকৃষ্ণ লীলাকীর্তনে যে 'ব্রজবুলি'র প্রচলন দেখা যায়, ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন, সেই "ব্রজবুলির বীজ হইতেছে লৌকিক বা অর্বাচীন অপভ্রংশ" [ভাষায় ইতিবৃত্ত]। উক্তিটি সমীচীন। কারণ, অবহট্‌ঠ ভাষার প্রভাব মাত্র নয়, এই ভাষায় কাব্যরচনার ধারা পঞ্চদশ শতক পর্যন্তও যে অব্যাহত ছিল মৈথিল কবি 'বিঙ্জাবই'র (বিদ্যাপতির) কীর্তিলতা তাহার প্রমাণ। অনেকে মনে করে, বাংলাদেশে ব্রজবুলির প্রসার বিদ্যাপতির সরণি ধরিয়া। বিদ্যাপতির মধ্যস্থতার কথা বাদ দিয়াও বলা চলে, উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত অপ্রাচীন অপভ্রংশ হইতে যেমন চর্যাপদের ভাষার উৎপত্তি, তেমনই ব্রজবুলিরও উৎপত্তি। চর্যার ভাষার সহিত ব্রজবুলির সাদৃশ্যও দুর্লক্ষ্য নয়।

ভাষার দিক হইতে তো বটেই, বাংলার ধর্ম-সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উপরও অপভ্রংশ সাহিত্যের অমোঘ প্রভাব। অপভ্রংশ 'লৌকিক', বাংলার দেশজ সংস্কৃতিও লৌকিক। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মও লৌকিক। এইজন্য ধর্মপ্রচারে জৈন ও বৌদ্ধগণ লৌকিক ভাষাকেই মাধ্যম করিয়াছিলেন। এই সূত্রে অপভ্রংশ কাব্যকবিতার বহু ভাব বাংলাসাহিত্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং আদৌ বাংলাসাহিত্য রচিত হইয়াছে লৌকিক ভাব ও ধর্মের পটভূমিতে।

(i) প্রথমেই উল্লেখযোগ্য বাংলার আদি গীতকবিতা চর্যাগান। এই গান কতিপয় বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য-রচিত গীতের সংকলন। সিদ্ধাচার্যদের রচিত অবহট্‌ঠ দোহাকোষে যে-ধর্মসাধনার বিষয় বিবৃত হইয়াছে, বাংলার প্রাচীনতম সাহিত্য সেই বিষয়েরই সঙ্গীতময় প্রকাশ। এমন কি যাঁহারা দোহা লিখিয়াছেন, তাঁহারা বাংলা ভাষায় গানও রচনা করিয়াছেন, যেমন, সরহপাদ কাহ্নপাদ প্রভৃতি। দোহা ও চর্যার সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব এক বলিয়াই বাংলা চর্যায় অবহট্‌ঠ দোহার ধ্বনি ঝঙ্কৃত হইয়াছে। আগম, বেদ, পুরাণ ও মন্ত্র-তন্ত্রের প্রতি দোহাকার বিরূপ—'এক্ক ণ কিজ্জই মন্ত ন তন্ত' [কাহ্নপাদ]; চর্যাকার দারিকপাদও বলেন, 'কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তো রে ঝাণবখানে' [চর্যা ৩৪]। আসল সত্য সহজভাবে স্থিত চিত্ত—উহা শূন্যতা ও করুণার মিলিত রূপ। তাই দোহাকার সরহপাদ বলেন, 'সুণ্ণ তরুবর ফুল্লিঅউ

১. এই ছড়াটি আমার কর্তামার মুখ হইতে শুনা। ইহা যে ডাকের বচন, তাহা জানিয়াছি রামপ্রসাদের এই গানটি হইতে ঃ

মনরে আমায় এই মিনতি।
তুমি পড়া পাখী হও করি স্তুতি ॥···
ওরে জান নাকি ডাকের কথা না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি ॥

করুণা বিবিহ বিচিত্ত' [শূন্য তরুবর ফুল্লিত হইল—উহাতে বিবিধ বিচিত্র করুণা] ; কম্বলাম্বরপাদ চর্যায় বলেন 'সোনে ভরিতি করুণা নাবী' [শূন্যতা সোনা দিয়া ভরা করুণার নৌকা—৮নং]। এই যে সহজানন্দ, ইহা দেহের বাহিরে নয়, দেহেই। গুরুর বচনে রহস্যময় যোগ-কৌশলে এই আনন্দ সহজলভ্য। সহজানন্দলাভের সাধনপ্রক্রিয়ার উক্তিগুলি এবং দেহতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব সম্পর্কে রূপকময় ভাষণগুলিও দোহা ও চর্যায় এক প্রকার।

মনে হয়, এই সহজিয়া সংস্কারের ধারা তন্ত্রাচারের সহিত যুক্ত হইয়া বাংলার অন্যান্য লৌকিক ধর্মসঙ্গীতেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। নাথযোগীদের সাধন সংকেত—

নারী লইয়া করে কেলি তত্ত্বেতে না রহে ভুলি
বিস্মরণ নাহিক তাহার।...
সর্বভোগে না করে আহার ॥ [গোর্খবিজয়]

যেন সহরহপাদের দোহারই প্রতিধ্বনি ঃ

এমই জোঈ মূল সরন্ত।
বিসহি ন বাহই বিসঅ রমন্ত ॥

—এইরূপ যোগী যাঁহারা মূলকে জানেন, তাঁহারা বিষয়-রমণ করিয়াও বিষয়-দ্বারা বাধিত হন না।

গোর্খনাথী হেঁয়ালী ছড়ার সঙ্গেও বৌদ্ধ সহজিয়াদের হেঁয়ালীর সাদৃশ্য আছে।

বাউলগানেও দোহার সুর দুর্লভ নয়। পরম সত্য দেহের বাহিরে নয়, দেহেই আছে—এ বিষয়ে সহজিয়া বৌদ্ধ ও বাউল একমত। সরহ বলেন, 'ঘরে অচ্ছই বাহিরে কুই পুচ্ছই', লালন বলেন, 'আদ্যঅন্ত এই মানুষে বাইরে কোথাও নাই।' কাহ্নপাদ বলিতেছেন,

আগম বেঅ পুরাণেঁ পংডিআমাণ বহন্তি।
পক্ক সিরিফলে অলিঅ জিম বাহেরিঅ ভমন্তি ॥

—অলি যেমন পক্ক বিল্বফলের স্বাদ পায় না, বাহিরে ঘুরে—তেমনই আগম-বেদপুরাণে পণ্ডিত অভিমানকেই বহন করে।

বাউলও বলেন,

তন্ত্র মন্ত্র বেদ পুরাণে ঘুরায় কেবল নানান টানে,
যোগে-যাগে-তীর্থস্নানে সহজ মানুষ পেয়ে হারাই।[১]

সহজিয়া বৌদ্ধর গুরুবাদ, দেহতত্ত্ব ও দেহসাধনের কথাও লোকসমাজের পথ বাহিয়া বাউলের ভিতর মিলিত হইয়াছে।

(ii) বাংলা সাহিত্যে প্রাকৃত ভাষায় রচিত জৈন শাস্ত্রের প্রভাব-প্রসঙ্গ আলোচনা কালে বলা হইয়াছে যে, বাংলার ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যগুলির উপর জৈন ধর্মকথার

১. ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা—আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন।

প্রভাব বিদ্যমান। জৈনগণ অপভ্রংশভাষাতেও এই ধরনের ধর্মকথা রচনা করিয়াছিলেন। প্রাকৃত কিংবা অপভ্রংশভাষায় রচিত এই ধর্মকথাগুলির বিষয়, উদ্দেশ্য ও প্রকাশভঙ্গি বাংলা ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যের বিষয়, উদ্দেশ্য ও প্রকাশভঙ্গি হইতে অভিন্ন। ব্রতের মহিমা-খ্যাপন প্রসঙ্গেই ব্রতকথা, মঙ্গল দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার উপলক্ষ্যেই মঙ্গলকাব্য কাহিনী। জৈন কথাগুলিরও একই উদ্দেশ্য। তাহা ছাড়া জৈন ধর্মকথায় যে আশ্চর্য-অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ, অভিশপ্ত কোন বিদ্যাধর বা দেবশিশুর মর্ত্যমানব রূপে জন্মগ্রহণ, প্রেম ও বীরত্বমূলক ক্রিয়াকলাপ ও দক্ষিণ-পাটন যাত্রার উল্লেখ দেখা যায়—বাংলা মঙ্গলকাব্যেও পাওয়া যায় সেই একই বিষয়। উভয়স্থলেই দৈবপ্রভাবে পুরুষের পৌরুষ প্রতিহত এবং শেষপর্যন্ত পুরুষকারের উপর দৈবমহিমার বিজয়। মনে হয়, লোকজগতের সংস্কৃতির সূত্র ধরিয়াই এই সকল কাহিনী ও সংস্কার বাংলা ব্রতকথায় বা মঙ্গলকাব্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বাংলা ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্য মূলতঃ লৌকিক। ক্রমশঃ উহার উপর হিন্দুব্রাহ্মণ্য প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে।

(iii) বাংলার মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও শিবায়ন কাব্যে যে হরগৌরীর লৌকিক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাও অপভ্রংশ কবিতার হরগৌরীর চিত্র হইতে ভিন্ন নয়। বাংলাকাব্যের শিব-পার্বতী অর্ধেক লৌকিক, অর্ধেক পৌরাণিক। লৌকিক অংশ লৌকিক সমাজ ও লৌকিক সাহিত্য হইতেই সমাহৃত। দিগ্‌বসন শিবকে ভিখারী কল্পনা করিয়া অপভ্রংশ কবিতায় পার্বতীর 'বালকুমারো ছয়মুণ্ড ধারী' উক্তিতে যে দারিদ্র্য-দুঃখের ধ্বনি যোজিত হইয়াছে, তাহার দূরাগত সুর শুনা যায় কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ঃ

আছিল ভিক্ষার শেষ পালি দুই ধান।
গণেশের মূষিক করিল জলপান ॥...
বাঘে-বলদে সদাই দ্বন্দ্ব নিবারিব কত।
অভাগিনী গৌরীর দারুণ উপহত ॥

কিংবা রামেশ্বরের পার্বতীর এই খেদ,

নিত্য রান্ধি অদ্যাবধি অন্ত নাহি পাই।
বাপে পুতে খাত্যে দিতে কাকে কত চাই ॥
দাসদাসী দুটি কেহ খাত্যে নাই ত্রুটি।
ঠাকুরের উপায় সে ঠাঁঞি নাই ক্ষিতি ॥

(iv) বাংলার কৃষ্ণকীর্তন বা কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে যে রাধাকৃষ্ণলীলার বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহারও কিছুটা লৌকিক, কিছুটা পৌরাণিক। লোকজগতেই কৃষ্ণের নৌকা-বিলাসাদি পালা প্রচলিত ছিল। এই নৌকা-বিলাসের উপলক্ষ্যে একটি গোপীর (সম্ভবত রাধার) একটি কাতরোক্তি পাওয়া যাইতেছে অপভ্রংশ কবিতার 'অরেরে বাহহি কাণ্হ ণাব' শ্লোকটিতে। ঠিক এই ধরনেরই উক্তি পাওয়া যায় বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে,

মাঝযমুনাত বড় বাত ভআঁ গেল ।
পর্বত সমান ঢেউ নায়ত লাগিল ॥
বাহা বাহা করি তবেঁ রাধিকা ফুকরে
বারেক কর মোর পরাণ উদ্ধারে ॥...
দশনেত তৃন করি বোলোঁ মো তোহ্মারে ।
যেই চাই সেই দিবোঁ কর মোরে পারে ॥ [নৌকাখণ্ড]

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন বাংলাভাষায় দেশী শব্দের প্রভাব দেখাইতে গিয়া গঙ্গাদাসের ছন্দোমঞ্জরী হইতে [ষষ্ঠ স্তবক][১] হইতে একটি অপভ্রংশ শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন,

রাই-দোহড়িপঠণ সুণি হসিঅ কাহ্নু গোআল ।
বিন্দাবন ঘনকুঞ্জঘর চলিও কমণ রসাল ॥

—রাধিকার দোহড়িকা পাঠ শুনিয়া কামুক (কমণ) রসিক (রসাল) গোয়াল কানু হাসিয়া বৃন্দাবনের নিবিড় কুঞ্জঘরের দিকে চলিল ।

বাংলার লৌকিক কণ্হ (কৃষ্ণ) এই কামুক গোয়াল কাহ্নুর প্রতিরূপ ।

(v) অপভ্রংশের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশি বিস্তৃত হইয়াছে বাংলা ছন্দে।[২] প্রাচীন বাংলায় দুই প্রকারের ছন্দ ছিল প্রধান—এক, নির্দিষ্ট মাত্রার দৃষ্টিগ্রাহ্য অক্ষরের ধ্বনিপ্রধান ছন্দ ; দুই, অনির্দিষ্টমাত্রার অক্ষরের (শ্রুতিদ্বারা যে অক্ষরের মাত্রা নিরূপিত হইত) তানপ্রধান ছন্দ। এই দুইটি ছন্দই অপভ্রংশ ছন্দের সাক্ষাৎ বংশধর, তন্মধ্যে তানপ্রধান পয়ার ছন্দে লৌকিক উচ্চারণ-রীতির প্রভাব গুরুতর ।

প্রথমোক্ত ছন্দ অপভ্রংশ ছন্দের নির্দিষ্ট নিয়মানুগ। উহার উচ্চারণ-পদ্ধতি, অক্ষরের মাত্রা-গণনার পদ্ধতি [হ্রস্বস্বরান্ত অক্ষর ১ মাত্রা, দীর্ঘস্বরান্ত অক্ষর ২ মাত্রা, যৌগিক স্বরান্ত ও হলন্ত অক্ষর ২ মাত্রা] নির্দিষ্ট ও নিয়মবন্ধ। চর্যাগানে ও ব্রজবুলিতে এই ছন্দের প্রচুর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় । যথা,

২ ১১ ২ ১১ ২ ২ ২ ২
জো মণ গোঅর আলা জালা

২ ১১ ২ ২ ২২ ২২
আগম পোথী ইষ্টা মালা ॥ [৪০ নং চর্যা]

[ষোল মাত্রার চতুষ্পদী ছন্দ ; দৃষ্টিগাহ্য অক্ষরের মাত্রা সুনির্দিষ্ট]

২ ১১ ২ ১১ ১১১১ ২ ২
কিংবা, মন্দির বাহির কঠিনক পাট ।

১১১১ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ২২
চলইতে শাঙ্কল পঙ্কিল বাট ॥

বাংলার নিজস্ব ছন্দ পয়ার। অনেকেই মনে করেন ষোল মাত্রার অপভ্রংশ

১. কোন কোন পুঁথির মতে পঞ্চম স্তবক ।
২. দ্রষ্টব্য সাহিত্যদীপিকা (ছন্দের অধ্যায়)—শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী ।

পাদকুলক ছন্দ হইতে এই ছন্দ উৎপন্ন। লৌকিক উচ্চারণে ক্রমশঃ অক্ষরের সুনির্দিষ্ট উচ্চারণপদ্ধতি শিথিল হইয়া আসিতেছিল। দেখা যাইতেছিল,

দীহো বিঅ বণ্ণো লহু জীহা পড়ই হোই সে বি লহু।
বণ্ণো বি তুরিঅ পঢ়িও দোত্তিন্নে এক্কং জাণেই ॥

—লঘু জিহ্বায় পড়িলে দীর্ঘ বর্ণও লঘু হইয়া যায় ; তাড়াতাড়ি পড়িলে দুই-তিন বর্ণও এক হয় জানিবে।

অপভ্রংশপাদাকুলক ছন্দেই এই উচ্চারণ-শৈথিল্য বর্তমান ছিল। পিঙ্গলনাগের মতে,

লহগুরু এক ণিঅম ণহি জেহা
পঅপঅ লেক্‌খহি উত্তম রেহা।
সুকইফণিন্দহ কণ্ঠহ বলঅং
সোলহমত্তা পাআকুলঅং ॥[১]

—যেখানে লঘু গুরু উচ্চারণের নিয়ম নাই, পদে পদে লেখা হয় উত্তম রেখা, তাহা সুকবি ফণীন্দ্রের কণ্ঠহার ষোলমাত্রার পাদকুলক।

উচ্চারণ রীতির এই বিশিষ্টতাই দেখা যায় বাংলা ভাষায়। চিত্রিত অক্ষরের নির্দিষ্ট লঘুগুরুভার রক্ষার দায় বাংলার নাই। বাঙালীর কানেই অক্ষরের মাপ। কাজেই গুরু নিয়ম রক্ষা না করার জন্য, দ্রুত পাঠের ফলে দুই-তিন বর্ণকে এক করিয়া উচ্চারণ করার জন্য, বাংলা ছন্দে দেখা দিল তান (টান)—যাহার ফলে অক্ষরমাত্রা নির্ভরশীল হইল শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনির উপর এবং একই অক্ষরের ভারবহন ক্ষমতাও হইল অপরিসীম। ইহার ফলে দৃষ্টিগ্রাহ্য দীর্ঘ অক্ষর কোথাও সংকুচিত হইল, কোথাও একটি অক্ষরে আসিয়া মিলিত হইল দুই-তিনটি বর্ণ। এই মাত্রা-সঙ্কুচনের ফলে ষোলমাত্রার পাদাকুলক বাংলায় হইল চোদ্দ মাত্রার পয়ার। উপরের পাদাকুলক ছন্দের নিময়টিই পয়ার-অনুবাদে এইরূপ দাঁড়ায় ঃ

লঘুগুরু নিয়মের নাহিক বন্ধন।
পদে পদে ফুটি উঠে উত্তম স্পন্দন ॥
কবিবর ফণীন্দ্রের কণ্ঠের বলয়।
তারেই পাদাকুলক ষোলমাত্রা কয় ॥

এই পয়ারই প্রাচীন বাংলার বিশিষ্ট ছন্দ। লোকজগতের শিথিল উচ্চারণ-ভঙ্গিই ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। চরণান্তিক মিলের (অন্ত্যানুপ্রাস রক্ষার) নিয়মটিও অপভ্রংশ ছন্দ হইতে গৃহীত।

ভাব, ভাষা ও ছন্দ—সমস্ত দিক হইতেই অপভ্রংশের উত্তরাধিকার বাংলাসাহিত্যে অনল্প। দেশজ মৃত্তিকার এই পবিত্র দায়ভাগ স্বীকার করিয়াছে বলিয়াই বহুবিচিত্র বাংলাসাহিত্য বহুমুখী হইয়াও চিরকাল মাতৃমুখী।

---

১. এই চতুষ্পদীটিও পাদাকুলক ছন্দের উদাহরণ।

—সমাপ্ত—

নির্ঘণ্ট

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

ঐতিহাসিক রহস্য (২য়, ৩য়) ঃ রামদাস সেন
কাব্যাদর্শ (কঃ বিশ্ববিদ্যালয়) ঃ দণ্ডী
গৌড়ের ইতিহাস ঃ রজনীকান্ত চক্রবর্তী
চিন্ময় বঙ্গ ঃ ক্ষিতিমোহন সেন
ছন্দোমঞ্জরী (গঙ্গাদাস) ঃ সম্পাদক রামধন ভট্টাচার্য
ত্রয়া ঃ ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত
থেরীগাথা ঃ বিজয়চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত
ধ্বন্যালোক ও লোচন ঃ সুবোধ সেনগুপ্ত ও কালিপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত
নাট্যশাস্ত্র (ভরত মুনি) ঃ নির্ণয় সাগর
পটুয়া সঙ্গীত ঃ গুরুসদয় দত্ত
প্রাকৃতসাহিত্য (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ) ঃ মনোমোহন ঘোষ
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ঃ দীনেশচন্দ্র সেন
বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক ঃ শিবরতন মিত্র সম্পাদিত
বঙ্গের কবিতা ঃ অনাথকৃষ্ণ দেব
বিশ্বভারতী পত্রিকা ঃ ষষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস ঃ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
বাংলার লোকসাহিত্য ঃ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
বাঙলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ ঃ ডঃ আশা দেবী
বাঙলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা ঃ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঙ্গালার ইতিহাস ঃ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম, ২য়) ঃ ডঃ সুকুমার সেন
বৌদ্ধ গ্রন্থ কোষ ঃ
ভাষার ইতিবৃত্ত ঃ ডঃ সুকুমার সেন
রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৭ ভাগ ১-৪
শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ ঃ ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত
সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র ঃ রাজকৃষ্ণ ঘোষ সম্পাদিত
সাহিত্যদর্পণ (বিশ্বনাথ) ঃ জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত
সাহিত্য-দীপিকা ঃ জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী
সাহিত্যে ছোটগল্প ঃ ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
হরপ্রসাদ সম্বর্ধন লেখমালা ঃ ১ম ও ২য় খণ্ড
হারামণি (কঃ বিশ্ববিদ্যালয়) ঃ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন
A History of Indian Literature, vol II : M. Winternitz.
Buddhism : Rhys Davids.

Classical Sanskrit Literature : A. B. Keith.
History of Sanskrit Literature : Dr. S. N. Dasgupta & Dr. S. K. De.
History of Sanskrit Literature : Macdonell.
History of Sanskrit Literature : A. B. Keith.
Indian Inheritance : Edt. K. M. Munshi & R. R. Diwakar.
Journal & Text of Buddhist Text Society of India : Edt. S. C. Das.
Original Sanskrit Texts : Muir.
Outlines of Classical Literature : H. R. Rose.
Sanskrit Buddhist Literature of Nepal : Rajendra Lal Mitra.
